জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

দ্বিতীয় খণ্ড



উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা-৩

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের
অধ্যক্ষ কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ
পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৭

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

প্রকাশকের নিবেদন

'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধানতঃ জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, আলোচনা ও লেখা সন্নিবেশিত হইল। স্বামীজী এখানে সহজ সরল স্পষ্ট ও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে অদ্বৈত বেদান্তের আত্মতত্ত্বই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

'জ্ঞানযোগ' পুস্তকের উদ্বোধন-সংস্করণই আমরা অনুসরণ করিয়াছি। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য—'উদ্বোধন' হইতে জ্ঞানযোগের একটি মূল ইংরেজী সংস্করণও বহুদিন যাবৎ প্রকাশিত ছিল। বাংলা 'জ্ঞানযোগ' তাহারই অনুবাদ। 'অদ্বৈত আশ্রম'-সংস্করণের সহিত কোথাও কোথাও সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হইবে।

'জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গ' প্রধানতঃ আত্মতত্ত্ব এবং বেদান্ত-বিষয়ক অন্যান্য বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও আলোচনাগুলির অনুবাদ এই প্রথম পুস্তকাকারে গ্রথিত হইল। অনুবাদগুলি সবই প্রায় নূতন।

তৃতীয় অংশে 'হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত' উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত 'Vedanta Philosophy at the Harvard University' পুস্তিকার অনুবাদ। মধ্যের অংশটি এতদিন বাংলা 'কথোপকথন' পুস্তকের অন্তর্গত ছিল। 'বেদান্তদর্শন' বক্তৃতাটি ও শেষের উত্তরগুলি নূতন অনুবাদ।

তথ্যপঞ্জীতে বিভিন্ন দর্শন ও দার্শনিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় টীকা সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইল।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে যে-সকল লেখক শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য; বর্তমান গ্রন্থাবলীর প্রচ্ছদপট তাঁহারই পরিকল্পনা।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' প্রকাশে আংশিক অর্থসাহায্য করিয়া আমাদের প্রাথমিক প্রেরণা দিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

সূচীপত্র

জ্ঞানযোগ



মায়া

(লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা)

'মায়া' কথাটি আপনারা প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন। সাধারণতঃ কল্পনা বা কুহক বা এইরূপ কোন অর্থে মায়া-শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা উহার প্রকৃত অর্থ নহে। মায়াবাদ-রূপ অন্যতম স্তম্ভের উপর বেদান্ত স্থাপিত বলিয়া মায়ার যথার্থ তাৎপর্য বুঝা আবশ্যক। মায়াবাদ বুঝাইতে হইলে সহসা হৃদয়ঙ্গম না হইবার আশঙ্কা আছে, এজন্য আপনারা কিঞ্চিৎ ধৈর্যের সহিত শ্রবণ করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বৈদিক সাহিত্যে কুহক অর্থেই মায়া-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাই মায়া-শব্দের প্রাচীনতম অর্থ। কিন্তু তখন প্রকৃত মায়াবাদের অভ্যুদয় হয় নাই। বেদে আমরা এইরূপ বাক্য দেখিতে পাই, 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'—ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানা রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এস্থলে মায়া-শব্দ ইন্দ্রজাল বা অনুরূপ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদের অনেক স্থলে মায়া-শব্দ ঐরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। অতঃপর কিছুদিনের জন্য মায়া-শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু এই অবকাশে ঐ শব্দ-প্রতিপাদ্য ভাব ক্রমশই পরিপুষ্ট হইতেছিল। পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, প্রশ্ন করা হইতেছে, 'আমরা জগতের গুপ্ত রহস্য জানিতে পারি না কেন?' ইহার এইরূপ গভীরভাবব্যঞ্জক উত্তর পাওয়া যায়, 'আমরা জল্পক, ইন্দ্রিয়সুখে পরিতৃপ্ত ও বাসনাপর বলিয়া এই সত্যকে নীহারাবৃত করিয়া রাখিয়াছি'—'নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরংতি।'[১] এস্থলে মায়া-শব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু উহাতে এই ভাবটি পরিস্ফুট হইতেছে—আমাদের অজ্ঞতার যে কারণ, তাহা সত্য এবং আমাদের মধ্যে কুজ্ঝটিকাবৎ বর্তমান।

অনেক পরবর্তী কালে অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে 'মায়া'-শব্দের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়। কিন্তু ইতোমধ্যে ইহার প্রভূত রূপান্তর ঘটিয়াছে, ইহার সহিত নূতন অর্থ সংযোজিত হইয়াছে, নানাবিধ মতবাদ প্রচারিত ও পুনরালোচিত হইয়াছে; অবশেষে মায়া-বিষয়ক ধারণা একটি নির্দিষ্ট

১ ঋগ্বেদ—১০ম মণ্ডল, ৮২ সূক্ত, ৭ম ঋক্

ভাব পাইয়াছে। আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাঠ করি, 'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।'—মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। মহাত্মা শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ এই মায়া-শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়, মায়া-শব্দ বা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের দ্বারাও কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের হস্তে ইহা অনেকটা বিজ্ঞানবাদে[১] পরিণত হইয়াছিল এবং 'মায়া' কথাটি এইরূপ অর্থেই এখন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দু যখন বলেন, 'জগৎ মায়াময়', তখন সাধারণ মানবের মনে এই ভাব উদিত হয় যে, জগৎ কল্পনামাত্র। বৌদ্ধ দার্শনিকদের এইরূপ ব্যাখ্যার কিছু ভিত্তি আছে; কারণ এক শ্রেণীর দার্শনিক বাহ্যজগতের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু বেদান্তোক্ত মায়ার শেষ পরিপূর্ণরূপ বিজ্ঞানবাদ, বাস্তববাদ[২] বা কোন মতবাদ নহে। আমরা কি এবং সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনামাত্র।

আপনাদিগকে পূর্বে বলিয়াছি, বেদ যাঁহাদের হৃদয়নিঃসৃত, তাঁহাদের চিন্তাশক্তি মূলতত্ত্বের অনুধাবন ও আবিষ্কারেই অভিনিবিষ্ট ছিল। তাঁহারা যেন এই-সকল তত্ত্বের বিস্তারিত অনুশীলন করিবার অবসর পান নাই এবং সেজন্য অপেক্ষাও করেন নাই। তাঁহারা বস্তুর গভীরতম প্রদেশে উপনীত হইতে ব্যগ্র ছিলেন। এই জগতের অতীত কিছু যেন তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাঁহারা যেন আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। বস্তুতঃ উপনিষদের মধ্যে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানে আলোচিত বিশেষ সিদ্ধান্তগুলি অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইলেও উহাদের মূলতত্ত্বগুলির সহিত বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের কোন প্রভেদ নাই। একটি দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইথর (ether) বা আকাশ-বিষয়ক অভিনব তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে রহিয়াছে। এই আকাশতত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ইথর অপেক্ষা সমধিক পরিপুষ্টভাবে বিদ্যমান। কিন্তু ইহা মূলতত্ত্বেই পর্যবসিত ছিল। তাঁহারা এই আকাশতত্ত্বের কার্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমে

১ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদয় জগৎ আমাদের মনেরই বিভিন্ন অনুভূতিমাত্র, উহাদের বাস্তব সত্তা নাই—এই মতকে বিজ্ঞানবাদ বা Idealism বলে।

২ জগৎ আমাদের মনের অনুভূতিমাত্র নহে, উহার বাস্তব সত্তা আছে—এই মতকে বাস্তববাদ বা Realism বলে।

পণ্ডিত হইয়াছিলেন। জগতের যাবতীয় শক্তি যাহার বিভিন্ন বিকাশমাত্র, সেই সর্বব্যাপী প্রাণ-তত্ত্ব বেদে—উহার ব্রাহ্মণাংশেই পাওয়া যায়। সংহিতার একটি দীর্ঘ মন্ত্রে সকল জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি প্রাণের প্রশংসা আছে। এই প্রসঙ্গে আপনাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হয়তো জানিয়া আনন্দ হইতে পারে যে, আধুনিক ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুযায়ী এই পৃথিবীতে যেভাবে জীব-সৃষ্টি হইল, তাহা বৈদিক দর্শনেও পাওয়া যায়। আপনারা সকলেই নিশ্চয় জানেন যে, জীব অন্য গ্রহাদি হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে—এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। জীব চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আসে—কোন কোন বৈদিক দার্শনিকের ইহাই স্থির বিশ্বাস।

মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা সাধারণ তত্ত্বসকল বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিতে অতিশয় সাহস ও আশ্চর্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন। বাহ্য জগৎ হইতে এই বিশ্ব-রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনে যথাসম্ভব উত্তর তাঁহারা পাইয়াছিলেন। আর তাঁহারা ঐরূপে যে-সকল মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে যখন জগৎ-রহস্যের প্রকৃত মীমাংসা হইল না, তখন আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রমাণসকল উহার মীমাংসায় যে অধিকতর সহায়তা করিবে না, ইহা বলা বাহুল্য। যদি পুরাকালে আকাশ-তত্ত্ব বিশ্বরহস্য-উদ্ঘাটনে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার বিস্তারিত অনুশীলন দ্বারা আমরা সত্যের অভিমুখে অধিক অগ্রসর হইতে পারিব না। যদি এই সর্বব্যাপী প্রাণ-তত্ত্ব বিশ্বতত্ত্ব-নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অনুশীলন নিরর্থক ; কারণ তাহা বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না। আমি বলিতে চাই, তত্ত্বানুশীলনে হিন্দু দার্শনিকগণ আধুনিক পণ্ডিতদিগের ন্যায় এবং কখন কখন তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ছিলেন। তাঁহারা এমন অনেক ব্যাপক সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, যেগুলি আজও সম্পূর্ণ নূতন ; এবং তাঁহাদের গ্রন্থে এইরূপ অনেক মতবাদ আছে, যেগুলি বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ আজও মতবাদরূপে চিন্তা করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যাইতে পারে যে, তাঁহারা কেবল আকাশ-তত্ত্বে উপনীত হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আরও অগ্রসর হইয়া সমষ্টি-মনকেও সূক্ষ্মতর আকাশরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার উচ্চে অধিকতর সূক্ষ্ম আকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কিছুরই মীমাংসা হইল না। এই-সকল তত্ত্ব রহস্যের উত্তরদানে অক্ষম।

কারণ আমি দুঃখ-পীড়িত, সকলেই দুঃখ-পীড়িত হউক—ইহাতেই আমার শান্তি।' এইরূপে আমরা আশাবাদ হইতে নিরাশাবাদে যাইতেছি। অতঃপর মৃত্যুরূপ ভয়াবহ ব্যাপার—সমগ্র সংসারই মৃত্যুর মুখে যাইতেছে; সকলেই মরিতেছে। আমাদিগের উন্নতি, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কার্যকলাপ, সমাজসংস্কার; বিলাসিতা, ঐশ্বর্য, জ্ঞান—মৃত্যুই সকলের শেষ গতি। একমাত্র ইহাই সুনিশ্চিত। নগরাদি হইতেছে, যাইতেছে; সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইতেছে—গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড হইয়া ধূলির মতো চূর্ণ হইয়া বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। অনাদি কাল হইতে এইরূপ চলিতেছে। ইহার লক্ষ্য কি? মৃত্যুই সকলের লক্ষ্য। মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্যের লক্ষ্য, ঐশ্বর্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি ধর্মেরও লক্ষ্য। সাধু ও পাপী মরিতেছে, রাজা ও ভিক্ষুক মরিতেছে—সকলেই মৃত্যুর পথে ধাবমান। তথাপি জীবনের প্রতি এই বিষম আসক্তি রহিয়াছে। জানি না, কেন আমরা এ জীবনের প্রতি আসক্ত, কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। ইহাই মায়া।

জননী সন্তানকে সযত্নে লালন করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত মন, সমস্ত জীবন ঐ সন্তানের প্রতি আসক্ত। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং হয়তো কুচরিত্র ও পশুবৎ হইয়া প্রত্যহ মাতাকে পদাঘাত ও তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপি পুত্রের প্রতি আসক্ত। যখন তাঁহার বিচারশক্তি জাগরিত হয় তখন তিনি পুত্রকে স্নেহের আবরণে আবৃত করিয়া রাখেন। তিনি কিন্তু জানেন না, ইহা স্নেহ নহে—এক অজ্ঞেয় শক্তি তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী অধিকার করিয়াছে। তিনি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি যতই চেষ্টা করুন না, এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। ইহাই মায়া।

আমরা সকলেই কল্পিত স্বর্ণলোমের[১] অন্বেষণে ছুটিয়া চলিয়াছি, প্রত্যেকেরই মনে হয়, আমিই ইহা পাইব; জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন, এই স্বর্ণলোম লাভের সম্ভাবনা তাঁহার হয়তো বিশ লক্ষের মধ্যে এক। তথাপি প্রত্যেকেই উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করেন; ইহাই মায়া।

ইহসংসারে মৃত্যু দিবারাত্র সগর্বে বিচরণ করিতেছে; আমাদের বিশ্বাস—আমরা চিরকাল জীবিত থাকিব। কোন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা

১ Golden Fleece : গ্রীকপুরাণে উহা Argonautic Expedition-নামে খ্যাত।

করা হয়—'এই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য কি?' রাজা উত্তর দিয়াছিলেন, 'প্রত্যহই চারিদিকে মানুষ মরিতেছে, তথাপি মানুষ মনে করে, সে কখনই মরিবে না।' ইহাই মায়া।

আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান ও জীবনের প্রতি ঘটনার মধ্যে সর্বত্রই এই বিষম বিরুদ্ধভাব রহিয়াছে। সুখ দুঃখের এবং দুঃখ সুখের অনুগামী হইতেছে। একজন সংস্কারক আবির্ভূত হইয়া জাতি-বিশেষের দোষসমূহ প্রতিকার করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন; প্রতিকারের পূর্বেই অপর দিকে অন্য সহস্রপ্রকার দোষ দেখা দিল। এ যেন পতনোন্মুখ অট্টালিকার মতো, এক স্থানে জীর্ণসংস্কার করিতে করিতে অপরদিকে ভাঙন ধরে। ভারতীয় নারীগণের বাধ্যতামূলক বৈধব্য-জনিত দুঃখ প্রতিকারের জন্য আমাদের সংস্কারকগণ প্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্যে বিবাহ না হওয়াই প্রধান দোষ। একস্থানে কুমারীদের সাহায্য করিতে হইবে, তাহারা দুঃখ পাইতেছে; অন্যস্থানে বিধবাদের সাহায্য করিতে হইবে, তাহারা কষ্ট পাইতেছে। দেহের পুরাতন বাতব্যাধির মতো মাথা হইতে তাড়িত হইয়া ইহা শরীরের অন্য স্থান আশ্রয় করিতেছে; আবার সেখান হইতে পাদদেশ আক্রমণ করিতেছে। সংস্কারক আসিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন—বিদ্যা ধন কৃষি কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, তাহারা এগুলি সকলের আয়ত্তের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে কেহ কেহ এক হিসাবে কতকটা সুখী হইল বটে, কিন্তু জ্ঞানানুশীলন যতই বেশী হইতে লাগিল, শারীরিক সুখ ততই হয়তো অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এখন সুখের জ্ঞান হইতেই যে দুঃখের জ্ঞান আসিতেছে! কোন্ পথে যাইব? আমরা যে সামান্য সুখ ভোগ করিতেছি, অন্য কোথাও সেই পরিমাণ দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে। ইহাই নিয়ম। যুবকেরা হয়তো ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘদিন জীবিত আছেন, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই মায়া।

দিবারাত্র এই-সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, কিন্তু এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব। এইরূপ হইবার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কারণ প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গতভাবে উত্থাপিতই হইতে পারে না; যাহা ঘটিতেছে তাহার না আছে 'কেন', না আছে 'কি ভাবে'; আমরা শুধু জানি ইহা ঘটিতেছে, আমরা

আর কিছুই করিতে পারি না। আমরা ইহাকে এক মুহূর্তও স্থির রাখিতে পারি না—প্রতি মুহূর্তেই ইহা আমাদের হাতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় কি ভাবে আমরা এ সমস্যার সমাধান করিব—আমরা যে কখন কখন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিয়াছি, পরোপকারের চেষ্টা করিয়াছি, সেইগুলি স্মরণ করিয়া ভাবিতে পারি—কেন, ঐ কাজগুলি তো আমরা বুঝিয়া-সুঝিয়া, ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সেগুলি না করিয়া থাকিতে পারি নাই বলিয়াই ঐরূপ করিয়াছিলাম। আমাকে এই স্থানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে হইতেছে আর আপনাদিগকে বসিয়া উহা শ্রবণ করিতে হইতেছে—ইহাও আমরা না করিয়া থাকিতে পারি না বলিয়াই করিতেছি। আপনারা গৃহে ফিরিয়া যাইবেন, হয়তো কেহ ইহা হইতে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিবেন, অপরে হয়তো মনে করিবেন লোকটা অনর্থক বকিতেছে। আমি বাড়ি যাইয়া ভাবিব, আমি বক্তৃতা দিয়াছি। ইহাই মায়া।

অতএব এই সংসারগতি-বর্ণনার নামই মায়া। সাধারণতঃ লোকে এ কথা শুনিয়া ভয় পায়। আমাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় গোপন করিলে রোগের প্রতিকার হইবে না। কুকুর দ্বারা অনুসৃত হইয়া শশক যেরূপ মাটিতে মাথা লুকাইয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করে, আমরা আশাবাদী বা নিরাশাবাদী হইয়া অবিকল সেই শশকের মতো কাজ করিতেছি। ইহা রোগমুক্তির ঔষধ নহে।

অপর পক্ষে—ইহজীবনের প্রাচুর্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগিগণ এই মায়াবাদ সম্বন্ধে বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করেন। এদেশে—ইংলণ্ডে নিরাশাবাদী হওয়া কঠিন। সকলেই আমাকে বলিতেছেন—জগতের কাজ কি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে! জগৎ কিরূপ উন্নতিশীল! কিন্তু তাঁহারা নিজেদের জীবনকেই তাঁহাদের জগৎ বলিয়া জানেন। পুরাতন প্রশ্ন উঠিতেছে—খ্রীষ্টধর্মই পৃথিবী-মধ্যে একমাত্র ধর্ম, কারণ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিমাত্রেই সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু এইরূপ উক্তি স্ববিরোধী। যেহেতু অখ্রীষ্টান জাতিদের দুর্ভাগ্যই খ্রীষ্টান-জাতির সৌভাগ্যের কারণ। শোষণযোগ্য কতকগুলি জাতি যে চাই। সমস্ত পৃথিবী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হইলে, শিকার-স্বরূপ অখ্রীষ্টান জাতির অস্তিত্ব না থাকিলে খ্রীষ্টানজাতিগুলিই দরিদ্র হইয়া যাইবে। সুতরাং এ যুক্তি নিজেকেই খণ্ডন করিয়াছে। উদ্ভিজ্জ পশ্বাদির খাদ্য, মনুষ্য পশ্বাদির ভোক্তা, এবং

সর্বাপেক্ষা গর্হিত ব্যাপার—মনুষ্য পরস্পরের, দুর্বল বলবানের ভক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ সবত্রই বিদ্যমান। ইহাই মায়া।

এ রহস্যের তুমি কী মীমাংসা কর? আমরা প্রত্যহই অভিনব যুক্তি শুনিয়া থাকি। কেহ বলিতেছেন, চরমে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। স্বীকার করিয়া লইলাম এরূপ সম্ভব, কিন্তু এইরূপ পৈশাচিক উপায়ে মঙ্গল উৎপন্ন হইবার কারণ কি? পৈশাচিক রীতি ব্যতীত শুধু মঙ্গলের মধ্য দিয়া কি মঙ্গল সাধিত হয় না? মানবজাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সুখী হইবে, কিন্তু এখন কেন এই ভয়ানক দুঃখ যন্ত্রণা! ইহার মীমাংসা নাই। ইহাই মায়া।

এরূপ শোনা যায়, দোষাংশের ক্রমপরিহার ক্রমবিকাশবাদের[১] একটি বিশেষত্ব, সংসার হইতে ক্রমাগত এইরূপ দোষভাগ পরিত্যক্ত হইলে অবশেষে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। ইহা শুনিতে অতি সুন্দর। এ সংসারে যাহাদের প্রাচুর্য আছে, যাহাদের প্রত্যহ কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, যাহাদিগকে তথাকথিত ক্রমবিকাশের চক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত তাহাদের দাম্ভিকতা বাড়াইতে পারে। সত্যই ইহা তাহাদের পক্ষে অতিশয় হিতকর ও শান্তিপ্রদ। সাধারণ লোকেরা যন্ত্রণা ভোগ করুক—তাহাদের ক্ষতি কি? সাধারণ লোক মারা যায়—সেজন্য তাহাদের কি? বেশ কথা, কিন্তু এ যুক্তি আগাগোড়া ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ তাহারা বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়া লয় যে, জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অপেক্ষা দোষাবহ এ কথা স্বীকার করা যে, মঙ্গলের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান, এবং অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট। অতএব এমন সময় উপস্থিত হইবে, যখন অমঙ্গল-ভাগ এইরূপে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া একেবারে নিঃশেষিত হইবে, তখন কেবল মঙ্গলই থাকিবে। এরূপ বলা অতি সহজ। কিন্তু অমঙ্গল যে ক্রমশঃ কমিতেছে, ইহা কি প্রমাণ করা যায়? অমঙ্গল কি ক্রমশই বাড়িতেছে না? একজন অরণ্যবাসী মানুষ, যে মনোবৃত্তি-পরিচালনায় অনভিজ্ঞ—একখানি পুস্তকপাঠেও অসমর্থ, হস্তলিপি কাহাকে বলে তাহা শোনে নাই, আজ তাহাকে ক্ষতবিক্ষত কর, কাল সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। শাণিত অস্ত্র তাহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহির করিয়া আনো, তথাপি সে শীঘ্রই

১ Darwin's Theory of Evolution.

আরোগ্যলাভ করিবে; কিন্তু পথ চলিতে একটু আঁচড় লাগিলেই আমরা মরিয়া যাই। শিল্পযন্ত্র দ্রব্যাদি সুলভ করিতেছে, উন্নতি ও ক্রমবিকাশ হইতেছে; কিন্তু একজন ধনী হইবে বলিয়া লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করিতেছে; একজন ধনশালী হইতেছে, একইকালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছে, দলকে দল মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হইতেছে। এইভাবেই চলিয়াছে। পশুমানবের অনুভূতি ইন্দ্রিয়েই আবদ্ধ; যদি সে প্রচুর আহার না পায়, কিংবা যদি তাহার শারীরিক অসুস্থতা ঘটে, সে দুর্দশাগ্রস্ত হয়। ইন্দ্রিয়েই তাহার সুখ-দুঃখের আরম্ভ ও শেষ। যখন এরূপ ব্যক্তির উন্নতি হইতে থাকে, সুখের সীমারেখার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুঃখের পরিধিও সমপরিমাণে বর্ধিত হয়। অরণ্যবাসী মানুষ ঈর্ষা জানে না, বিচারালয় জানে না, নিয়মিত কর দিতে জানে না, সমাজকর্তৃক নিন্দিত হইতে জানে না, পৈশাচিক মানব-প্রকৃতি-সম্ভূত যে ভীষণ শাসনযন্ত্র প্রত্যেকটি মানুষের মনের গোপন কথাও জানিয়া লইতে চায়, তাহা দ্বারা সে দিবারাত্র শাসিত হইতে জানে না। সে জানে না—ভ্রান্ত গর্বিত মানুষ কিরূপে পশু অপেক্ষাও সহস্রগুণে পৈশাচিকস্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আমরা যখনই স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকি, আমাদের সুখানুভবের উচ্চতর শক্তির উন্মেষের সহিত দুঃখানুভবের শক্তিও বিকশিত হয়। স্নায়ুমণ্ডল সূক্ষ্মতর হইয়া অধিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সকল সমাজেই ইহা অহরহঃ দেখা যাইতেছে যে, মূর্খ সাধারণ মানুষ তিরস্কৃত হইলে বেশী দুঃখ অনুভব করে না, কিন্তু প্রহারের আতিশয্য হইলে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। শিক্ষিত ভদ্রলোক কিন্তু একটি কথার তিরস্কারও সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহার স্নায়ুমণ্ডল এত সূক্ষ্ম হইয়াছে! তাঁহার সুখানুভূতি সহজ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার দুঃখও বাড়িয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিতগণের—ক্রমবিকাশবাদীদের মত ইহার দ্বারা বিশেষ প্রমাণিত হয় না। আমাদের সুখী হইবার শক্তি যতই বৃদ্ধি পায়, যন্ত্রণাভোগের শক্তি সেই পরিমাণে বর্ধিত হইয়া থাকে। কখন কখন আমার মনে হয়, আমাদের সুখী হইবার শক্তি যদি সমযুক্তান্তর শ্রেণীর[১] নিয়মে অগ্রসর হয়, অপর দিকে অসুখী হইবার শক্তি সমগুণিতান্তর শ্রেণীর[২] নিয়মে বর্ধিত হইবে। অরণ্যবাসী

১ A. P. (Arithmetical Progression) : ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ..

২ G. P. (Geometrical Progression) : ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ .

মানুষ শরীর সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞ নহে। কিন্তু উন্নতিশীল আমরা জানি, যতই আমরা উন্নত হইব, ততই আমাদের সুখদুঃখের অনুভবশক্তি তীব্র হইবে। ইহাই মায়া।

অতএব আমরা দেখিতেছি, মায়া সংসার-রহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত মতবাদবিশেষ নহে,—সংসারের ঘটনা যেভাবে বর্তমান রহিয়াছে, তাহারই বর্ণনামাত্র। বিরুদ্ধভাবই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি; সর্বত্র এই ভয়ানক বিরুদ্ধভাবের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি। যেখানে মঙ্গল, সেইখানেই অমঙ্গল। যেখানে অমঙ্গল, সেইখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন সেইখানেই ছায়ার মতো মৃত্যু তাহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাসিতেছে, তাহাকে কাঁদিতে হইবে; যে কাঁদিতেছে, সে হাসিবে। এ অবস্থার প্রতিকারও সম্ভব নয়। আমরা অবশ্য এমন স্থান কল্পনা করিতে পারি, যেখানে কেবল মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল থাকিবে না; যেখানে আমরা কেবল হাসিব, কাঁদিব না। কিন্তু যখন এই-সকল কারণ সমভাবে সর্বত্র বিদ্যমান, তখন এরূপ সংঘটন স্বতই অসম্ভব। যেখানে আমাদিগকে হাসাইবার শক্তি আছে, কাঁদাইবার শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যেখানে সুখোৎপাদক শক্তি বর্তমান, দুঃখজনক শক্তিও সেইখানে লুকায়িত।

অতএব বেদান্তদর্শন আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী নহে। বেদান্ত এই দুই মতবাদই প্রচার করিতেছে; ঘটনাসকল যেভাবে বর্তমান, বেদান্ত সেভাবে সেগুলি গ্রহণ করিতেছে; অর্থাৎ বেদান্তমতে এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ; একটিকে বর্ধিত কর, অপরটিও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে। কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হইতে পারে না। এরূপ ধারণাই স্ববিরোধী। কিন্তু এরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা বেদান্ত এই একটি মহারহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পৃথক্ সত্তা নহে। এই সংসারে এমন একটি বস্তু নাই, যাহা সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক বা সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। একই ঘটনা, যাহা আজ শুভজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, কাল তাহাই আবার অশুভ বোধ হইতে পারে। একই বস্তু, যাহা একজনকে দুঃখী করিতেছে, তাহাই আবার অপরের সুখ উৎপাদন করিতে পারে। যে অগ্নি শিশুকে দগ্ধ করে, তাহাই আবার অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির উপাদেয় আহার রন্ধন করিতে পারে।

যে স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা দুঃখবোধ অন্তরে প্রবাহিত হয়, সুখবোধও তাহারই দ্বারা অন্তরে নীত হয়। অমঙ্গল-নিবারণের একমাত্র উপায় মঙ্গল-নিবারণ; উপায়ান্তর নাই, ইহা নিশ্চিত। মৃত্যু বারণ করিতে হইলে জীবনও বারণ করিতে হইবে। মৃত্যুহীন জীবন ও দুঃখহীন সুখ স্ববিরোধী বাক্য, কোনটিকেই একা পাওয়া যায় না। দুই-ই একই বস্তুর বিকাশ। গতকাল যাহা শুভদায়ক মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা করি না। যখন আমরা অতীত জীবন পর্যালোচনা করি, বিভিন্ন সময়ের আদর্শসকল আলোচনা করি, তখনই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করি। এক সময়ে তেজস্বী অশ্বযুগল চালনা করাই আমার জীবনের আদর্শ ছিল। এখন এরূপ চিন্তা করি না। শৈশবাবস্থায় মনে করিতাম, মিষ্টান্ন-বিশেষ প্রস্তুত করিতে পারিলে আমি খুব সুখী হইব। অন্য সময়ে মনে হইত, স্ত্রীপুত্র ও প্রচুর টাকাকড়ি হইলেই যথার্থ সুখী হইব। এখন এগুলিকে ছেলেমানুষি মনে করিয়া হাসিয়া থাকি।

বেদান্ত বলেন, এমন এক সময় আসিবেই আসিবে, যখন আমরা পিছনের দিকে তাকাইব, এবং যে-সকল ভাবাদর্শের জন্য আমরা ব্যক্তিত্ব পরিহার করিতে ভয় পাইতেছি, সেগুলিকে আমরা বিদ্রূপ করিব। সকলেই নিজ দেহ বাঁচাইয়া রাখিতে ব্যগ্র, কেহই ইহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই দেহ যতকাল ইচ্ছা ততকাল রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব, আমরা এইরূপই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন এ কথা স্মরণ করিয়া আমরা হাসিয়া উঠিব। অতএব যদি আমাদের বর্তমান অবস্থা সত্যও নয়, অসত্যও নয়, উভয়ের সংমিশ্রণ—দুঃখও নয়, সুখও নয়, উভয়ের সংমিশ্রণ—এইরূপ বিষমবিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়, তবে বেদান্তের আবশ্যকতা কি? অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মমতগুলিরই বা প্রয়োজন কি? সর্বোপরি শুভকর্ম করিবারই বা কি প্রয়োজন? এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়। লোকে জিজ্ঞাসা করিবে—যদি অশুভ ছাড়া শুভ হয় না, যদি সুখ উৎপন্ন করিতে গেলেই সর্বদা দুঃখও উৎপন্ন হয়, তবে এ-সকলের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে বলা যায়—প্রথমতঃ দুঃখ লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে তোমাকে কর্ম করিতেই হইবে, কারণ নিজেকে সুখী করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে, শীঘ্র বা বিলম্বে হউক, ইহার যথার্থতা বুঝিয়া থাকি। তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক কিছু সত্বর, জড়বুদ্ধি কিছু বিলম্বে ইহা বুঝিতে পারেন। জড়বুদ্ধি লোক উৎকট যন্ত্রণা

ভোগ করিয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অল্প যন্ত্রণা পাইয়া ইহা আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগকে আমাদের কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে, কারণ সুখদুঃখময় বিপরীতভাবপূর্ণ জীবনের বাহিরে যাইবার ইহাই একমাত্র পথ। সুখ ও দুঃখ—উভয় শক্তিই জগৎকে আমাদের জন্য জীবন্ত রাখিবে, যতদিন না আমরা স্বপ্ন হইতে জাগরিত হই এবং এই মাটির পুতুল গড়া পরিত্যাগ করি। আমাদের এ শিক্ষালাভ করিতে হইবে; আর ইহা শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে।

'অনন্তই সান্ত হইয়াছেন'—জার্মানিতে এই সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর দর্শন-শাস্ত্র-প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ চেষ্টা এখনও ইংলণ্ডে হইতেছে। কিন্তু এই-সকল দার্শনিকের মত বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়—অনন্তস্বরূপ[১] নিজেকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। একদিন অনন্ত নিজেকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা অতি শ্রুতিমধুর এবং আমরা অনন্ত, বিকাশ, অভিব্যক্তি প্রভৃতি দার্শনিক শব্দও ব্যবহার করিলাম। কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করেন: সান্ত কিরূপে অনন্ত হইতে পারে, এ সিদ্ধান্তের ন্যায়ানুগত মূলভিত্তি কি? নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা সোপাধিক হইয়াই এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এস্থলে সকলই সীমাবদ্ধ থাকিবে। যাহা কিছু ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধির মধ্য দিয়া আসিবে, তাহাকে স্বতই সীমাবদ্ধ হইতে হইবে; অতএব সসীমের অসীমত্ব-প্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভব। ইহা হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে বেদান্ত বলিতেছেন, সত্য বটে নিরপেক্ষ বা অনন্ত সত্তা নিজেকে সান্তরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন এই উদ্যোগ অসম্ভব বুঝিয়া তাহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। এই পশ্চাৎপদ হওয়াই যথার্থ ধর্মের আরম্ভ। বৈরাগ্যই ধর্মের সূচনা। আজকাল বৈরাগ্য-বিষয়ে কথা বলা বড় অপ্রীতিকর। আমেরিকায় আমাকে বলিত, আমি যেন পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বের কোন অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ হইতে আসিয়া বৈরাগ্যবিষয়ে উপদেশ দিতেছি। ইংলণ্ডের দার্শনিকগণও হয়তো এইরূপই বলিবেন। কিন্তু বৈরাগ্যই সত্য এবং ধর্মলাভের একমাত্র পথ। চেষ্টা করিয়া

১ Hegel's Absolute Mind

দেখ, যদি অন্য পথ খুঁজিয়া পাও ; কখনই পাইবে না। এমন সময় আসিবে, যখন অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠিবে, এই দীর্ঘ বিষাদময় স্বপ্নদর্শন হইতে জাগ্রত হইবে ; শিশু খেলা ছাড়িয়া জননীর নিকট ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইবে, বুঝিবে :

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে ব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥[১]

—কাম্যবস্তুর উপভোগে বাসনার কখনও নিবৃত্তি হয় না, ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নির মতো বাসনা বরং বাড়িতেই থাকে। এইরূপ কি ইন্দ্রিয়বিলাস, কি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাজনিত আনন্দ, কি মানবাত্মার উপভোগ্য সর্ববিধ সুখ—সবই শূন্য, সকলই মায়ার অন্তর্গত। সকলই এই সংসারজালের অন্তর্গত, আমরা উহাকে অতিক্রম করিতে পারি না। আমরা মায়াজালের মধ্যে অনন্তকাল ছুটাছুটি করিতে পারি, কিন্তু শেষ পাইব না ; এবং যখনই এক কণা সুখ পাইবার চেষ্টা করিব, তখনই রাশি রাশি দুঃখ আমাদিগকে চাপিয়া ধরিবে। কি ভয়ানক অবস্থা ! যখন আমি ব্যাপারটি ভাবিতে চেষ্টা করি, আমার নিঃসংশয় অনুভূতি হয়, ইহাই মায়াবাদ—সকলই মায়া ; এই বাক্যই ইহার একমাত্র এবং সর্বাপেক্ষা ভাল ব্যাখ্যা। এ সংসারে কি দুঃখরাশিই না বর্তমান ! যদি আপনারা বিবিধ জাতির মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, বুঝিতে পারিবেন যে, এক জাতি তাহার দোষভাগ এক উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, অপর জাতি অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছে। সেই একই দোষ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হয় নাই। যদি দোষগুলি ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া একদিকে নিবদ্ধ করা যায়, অপরদিকে রাশি রাশি অশুভ সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার গতিই এইরূপ। হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে কতকটা সতীত্ব-ধর্মের আদর্শ উচ্চে স্থাপন করিবার জন্য বাল্যবিবাহ দ্বারা তাহাদের সন্তানগণকে এবং ক্রমে সমগ্র জাতিকে অধঃপাতিত করিয়াছে। কিন্তু এ কথাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, বাল্যবিবাহ হিন্দুজাতিকে পবিত্রতায় ভূষিত করিয়াছে। কি চাও ? যদি জাতিকে সতীত্বধর্মে সমধিক ভূষিত করিতে চাও তাহা হইলে এই বাল্যবিবাহ দ্বারা সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের শরীর দুর্বল করিতে হইবে। অপরদিকে ইংলণ্ডে তোমাদের অবস্থাই কি খুব ভাল ? কখনই নয়। কারণ

১ বিষ্ণুপুরাণ—৪।১০।৯

পবিত্রতাই জাতির জীবনী-শক্তি। তুমি কি ইতিহাসে লক্ষ্য কর নাই যে, অপবিত্রতার মধ্য দিয়াই জাতির মৃত্যুচিহ্ন দেখা দেয়?—যখন যৌন অপবিত্রতা কোন জাতির মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই বুঝিতে হইবে উহার বিনাশ আসন্ন। এই-সকল দুঃখজনক সমস্যার মীমাংসা কোথায়? যদি পিতা-মাতা নিজ সন্তানের জন্য পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করেন, তাহা হইলে এই দোষ অনেকটা নিবারিত হয়। ভারতের কন্যাগণ যতটা ভাবপ্রবণ তদপেক্ষা অধিক কার্যকুশল। তাহাদের জীবনে কাব্য খুবই কম। কিন্তু যদি লোকে নিজেরাই স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন করে, তাহাতেও অধিক সুখ হয় না। ভারতীয় নারীগণ সাধারণতঃ বেশ সুখী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ খুব বেশী হয় না। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্রে—যেখানে স্বাধীনতার আতিশয্য বিদ্যমান, সেখানে অসুখী পরিবার ও দুঃখকর বিবাহের সংখ্যা অনেক। আমি যে-কোন সভায় গিয়াছি, সেখানেই শুনিয়াছি—সভায় উপস্থিত এক-তৃতীয়াংশ নারী তাহাদের পতিপুত্রকে দূর করিয়া দিয়াছে। এইরূপই সর্বত্র। ইহাতে কি প্রকাশ পাইতেছে? প্রকাশ পাইতেছে যে, এই-সকল আদর্শ দ্বারা অধিকতর সুখ অর্জিত হয় নাই। আমরা সকলেই সুখের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একদিকে কিছু সুখ পাইতে না পাইতেই অন্যদিকে দুঃখ উপস্থিত হইতেছে।

তবে কি আমরা শুভ কর্ম করিব না? করিব বইকি—পূর্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহের সহিত আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান আমাদের উৎকট বাড়াবাড়ি ও ধর্মান্ধতা দূর করিবে। ইংরেজ আর উত্তেজিত হইয়া হিন্দুকে 'ওঃ পৈশাচিক হিন্দু! নারীগণের প্রতি কি অসৎ ব্যবহার করে!'—এই বলিয়া অভিশাপ দিবে না। সে বিভিন্ন জাতির রীতিনীতি মান্য করিতে শিখিবে। ধর্মান্ধতা অল্প হইবে এবং কাজ বেশী হইবে। ধর্মান্ধ লোকেরা কাজ করিতে পারে না। তাহারা শক্তির তিন-চতুর্থাংশ বৃথা ব্যয় করে। ধীর প্রশান্তচিত্ত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই কাজ করেন; অতএব এই জ্ঞান দ্বারা কাজ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। অবস্থা এইরূপই জানিয়া তিতিক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। দুঃখ ও অমঙ্গল আমাদিগকে ভারসাম্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না এবং ছায়ার পিছনে ধাবিত করিবে না। সুতরাং সংসারগতি এইরূপ জানিয়া আমরা সহিষ্ণু হইব। ধরা যাক, সকল মানুষই

দোষশূন্য হইবে, তারপর পশুকুল ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং পূর্ববৎ সব অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে, উদ্ভিদ্‌দিগেরও গতি ঐরূপ। কিন্তু কেবল একটা জিনিস সুনিশ্চিত—এই মহতী নদী সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, উহার জলবিন্দুগুলির প্রত্যেকটি অনন্ত বারিধিবক্ষে বিলীন হইবে। অতএব সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ, আনন্দ হাস্য ও ক্রন্দনের সহিত জীবন যে সেই অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে, ইহা নিশ্চিত।—তুমি আমি, জীব উদ্ভিদ ও সামান্য জীবাণুপর্যন্ত, যে যেখানে রহিয়াছে, সকলেই সেই অনন্ত জীবন-সমুদ্রে উপনীত হইবে, মুক্তি বা ঈশ্বর লাভ করিবে, ইহা কেবল সময়সাপেক্ষ।

পুনরায় বলিতেছি, বেদান্ত আশাবাদী বা নিরাশাবাদী নহে। এ সংসার কেবল মঙ্গলময় বা কেবল অমঙ্গলময়—এইরূপ মত বেদান্ত ব্যক্ত করে না। বেদান্ত বলিতেছে, মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই মূল্য সমান। ইহারা এইরূপে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সংসার এইরূপ জানিয়া সহিষ্ণুতার সহিত কর্ম কর। কি জন্য কর্ম করিব? যদি সংসারের অবস্থা এইরূপ, আমরা কি করিব? অজ্ঞেয়বাদী হই না কেন? আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীরাও জানেন, এ রহস্যের মীমাংসা নাই, বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে -এই মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি নাই। অতএব সন্তুষ্ট হইয়া জীবন ভোগ কর। এখানেও একটি অতি অসঙ্গত মহাভ্রম রহিয়াছে। তুমি যে-জীবন দ্বারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছ, সেই জীবন সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান কিরূপ? জীবন বলিতে তুমি কি কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ জীবনই বুঝ? ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আমরা পশু হইতে সামান্যই ভিন্ন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এ-স্থানে উপস্থিত এমন কেহ নাই যাঁহার জীবন কেবল ইন্দ্রিয়েই আবদ্ধ। অতএব আমাদের বর্তমান জীবন বলিতে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আরও কিছু বেশী বুঝায়। আমাদের সুখদুঃখের অনুভব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তাশক্তিও তো আমাদের জীবনের প্রধান অঙ্গ, আর সেই উচ্চ আদর্শ ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার কঠোর চেষ্টাও কি আমাদের জীবনের উপাদান নহে? অজ্ঞেয়বাদীদের[১] মতে জীবন যেভাবে আছে, সেইভাবেই উহাকে ভোগ করা কর্তব্য। কিন্তু জীবন

১ Spencer's Agnosticism

বলিলে সর্বোপরি আদর্শ-অন্বেষণের—পূর্ণতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রবল চেষ্টাও বুঝায়। আমাদের এই আদর্শ লাভ করিতেই হইবে। অতএব আমরা অজ্ঞেয়বাদী হইতে পারি না এবং জগৎ যেভাবে প্রতীয়মান হয়, সেভাবে উহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। অজ্ঞেয়বাদী জীবনের আদর্শ-ভাগ বর্জন করিয়া বাকীটুকু সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। এই আদর্শ লাভ করা অসম্ভব জানিয়া তিনি ইহার অন্বেষণই পরিত্যাগ করেন। ইহাই স্বভাব, ইহাই জগৎ; ইহাই মায়া।

বেদান্তমতে ইহাই প্রকৃতি। কিন্তু কি দেবোপাসনা প্রতীকোপাসনা বা দার্শনিক চিন্তা অবলম্বনপূর্বক আচরিত ধর্ম, অথবা দেবতা পিশাচ প্রেতের গল্প, সাধু ঋষি মহাত্মা বা অবতারের চরিতকথার সাহায্যে অনুষ্ঠিত অপরিণত বা উন্নত ধর্মমতগুলির উদ্দেশ্য একই। সকল ধর্মই ইহাকে—এই প্রকৃতির বন্ধনকে অতিক্রম করিবার অল্পবিস্তর চেষ্টা করিতেছে। এক কথায় সকলেই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে কঠোর চেষ্টা করিতেছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ বুঝিয়াছে, সে বন্দী। সে যাহা হইতে ইচ্ছা করে, সে তাহা নয়। যে সময়ে—যে মুহূর্তে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছে, সেই মুহূর্তেই তাহাকে শেখানো হইয়াছে, তখনই সে অনুভব করিয়াছে—সে বন্দী। সে আরও বুঝিয়াছে, এই সীমাশৃঙ্খলিত হইয়া তাহার অন্তরে কে যেন রহিয়াছেন, যিনি দেহ যেখানে যাইতে পারে না, সেখানে যাইতে চাহিতেছেন। দুর্দান্ত, নৃশংস, আত্মীয়-স্বজনের গৃহসন্নিধানে গোপনে অবস্থিত, হত্যাপ্রিয় ও তীব্র সুরাপ্রিয়, মৃত পিতৃপুরুষ বা অন্য ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী অতি নিম্ন ধর্মমতগুলিতে আমরা সেই একই প্রকার মুক্তির ভাব দেখিতে পাই। যাঁহারা দেবতার উপাসনা ভালবাসেন, তাঁহারা সেই-সকল দেবতার মধ্যে নিজেদের অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা দেখিতে পান—গৃহের দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও দেবতারা প্রাচীরের মধ্য দিয়া আসিতে পারেন; প্রাচীর তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। এই মুক্তির ভাব ক্রমেই বর্ধিত হইয়া অবশেষে সগুণ ঈশ্বরের আদর্শে উপনীত হয়। ঈশ্বর প্রকৃতির পারে, ঈশ্বর মায়াতীত—ইহাই সেই আদর্শের কেন্দ্রগত ভাব।

আমি যেন শুনিতেছি, সম্মুখে কোন কণ্ঠস্বর উত্থিত হইতেছে, যেন অনুভব করিতেছি—ভারতের সেই প্রাচীন আচার্যগণ অরণ্যাশ্রমে এই-সকল প্রশ্ন বিচার

করিতেছেন, বৃদ্ধ ও পবিত্র শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ উহার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু একটি যুবক সেই সভামধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছে: হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি, যিনি অন্ধকারের পারে, তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়।[১]

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

উপনিষদ্ হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি যে, মায়া আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং উহা অতি ভয়ঙ্কর। তথাপি মায়ার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইবে। যিনি বলেন, 'এই নদীতীরে বসিয়া থাকি, সমস্ত জল যখন সমুদ্রে চলিয়া যাইবে তখন নদী পার হইব', তিনি যেমন সফল হন, আর যিনি বলেন, 'পৃথিবী পূর্ণমঙ্গলময় হইলে পর কাজ করিব এবং জীবন উপভোগ করিব', তিনিও সেইরূপ সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন। মায়ার অনুকূলে পথ নাই, মায়ার বিরুদ্ধে গমনই পথ—এ কথাও শিক্ষা করিতে হইবে। আমরা প্রকৃতির সহায়ক হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু তাহার প্রতিযোগী হইয়াই জন্মিয়াছি। আমরা বন্ধনের কর্তা হইয়াও নিজদিগকে বদ্ধ করিতেছি। এই বাড়ি কোথা হইতে আসিল? প্রকৃতি ইহা দেয় নাই। প্রকৃতি বলিতেছে—'যাও, বনে গিয়া বাস কর।' মানব বলিতেছে—'আমি বাটী নির্মাণ করিব, প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিব।' সে তাহাই করিতেছে। তথাকথিত প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত অবিরাম সংগ্রামই মানবজাতির ইতিহাস এবং মানবই অবশেষে জয়ী হয়। অন্তর্জগতে আসিয়া দেখ, সেখানেও সেই সংগ্রাম চলিয়াছে, ইহা পশু-মানব ও আধ্যাত্মিক-মানবের সংগ্রাম, আলোক ও অন্ধকারের সংগ্রাম, মানুষ এখানেও বিজেতা। প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানুষ আপনার মুক্তির পথ করিয়া লয়।

১ শ্বেতাশ্বতর উপ ২।৫ ও ৩।৮

অতএব আমরা দেখিতেছি, এই মায়া অতিক্রম করিয়া বৈদান্তিক দার্শনিকগণ এমন কিছু জানিয়াছেন, যাহা মায়াধীন নহে; যদি আমরা সে অবস্থায় উপনীত হইতে পারি, আমরাও মায়ার পারে যাইব। ঈশ্বরবাদী সমস্ত ধর্মেরই ইহা সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু বেদান্তমতে ইহা ধর্মের আরম্ভমাত্র, শেষ নহে। যিনি বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা, যিনি মায়াধীশ, মায়া বা প্রকৃতির অধীশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেই সগুণ ঈশ্বরের জ্ঞান এই বেদান্তভাবের শেষ কথা নহে। এই জ্ঞান ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। অবশেষে বৈদান্তিক দেখেন, যাঁহাকে বাহিরে বোধ হইয়াছিল, তিনি নিজেই সেই, তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্তরেই ছিলেন। যিনি সীমার মধ্যে আপনাকে বদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মুক্ত-স্বরূপ।

মানুষের যথার্থ স্বরূপ

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

মানুষ এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে এতটা আসক্ত যে, সহজে সে উহা ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু এই বাহ্য জগৎকে যতদূর সত্য ও সার বলিয়া বোধ হউক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন একটি সময় আসে, যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়—জগৎ কি সত্য? যে ব্যক্তি তাহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্রও সময় পায় না, যাহার জীবনের প্রতি মুহূর্তই কোন না কোনরূপ বিষয়-ভোগে নিযুক্ত, মৃত্যু তাহারও নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকেও বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়—জগৎ কি সত্য? এই প্রশ্নেই ধর্মের আরম্ভ এবং ইহার উত্তরেই ধর্মের পরিসমাপ্তি। এমন কি প্রণালীবদ্ধ ইতিহাসেরও পূর্বে, সুদূর অতীত কালে, সভ্যতার অস্ফুট উষাকালেও—সেই রহস্যময় পৌরাণিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই, এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে: 'জগৎ কি সত্য?'

কবিত্বময় কঠোপনিষদের প্রারম্ভে আমরা এই প্রশ্ন দেখিতে পাই: কেহ বলেন, 'মানুষ মরিয়া গেলে তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না', আবার

কেহ বলেন, 'না, তখন তাহার অস্তিত্ব থাকে'। ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য?[১]

এ প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। যাবতীয় দর্শন ও ধর্ম প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নেরই বিভিন্ন প্রকার উত্তরে পরিপূর্ণ। 'এর পরে কি? প্রকৃত সত্য কি?'—অনেকে আবার এই প্রশ্নকে, প্রাণের এই অশান্ত জিজ্ঞাসাকে থামাইয়া দিতে—দাবাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন জগতে মৃত্যু বলিয়া কিছু থাকিবে, ততদিন এই দাবাইয়া দিবার চেষ্টা সর্বদা বিফল হইবে। আমরা মুখে খুব সহজে বলিতে পারি—জগতের অতীত সত্তার অন্বেষণ করিব না, বর্তমান মুহূর্তেই আমাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আবদ্ধ রাখিব. ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর চিন্তা করিব না বলিয়া খুব চেষ্টা করিতে পারি, আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের সব কিছু আমাদিগকে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিতে পারে, সমুদয় জগৎ মিলিয়া বর্তমানের ক্ষুদ্র সীমার বাহিরে দৃষ্টি-প্রসারণে বাধা দিতে পারে; কিন্তু যতদিন জগতে মৃত্যু থাকিবে, ততদিন এই প্রশ্ন বারংবার জিজ্ঞাসিত হইবে: আমরা এই যে-সকল বস্তুকে সত্যের সত্য, সারের সার বলিয়া ঐগুলির প্রতি আসক্ত, মৃত্যুই কি ইহাদের চরম পরিণাম? জগৎ তো এক মুহূর্তেই ধ্বংস হইয়া কোথায় চলিয়া যায়! গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ পর্বত, নিম্নে অতল গহ্বর—যেন মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। এই পাহাড়ের ধারে দাঁড়াইয়া যত কঠোর অন্তঃকরণই হউক, নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিবে আর জিজ্ঞাসা করিবে—'এ-সব কি সত্য?' কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তি সারা জীবন ধরিয়া, সমস্ত শক্তি দিয়া একটু একটু করিয়া যে আশার সৌধ নির্মাণ করিলেন, এক মুহূর্তে তাহা উড়িয়া গেল। এগুলি কি সত্য? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে। কালক্রমে এই প্রশ্নের শক্তি হ্রাস পাইবে না, বরং কালস্রোতে যতই উহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ততই উহা হৃদয়ের উপর গভীর বেগে আঘাত করিবে।

দ্বিতীয় কথা হইতেছে—মানুষের সুখী হইবার ইচ্ছা। আপনাকে সুখী করিবার জন্য মানুষ সব কিছুর পশ্চাতে ধাবিত হয়—ইন্দ্রিয়ের পিছনে পিছনে ছুটিয়া উন্মত্তের ন্যায় বহির্জগতের কাজ করিয়া যায়। যে যুবক জীবন-সংগ্রামে

১ যেয়ম্ প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। কঠ উপ. ১।১।২০

কৃতকার্য হইয়াছে, তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে এই জগৎ সত্য—সব কিছু তাহার সত্য বলিয়া মনে হয়। হয়তো সেই যখন বৃদ্ধ হইবে, ভাগ্য-দ্বারা বার'বার বঞ্চিত হইয়া হয়তো সেই ব্যক্তিই জিজ্ঞাসিত হইলে বলিবে, 'সবই অদৃষ্ট।' সে এতদিনে দেখিতে পাইল—বাসনা পূর্ণ হয় না। সে যেখানেই যায়, সেখানেই দেখে এক বজ্রদৃঢ় প্রাচীর, তাহা অতিক্রম করিয়া যাইবার সাধ্য তাহার নাই। প্রতিটি ইন্দ্রিয়কর্ম প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়। সবই ক্ষণস্থায়ী। সুখ-দুঃখ, বিলাস-বিভব, ক্ষমতা-দারিদ্র্য— এমন কি জীবন পর্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

এই সমস্যার দুইটি সিদ্ধান্ত আছে। একটি—শূন্যবাদীদের মতো বিশ্বাস কর যে, সবই শূন্য, আমরা কিছুই জানি না, আমরা ভূত ভবিষ্যৎ, এমন কি বর্তমান সম্বন্ধেও কিছুই জানিতে পারি না। কারণ, যে ভূত-ভবিষ্যৎ অস্বীকার করিয়া কেবল বর্তমান স্বীকার করিয়া উহাতেই আবদ্ধ থাকিতে চাহে, সে বাতুল। তাহা হইলে সে পিতামাতাকে অস্বীকার করিয়াও সন্তানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে। ইহাও যুক্তিসঙ্গত হইয়া পড়ে। ভূত-ভবিষ্যৎ অস্বীকার করিলে বর্তমানও অস্বীকার করিতে হইবে। এই এক সিদ্ধান্ত—ইহা শূন্যবাদীর মত। কিন্তু আমি এমন লোক কখনও দেখি নাই, যে এক মিনিটের জন্য শূন্যবাদী হইতে পারে; মুখে ইহা বলা অবশ্য খুব সহজ।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই—এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর অন্বেষণ কর, সত্যের অন্বেষণ কর, এই নিত্যপরিবর্তনশীল নশ্বর জগতের মধ্যে কি সত্য আছে, অন্বেষণ কর। এই দেহ, যাহা কতকগুলি জড় পদার্থের অণুর সমষ্টিমাত্র, ইহার মধ্যে কি কিছু সত্য আছে? মানব-মনের ইতিহাসে বরাবর এই তত্ত্বের অনুসন্ধান হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কালেই মানবের মনে এই তত্ত্বের অস্ফুট আলোক প্রতিভাত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, তখন হইতেই মানুষ স্থূলদেহের অতীত অন্য একটি দেহের জ্ঞানলাভ করিয়াছে, উহা অনেকাংশে ঐ দেহেরই মতো বটে, কিন্তু স্থূল দেহ অপেক্ষা পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ—শরীরের ধ্বংস হইলেও উহার ধ্বংস হইবে না। আমরা ঋগ্বেদের সূক্তে মৃতশরীর-দহনকারী অগ্নিদেবের উদ্দেশে নিম্নলিখিত স্তব দেখিতে পাই: 'হে অগ্নি, তুমি ইহাকে তোমার হাতে ধরিয়া মৃদুভাবে লইয়া যাও—ইহার শরীর সর্বাঙ্গসুন্দর জ্যোতির্ময় কর; ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও, যেখানে পিতৃগণ বাস করেন, যেখানে দুঃখ নাই, যেখানে মৃত্যু নাই।'

দেখিবে, সকল ধর্মেই এই একই প্রকার ভাব বিদ্যমান, এবং তাহার সহিত আমরা আর একটি তত্ত্বও পাইয়া থাকি। আশ্চর্যের বিষয়, সকল ধর্মই সমস্বরে ঘোষণা করেন, মানুষ প্রথমে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিল, এখন তাহার অবনতি হইয়াছে—এ ভাব তাঁহারা রূপকের ভাষায়, কিংবা দর্শনের সুস্পষ্ট ভাষায়, অথবা সুন্দর কবিত্বের ভাষায়, যেভাবেই প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহারা সকলেই কিন্তু ঐ এক তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন। সকল শাস্ত্র এবং সকল পুরাণ হইতেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্বে যাহা ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অবনত হইয়া পড়িয়াছে। য়াহুদীদের শাস্ত্র বাইবেলের পুরাতন ভাগে আদমের পতনের যে-গল্প আছে, ইহাই তাহার সারাংশ। হিন্দুশাস্ত্রে এই তত্ত্ব পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা সত্যযুগ বলিয়া যে-যুগের বর্ণনা করিয়াছেন—যখন মানুষের ইচ্ছামৃত্যু ছিল, তখন মানুষ যতদিন ইচ্ছা শরীর রক্ষা করিতে পারিত, তখন লোকের মন শুদ্ধ ও সংযত ছিল, তাহাতেও এই সবজনীন সত্যের ইঙ্গিত দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, তখন মৃত্যু ছিল না এবং কোনরূপ অশুভ বা দুঃখ ছিল না, আর বর্তমান যুগ সেই উন্নত অবস্থারই অবনতভাব। এই বর্ণনার সহিত আমরা সর্বত্রই জলপ্লাবনের বর্ণনা দেখিতে পাই। এই জলপ্লাবনের গল্পেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সকল ধর্মই বর্তমান যুগকে প্রাচীন যুগের অবনত অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জগৎ ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। অবশেষে জলপ্লাবনে অধিকাংশ লোকই জলমগ্ন হইয়া গেল। আবার উন্নতি আরম্ভ হইল। মানুষ আবার উহার সেই পূর্ব পবিত্র অবস্থা লাভ করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

আপনারা সকলেই ওল্ড টেস্টামেণ্টের জলপ্লাবনের গল্প জানেন। ঐ একই প্রকার গল্প প্রাচীন বাবিল, মিশর, চীন এবং হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে জলপ্লাবনের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:

মহর্ষি মনু একদিন গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আসিয়া বলিল, 'আমাকে আশ্রয় দিন।' মনু তৎক্ষণাৎ উহাকে সন্নিহিত একটি জলপাত্রে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি চাও?' মৎস্যটি বলিল, এক বৃহৎ মৎস্য আমাকে অনুসরণ করিতেছে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' মনু উহাকে গৃহে লইয়া গেলেন, প্রাতঃকালে দেখেন, মৎস্য ঐ

পাত্রপ্রমাণ হইয়াছে। সে বলিল, 'আমি এ পাত্রে আর থাকিতে পারি না।' মনু তখন তাহাকে এক চৌবাচ্চায় রাখিলেন। পরদিন সে ঐ চৌবাচ্চার সমান হইয়া বলিল, 'আমি এখানেও থাকিতে পারিতেছি না।' তখন মনু তাহাকে নদীতে স্থাপন করিলেন। প্রাতে যখন দেখিলেন, মৎস্যের কলেবর নদী ভরিয়া ফেলিয়াছে, তখন তিনি উহাকে সমুদ্রে স্থাপন করিলেন। তখন মৎস্য বলিতে লাগিল, 'মনু, আমি জগতের সৃষ্টিকর্তা। জলপ্লাবন দ্বারা জগৎ ধ্বংস করিব; তোমাকে সাবধান করিবার জন্য আমি এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছি। তুমি একখানি সুবৃহৎ নৌকা নির্মাণ করিয়া উহাতে সর্বপ্রকার প্রাণী এক এক জোড়া করিয়া রক্ষা কর এবং স্বয়ং সপরিবারে উহাতে প্রবেশ কর। সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে জলের মধ্যে তুমি আমার শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে, তাহাতে তোমার নৌকা বাঁধিবে। পরে জল কমিয়া গেলে নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া প্রজাবৃদ্ধি করিও।' এইরূপে ভগবানের কথা অনুসারে জলপ্লাবন হইল এবং মনু নিজ পরিবার এবং সর্বপ্রকার জন্তুর এক এক জোড়া এবং সর্বপ্রকার উদ্ভিদের বীজ জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিলেন এবং প্লাবনের অবসানে তিনি ঐ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া জগতে প্রজা উৎপন্ন করিতে লাগিলেন—আর আমরা মনুর বংশধর বলিয়া মানব নামে অভিহিত।[১]

এখন দেখ, মানবভাষা সেই অন্তর্নিহিত সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টামাত্র। আমার স্থির বিশ্বাস—এই-সকল গল্প আর কিছু নয়, একটি ছোট বালক—অস্পষ্ট অস্ফুট শব্দরাশিই যাহার একমাত্র ভাষা—সে যেন সেই ভাষায় গভীরতম দার্শনিক সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে; শিশুর উহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয় অথবা অন্য কোনরূপ উপায় নাই। উচ্চতম দার্শনিকের এবং শিশুর ভাষায় কোন প্রকারগত ভেদ নাই, শুধু মাত্রাগত ভেদ আছে। আজকালকার বিশুদ্ধ প্রণালীবদ্ধ গণিতের মতো সঠিক কাটাছাঁটা ভাষা, আর প্রাচীনদিগের অস্ফুট রহস্যময় পৌরাণিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রার উচ্চতা নিম্নতা। এই-সকল গল্পের পিছনে একটি মহৎ সত্য আছে, প্রাচীনেরা উহা যেন প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

১ মন্ ধাতু হইতে 'মনু' শব্দ সিদ্ধ, মন্ ধাতুর অর্থ মনন অর্থাৎ চিন্তা করা।

অনেক সময় এই-সকল প্রাচীন পৌরাণিক গল্পের ভিতরে মহামূল্য সত্য থাকে, আর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আধুনিকদিগের সুন্দর মার্জিত ভাষার ভিতরে অনেক সময় শুধু অসার জিনিস পাওয়া যায়। অতএব পৌরাণিক কাহিনী দ্বারা আবৃত বলিয়া এবং আধুনিক কালের অমুক মহাশয় কি তমুক মহাশয়ার মনে লাগে না বলিয়া প্রাচীন সব জিনিসই একেবারে ফেলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

'অমুক ঋষি বা মহাপুরুষ বলিয়াছেন, অতএব ইহা বিশ্বাস কর'—এইরূপ বলাতে যদি ধর্মগুলি উপহাসের যোগ্য হয় তবে আধুনিকগণ অধিকতর উপহাসের যোগ্য। এখনকার কালে যদি কেহ মূশা, বুদ্ধ বা ঈশার উক্তি উদ্ধৃত করে, সে হাস্যাস্পদ হয়, কিন্তু হাক্সলি টিণ্ডাল বা ডারুইনের নাম করিলেই লোকে সে কথা একেবারে নির্বিচারে গলাধঃকরণ করে। 'হাক্সলি এই কথা বলিয়াছেন'—অনেকের পক্ষে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট। আমরা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছি বটে। আগে ছিল ধর্মের কুসংস্কার, এখন হইয়াছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার, আগেকার কুসংস্কারের ভিতর দিয়া জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিক ভাব আসিত, আধুনিক কুসংস্কারের ভিতর দিয়া কেবল কাম ও লোভ আসিতেছে। সে কুসংস্কার ছিল ঈশ্বরের উপাসনা লইয়া, আর আধুনিক কুসংস্কার—অতি ঘৃণিত ধন, নাম যশ বা ক্ষমতার উপাসনা। ইহাই প্রভেদ।

এখন পূর্বোক্ত পৌরাণিক গল্পগুলি সম্বন্ধে আবার আলোচনা করা যাউক। সকল গল্পের ভিতরেই এই একটি প্রধান ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্বে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা এখন অবনত হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক কালের গবেষকগণ বোধ হয় যেন এই সিদ্ধান্ত একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ মনে করেন, তাঁহারা যেন এই সিদ্ধান্ত একেবারে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মানুষ ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষের (mollus) ক্রমবিকাশ-মাত্র, অতএব পূর্বোক্ত পৌরাণিক সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না। ভারতীয় পুরাণ কিন্তু উভয় মতেরই সমন্বয় করিতে সমর্থ। ভারতীয় পুরাণ-মতে সকল উন্নতিই তরঙ্গাকারে হইয়া থাকে। প্রত্যেক তরঙ্গই একবার উঠিয়া আবার পড়ে, পড়িয়া আবার উঠে, আবার পড়ে—এইরূপ ক্রমাগত চলিতে থাকে। প্রত্যেক গতিই চক্রাকারে

হইয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলেও দেখা যাইবে, সহজ সরল ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ উৎপন্ন হইতে পারে না। ক্রমবিকাশ বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়াকেও ধরিতে হইবে। বিজ্ঞানবিদ্‌ই বলিবেন, কোন যন্ত্রে তুমি যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ কর, উহা হইতে সেই পরিমাণ শক্তিই পাইতে পারো। অসৎ (কিছু-না) হইতে সৎ (কিছু) কখন হইতে পারে না। যদি মানব, পূর্ণ মানব, বুদ্ধ-মানব, খ্রীষ্ট-মানব ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষের ক্রমবিকাশ হয়, তবে এ জন্তুকেও ক্রমসঙ্কুচিত বুদ্ধ বলিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, তবে ঐ মহাপুরুষগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন? অসৎ হইতে তো কখন সৎ-এর উদ্ভব হয় না। এইরূপে আমরা শাস্ত্রের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে পারি। যে-শক্তি ধীরে ধীরে নানা সোপানের মধ্য দিয়া পূর্ণ মনুষ্যরূপে পরিণত হয়, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। তাহা কোথাও না কোথাও বর্তমান ছিল, এবং যদি তোমরা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মোলাস্ক বা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ পর্যন্ত গিয়া উহাকেই আদিকারণ স্থির করিয়া থাকো, তবে ইহা নিশ্চিত যে, উহাতেও ঐ শক্তি কোন না কোনরূপে অবস্থিত ছিল।

আজকাল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতেছে: জড়পদার্থের সমষ্টি এই দেহই কি আত্মা চিন্তা প্রভৃতি বলিয়া কথিত শক্তির বিকাশের কারণ, অথবা চিন্তাশক্তিই দেহের কারণ? অবশ্য জগতের সকল ধর্মই বলেন, চিন্তা বলিয়া পরিচিত শক্তিই শরীরকে ব্যক্ত করে—ইহার বিপরীত মত তাহারা স্বীকার করেন না। কিন্তু আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ের মত[১] চিন্তাশক্তি কেবল শরীর-নামক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির কোন বিশেষ ধরনের সন্নিবেশে উৎপন্ন। যদি এই দ্বিতীয় মতটি স্বীকার করিয়া লইয়া বলা যায়—এই আত্মা বা মন বা উহাকে যে আখ্যাই দাও না কেন, উহা এই জড়দেহরূপ যন্ত্রেরই ফলস্বরূপ, যে-সকল জড়পরমাণু মস্তিষ্ক ও শরীর গঠন করিতেছে, তাহাদেরই রাসায়নিক মিলন বা সাধারণ মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাতে এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যায়—শরীর-গঠন কে করে? কোন্ শক্তি পদার্থের অণুগুলিকে শরীররূপে পরিণত করে? কোন্ শক্তি চারিদিকের জড়রাশি হইতে

১ Comte's Positivism

কিয়দংশ লইয়া তোমার শরীর একরূপে, আমার শরীর আর একরূপে গঠন করে? এই-সকল বিভিন্নতা কিসে হয়? আত্মা নামক শক্তি শরীরস্থ ভৌতিক পরমাণুগুলির বিভিন্ন সন্নিবেশে উৎপন্ন বলিলে 'গাড়ির পিছনে ঘোড়াজোতা'র ন্যায় হয়। কিরূপে এই সংযোগ হইল? কোন্ শক্তি উহা করিল? যদি বলা যায়, অন্য কোন শক্তি এই সংযোগ সাধন করিয়াছে, আর আত্মা—যাহা এখন জড়রাশি-বিশেষের সহিত সংযুক্তরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাই আবার ঐ জড়পরমাণুসকলের সংযোগের ফলরূপ, তাহা হইলে কোন উত্তর হইল না। যে-মত অন্যান্য মতকে খণ্ডন না করিয়া—সমুদয় না হউক, অধিকাংশ ঘটনা—অধিকাংশ বিষয় ব্যাখ্যা করিতে পারে, তাহাই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং ইহাই বেশী যুক্তিসঙ্গত, যে-শক্তি জড়রাশি গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে শরীর গঠন করে আর যে-শক্তি শরীরের ভিতরে প্রকাশিত রহিয়াছে, উভয়ে অভেদ। অতএব, যে চিন্তাশক্তি আমাদের দেহে প্রকাশিত হইতেছে, উহা কেবল জড়-অণুর সংযোগে উৎপন্ন, সুতরাং তাহার দেহনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই—এ-কথার কোন অর্থ হয় না। আর শক্তি কখনও জড় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। পরীক্ষা দ্বারা বরং ইহা প্রদর্শন করা সম্ভব—যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহার অস্তিত্ব নাই, উহা কেবল শক্তির এক বিশেষ অবস্থামাত্র। কাঠিন্য প্রভৃতি জড়ের গুণসকল বিভিন্ন প্রকার গতি ও স্পন্দনের ফল—ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। জড় পরমাণুর ভিতর প্রবল আবর্তগতি উৎপাদন করিলে উহা কঠিনপদার্থবৎ শক্তিলাভ করিবে। বায়ুরাশি যখন ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়, তখন উহা কঠিন পদার্থের মতো হইয়া যায়, কঠিন পদার্থ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। —কেবল গতিশীলতা দ্বারাই উহাতে এই কাঠিন্য-ধর্ম উৎপন্ন হইবে। এইভাবে বিচার করিলে ইহা প্রমাণ করা সহজ হইবে যে, যাহাকে আমরা পদার্থ বলি, তাহার কোন অস্তিত্ব নাই; কিন্তু বিপরীত মতটি প্রমাণ করা যায় না।

শরীরের ভিতর এই যে শক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, ইহা কি? আমরা সকলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারি, ঐ শক্তি যাহাই হউক, উহা জড়পরমাণুগুলি লইয়া তাহা হইতে আকৃতি-বিশেষ—মনুষ্য-দেহ গঠন করিতেছে। আর কেহ আসিয়া তোমার আমার জন্য শরীর গঠন করে না। কখনও দেখি নাই—অপরে আমার হইয়া খাইতেছে। আমাকেই ঐ খাদ্যের সার শরীরে গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি—সব কিছুই গঠন করিতে

হয়। কি এই রহস্যময় শক্তিটি? ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত মানুষের পক্ষে ভয়াবহ বোধ হয়; অনেকের পক্ষে উহা কেবল আনুমানিক ব্যাপারমাত্র বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং বর্তমানে কি হয়, সেইটিই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আমরা এখন বিষয়টি আলোচনা করিব। সে শক্তিটি কি, যাহা এইক্ষণে আমার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছে? আমরা দেখিয়াছি, সকল প্রাচীন শাস্ত্রেই এই শক্তিকে লোকে এই শরীরের মতো শরীরসম্পন্ন একটি জ্যোতির্ময় পদার্থ বলিয়া মনে করিত, তাহারা বিশ্বাস করিত—এই শরীর গেলেও উহা থাকিবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাই, ঐ শক্তি জ্যোতির্ময় দেহমাত্র বলিয়া তৃপ্তি হইতেছে না, আর একটি উচ্চতর ভাব লোকের মন অধিকার করিতেছে—তাহা এই যে, ঐ জ্যোতির্ময় শরীর শক্তির প্রতিরূপ হইতে পারে না। যাহারই আকৃতি আছে, তাহাই কতকগুলি পরমাণুর সংযোগমাত্র, সুতরাং উহাকে পরিচালিত করিতে অন্য কিছুর প্রয়োজন। যদি এই শরীরের গঠন ও পরিচালন করিতে এই শরীরাতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে সেই কারণেই জ্যোতির্ময় দেহের গঠন ও পরিচালনে ঐ দেহের অতিরিক্ত অন্য কিছুর প্রয়োজন হইবে। এই 'অন্য কিছুই' আত্মা শব্দে অভিহিত হইল। আত্মাই ঐ জ্যোতির্ময় দেহের মধ্য দিয়া যেন স্থূল শরীরের উপর কায করিতেছেন। ঐ জ্যোতির্ময় দেহই মনের আধার বলিয়া বিবেচিত হয়, আর আত্মা উহার অতীত। আত্মা মন নহেন, তিনি মনের উপর কায করেন এবং মনের মধ্য দিয়া শরীরের উপর কার্য করেন। তোমার একটি আত্মা আছে, আমার একটি আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ এক একটি আত্মা আছে এবং এক একটি সূক্ষ্ম শরীরও আছে; ঐ সূক্ষ্ম শরীরের সাহায্যে আমরা স্থূল দেহের উপর কার্য করিয়া থাকি। এখন এই আত্মা ও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। শরীর ও মন হইতে পৃথক্ এই আত্মার স্বরূপ কি? অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইতে লাগিল, নানাবিধ সিদ্ধান্ত ও অনুমান হইতে লাগিল, নানাপ্রকার দার্শনিক অনুসন্ধান চলিতে লাগিল,—এই আত্মা সম্বন্ধে তাঁহারা যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, আপনাদের নিকট সেগুলি বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। ভিন্ন ভিন্ন দর্শন এই একটি বিষয়ে একমত দেখা যায় যে, আত্মার স্বরূপ যাহাই হউক, উহার কোন আকৃতি নাই, আর যাহার আকৃতি

নাই, তাহা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে। কাল মনের অন্তর্গত, দেশও মনের অন্তর্গত। কাল ব্যতীত কার্যকারণভাব থাকিতে পারে না। ক্রমানুবর্তিতার ভাব ব্যতীত কার্যকারণভাবও থাকিতে পারে না। অতএব দেশকালনিমিত্ত মনের অন্তর্গত, আর এই আত্মা মনের অতীত ও নিরাকার বলিয়া উহাও অবশ্য দেশকালনিমিত্তের অতীত। আর যদি উহা দেশকালনিমিত্তের অতীত হয় তাহা হইলে উহা অবশ্য অনন্ত হইবে। এইবার হিন্দুদর্শনের চূড়ান্ত বিচার আসিল। অনন্ত কখন দুইটি হইতে পারে না। যদি আত্মা অনন্ত হয়, তবে একটি মাত্র আত্মাই থাকিতে পারে, আর এই যে অনেক আত্মা বলিয়া বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে—তোমার এক আত্মা আমার আর এক আত্মা—ইহা সত্য নহে।

অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সেই এক অনন্ত ও সর্বব্যাপী, আর এই ব্যাবহারিক জীব মানুষের প্রকৃত স্বরূপের সীমাবদ্ধ ভাবমাত্র। এই হিসাবে পূর্বোক্ত পৌরাণিক তত্ত্বগুলিও সত্য হইতে পারে যে, ব্যাবহারিক জীব যত বড় হউন না কেন, তিনি মানুষের ঐ অতীন্দ্রিয় প্রকৃত স্বরূপের অস্ফুট প্রতিবিম্ব-মাত্র। অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা—কার্যকারণের অতীত বলিয়া, দেশকালের অতীত বলিয়া অবশ্যই মুক্তস্বভাব। তিনি কখনও বদ্ধ ছিলেন না, তাঁহাকে বদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই ব্যাবহারিক জীব, এই প্রতিবিম্ব দেশকালনিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং তিনি বদ্ধ। অথবা আমাদের কোন কোন দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'বোধ হয় তিনি যেন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বদ্ধ নন।' আমাদের আত্মার ভিতরে যথার্থ সত্য এইটুকু—এই সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্যস্বভাব, উহাই আমাদের স্বভাব চেষ্টা করিবা আর আমাদিগকে এরূপ হইতে হয় না। প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত, সুতরাং জন্মমৃত্যুর প্রশ্ন আসিতেই পারে না। কতকগুলি বালক পরীক্ষা দিতেছিল। পরীক্ষক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এই প্রশ্ন ছিল—'পৃথিবী কেন পড়িয়া যায় না?' তিনি মহাকর্ষের নিয়ম প্রভৃতি উত্তর আশা করিতেছিলেন। অধিকাংশ বালক-বালিকাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেহ কেহ মাধ্যাকর্ষণ বা আর কিছু বলিয়া উত্তর দিল। তাহাদের মধ্যে একটি বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটি প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিল—'কোথায় উহা পড়িবে?' এই প্রশ্নই যে

ভুল। পৃথিবী পড়িবে কোথায়? পৃথিবীর পক্ষে পতন বা উত্থান কিছুই নাই। অনন্ত দেশের উঁচু-নীচু বলিয়া কিছুই নাই। উহা কেবল আপেক্ষিক। অনন্ত কোথায়ই বা যাইবে, কোথা হইতেই বা আসিবে?

যখন মানুষ অতীত-ভবিষ্যতের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে, যখন সে দেহকে সীমাবদ্ধ—সুতরাং উৎপত্তি-বিনাশশীল জানিয়া দেহাভিমান ত্যাগ করিতে পারে, তখনই সে এক উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়। দেহ আত্মা নয়, মনও আত্মা নয়, কারণ উহাদের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। জড় জগতের অতীত আত্মাই অনন্তকাল ধরিয়া থাকিতে পারেন। শরীর ও মন প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল—এগুলি পরিবর্তনশীল ঘটনা-শ্রেণীর নামমাত্র; নদীর প্রত্যেক জলবিন্দুই নিয়ত-পরিবর্তনশীল প্রবাহের অন্তর্গত; তথাপি আমরা দেখিতেছি, উহা সেই একই নদী। এই দেহের প্রত্যেক পরমাণুই নিয়ত-পরিবর্তনশীল; কোন ব্যক্তির শরীরই কয়েক মুহূর্তের জন্যও একইরূপ থাকে না। তথাপি মনের একপ্রকার সংস্কারবশতঃ আমরা উহাকে সেই এক শরীর বলিয়াই মনে করি। মন সম্বন্ধেও এইরূপ, উহা ক্ষণে সুখী, ক্ষণে দুঃখী, ক্ষণে সবল, ক্ষণে দুর্বল! নিয়ত-পরিবর্তনশীল ঘূর্ণিবিশেষ। সুতরাং উহাও আত্মা হইতে পারে না, আত্মা অনন্ত। পরিবর্তন কেবল সসীম বস্তুতেই সম্ভব। অনন্তের *কোনরূপ পরিবর্তন হওয়া—অসম্ভব কথা। তাহা কখনও হইতে পারে না।* শরীর-হিসাবে তুমি আমি একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারি, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুই নিত্য-পরিবর্তনশীল; কিন্তু জগৎকে সমষ্টিরূপে ধরিলে উহাতে গতি বা পরিবর্তন অসম্ভব। গতি সর্বত্রই আপেক্ষিক। তুমি বা আমি যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাই, তাহা অপর একটি স্থির বস্তুর সহিত তুলনায় বুঝিতে হইবে, জগতের কোন পরমাণু অপর একটি পরমাণুর সহিত তুলনায় পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু সমুদয় জগৎকে সমষ্টিভাবে ধরিলে কাহার সহিত তুলনায় উহা স্থান পরিবর্তন করিবে? ঐ সমষ্টির অতিরিক্ত তো আর কিছু নাই। অতএব এই অনন্ত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অপরিণামী অচল ও পূর্ণ, উহাই পারমার্থিক সত্তা—মানুষের যথার্থ স্বরূপ। সুতরাং সর্বব্যাপী অনন্তই সত্য, সান্ত সসীম সত্য নয়। আমরা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীব—এই ধারণা যতই আরামপ্রদ হউক না কেন, ইহা পুরাতন ভ্রম মাত্র। যদি লোককে বলা যায়, তুমি সর্বব্যাপী অনন্ত পুরুষ, সে ভয় পায়।

সকলের ভিতর দিয়া তুমি কাজ করিতেছ, সকল চরণের দ্বারা তুমি চলিতেছ, সকল মুখের দ্বারা তুমি কথা কহিতেছ, সকল নাসিকা দ্বারাই তুমি শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য নির্বাহ করিতেছ—লোককে ইহা বলিলে সে ভয় পায়। সে তোমায় পুনঃ পুনঃ বলিবে, এই 'অহং'-জ্ঞান কখনও যাইবে না। লোকের এই 'আমিত্ব' কোন্‌টি—তাহা দেখিতে পাইলে সুখী হই।

ছোট শিশুর গোঁফ নাই, বড় হইলে তাহার গোঁফ দাড়ি হয়। যদি 'আমিত্ব' শরীরগত হয়, তবে তো বালকের 'আমিত্ব' নষ্ট হইয়া গেল। যদি 'আমিত্ব' শরীরগত হয়, তবে আমার একটি চোখ বা হাত নষ্ট হইলে 'আমিত্ব'ও নষ্ট হইয়া গেল। মাতালের মদ ছাড়া উচিত নয়, তাহা হইলে তাহার 'আমিত্ব' যাইবে! চোরের সাধু হওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে সে তাহার 'আমিত্ব' হারাইবে! অতএব কাহারও এই ভয়ে নিজ অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত নয়। অনন্ত ব্যতীত আর 'আমিত্ব' কিছুতেই নাই। এই অনন্তেরই কেবল পরিবর্তন হয় না, আর সবই ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। 'আমিত্ব' স্মৃতিতেও নাই। 'আমিত্ব' যদি স্মৃতিতে থাকিত, তবে মস্তকে প্রবল আঘাত পাইয়া অতীত স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গেলে আমার 'আমিত্ব' নষ্ট হইত, আমি একেবারে লোপ পাইতাম! ছেলেবেলার দুই-তিন বৎসর আমার মনে নাই; যদি স্মৃতির উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে ঐ দুই-তিন বৎসর আমার অস্তিত্ব ছিল না—বলিতেই হইবে। তাহা হইলে আমার জীবনের যে-অংশ আমার মনে নাই, সেই সময়ে আমি জীবিত ছিলাম না, বলিতে হইবে।

ইহা অবশ্য 'আমিত্ব'-সম্বন্ধীয় খুব সঙ্কীর্ণ ধারণা। আমরা এখনও 'আমি' নহি! আমরা এই 'আমিত্ব'—প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-লাভের চেষ্টা করিতেছি, উহা অনন্ত, উহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। যাহার জীবন বিশ্বব্যাপী, তিনিই জীবিত, আর যতই আমরা আমাদের জীবনকে শরীররূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ পদার্থে কেন্দ্রীভূত করি, ততই আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হই। আমাদের জীবন যতক্ষণ সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত থাকে, যতক্ষণ উহা অপরের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে, ততক্ষণই আমরা জীবিত, আর এই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জীবন যাপনই মৃত্যু এবং এই জন্যই আমাদের মৃত্যুভয় দেখা দেয়। মৃত্যুভয় তখনই জয় করা যাইতে পারে, যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, যতদিন এই জগতে একটি জীবনও রহিয়াছে, ততদিন সেও জীবিত। এরূপ উপলব্ধি হইলে মানুষ বলিতে পারে: 'আমি সকল

বস্তুতে, সকল দেহে বর্তমান ; সকল জীবের মধ্যেই আমি বর্তমান। আমিই এই জগৎ, সমুদয় জগৎই আমার শরীর! যতদিন একটি পরমাণু রহিয়াছে, ততদিন আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা কি?' এইভাবেই মানুষ নির্ভীক অবস্থায় উপনীত হয়। নিয়ত-পরিবর্তনশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে অমরত্ব আছে, এ-কথা বলা বাতুলতা। একজন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, আত্মা অনন্ত, সুতরাং আত্মাই 'আমি' হইতে পারেন। অনন্তকে ভাগ করা যাইতে পারে না—অনন্তকে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে না। এই এক অবিভক্ত সমষ্টিস্বরূপ অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, তিনিই মানুষের যথার্থ 'আমি', তিনিই 'প্রকৃত মানুষ'। মানুষ বলিয়া যাহা বোধ হইতেছে, তাহা শুধু ঐ 'আমি'কে ব্যক্ত জগতের ভিতর প্রকাশ করিবার চেষ্টার ফল মাত্র ; আর আত্মাতে কখন 'ক্রমবিকাশ' থাকিতে পারে না। এই যে-সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে, অসাধু সাধু হইতেছে, পশু মানুষ হইতেছে—এ-সকল কখন আত্মাতে হয় না। মনে কর, যেন একটি যবনিকা রহিয়াছে, আর উহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে, উহার ভিতর দিয়া আমার সম্মুখস্থ কতকগুলি—কেবল কতকগুলি মুখ দেখিতে পাইতেছি। এই ছিদ্র যতই বড় হইতে থাকে, ততই সম্মুখের দৃশ্য আমার নিকট অধিকতর প্রকাশিত হইতে থাকে, আর যখন ঐ ছিদ্রটি সমগ্র যবনিকা ব্যাপ্ত করে, তখন আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। এস্থলে তোমাদের কোন পরিবর্তন হয় নাই—তোমরা যাহা, তাহাই ছিলে। ছিদ্রেরই ক্রমবিকাশ হইতেছিল, আর সেই সঙ্গে তোমাদের প্রকাশ হইতেছিল। আত্মা সম্বন্ধেও এইরূপ। তুমি মুক্তস্বভাব ও পূর্ণই আছ। চেষ্টা করিয়া পূর্ণত্ব পাইতে হয় না। ধর্ম, ঈশ্বর বা পরকালের এই-সকল ধারণা কোথা হইতে আসিল? মানুষ 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করিয়া বেড়ায় কেন? কেন সকল জাতির ভিতরে সকল সমাজেই মানুষ পূর্ণ আদর্শের অন্বেষণ করে—উহা মনুষ্যে, ঈশ্বরে বা অন্য যাহাতেই হউক? তাহার কারণ —পূর্ণ আদর্শ তোমার মধ্যেই বর্তমান। তোমার নিজের হৃদয়ই ধক্ ধক্ করিতেছে, তুমি মনে করিতেছ বাহিরের কোন বস্তু এইরূপ শব্দ করিতেছে, তোমার নিজের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরই তোমাকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে, তাঁহার উপলব্ধি করিতে প্রেরণা দিতেছেন। এখানে সেখানে, মন্দিরে গির্জায়, স্বর্গে মর্ত্যে, নানা স্থানে এবং নানা উপায়ে অন্বেষণ করিবার পর অবশেষে

আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম অর্থাৎ আমাদের আত্মাতেই বৃত্তপথে ঘুরিয়া আসি এবং দেখিতে পাই—যাঁহার জন্য আমরা সমুদয় জগতে অন্বেষণ করিতেছিলাম, যাহার জন্য আমরা মন্দির গির্জা প্রভৃতিতে কাতর হইয়া প্রার্থনা এবং অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলাম, যাঁহাকে আমরা সুদূর আকাশে মেঘরাশি দ্বারা আবৃত অব্যক্ত রহস্যময় বলিয়া মনে করিতেছিলাম, তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটতম, প্রাণের প্রাণ, তিনিই আমার দেহ, তিনিই আমার আত্মা। 'তুমিই আমি—আমিই তুমি।' ইহাই তোমার স্বরূপ—ইহাকে প্রকাশ কর। তোমাকে পবিত্র হইতে হইবে না—তুমি *পবিত্র-স্বরূপই আছ। তোমাকে পূর্ণ হইতে হইবে না, তুমি পূর্ণস্বরূপই আছ। সমুদয় প্রকৃতিই যবনিকার ন্যায় তাহার অন্তরালে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন।* তুমি যে কোন সংচিন্তা বা সংকার্য কর, তাহা যেন শুধু আবরণকে ধীরে ধীরে ছিন্ন করিতেছে, আর সেই প্রকৃতির অন্তরালে শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর প্রকাশিত হইতেছেন।

ইহাই মানুষের সমগ্র ইতিহাস। আবরণ ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, তখন প্রকৃতির অন্তরালে আলোক নিজ স্বভাববশতই ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে দীপ্ত হইতে থাকেন, কারণ তাহার স্বভাবই এইভাবে দীপ্তি পাওয়া। তাঁহাকে জানা যায় না, আমরা তাঁহাকে জানিতে বৃথাই চেষ্টা করি। যদি তিনি জ্ঞেয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বভাবের বিলোপ হইত, কারণ তিনি নিত্য-জ্ঞাতা। জ্ঞান তো সসীম, কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে উহাকে জ্ঞেয়বস্তুরূপে—বিষয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে। তিনি তো সকল বস্তুর জ্ঞাতা-স্বরূপ, সকল বিষয়ের বিষয়িস্বরূপ, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ, তোমারই আত্মাস্বরূপ। বিষয়-জ্ঞান যেন একটি নিম্নতর অবস্থা—একটা অধঃপতন। আমরাই সেই আত্মা, আত্মা আবার জানিব কিরূপে? প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আত্মা এবং সকলেই বিভিন্ন উপায়ে ঐ আত্মাকে জীবনে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা না হইলে এত নীতি-পদ্ধতি কোথা হইতে আসিল? সমুদয় নীতিপ্রণালীর তাৎপর্য কি? সকল নীতিপ্রণালীতে একটি মূল ভাবই ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, ভাবটি অপরের উপকার করা। মানবজাতির সকল সংকর্মের মূল উদ্দেশ্য—মানুষ জীব জন্তু সকলের প্রতি দয়া। কিন্তু এ-সবই 'আমিই

জগৎ, এই জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ'—এই চিরন্তন সত্যের বিভিন্ন ভাবমাত্র। তাহা না হইলে অপরের হিত করিবার যুক্তি কি? কেন আমি অপরের উপকার করিব? কিসে আমাকে অপরের উপকার করিতে বাধ্য করে? সর্বত্র সমদর্শনজনিত সহানুভূতির ভাব হইতেই এরূপ হইয়া থাকে। অতি কঠোর অন্তঃকরণও কখন কখন অপরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি এই আপাতপ্রতীয়মান 'অহং' প্রকৃতপক্ষে ভ্রমমাত্র, এই ভ্রমাত্মক 'অহং'-এ আসক্ত থাকা অতি নীচ কাজ—যে ব্যক্তি এই সকল কথা শুনিলে ভয় পায়, সেই ব্যক্তিই তোমাকে বলিবে, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই সকল নীতির ভিত্তি। কিন্তু পূর্ণ আত্মত্যাগ কি? সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ হইলে কি অবশিষ্ট থাকে? আত্মত্যাগ অর্থে এই আপাতপ্রতীয়মান 'অহং'-এর ত্যাগ, সর্বপ্রকার স্বার্থপরতা বর্জন। এই অহংভাব ও মমতা পূর্ব কুসংস্কারের ফলস্বরূপ, আর যতই এই 'অহং' ত্যাগ হইতে থাকে, ততই আত্মা নিত্যস্বরূপে নিজ পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হন। ইহাই প্রকৃত আত্মত্যাগ, ইহাই সমুদয় নীতিশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ—কেন্দ্রস্বরূপ। মানুষ উহা জানুক আর নাই জানুক, সমুদয় জগৎ সেই দিকে ধীরে ধীরে চলিয়াছে, অল্পাধিক পরিমাণে তাহাই অভ্যাস করিতেছে। কেবল অধিকাংশ লোক উহা অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকে। তাহারা উহা জ্ঞাতসারে করুক। এই 'আমি' ও 'আমার' প্রকৃত আত্মা নহে—ইহা জানিয়া তাহারা এই ত্যাগ আচরণ করুক। এই ব্যাবহারিক জীব সীমাবদ্ধ। এখন যাহাকে মানুষ বলা যাইতেছে সে সেই জগতের অতীত অনন্ত সত্তার সামান্য আভাস মাত্র, সেই সর্বস্বরূপ অনন্ত অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র। কিন্তু সেই অনন্তই তাহার প্রকৃত স্বরূপ।

এই জ্ঞানের ফল—এই জ্ঞানের উপকারিতা কি? আজকাল সব বিষয়ই এই ফল—এই উপকার দেখিয়াই পরিমাণ করা হয়। অর্থাৎ মোট কথা এই—উহাতে কত টাকা, কত আনা, কত পয়সা হয়। লোকের এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কি অধিকার আছে? সত্য কি উপকার বা অর্থের মাপকাঠি লইয়া বিচারিত হইবে? মনে কর, উহাতে কোন উপকার নাই, উহা কি কম সত্য হইয়া যাইবে? উপকার বা প্রয়োজন সত্যের নির্ণায়ক হইতে পারে না।[১] যাহা হউক, এই জ্ঞানে মহৎ উপকার এবং প্রয়োজন আছে।

১ Bentham's Utilitarianism and James' Pragmatism

আমরা দেখিতেছি সকলেই সুখের অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক নশ্বর মিথ্যা বস্তুতে উহা অন্বেষণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ে কেহ কখনও সুখ পায় নাই। সুখ কেবল আত্মাতেই পাওয়া যায়। অতএব এই আত্মাতে সুখলাভ করাই মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। আর এক কথা এই যে, অবিদ্যাই সকল দুঃখের প্রসূতি এবং মূল অজ্ঞান এই যে, আমরা মনে করি সেই অনন্তস্বরূপ যিনি, তিনি আপনাকে সান্ত মনে করিয়া বাদিতেছেন, সমস্ত অজ্ঞানের মূলভিত্তি এই যে, অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি যে, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহমাত্র, ইহাই সমুদয় স্বার্থপরতার মূল। যখনই আমি নিজেকে একটি ক্ষুদ্র দেহ বলিয়া মনে করি, তখনই—জগতের অন্যান্য শরীরের সুখদুঃখের দিকে না চাহিয়া আমি দেহটিকে রক্ষা করিতে এবং উহার সৌন্দর্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি। তখন তুমি আমি ভিন্ন হইয়া যাই। যখনই এই ভেদজ্ঞান দেখা দেয়, তখনই উহা সব প্রকার অমঙ্গলের দ্বার খুলিয়া দেয় এবং সর্বপ্রকার দুঃখ সৃষ্টি করে। সুতরাং পূর্বোক্ত জ্ঞানলাভে এই উপকার হইবে যে, যদি বর্তমান কালের মনুষ্য-জাতির খুব সামান্য অংশও স্বার্থপরতা সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রত্ব ত্যাগ করিতে পারে, তবে কালই এই জগৎ স্বর্গে পরিণত হইবে, নানাবিধ যন্ত্র এবং বাহ্য-জগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতিতে কখনও হইবে না। যেমন অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা আরও বর্ধিত হয়, তেমনি এগুলি দুঃখই বৃদ্ধি করে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত যাবতীয় জড়ের জ্ঞান অগ্নিতে ঘৃতাহুতি মাত্র। জড়বিজ্ঞান—স্বার্থপর লোকের হাতে পরস্ব কাড়িয়া লইবার এবং পরার্থে জীবন উৎসর্গ না করিয়া অপরকে শোষণ করিবার আর একটি যন্ত্র তুলিয়া দেয় মাত্র।

আর এক প্রশ্ন—এই ভাব কি কার্যে পরিণত করা সম্ভব? বর্তমান সমাজে ইহা কি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই, সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান করে না, সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে, নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক। সত্যের উপরই সকল সমাজ গঠিত হইবে, সত্য কখনও সমাজের সহিত আপস করিবে না। নিঃস্বার্থপরতার ন্যায় একটি মহৎ সত্য যদি সমাজে কার্যে পরিণত না করা যায়, তবে বরং সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস কর। তাহা

হইলেই বুঝিব তুমি সাহসী। সাহস দুই প্রকারের—এক প্রকারের সাহস কামানের মুখে যাওয়া। আর এক প্রকার—আধ্যাত্মিক দৃঢ় প্রত্যয়ের সাহস। একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে ভারতীয় সাধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধ সাধু এক প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট। সম্রাট তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সুতরাং তিনি ঐ সাধুকে সঙ্গে করিয়া নিজ দেশে লইয়া যাইতে চাহিলেন। সাধু তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, 'আমি এই বনে বেশ আনন্দে আছি।' সম্রাট বলিলেন, 'আমি সমুদয় পৃথিবীর সম্রাট। আমি আপনাকে ধন ঐশ্বর্য ও পদমর্যাদা প্রদান করিব।' সাধু বলিলেন, 'ঐশ্বর্য পদমর্যাদা প্রভৃতি কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।' তখন সম্রাট বলিলেন, 'আপনি যদি আমার সহিত না যান, তবে আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব।' সাধু তখন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, মহারাজ, তুমি যত কথা বলিলে তন্মধ্যে ইহাই দেখিতেছি মহা মূঢ়ের মতো কথা। তুমি আমাকে সংহার করিতে পার না? সূর্য আমায় শুষ্ক করিতে পারে না, অগ্নি আমায় পোড়াইতে পারে না, কোন যন্ত্রও আমাকে সংহার করিতে পারে না, কারণ আমি জন্মরহিত, অবিনাশী, নিত্যবিদ্যমান, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান আত্মা।' ইহা আর এক প্রকারের সাহসিকতা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় একটি মুসলমান সৈনিক একজন মহাত্মা সন্ন্যাসীকে প্রচণ্ডভাবে অস্ত্রাঘাত করে। হিন্দু বিদ্রোহিগণ ঐ মুসলমানকে সন্ন্যাসীর নিকট ধরিয়া আনিয়া বলিল, 'বলেন তো, ইহাকে হত্যা করি।' কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার দিকে ফিরিয়া 'ভাই, তুমিই সেই, তুমিই সেই' বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিলেন। এও একপ্রকার সাহসিকতা। যদি এমনভাবে সমাজ গঠন না করিতে পারো যাহাতে সেই সর্বোচ্চ সত্য স্থান পায়, তাহা হইলে তোমরা আর বাহুবলের কি গৌরব কর? তাহা হইলে তোমরা তোমাদের পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানগুলির কি গৌরব কর? তোমাদের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কি গৌরব কর, যদি তোমরা কেবল দিবারাত্র বলিতে থাকো—ইহা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব? টাকা-আনা-পাই ছাড়া আর কিছুই কি কার্যকর নহে? যদি তাহাই হয়, তবে তোমাদের সমাজের এত গর্ব কর কেন? সেই

সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে—ইহাই আমার মত। আর যদি সমাজ উচ্চতম সত্যের উপযুক্ত না হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও। যত শীঘ্র করিতে পারো ততই মঙ্গল। হে নরনারীগণ, এই ভাব লইয়া দণ্ডায়মান হও, সত্যে বিশ্বাসী হইতে সাহসী হও, সত্য অভ্যাস করিতে সাহসী হও। জগতে কয়েক শত সাহসী নরনারীর প্রয়োজন। সাহসী হওয়া বড় কঠিন। সেই সাহসিকতা অভ্যাস কর, যে সাহসিকতা সত্যকে জানিতে চায় এবং জীবনে সেই সত্য দেখাইতে পারে, যাহা মৃত্যুকে ভয় পায় না, যাহা মৃত্যুকে স্বাগত বলিতে পারে, যাহাতে মানুষ জানিতে পারে সে আত্মা, আর সমুদয় জগতের মধ্যে কোন অস্ত্রেরই সাধ্য নাই তাহাকে সংহার করে, সমুদয় বজ্র মিলিলেও তাহাদের সাধ্য নাই তাহাকে সংহার করে, জগতের সমুদয় অগ্নির সাধ্য নাই তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে—তবেই তুমি মুক্ত পুরুষ তবেই তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিবে। ইহা এই সমাজে—প্রত্যেক সমাজেই অভ্যাস করিতে হইবে। 'আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ পরে মনন, তৎপরে নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।'

আজকাল কর্ম বিষয়ে বেশী কথা বলা এবং চিন্তাকে উড়াইয়া দেওয়ার খুব ঝোঁক। কর্ম খুব ভাল বটে, কিন্তু তাহাও চিন্তা হইতে প্রসূত। শরীরের ভিতর দিয়া ব্যক্ত শক্তির ক্ষুদ্র প্রকাশকেই কর্ম বলে। চিন্তা ব্যতীত কোন কায হইতে পারে না। মস্তিষ্ককে উচ্চ উচ্চ চিন্তায়—উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, দিবারাত্র মনের সম্মুখে ঐগুলি স্থাপন কর, তাহা হইলেই বড় বড় কায হইবে। অপবিত্রতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না, কিন্তু মনকে বলো—আমরা শুদ্ধস্বরূপ। আমরা ক্ষুদ্র, আমরা জন্মিয়াছি, আমরা মরিব—এই চিন্তায় আমরা নিজেদের একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছি এবং সেজন্য সর্বদাই একরূপ ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিয়াছি।

একটি আসন্নপ্রসবা সিংহী একবার শিকার-অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল। সে দূরে একদল মেষ চরিতেছে দেখিয়া যেমন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য লাফ দিল, অমনি তাহার মৃত্যু হইল, একটি মাতৃহীন সিংহশাবক জন্মগ্রহণ করিল। মেষদল তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল, সে-ও মেষগণের সহিত একত্র বড় হইতে লাগিল, মেষগণের ন্যায় ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করিতে

লাগিল,. মেষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল, যদিও সে রীতিমত একটি সিংহ হইয়া দাড়াইল, তথাপি সে নিজেকে মেষ বলিয়া ভাবিতে লাগিল। এইরূপে দিন যায়, এমন সময় আর একটি প্রকাণ্ডকায় সিংহ শিকার-অন্বেষণে সেখানে উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দেখিয়াই আশ্চর্য হইল যে, ঐ মেষদলের মধ্যে একটি সিংহ রহিয়াছে, আর সে মেষধর্মী হইয়া বিপদের সম্ভাবনা মাত্রেই পলাইয়া যাইতেছে। সিংহ উহার নিকট গিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল যে, সে সিংহ, মেষ নহে, কিন্তু যেমনি সে অগ্রসর হয়, অমনি মেষপাল পলাইয়া যায়—তাহাদের সঙ্গে মেষ-সিংহটিও পলায়। যাহা হউক, ঐ সিংহ মেষ সিংহটিকে তাহার যথার্থ স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। সে ঐ মেষ-সিংহটি কোথায় থাকে, কি করে, লক্ষ্য করিতে লাগিল। একদিন দেখিল, সে এক জায়গায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে, দেখিয়াই সে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, 'ওহে, তুমি মেষপালের সঙ্গে থাকিয়া আপন স্বভাব ভুলিলে কেন? তুমি তো মেষ নও, তুমি যে সিংহ।' মেষ সিংহটি বলিয়া উঠিল, 'কি বলিতেছ আমি যে মেষ, সিংহ হইব কিরূপে?' সে কোনমতে বিশ্বাস করিবে না যে, সে সিংহ, বরং সে মেষের মতো চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ তাহাকে টানিয়া একটা হ্রদের দিকে লইয়া গেল, বলিল, 'এই দেখ তোমার প্রতিবিম্ব, এই দেখ আমার প্রতিবিম্ব।' তখন সে সেই দুইটির তুলনা করিতে লাগিল। সে একবার সেই সিংহের দিকে, একবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মুহূর্তের মধ্যে তাহার এই জ্ঞানোদয় হইল যে, সত্যই তো আমি সিংহ। তখন সে সিংহ-গর্জন করিতে লাগিল, তাহার মেষবৎ চীৎকার কোথায় চলিয়া গেল। তোমরা সিংহ-স্বরূপ—তোমরা আত্মা, শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতর। 'হে সখে, কেন রোদন করিতেছ? জন্ম-মৃত্যু তোমার নাই, আমারও নাই। কেন কাঁদিতেছ? তোমার রোগ-দুঃখ কিছুই নাই, তুমি অনন্ত-আকাশস্বরূপ, নানাবর্ণের মেঘ উহার উপর আসিতেছে, এক মুহূর্ত খেলা করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে, কিন্তু আকাশ যে নীলবর্ণ, সেই নীলবর্ণই রহিয়াছে।' এইরূপ জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে। আমরা জগতে অসৎ ভাব দেখি কেন? কারণ আমরা নিজেরাই অসৎ। পথের ধারে একটি স্থাণু রহিয়াছে। একটা চোর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল,

সে ভাবিল—এ একজন পাহারাওয়ালা। নায়ক উহাকে তাহার নায়িকা ভাবিল। একটি শিশু উহাকে দেখিয়া ভূত মনে করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এইরূপে উহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিলেও উহা সেই স্থাণু—শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

আমরা নিজেরা যেমন, জগৎকেও সেইরূপ দেখিয়া থাকি। মনে কর ঘরে একটি শিশু আছে, এবং টেবিলের উপর এক থলে মোহর রহিয়াছে। একজন চোর আসিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি গ্রহণ করিল। শিশুটি কি বুঝিতে পারিবে—উহা অপহৃত হইল? আমাদের ভিতরে যাহা, বাহিরেও তাহাই দেখিয়া থাকি। শিশুটির মনে চোর নাই, সুতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। সকল জ্ঞান-সম্বন্ধে এইরূপ। জগতের পাপ-অত্যাচারের কথা বলিও না। বরং তোমাকে যে জগতে এখনও পাপ দেখিতে হইতেছে, সেজন্য রোদন কর। নিজে কাঁদো যে, তোমাকে এখনও সর্বত্র পাপ দেখিতে হইতেছে। যদি তুমি জগতের উপকার করিতে চাও, তবে আর জগতের উপর দোষারোপ করিও না, উহাকে আরও বেশী দুর্বল করিও না। এই সকল পাপ দুঃখ প্রভৃতি আর কি?—এগুলি তো দুর্বলতারই ফল। মানুষ ছেলেবেলা হইতে শিক্ষা পায় যে, সে দুর্বল ও পাপী। জগৎ এইরূপ শিক্ষা দ্বারা দিন দিন দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়াছে। তাহাদিগকে শিখাও যে, তাহারা সকলেই সেই অমৃতের সন্তান—এমন কি যাহাদের ভিতরে আত্মার প্রকাশ অতি ক্ষীণ, তাহাদিগকেও উহা শিখাও। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্কে এমন সকল চিন্তা প্রবেশ করুক, যাহা তাহাদিগকে যথার্থ সাহায্য করিবে, যাহা তাহাদিগকে সবল করিবে, যাহাতে তাহাদের যথার্থ কল্যাণ হইবে। দুর্বলতা ও কর্মশক্তি-লোপকারী চিন্তা যেন তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ না করে। সৎ চিন্তার স্রোতে গা ঢালিয়া দাও, নিজের মনকে সর্বদা বলো—'আমি সেই, আমিই সেই', তোমার মনে দিনরাত্রি ইহা সঙ্গীতের মতো বাজিতে থাকুক, আর মৃত্যুর সময়েও 'সোঽহং, সোঽহং' বলিয়া দেহত্যাগ কর। ইহাই সত্য—জগতের অনন্ত শক্তি তোমার ভিতরে। যে কুসংস্কার তোমার মনকে আবৃত রাখিয়াছে, তাহা দূর করিয়া দাও। সাহসী হও। সত্যকে জানিয়া তাহা জীবনে পরিণত কর। চরম লক্ষ্য অনেক দূর হইতে পারে, কিন্তু উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

মানুষের যথার্থ স্বরূপ (২)

[নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আমরা এখানে দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত, অনেক সময় আমরা বহু দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। মানুষও যতদিন চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ততদিন এইরূপ করিতেছে। মানুষ সর্বদাই সম্মুখে—ভবিষ্যতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে; সে জানিতে চাহে—এই শরীর ধ্বংস হইলে মানুষ কোথায় যায়। এই রহস্য-ভেদের জন্য বহু প্রকার মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে, একের পর এক বহু মত উপস্থাপিত হইয়াছে, আবার শত শত মত খণ্ডিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, কতকগুলি গৃহীত হইয়াছে, আর যতদিন মানুষ এই জগতে বাস করিবে, যতদিন সে চিন্তা করিবে, ততদিন এইরূপ চলিবে। এই মতগুলির প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু সত্য আছে, আবার সবগুলিতেই এমন অনেক কিছু আছে, যাহা সত্য নয়। এই সম্বন্ধে ভারতে যে-সকল অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহারই সার—তাহারই সিদ্ধান্ত আমি আপনাদের নিকট বলিতে চেষ্টা করিব। ভারতীয় দার্শনিকগণের এই-সকল বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিতে এবং যদি সম্ভব হয়, তাহাদের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিব।

বেদান্তদর্শনের একটি উদ্দেশ্য—একত্বের অনুসন্ধান। হিন্দুগণ বিশেষের[১] প্রতি বড় মন দেন না; তাঁহারা সর্বদাই সামান্যের[২]—শুধু তাহাই নহে—সর্বব্যাপী সার্বভৌম বস্তুর অন্বেষণ করিয়াছেন। 'এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে জানিলে সবই জানা হয়?'—গবেষণার ইহাই একমাত্র বিষয়বস্তু। 'যেমন একতাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারিলে জগতের সমুদয় মৃত্তিকাকে জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে জগতের সব কিছু জানা যাইবে?' ইহাই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধান, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা।

তাঁহাদের মতে সমুদয় জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে উহা একমাত্র 'আকাশ' নামক পদার্থে পর্যবসিত হয়। আমরা আমাদের চতুর্দিকে যাহা কিছু

১ Particular ২ General

দেখিতে পাই, স্পর্শ করি বা আস্বাদ করি, এমন কি, আমরা যাহা কিছু অনুভব করি—সবই এই আকাশের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। এই আকাশ সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী। কঠিন তরল বাষ্পীয় সকল পদার্থ, সর্বপ্রকার আকৃতি ও শরীর, পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারা—সবই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন।

এই আকাশের উপর কোন্ শক্তি কার্য করিয়া তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি করিল? আকাশের সঙ্গে একটি সর্বব্যাপী শক্তি রহিয়াছে। জগতে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, এমন কি চিন্তাশক্তি পর্যন্ত 'প্রাণ' নামক এক মহাশক্তির বিকাশ। এই প্রাণ আকাশের উপর কার্য করিয়া জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে। কল্প-প্রারম্ভে এই প্রাণ যেন অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে সুপ্ত থাকে। আদিতে এই আকাশ গতিহীন অবস্থায় ছিল। পরে প্রাণের প্রভাবে এই আকাশ-সমুদ্রে গতি উৎপন্ন হয়। আর এই প্রাণের যেমন গতি হইতে থাকে, তেমনই এই আকাশ-সমুদ্র হইতে নানা ব্রহ্মাণ্ড, নানা জগৎ—কত সূর্য, কত চন্দ্র, কত তারা পৃথিবী মানুষ জন্তু উদ্ভিদ্ ও নানা শক্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। অতএব হিন্দুদের মতে সর্বপ্রকার শক্তি প্রাণের এবং সর্বপ্রকার পদার্থ আকাশের বিভিন্ন রূপমাত্র। কল্পান্তে সমুদয় কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত হইবে, সেই তরল পদার্থ আবার বাষ্পে পরিণত হইবে, তাহা আবার তেজরূপ ধারণ করিবে; অবশেষে সব কিছু যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই আকাশে লীন হইবে। আর আকর্ষণ বিকর্ষণ গতি প্রভৃতি সমুদয় শক্তি ধীরে ধীরে মূল প্রাণে পর্যবসিত হইবে। কিছুকালের জন্য এই প্রাণ যেন নিদ্রিত অবস্থায় থাকিবে; কল্প আরম্ভ হইলে আবার জাগ্রত হইয়া নানাবিধ রূপ প্রকাশ করিবে, কল্পাবসানে সকলই আবার লয় পাইবে। এইরূপে সৃষ্টি-প্রণালী চলিয়াছে; আসিতেছে, যাইতেছে—একবার পশ্চাতে, আবার যেন সম্মুখের দিকে দুলিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—কিছুকাল স্থিতিশীল, কিছুকাল গতিশীল হইতেছে; একবার সুপ্ত আর একবার ক্রিয়াশীল হইতেছে। এইরূপ পরিবর্তন অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু এই বিশ্লেষণও আংশিক। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানও এই পর্যন্ত জানিয়াছে। ইহার উপরে ঐ বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আর যাইতে পারে না। কিন্তু এই অনুসন্ধানের এখানেই শেষ হয় না। এ পর্যন্ত আমরা এমন জিনিস পাই নাই, যাহা জানিলে সব জানা যায়। আমরা সমুদয় জগৎকে পদার্থ

ও শক্তিতে, অথবা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের ভাষায় বলিতে গেলে—আকাশ ও প্রাণে পর্যবসিত করিয়াছি। এখন আকাশ ও প্রাণকে উহাদের আদি কারণে পর্যবসিত করিতে হইবে। উহাদিগকে 'মন' নামক উচ্চতর ক্রিয়াশক্তিতে পর্যবসিত করা যাইতে পারে, 'মহৎ' বা সমষ্টি চিন্তাশক্তি হইতে প্রাণ ও আকাশ—উভয়ের উৎপত্তি। চিন্তাশক্তিই এই দুইটি শক্তিরূপে বিভক্ত হইয়া যায়। আদিতে এই সর্বব্যাপী মন ছিলেন। ইনিই পরিণত হইয়া আকাশ ও প্রাণরূপ ধারণ করিলেন, আর এই দুইটির সংযোগে ও মিলনে সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

এবার মনস্তত্ত্বের আলোচনা করা যাক। আমি তোমাকে দেখিতেছি, চক্ষু দ্বারা বিষয় গৃহীত হইতেছে, উহা অনুভূতিজনক স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হইতেছে। এই চক্ষু দর্শনের সাধন নহে, উহা বাহিরের যন্ত্রমাত্র, কারণ দর্শনের প্রকৃত সাধন—যাহা মস্তিষ্কে বিষয়-জ্ঞানের সংবাদ বহন করে, তাহা যদি নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তবে আমার বিশটি চক্ষু থাকিলেও তোমাদের কাহাকেও দেখিতে পাইব না। অক্ষিজালের (retina) উপর সম্পূর্ণ ছবি পড়িতে পারে, তথাপি আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। সুতরাং প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় এই চক্ষু হইতে পৃথক্; প্রকৃত চক্ষুরিন্দ্রিয় অবশ্য চক্ষু-যন্ত্রের পশ্চাতে অবস্থিত। সকল প্রকার বিষয়ানুভূতি সম্বন্ধেই এরূপ বুঝিতে হইবে। নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নহে; উহা যন্ত্রমাত্র, উহার পশ্চাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, প্রথমে এই স্থূল শরীরে বাহ্যযন্ত্রগুলি অবস্থিত, তৎপশ্চাতে কিন্তু ঐ স্থূল শরীরেই ইন্দ্রিয়গণও অবস্থিত। কিন্তু তথাপি যথেষ্ট হইল না। মনে কর আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি অতিশয় মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনিতেছ, এমন সময় এখানে একটি ঘণ্টা বাজিল, তুমি হয়তো সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইবে না। ঐ শব্দতরঙ্গ তোমার কানে পৌঁছিয়া কর্ণপটহে লাগিল, স্নায়ুর দ্বারা ঐ সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছিল, কিন্তু তথাপি তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? যদি মস্তিষ্কে সংবাদ-বহন পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হইযা থাকে, তবে তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? তাহা হইলে দেখা গেল, এই শ্রবণ-প্রক্রিয়ার জন্য আরও কিছু আবশ্যক—এ ক্ষেত্রে মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত ছিল না। যখন মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ থাকে, ইন্দ্রিয় উহাকে যে-কোন সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, মন তাহা

গ্রহণ করিবে না। যখন মন উহাতে যুক্ত হয়, তখনই কেবল উহার পক্ষে কোন সংবাদগ্রহণ সম্ভব। কিন্তু উহাতেও বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। বাহিরের যন্ত্র সংবাদ আনিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণ ভিতরে উহা বহন করিতে পারে, মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তথাপি বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না; আর একটি জিনিস আবশ্যক। ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া আবশ্যক। প্রতিক্রিয়া হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। বাহিরের বস্তু যেন আমার অন্তরে সংবাদ-প্রবাহ প্রেরণ করিল। আমার মন উহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির নিকট প্রেরণ করিল, বুদ্ধি পূর্বানুভূত মনের সংস্কার অনুসারে উহাকে সাজাইল এবং বাহিরে প্রতিক্রিয়াপ্রবাহ প্রেরণ করিল, ঐ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। মনে যে শক্তি এই প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে, তাহাকে বুদ্ধি বলে। তথাপি ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হইল না। মনে কর—একটি ক্যামেরা (ম্যাজিক লণ্ঠন) রহিয়াছে, আর একটি বস্ত্রখণ্ড রহিয়াছে। আমি ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপর একটি চিত্র ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি কি করিতেছি? আমি ক্যামেরা হইতে নানা প্রকার আলোক-কিরণ ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপর ফেলিয়া ঐগুলি ঐ স্থানে একত্র করিতে চেষ্টা করিতেছি। একটি অচল বস্তুর আবশ্যক, যাহার উপর চিত্র ফেলা যাইতে পারে। কোন সচল বস্তুর উপর চিত্র ফেলা অসম্ভব—কোন স্থির বস্তুর প্রয়োজন। আমি যে-সকল আলোকরশ্মি ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি, সেগুলি সচল; এই সচল আলোকরশ্মি কোন অচল বস্তুর উপর একত্র—একীভূত করিয়া মিলিত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ যে-সকল অনুভূতি ভিতরে লইয়া গিয়া মনের নিকট এবং মন বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ। যতক্ষণ না এমন কোন স্থির বস্তু পাওয়া যায়, যাহার উপর এই চিত্র ফেলিতে পারা যায়, যাহাতে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি একত্র মিলিত হইতে পারে, ততক্ষণ এই বিষয়ানুভূতি-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কি সেই বস্তু, যাহা আমাদের পরিবর্তনশীল সত্তাকে একটি একত্বের ভাব প্রদান করে? কি সেই বস্তু, যাহা বিভিন্ন গতির ভিতরেও প্রতি মুহূর্তে ঐক্য রক্ষা করিয়া থাকে? কি সেই বস্তু, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি যেন একত্র গ্রথিত থাকে, যাহার উপর বিষয়গুলি আসিয়া যেন একত্র বাস করে এবং একটি অখণ্ড ভাব ধারণ করে? আমরা দেখিলাম, এমন একটি বস্তু আবশ্যক, এবং শরীর-মনের তুলনায় সেই বস্তুটিকে স্থির হইতে হইবে। যে

বস্ত্রখণ্ডের উপর ঐ ক্যামেরা চিত্রনিক্ষেপ করিতেছে, তাহা ঐ আলোকরশ্মির তুলনায় স্থির, নতুবা কোন চিত্র প্রক্ষিপ্ত হইবে না। অর্থাৎ অনুভবিতা একটি 'ব্যক্তি' হওয়া আবশ্যক। এই বস্তু, যাহার উপর মন এই-সকল চিত্রাঙ্কন করিতেছে—যাহার উপর মন ও বুদ্ধি দ্বারা বাহিত হইয়া আমাদের বিষয়ানুভূতিসকল স্থাপিত, শ্রেণীবদ্ধ ও একত্র হয়, তাহাকেই মানুষের আত্মা বলে।

আমরা দেখিলাম, সমষ্টি-মন বা মহৎ—আকাশ ও প্রাণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, আর মনের পশ্চাতে আত্মা রহিয়াছেন। সমষ্টি-মনের পশ্চাতে যে আত্মা, তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলে। ব্যষ্টিতে ইহা মানবের আত্মা মাত্র। যেমন জগতে সমষ্টি-মন আকাশ ও প্রাণরূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ সমষ্টি-আত্মাও মনরূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই—ব্যষ্টি-মানব সম্বন্ধেও কি ঐরূপ? মানুষেরও মন কি তাহার শরীরের স্রষ্টা, তাহার আত্মা তাহার মনের স্রষ্টা—অর্থাৎ মানুষের শরীর, মন ও আত্মা—তিনটি বিভিন্ন বস্তু, অথবা ইহারা একের ভিতরেই তিন, অথবা ইহারা এক পদার্থেরই বিভিন্ন অবস্থামাত্র? আমরা ক্রমশঃ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক, আমরা এতক্ষণে এই পাইলাম—প্রথমতঃ এই স্থূলদেহ, তৎপশ্চাতে ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি এবং বুদ্ধিরও পশ্চাতে আত্মা। প্রথমতঃ আমরা পাইলাম, আত্মা শরীর হইতে পৃথক্, মন হইতেও পৃথক্। এই স্থান হইতেই ধর্মজগতে মতভেদ দেখা যায়। দ্বৈতবাদী বলেন—আত্মা সগুণ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও ভোগের সব অনুভূতিই যথার্থতঃ আত্মার ধর্ম; অদ্বৈতবাদী বলেন—আত্মা নির্গুণ।

আমরা প্রথমে দ্বৈতবাদীদের মত—আত্মা ও উহার গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত বর্ণনা করিয়া পরে যে মত উহা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে, তাহা বর্ণনা করিব। অবশেষে অদ্বৈতবাদের দ্বারা উভয় মতের সামঞ্জস্য সাধন করিতে চেষ্টা করিব। এই মানবাত্মা শরীর-মন হইতে পৃথক্ বলিয়া এবং আকাশ ও প্রাণ দ্বারা গঠিত নয় বলিয়া অমর। কেন? মরত্বের বা নশ্বরত্বের অর্থ কি? যাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তাহাই নশ্বর। আর যে দ্রব্য কতকগুলি পদার্থের সংযোগ দ্বারা লব্ধ, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইবে। কেবল যে-পদার্থ অপর পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন নয়, তাহা কখনও বিশ্লিষ্ট হয় না, সুতরাং তাহার বিনাশ কখনও হইতে পারে না, তাহা অবিনাশী; তাহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার কখনও সৃষ্টি হয়

নাই। সৃষ্টি কেবল সংযোগমাত্র। শূন্য হইতে সৃষ্টি—কেহ কখনও দেখে নাই। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা কেবল এইমাত্র জানি যে, উহা পূর্ব হইতে অবস্থিত কতকগুলি বস্তুর নূতন নূতন রূপে একত্র মিলন মাত্র। যদি তাহাই হইল, তবে এই মানবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন নয় বলিয়া অবশ্য অনন্তকাল ধরিয়া ছিল এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। এই শরীর-পাত হইলেও আত্মা থাকিবেন। বেদান্তবাদীদের মতে—যখন এই শরীরের পতন হয়, তখন মানবের ইন্দ্রিয়গণ মনে লয় পায়, মন প্রাণে লীন হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তখন সেই মানবাত্মা যেন সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান।

এই সূক্ষ্মশরীরেই মানুষের সমুদয় সংস্কার বাস করে। সংস্কার কি ? মন যেন হ্রদের তুল্য, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন সেই হ্রদে তরঙ্গতুল্য। যেমন হ্রদে তরঙ্গ উঠে, আবার পড়ে—পড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়; সেইরূপ মনে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, আবার অন্তর্হিত হইতেছে। কিন্তু উহারা একেবারে অন্তর্হিত হয় না; উহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইয়া যায়, উহাদের অস্তিত্ব থাকে, প্রয়োজন হইলে আবার উদয় হয়। যে চিন্তাগুলি সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্গাকারে আনয়ন করাকেই 'স্মৃতি' বলে। এইরূপে আমরা যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে কোন কার্য করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে রহিয়াছে। সবগুলিই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে এবং মানুষ মরিলেও এই সংস্কারগুলি তাহার মনে বর্তমান থাকে—উহারা আবার সূক্ষ্মশরীরের উপর কার্য করিয়া থাকে। আত্মা এই-সকল সংস্কার এবং সূক্ষ্মশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান এবং এই বিভিন্নসংস্কাররূপ বিভিন্ন শক্তির সমবেত ফলই আত্মার গতি নিয়মিত করে। তাঁহাদের মতে আত্মার ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে।

যাঁহারা অত্যন্ত ধার্মিক, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা সূর্যরশ্মির অনুসরণ করেন; সূর্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সূর্যলোকে উপনীত হন, তথা হইতে চন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হন; তথায় তাঁহাদের সহিত আর একজন মুক্তাত্মার সাক্ষাৎ হয়; তিনি ঐ জীবাত্মাগণকে সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এইস্থানে তাহারা সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা লাভ করেন; তাঁহাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয়; আর দ্বৈতবাদীদের মতে—তাঁহারা তথায় অনন্তকাল বাস করেন, অথবা অদ্বৈতবাদীদের মতে—

কল্পাবসানে ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন। যাঁহারা সকামভাবে সৎকার্য করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করেন। এখানে নানাবিধ স্বর্গ আছে। তাঁহারা এখানে সূক্ষ্মশরীর—দেবশরীর লাভ করেন। তাঁহারা দেবতা হইয়া এখানে বাস করেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। এই ভোগের অবসানে আবার তাঁহাদের পুরাতন কর্ম বলবান হয়, সুতরাং পুনরায় তাঁহাদের মর্ত্যলোকে জন্ম হয়। তাঁহারা বায়ুলোক, মেঘলোক প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বৃষ্টিধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হন। বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়া তাঁহারা কোন শস্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তৎপরে সেই শস্য কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে তাহার ঔরসে সেই জীবাত্মা পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করে।

যাহারা অতিশয় দুর্বৃত্ত, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা ভূত বা দানব হয় এবং চন্দ্রলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যগণের উপর নানাবিধ অত্যাচাব করিয়া থাকে, কেহ কেহ আবার মনুষ্যগণের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়। তাহারা কিছুকাল ঐস্থানে থাকিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া পশুজন্ম গ্রহণ করে। কিছুদিন পশুদেহে নিবাস করিয়া তাহারা আবার মানুষ হয়—আর একবার মুক্তিলাভ করিবার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, যাঁহারা মুক্তির নিকটতম সোপানে পৌঁছিয়াছেন, যাঁহাদের ভিতরে খুব সামান্য অপবিত্রতা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারাই সূর্যকিরণ ধরিয়া ব্রহ্মলোকে গমন কবেন। যাঁহারা মাঝারি রকমের লোক, যাঁহারা স্বর্গে যাইবার কামনা রাখিয়া কিছু সৎকার্য করেন, চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সেই-সকল ব্যক্তি সেইস্থানের স্বর্গে বাস করেন, সেখানে তাঁহারা দেবদেহ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহাদিগকে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হয়। আর যাহারা অত্যন্ত অসৎ, তাহারা ভূত দানব প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়, তাহার পর তাহারা পশু হয়; পরে মুক্তিলাভের জন্য তাহাদিগকে আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবীকে 'কর্মভূমি' বলে। ভাল-মন্দ কর্ম সবই এখানে করিতে হয়। স্বর্গকাম হইয়া সৎকার্য করিলে মানুষ স্বর্গে গিয়া দেবতা হন। এই অবস্থায় তিনি আর নূতন কর্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে তাঁহার সৎকর্মের ফলভোগ করেন। আর এই সৎকর্ম যেমনি শেষ হইয়া যায়, অমনি তিনি জীবনে যে-সকল অসৎ

কর্ম করিয়াছিলেন, তাহার সমবেত ফল বেগে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্বার এই পৃথিবীতে টানিয়া আনে। এইরূপে যাহারা ভূতপ্রেত হয়, তাহারা সেই অবস্থায় কোনরূপ নূতন কর্ম না করিয়াই কেবল অতীত কর্মের ফলভোগ করে, তাহার পর পশুজন্ম গ্রহণ করিয়া সেখানেও কোন নূতন কর্ম করে না, তাহার পর তাহারা আবার মানুষ হয়।

মনে কর—কোন ব্যক্তি সারা জীবন অনেক মন্দ কাজ করিল, কিন্তু একটি খুব ভাল কাজও করিল, তাহা হইলে সেই সৎকর্মের ফল তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাইবে, আর ঐ কার্যের ফল শেষ হইবামাত্র অসৎ কর্মগুলিও তাহাদের ফল প্রদান করিবে। যাহারা কতকগুলি ভাল ও মহৎ কাজ করিয়াছে, কিন্তু যাহাদের জীবনের অভ্যাস বা আচরণ ঠিক নহে, তাহারা দেবতা হইবে। দেবদেহসম্পন্ন হইয়া দেবতাদের শক্তি কিছুকাল সম্ভোগ করিয়া আবার তাহাদিগকে মানুষ হইতে হইবে। যখন সৎকর্মের শক্তি ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন আবার সেই পুরাতন অসৎকার্যগুলির ফল ফলিতে থাকিবে। যাহারা অতিশয় অসৎকর্ম করে, তাহাদিগকে ভূতশরীর দানবশরীর গ্রহণ করিতে হইবে; আর যখন ঐ অসৎকার্যগুলির ফল শেষ হইয়া যায়, তখন যে সৎকর্মটুকু অবশিষ্ট থাকে—তাহা দ্বারা তাহারা আবার মানুষ হইবে। যে পথে ব্রহ্মলোকে যাওয়া যায়, যেখান হইতে পতন বা প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকে 'দেবযান' বলে আর চন্দ্রলোকের পথকে 'পিতৃযান' বলে।

অতএব বেদান্তদর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী আর এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এইখানেই মুক্ত হইবার সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত হইতে হইলে মানবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই মানবজন্মেই মুক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা।

এখন এই মতেব বিরোধী মত আলোচনা করা যাক। বৌদ্ধগণ এই আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ বলেন: এই শরীর-মনের পশ্চাতে আত্মা বলিয়া একটি পদার্থ আছে, তাহা মানিবার আবশ্যকতা কি? 'এই শরীর ও মন-রূপ যন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ' বলিলেই কি যথেষ্ট ব্যাখ্যা হইল না? আবার একটি তৃতীয় পদার্থ কল্পনার প্রয়োজন কি? এই যুক্তিগুলি খুব প্রবল। যতদূর পর্যন্ত অনুসন্ধান চলে, ততদূর বোধ হয়,

এই শরীর ও মনরূপ যন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ, অন্ততঃ আমরা অনেকে এই তত্ত্বটি এই ভাবেই দেখিয়া থাকি। তবে শরীর ও মনের অতিরিক্ত, অথচ শরীর-মনের আশ্রয়স্বরূপ আত্মা-নামক একটি পদার্থের অস্তিত্ব-কল্পনায় আবশ্যকতা কি? শুধু শরীর-মন বলিলেই তো যথেষ্ট হয়; নিয়ত পরিণামশীল জড়স্রোতের নাম 'শরীর', আর নিয়ত-পরিণামশীল চিন্তাস্রোতের নাম মন। এই দুয়ের একত্ব-প্রতীতি হইতেছে কিসের দ্বারা? বৌদ্ধ বলেন: এই একত্ব বাস্তবিক নাই। একটি জলন্ত মশাল লইয়া ঘুরাইতে থাকো, একটি অগ্নির বৃত্তস্বরূপ হইবে। বাস্তবিক কোন বৃত্ত হয় নাই, কিন্তু মশালের নিয়ত ঘূর্ণনে উহা ঐ বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ আমাদের জীবনেও একত্ব নাই; জড়ের রাশি ক্রমাগত বহিয়া চলিয়াছে। সমুদয় জড়রাশিকে 'এক' বলিতে ইচ্ছা হয় বলো, কিন্তু তদতিরিক্ত বাস্তবিক কোন একত্ব নাই। মনের সম্বন্ধেও তাই; প্রত্যেক চিন্তা অপর চিন্তা হইতে পৃথক্। এই প্রবল চিন্তাস্রোতই এই একত্বের ভ্রম রাখিয়া যাইতেছে। সুতরাং তৃতীয় পদার্থের আর আবশ্যকতা নাই। দেহ-মনের বিশ্বপ্রপঞ্চ এই জড়স্রোত ও এই চিন্তাস্রোত—কেবল ইহাদেরই অস্তিত্ব আছে; ইহাদের পশ্চাতে আর কিছু অনুমান করিও না। আধুনিক অনেক সম্প্রদায় বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই মতকে তাঁহাদের নিজেদের আবিষ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। অধিকাংশ বৌদ্ধ-দর্শনেরই মোট কথাটা এই যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পর্যাপ্ত; ইহার পশ্চাতে আর কিছু আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই সব—কোন বস্তুকে এই জগতের আশ্রয়রূপে কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? সবই গুণসমষ্টি। এমন আনুমানিক পদার্থ কল্পনা করিবার কি আবশ্যকতা আছে, যাহাতে সেগুলি লাগিয়া থাকিবে? গুণরাশির দ্রুত আদানপ্রদানবশতই পদার্থের জ্ঞান হয়, কোন অপরিণামী পদার্থ বাস্তবিক উহাদের পশ্চাতে আছে বলিয়া নয়। আমরা দেখিলাম এই যুক্তিগুলি কি চমৎকার। আর এগুলি মানবের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে সহজেই নাড়া দেয়। বাস্তবিক লক্ষে একজনও এই দৃশ্যজগতের অতীত কিছুর ধারণা করিতে পারে কি না, সন্দেহ। অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি নিত্যপরিণাম-শীল। আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই পটভূমিস্থ সেই স্থির সমুদ্রের সামান্য

আভাস পাইয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরঙ্গ মাত্র। তাহা হইলে আমরা দুইটি মত পাইলাম। একটি—এই শরীর-মনের পশ্চাতে এক অপরিণামী সত্তা রহিয়াছে; আর একটি মত—এই জগতে অচল অপরিণামী বলিয়া কিছুই নাই, সবই চঞ্চল পরিবর্তনশীল—পরিণামী; পরিণাম ছাড়া কিছু নয়! যাহা হউক অদ্বৈতবাদেই এই দুই মতের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদী বলেন: 'জগতের একটি অপরিণামী আশ্রয় আছে'—দ্বৈতবাদীর এই বাক্য সত্য; অপরিণামী কোন পদার্থ কল্পনা না করিলে আমরা পরিণাম কল্পনা করিতে পারি না। কোন অপেক্ষাকৃত অল্পপরিণামী পদার্থের তুলনায় কোন পদার্থকে পরিণামিরূপে চিন্তা করা যাইতে পারে, আবার তাহা অপেক্ষাও অল্পপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় উহাকে আবার পরিণামিরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে, যতক্ষণ না একটি পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই জগৎপ্রপঞ্চ অবশ্য এমন এক অবস্থায় ছিল, যখন উহা শান্ত ও নিঃশব্দ ছিল, যখন উহা বিপরীত শক্তির সাম্যাবস্থায় ছিল, অর্থাৎ যখন প্রকৃতপক্ষে কোন শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল না; কারণ বৈষম্য না হইলে শক্তির বিকাশ হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ড আবার সেই সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তির জন্য দ্রুতবেগে চলিয়াছে। যদি আমাদের কোন বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তবে এই বিষয়েই আছে। দ্বৈতবাদীরা যখন বলেন কোন অপরিণামী পদার্থ আছে, তখন তাঁহারা ঠিকই বলেন, কিন্তু উহা যে শরীর-মনের সম্পূর্ণ অতীত, শরীর-মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এ কথা বলা ভুল। বৌদ্ধেরা যে বলেন, সমুদয় জগৎ পরিণামপ্রবাহ মাত্র—এ কথাও সত্য; কারণ যতদিন আমি জগৎ হইতে পৃথক্, যতদিন আমি আমার অতিরিক্ত আর কিছুকে দেখি, মোট কথা যতদিন দ্বৈতভাব থাকে, ততদিন এই জগৎ পরিণামশীল বলিয়াই প্রতীত হইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা—এই জগৎ পরিণামীও বটে, আবার অপরিণামীও বটে। আত্মা, মন ও শরীর—তিনটি পৃথক্ বস্তু নহে, উহারা একই। একই বস্তু কখন দেহ, কখন মন, কখন বা দেহ-মনের অতীত আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি মন পর্যন্ত দেখিতে পান না; যিনি মন দেখেন, তিনি আত্মা দেখিতে পান না; আর যিনি আত্মা দেখেন, তাঁহার পক্ষে শরীর ও মন উভয়ই কোথায় চলিয়া যায়! যিনি কেবল গতি দেখেন, তিনি পরম শান্ত স্থিরভাব দেখিতে পান না; আর যিনি সেই পরম শান্তভাব

দেখেন, তাঁহার পক্ষে গতি ও চঞ্চলতা কোথায় চলিয়া যায়! সর্পে রজ্জুভ্রম হইল। যে ব্যক্তি রজ্জুতে সর্প দেখিতেছে, তাহার পক্ষে রজ্জু কোথায় চলিয়া যায়, আর ভ্রান্তি দূর হইলে সে ব্যক্তি রজ্জুই দেখিতে থাকে, তখন তাহার পক্ষে সর্প আর থাকে না।

তাহা হইলে দেখা গেল, একটিমাত্র বস্তুই আছে—তাহাই নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাকে আত্মাই বলো আর বস্তুই বলো বা অন্য কিছুই বলো, জগতে কেবল একমাত্র ইহারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নামরূপ-উপাধিবশতঃ 'বহু' প্রতীত হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর; একটি তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে। তবে তরঙ্গকে পৃথক্ দেখাইতেছে কেন? নাম ও রূপ—তরঙ্গের আকৃতি রূপ, আর আমরা উহাকে 'তরঙ্গ' এই যে নাম দিয়াছি, এই নাম-রূপই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। নাম-রূপ চলিয়া গেলেই তরঙ্গ যে সমুদ্র ছিল, সেই সমুদ্রই হইয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ করিতে পারে? অতএব এই সমগ্র জগৎ এক সত্তা। নাম-রূপই যত পার্থক্য রচনা করিয়াছে। যেমন সূর্য লক্ষ লক্ষ জলকণার উপরে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই সূর্যের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে, তেমনি সেই এক আত্মা, সেই এক সত্তা অসংখ্য নাম-রূপের বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু স্বরূপতঃ উহা এক। বাস্তবিক 'আমি' বা 'তুমি' বলিয়া কিছুই নাই—সবই এক। হয় বলো—সবই আমি, না হয় বলো—সবই তুমি। দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর সমুদয় জগৎ এই দ্বৈতজ্ঞানের ফল। বিচারজ্ঞানের উদয় হইলে মানুষ দেখিতে পায় দুইটি বস্তু নাই, একটি বস্তুই আছে, তখন তাহার উপলব্ধি হয়—সে নিজেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। আমি এই পরিবর্তনশীল জগৎ, আমিই আবার অপরিণামী, নির্গুণ নিত্যপূর্ণ নিত্যানন্দময়।

অতএব নিত্যশুদ্ধ নিত্যপূর্ণ অপরিণামী অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন; তাঁহার কখন পরিণাম হয় নাই, আর এই-সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতে শুধু প্রতীত হইতেছে। উহার উপরে নাম-রূপ এই-সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কন করিয়াছে। রূপ বা আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটি মিলাইয়া গেল, তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে? উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে

সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে; কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ রূপ থাকে; কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না। এই 'নাম-রূপ'কেই মায়া বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন 'ব্যক্তি' সৃষ্টি করিয়া একজনকে আর একজন হইতে পৃথক্ মনে করাইতেছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না। 'রূপে'র বা আকৃতির অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই, একথাও বলা যায় না, কারণ উহাই এই-সকল ভেদ করিয়াছে। অদ্বৈতবাদীর মতে এই মায়া বা অজ্ঞান বা নাম-রূপ—ইওরোপীয়গণের মতে দেশকাল-নিমিত্ত—সেই এক অনন্ত সত্তা হইতে এই বিভিন্নরূপ জগৎসত্তা দেখাইতেছে, পরমার্থতঃ এই জগৎ এক অখণ্ড-স্বরূপ। যতদিন পর্যন্ত কেহ দুইটি বস্তুর কল্পনা করেন, ততদিন তিনি ভ্রান্ত। যখন তিনি জানিতে পারেন—একমাত্র সত্তা আছে, তখনই তিনি ঠিক ঠিক জানিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের নিকট এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে—কি জড়জগতে, কি মনো-জগতে, কি অধ্যাত্মজগতে, সর্বত্রই এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে তুমি আমি, সূর্য চন্দ্র তারা—এ-সবই এক জড়সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নামমাত্র। এই জড়রাশি ক্রমাগত পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে। যে শক্তিকণা কয়েক মাস পূর্বে সূর্যে ছিল, তাহা আজ হয়তো মনুষ্যের ভিতর আসিয়াছে, কাল হয়তো উহা পশুর ভিতরে, আবার পরশু হয়তো কোন উদ্ভিদে প্রবেশ করিবে। সর্বদাই আসিতেছে, সর্বদা যাইতেছে। উহা একমাত্র অখণ্ড জড়রাশি—কেবল নাম-রূপে পৃথক্। উহার এক বিন্দুর নাম সূর্য, এক বিন্দুর নাম চন্দ্র, এক বিন্দু তারা, এক বিন্দু মানুষ, এক বিন্দু পশু, এক বিন্দু উদ্ভিদ এইরূপ। আর এই যে বিভিন্ন নাম, ইহা ভ্রমাত্মক; কারণ এই জড়-রাশির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই জগৎকেই আর এক ভাবে দেখিলে চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীয়মান হইবে, উহার এক-একটি বিন্দু এক-একটি মন; তুমি একটি মন, আমি একটি মন, প্রত্যেকেই এক-একটি মনমাত্র। আবার এই জগৎকে জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে, অর্থাৎ যখন চক্ষু হইতে মোহাবরণ অপসারিত হয়, যখন মন শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহাকেই নিত্যশুদ্ধ অপরিণামী অবিনাশী অখণ্ড পূর্ণস্বরূপ পুরুষ বলিয়া প্রতীতি হইবে।

তবে দ্বৈতবাদীর পরলোকবাদ—মানুষ মরিলে স্বর্গে যায়, অথবা অমুক অমুক লোকে যায়, অসৎলোকে ভূত হয়, পরে পশু হয়—এ-সব কথার কি হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন—কেহ আসেও না, কেহ যায়ও না—তোমার পক্ষে যাওয়া-আসা কিসে সম্ভব? তুমি অনন্তস্বরূপ, তোমার পক্ষে যাইবার স্থান আর কোথায়?

কোন বিদ্যালয়ে কতকগুলি ছোট বালক-বালিকার পরীক্ষা হইতেছিল। পরীক্ষক ঐ ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে নানারূপ কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নটিও ছিল—পৃথিবী পড়িয়া যায় না কেন? অনেকেই প্রশ্নটি বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং যাহার যাহা মনে আসিতে লাগিল, সে সেইরূপ উত্তর দিতে লাগিল। একটি বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটি প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নটির উত্তর দিল—'কোথায় পড়িবে?' প্রশ্নটিই তো ভুল। জগতে উঁচু-নীচু বলিয়া তো কিছুই নাই। উঁচু-নীচু জ্ঞান আপেক্ষিক মাত্র। আত্মা সম্বন্ধেও সেইরূপ। আত্মার জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন একেবারে অর্থহীন। কে যায়, কে আসে? তুমি কোথায় নাই? এমন স্বর্গ কোথায় আছে, যেখানে তুমি পূর্ব হইতেই অবস্থিত নও? মানুষের আত্মা সর্বব্যাপী। তুমি কোথায় যাইবে? কোথায় যাইবে না? আত্মা তো সর্বত্র! সুতরাং জ্ঞানী বা সিদ্ধ পুরুষের পক্ষে এই-সব শিশুর কল্পনা, এই জন্মমৃত্যুরূপ বালসুলভ ভ্রম, এই স্বর্গ নরক—সবই একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়; যাঁহারা প্রায়সিদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষে উহা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত নানাবিধ দৃশ্য দেখাইয়া অন্তর্হিত হয়; অজ্ঞানীর পক্ষে উহা থাকিয়া যায়।

স্বর্গে যাওয়া, মরা, জন্মগ্রহণ করা—পৃথিবীর সকলে এ-সব কথা বিশ্বাস করে কি করিয়া? আমি একখানি বই পড়িতেছি, উহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটাইয়া যাইতেছি! আর এক পৃষ্ঠা আসিল, তাহাও উলটানো হইল। কাহার পরিণাম হইতেছে? কে যায় আসে? আমি নই—ঐ বইটিরই পাতা উলটানো হইতেছে। সমুদয় প্রকৃতিই আত্মার সম্মুখে একখানি পুস্তকের মতো। উহার অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়া হইয়া যাইতেছে ও উলটানো হইতেছে, নূতন দৃশ্য সম্মুখে আসিতেছে। উহাও পড়া হইয়া গেল এবং উলটানো হইল। আবার নূতন অধ্যায় আসিল; কিন্তু আত্মা যেমন, তেমনই—অনন্তস্বরূপ। প্রকৃতিই পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছেন, আত্মা নহেন। আত্মার কখন পরিণাম হয় না।

জন্মমৃত্যু প্রকৃতিতে, তোমাতে নয়। তথাপি অজ্ঞেরা ভ্রান্ত হইয়া মনে করে—আমরা জন্মাইতেছি, মরিতেছি, প্রকৃতি নয়; যেমন ভ্রান্তিবশতঃ আমরা মনে করি—সূর্যই চলিতেছে, পৃথিবী নয়। সুতরাং এ-সব কিছুই ভ্রান্তিমাত্র, যেমন আমরা ভ্রমবশতঃ রেলগাড়ির পরিবর্তে মাঠকে সচল বলিয়া মনে করি। জন্ম-মৃত্যুর ভ্রান্তি ঠিক এইরূপ। যখন মানুষ কোন বিশেষ ভাবে থাকে, তখন সে ইহাকেই পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারা প্রভৃতি বলিয়া দেখে; আর যাহারা ঐরূপ মনোভাবসম্পন্ন, তাহারাও ঠিক তাহাই দেখে! তোমার আমার মধ্যে বিভিন্ন স্তরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারাও আমাদিগকে কখন দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কখন দেখিতে পাইব না। এক প্রকার চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন একই লোকে অবস্থিত প্রাণীকেই আমরা দেখিতে পাই। যে যন্ত্রগুলি এক সুরে বাঁধা সেইগুলির মধ্যে একটি বাজিলেই অন্যগুলি বাজিয়া উঠিবে। মনে কর, আমরা এখন যেরূপ প্রাণকম্পনসম্পন্ন, উহাকে আমরা 'মানবকম্পন' নাম দিতে পারি; যদি উহা পরিবর্তিত হইয়া যায়, তবে আর মনুষ্য দেখা যাইবে না, পরিবর্তে অন্যরূপ দৃশ্য আমাদের সম্মুখে আসিবে—হয়তো দেবতা ও দেবজগৎ কিংবা অসৎ লোকের পক্ষে দানব ও দানবজগৎ; কিন্তু ঐ সবগুলিই এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এই জগৎ মানবদৃষ্টিতে পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারা প্রভৃতিরূপে, আবার দানবের দৃষ্টিতে ইহাই নরক বা শাস্তিস্থানরূপে প্রতীত হইবে, আবার যাহারা স্বর্গে যাইতে চাহে, তাহারা এই স্থানকেই স্বর্গরূপে দেখিবে। যাহারা সারা জীবন ভাবিতেছে, আমরা স্বর্গসিংহাসনারূঢ় ঈশ্বরের নিকট গিয়া সারা জীবন তাঁহার উপাসনা করিব, মৃত্যু হইলে তাহারা তাহাদের চিত্তস্থ ঐ-বিষয়ই দেখিবে। এই জগৎই তাহাদের চক্ষে একটি বৃহৎ স্বর্গে পরিণত হইয়া যাইবে; তাহারা দেখিবে—নানাপ্রকার পক্ষযুক্ত দেবদূত উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর ঈশ্বর সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। স্বর্গাদি সবকিছুই মানুষের সৃষ্টি। অতএব অদ্বৈতবাদী বলেন: দ্বৈতবাদীর কথা সত্য বটে, কিন্তু ঐ-সকল তাহার নিজেরই সৃষ্টি। এই-সব লোক, এই-সব দৈত্য, পুনর্জন্ম প্রভৃতি সবই রূপক, মানবজীবনও তাহাই। ঐগুলি কেবল রূপক, আর মানবজীবন সত্য—ইহা হইতে পারে না। মানুষ সর্বদাই এই ভুল করিতেছে। অন্যান্য জিনিস—যথা স্বর্গ নরক প্রভৃতিকে রূপক বলিলে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে রূপক বলিয়া

কোনমতে স্বীকার করিতে চায় না। এই আপাত-প্রতীয়মান সবই রূপকমাত্র আর 'আমরা শরীর'—এই জ্ঞানই সর্বাপেক্ষা মিথ্যা; আমরা কখনই শরীর নহি, কখনও শরীর হইতেও পারি না। আমরা কেবল মানুষ—ইহাই ভয়ানক মিথ্যা কথা। আমরাই জগতের ঈশ্বর। ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়া আমরা নিজেদের অন্তর্নিহিত আত্মারই উপাসনা করিয়া আসিতেছি।

তুমি জন্ম হইতে পাপী ও অসৎ—এইটি সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা। যিনি নিজে পাপী, তিনি কেবল অপরকে পাপী দেখিয়া থাকেন। মনে কর, এখানে একটি শিশু রহিয়াছে, আর তুমি টেবিলের উপর এক থলি মোহর রাখিলে। মনে কর, একজন চোর আসিয়া ঐ মোহর লইয়া গেল। শিশুর পক্ষে ঐ মোহরের থলির অবস্থান ও অন্তর্ধান—উভয়ই সমান; তাহার ভিতরে চোর নাই, সুতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। পাপী ও অসৎ লোকই বাহিরে পাপ দেখিতে পায়, কিন্তু সাধু পাপ দেখিতে পান না। অত্যন্ত অসাধু পুরুষেরা এই জগৎকে নরক-রূপে দেখে; যাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহারা ইহাকে স্বর্গ-রূপে দেখে; আর যাঁহারা পূর্ণ সিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা জগৎকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-রূপে দর্শন করেন, তখনই কেবল তাঁহার দৃষ্টি হইতে আবরণ সরিয়া যায়, আর তখন সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া দেখিতে পান, তাঁহার দৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যে-সকল দুঃস্বপ্ন তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া উৎপীড়ন করিতেছিল, তাহা একেবারে চলিয়া যায়, আর যিনি আপনাকে এতদিন মানুষ দেবতা দানব প্রভৃতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যিনি আপনাকে কখন ঊর্ধ্বে, কখন নিম্নে, কখন পৃথিবীতে, কখন স্বর্গে, কখন বা অন্যত্র অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান—বাস্তবিক তিনি সর্বব্যাপী, তিনি কালের অধীন নহেন, কাল তাঁহার অধীন, সমুদয় স্বর্গ তাঁহার ভিতরে, তিনি কোনরূপ স্বর্গে অবস্থিত নহেন; আর মানুষ এ পর্যন্ত যত দেবতার উপাসনা করিয়াছে, সবই তাহার ভিতরে; মানুষ কোন দেবতার ভিতরে অবস্থিত নয়, মানুষই দেব-অসুর মানুষ-পশু উদ্ভিদ্-প্রস্তর প্রভৃতির সৃষ্টিকর্তা, আর তখনই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার নিকট বিশ্বজগৎ অপেক্ষা পরিপূর্ণ, অনন্তকাল অপেক্ষা সীমাহীন এবং সর্বব্যাপী আকাশ অপেক্ষা সর্বব্যাপিরূপে প্রকাশ পায়। তখনই মানুষ নির্ভয় হইয়া যায়, তখনই মানুষ মুক্ত হইয়া যায়। তখন সব ভ্রান্তি চলিয়া যায়, সব দুঃখ দূর হইয়া যায়, সব

ভয় একেবারে চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যায়। তখন জন্ম কোথায় চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়া যায়; দুঃখ চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে সুখও চলিয়া যায়। পৃথিবী উড়িয়া যায়, তাহার সঙ্গে স্বর্গও উড়িয়া যায়; শরীর চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মনও চলিয়া যায়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় জগৎই যেন অন্তর্হিত হয়। এই যে শক্তিরাশির নিয়ত সংগ্রাম—নিয়ত সংঘর্ষ, ইহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, আর যাহা শক্তি ও পদার্থরূপে, প্রকৃতির বিভিন্ন চেষ্টারূপে ও যাহা স্বয়ং প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বর্গ-পৃথিবী উদ্ভিদ্-পশু মানুষ-দেবতা প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সব এক অনন্ত অচ্ছেদ্য অপরিণামী সত্তারূপে পরিণত হয়; আর জ্ঞানী পুরুষ দেখিতে পান—তিনি সেই সত্তার সহিত অভেদ। যেমন আকাশে নানাবর্ণের মেঘ আসিয়া খানিকক্ষণ খেলা করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ এই আত্মার সম্মুখে পৃথিবী স্বর্গ চন্দ্রলোক দেবতা সুখদুঃখ প্রভৃতি আসিতেছে, কিন্তু উহারা সেই অনন্ত অপরিণামী নীলবর্ণ আকাশকে আমাদের সম্মুখে রাখিয়া অন্তর্হিত হয়। আকাশ কখন পরিণামপ্রাপ্ত হয় না, মেঘই কেবল পরিণামপ্রাপ্ত হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি—আমরা অপবিত্র, আমরা সান্ত; আমরা জগৎ হইতে পৃথক্। প্রকৃত মানুষ এই এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ।

এখন দুইটি প্রশ্ন দেখা দিতেছে। প্রথমটি এই—অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি করা কি সম্ভব? এতক্ষণ পর্যন্ত মতের কথা হইল; কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি কি সম্ভব? হাঁ, সম্পূর্ণ ই সম্ভব। পৃথিবীতে এখনও এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞান চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা কি এই প্রকার উপলব্ধির পরক্ষণেই মরিয়া যান? আমরা যত শীঘ্র মনে করি, তত শীঘ্র নয়। একটি কাষ্ঠদণ্ডে সংযোজিত দুইটি চাকা একত্র চলিতেছে। যদি আমি একখানি চাকা ধরিয়া সংযোজক কাষ্ঠদণ্ডটিকে কাটিয়া ফেলি, তবে আমি যে চাকাখানি ধরিয়াছি, তাহা থামিয়া যাইবে; কিন্তু অপর চাকার উপর পূর্বার্জিত গতিবেগ রহিয়াছে, সুতরাং উহা কিছুক্ষণ গিয়া তবে পড়িয়া যাইবে। পূর্ণ শুদ্ধস্বরূপ আত্মা যেন একখানি চাকা, আর শরীরমনরূপ ভ্রান্তি আর একটি চাকা কর্মরূপ কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা যোজিত। জ্ঞানই সেই কুঠার, যাহা ঐ দুইটির সংযোগদণ্ড ছিন্ন করিয়া দেয়। যখন আত্মারূপ চাকা থামিয়া

যাইবে, তখন আত্মা আসিতেছেন, যাইতেছেন অথবা তাঁহার জন্মমৃত্যু হইতেছে—এ-সকল অজ্ঞানের ভাব পরিত্যক্ত হইবে; আর প্রকৃতির সহিত তাঁহার মিলিতভাব, অভাব, বাসনা—সব চলিয়া যাইবে; তখন আত্মা দেখিতে পাইবেন, তিনি পূর্ণ—বাসনারহিত। কিন্তু শরীরমন-রূপ অপর চাকার প্রাক্তন কর্মের বেগ থাকিবে। সুতরাং যতদিন না এই প্রাক্তন কর্মের বেগ একেবারে নিবৃত্ত হয়, ততদিন উহারা থাকিবে; ঐ বেগ নিবৃত্ত হইলে শরীর-মনের পতন হইবে, তখন আত্মা মুক্ত হইবেন। তখন আর স্বর্গে যাওয়া বা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা নাই, এমন কি ব্রহ্মলোকে গমন পর্যন্ত নাই; কারণ তিনি কোথা হইতে আসিবেন, কোথায়ই বা যাইবেন? যে ব্যক্তি এই জীবনেই এ-অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাঁহার পক্ষে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও এই সংসারদৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া গিয়া সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া কথিত হন। এই জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করাই বেদান্ত-সাধকের লক্ষ্য।

এক সময়ে আমি ভারত-মহাসাগরের উপকূলে পশ্চিমভারতের মরুখণ্ডে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি অনেক দিন ধরিয়া পদব্রজে মরুভূমিতে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু প্রতিদিন দেখিয়া আশ্চর্য হইতাম যে, চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর হ্রদ রহিয়াছে, তাহাদের সকলগুলির চতুর্দিকে বৃক্ষরাজি বিরাজিত, আর ঐ জলে বৃক্ষসমূহের ছায়া বিপরীতভাবে পড়িয়া নড়িতেছে। মনে মনে বলিতাম: কি অদ্ভুত দৃশ্য! লোকে ইহাকে মরুভূমি বলে! এই-সকল অদ্ভুত হ্রদ ও বৃক্ষরাজি দেখিয়া একমাস ভ্রমণ করিলাম। একদিন অতিশয় তৃষ্ণার্ত হওয়ায় আমার একটু জল খাইবার ইচ্ছা হইল, সুতরাং আমি ঐ সুন্দর নির্মল হ্রদসমূহের একটির দিকে অগ্রসর হইলাম। অগ্রসর হইবামাত্র হঠাৎ উহা অদৃশ্য হইল, আর আমার মনে তখন এই জ্ঞানের উদয় হইল, যে মরীচিকা সম্বন্ধে সারাজীবন পুস্তকে পড়িয়া আসিতেছি, এ সেই মরীচিকা! আর সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিল—এই সারা মাস প্রত্যহই আমি মরীচিকাই দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু জানিতাম না যে, ইহা মরীচিকা। তার পরদিন আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্বের মতোই হ্রদ দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও হইতে লাগিল যে, উহা মরীচিকা—সত্য হ্রদ নহে। এই জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ।

আমরা প্রতিদিন প্রতিমাস প্রতিবৎসর এই জগৎ-রূপ মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। একদিন এই মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, কিন্তু উহা আবার দেখা দিবে। শরীর প্রাক্তন কর্মের অধীন থাকিবে, সুতরাং ঐ মরীচিকা ফিরিয়া আসিবে। যতদিন আমরা কর্ম দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন জগৎ আমাদের সম্মুখে আসিবে। নর নারী, পশু উদ্ভিদ, আসক্তি কর্তব্য—সব আসিবে, কিন্তু উহারা পূর্বের মতো আমাদের উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে না। এই নূতন জ্ঞানের প্রভাবে কর্মের শক্তি নষ্ট হইবে, উহার বিষ দূরীভূত হইবে; জগৎ আমাদের পক্ষে একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে; কারণ যেমন জগৎ দেখা যাইবে, তেমনি উহার সহিত সত্য ও মরীচিকার প্রভেদজ্ঞানও দেখা দিবে।

তখন এই জগৎ আর সেই পূর্বের জগৎ থাকিবে না। তবে এইরূপ জ্ঞান-সাধনে একটি বিপদের আশঙ্কা আছে। আমরা দেখিতে পাই, প্রতি দেশেই লোকে এই বেদান্তদর্শনের মত গ্রহণ করিয়া বলে, 'আমি ধর্মাধর্মের অতীত, আমি বিধিনিষেধের অতীত, সুতরাং আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি।' এই দেশেই দেখিবে, অনেক নির্বোধ ব্যক্তি বলিয়া থাকে, 'আমি বদ্ধ নহি, আমি স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ; আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব।' ইহা ঠিক নহে, যদিও ইহা সত্য যে, আত্মা শারীরিক মানসিক বা নৈতিক—সর্বপ্রকার নিয়মের অতীত। ইহা সত্য যে, নিয়মের মধ্যেই বন্ধন, নিয়মের বাহিরে মুক্তি। ইহাও সত্য যে, মুক্তি আত্মার জন্মগত স্বভাব, উহা তাঁহার জন্মপ্রাপ্ত স্বত্ব, আর আত্মার যথার্থ মুক্তস্বভাব জড়ের আবরণের মধ্য দিয়া মানুষের আপাত-প্রতীয়মান মুক্তস্বভাবরূপে প্রতীত হইতেছে। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্তেই তুমি নিজেকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতেছ। আমরা নিজেকে মুক্ত অনুভব না করিয়া এক মুহূর্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, কথা কহিতে পারি না, কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাসও ফেলিতে পারি না। কিন্তু আবার অল্প চিন্তায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, আমরা যন্ত্রের মতো, আমরা মুক্ত নহি। তবে কোন্‌টি সত্য? এই যে 'আমি মুক্ত'—এই ধারণাটিই কি ভ্রমাত্মক! একদল বলেন—'আমি মুক্ত-স্বভাব' এই ধারণা ভ্রমাত্মক, আবার অপর দল বলেন—'আমি বদ্ধভাবাপন্ন' এই

ধারণাই ভ্রমাত্মক। ইহা কিভাবে সম্ভব? মানুষ প্রকৃতপক্ষে মুক্ত। মানুষ পরমার্থতঃ মুক্ত ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না; কিন্তু যখনই তিনি মায়ার জগতে আসেন, যখনই তিনি নাম-রূপের মধ্যে পড়েন, তখনই তিনি বদ্ধ হইয়া যান। 'স্বাধীন ইচ্ছা'—কথাটিই ভুল। ইচ্ছা কখনও স্বাধীন হইতেই পারে না। কি করিয়া হইবে? প্রকৃত মানুষ যখন বদ্ধ হইয়া যান, তখনই তাঁহার ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তাহার পূর্বে নহে। মানুষের ইচ্ছা বদ্ধভাবাপন্ন, কিন্তু উহার মূল অধিষ্ঠান নিত্যকালের জন্য মুক্ত। সুতরাং বন্ধনের অবস্থাতেও এই মনুষ্যজীবনেই হউক, দেবজীবনেই হউক, স্বর্গে অবস্থানকালেই হউক, আর মর্ত্যে অবস্থানকালেই হউক, আমাদের বিধিদত্ত অধিকারস্বরূপ এই মুক্তির স্মৃতি থাকিয়া যায়। আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই সেই মুক্তির দিকেই চলিয়াছি। যখন মানুষ মুক্তিলাভ করে, তখন আর সে নিয়মের দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে পারে? জগতের কোন নিয়মই তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। কারণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই যে তাহার।

মানুষ তখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। হয় বলো—তিনিই সমুদয় জগৎ, না হয় বলো—তাঁহার পক্ষে জগতের অস্তিত্বই নাই। তবে তাঁহার স্ত্রী-পুরুষবোধ, দেশবিদেশ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব কিরূপে থাকিবে? তিনি কিরূপে বলিবেন—আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, অথবা আমি বালক? এগুলি কি মিথ্যা কথা নহে? তিনি জানিয়াছেন—এ-সব মিথ্যা। তখন তিনি এইগুলি পুরুষের অধিকার, এইগুলি নারীর অধিকার—এ-কথা কিরূপে বলিবেন? কাহারও কিছুই অধিকার নাই, কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পুরুষ নাই, স্ত্রীও নাই; আত্মা লিঙ্গহীন, নিত্যশুদ্ধ। আমি পুরুষ বা স্ত্রী, অথবা আমি অমুক-দেশবাসী—এরূপ বলা মিথ্যা কথা মাত্র। সারা পৃথিবী আমার দেশ, সমুদয় জগৎই আমার; কারণ ইহারই দ্বারা আমি নিজেকে আবৃত করিয়াছি, জগৎই আমার শরীর হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি—অনেক লোকে বিচারের সময় এইসব কথা বলিয়া কার্যের সময় অপবিত্র কার্য করিয়া বেড়ায়; আর যদি আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন তোমরা এইরূপ করিতেছ?' তাহারা উত্তর দিবে, 'এ তোমাদের বুঝিবার ভ্রম। আমাদের দ্বারা কোন অন্যায় কার্য হওয়া অসম্ভব।' এই-সকল লোককে পরীক্ষা করিবার উপায় কি? উপায় এই—

যদিও ভাল-মন্দ উভয়ই আত্মার খণ্ড প্রকাশমাত্র, তথাপি অসৎ-ভাব আত্মার বাহ্য আবরণ, আর সৎ-ভাব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যে আত্মা—তাঁহার অপেক্ষাকৃত নিকটতর আবরণ। যতদিন না মানুষ 'অসৎ'-এর স্তর ভেদ করিতে পারিতেছে, ততদিন সৎ-এর স্তরে পৌঁছিতেই পারিবে না; আর যতদিন না মানুষ সদসৎ উভয় স্তর ভেদ করিতে পারিতেছে, ততদিন আত্মার নিকট পৌঁছিতেই পারিবে না। আত্মার নিকট পৌঁছিলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? অতি সামান্য কর্ম, অতীত-জীবনের কার্যের অতি সামান্য বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ—শুভকর্মেরই বেগ। যতদিন না অসৎ কর্মের গতিবেগ একেবারে রহিত হইয়া যাইতেছে, যতদিন না পূর্বের অপবিত্রতা একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ততদিন কোন ব্যক্তির পক্ষে সত্যকে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করা অসম্ভব। সুতরাং যিনি আত্মার নিকট পৌঁছিয়াছেন, যিনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কেবল অতীত-জীবনের শুভ সংস্কার, শুভ বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে। শরীরে বাস করিলেও এবং অনবরত কর্ম করিলেও তিনি কেবল সৎকর্ম করেন; তাঁহার মুখ সকলের প্রতি কেবল আশীর্বাদ বর্ষণ করে, তাঁহার হস্ত কেবল সৎকার্যই করিয়া থাকে, তাঁহার মন কেবল সৎ চিন্তা করিতেই সমর্থ, তাঁহার উপস্থিতিই—তিনি যেখানেই যান না কেন—সর্বত্র মানবজাতির মহাকল্যাণকর। এরূপ ব্যক্তির দ্বারা কোন অসৎ কর্ম কি সম্ভব? তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত 'প্রত্যক্ষানুভূতি' এবং 'শুধু মুখে বলা'র মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অজ্ঞান ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথা বলিয়া থাকে। তোতাপাখিও ঐরূপ বকিয়া থাকে। মুখে বলা এক, উপলব্ধি আর এক। দর্শন-মতামত-বিচার, শাস্ত্র-মন্দির-সম্প্রদায় প্রভৃতি কিছুই মন্দ নয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষানুভূতি হইলে ও-সব আর থাকে না। মানচিত্র অবশ্য উপকারী, কিন্তু মানচিত্রে অঙ্কিত দেশ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া তারপর আবার সেই মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তখন দেখিতে পাইবে কত প্রভেদ! সুতরাং যাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর উহা বুঝিবার জন্য যুক্তিতর্ক প্রভৃতি মানসিক ব্যায়ামের আশ্রয় লইতে হয় না। উহা তাঁহাদের মর্মে মর্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে—উহা তাঁহাদের জীবনের জীবন। বেদান্তবাদীদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উহা যেন তাহার 'করামলকবৎ' হইয়াছে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকারীরা অসঙ্কোচে বলিতে পারেন, 'এই যে, আত্মা রহিয়াছে'। তুমি

তাঁহাদের সহিত যতই তর্ক কর না কেন, তাঁহারা তোমার কথায় শুধু হাসিবেন, তাঁহারা উহা শিশুর আবোল-তাবোল বলিয়া মনে করিবেন। শিশুর আধ-আধ কথায় তাঁহারা বাধা দেন না। তাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া 'ভরপুর' হইয়া আছেন। মনে কর, তুমি একটি দেশ দেখিয়া আসিয়াছ, আর আর একজন ব্যক্তি তোমার নিকট আসিয়া এই তর্ক করিতে লাগিল—ঐ দেশের কখন অস্তিত্বই ছিল না; এইভাবে সে ক্রমাগত তর্ক করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতি তোমার এই মনোভাব হইবে যে, এ ব্যক্তি উন্মাদাগারে যাইবারই উপযুক্ত। এইরূপ যিনি ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বলেন, 'জগতে ধর্ম সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুনা যায়, সে-সকল কেবল শিশুর আধ-আধ কথামাত্র। প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্মের সার কথা।' ধর্ম উপলব্ধি করা যাইতে পারে। প্রশ্ন এই, তুমি কি উহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ? তুমি কি ধর্ম উপলব্ধি করিতে চাও? যদি তুমি ঠিক ঠিক চেষ্টা কর, তবে তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইবে। যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এবং নাস্তিকে কোন প্রভেদ নাই। নাস্তিকেরা তবু অকপট; কিন্তু যে বলে, 'আমি ধর্ম বিশ্বাস করি', অথচ কখন উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না, সে অকপট নহে।

পরবর্তী প্রশ্ন এই—উপলব্ধির পরে কি হয়? মনে কর, উপলব্ধি করিলাম—আমরা জগতের এক অখণ্ড সত্তা, আমরাই যে সেই একমাত্র অনন্ত পুরুষ; মনে কর, আমরা জানিতে পারিলাম—আত্মাই একমাত্র আছেন, আর তিনি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন; এইরূপ জানিতে পারিলে আমাদের কি হইবে? তাহা হইলে আমরা কি এক কোণে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া মরিয়া যাইব? ইহা দ্বারা জগতের কি উপকার হইবে? আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন! প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করি, উহা দ্বারা জগতের উপকার হইবে কেন? ইহার কি কোন যুক্তি আছে? লোকের এই প্রশ্ন করিবার কি অধিকার আছে,—ইহাতে কি জগতের উপকার হইবে? ইহার অর্থ কি? ছোট ছেলে মিষ্টান্ন ভালবাসে। মনে কর, তুমি তড়িতের বিষয়ে কিছু গবেষণা করিতেছ; শিশু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ইহাতে কি মিষ্টি কেনা যায়?' তুমি বলিলে, 'না'। 'তবে ইহাতে কি উপকার হইবে?' তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত

দেখিলেও লোকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, 'ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে? ইহাতে কি আমাদের টাকা হইবে?' 'না।' 'তবে ইহাতে আর উপকার কি?' জগতের হিত করা অর্থে মানুষ এইরূপই বুঝিয়া থাকে। তথাপি ধর্মের এই প্রত্যক্ষানুভূতিই জগতের যথার্থ উপকার করিয়া থাকে। লোকের ভয় হয়, যখন সে এই অবস্থা লাভ করিবে, যখন সে উপলব্ধি করিবে—সবই এক, তখন তাহার প্রেমের প্রস্রবণ শুকাইয়া যাইবে; জীবনের যাহা কিছু মূল্যবান্ সব চলিয়া যাইবে; ইহজীবনে ও পরজীবনে তাহাদের ভালবাসার আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু লোকে একবার ভাবিয়া দেখে না যে, যে-সকল ব্যক্তি নিজ সুখচিন্তায় একরূপ উদাসীন, তাঁহারাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী হইয়াছেন। তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসে, যখন সে দেখিতে পায়—তাহার ভালবাসার জিনিস কোন ক্ষুদ্র মর্ত্য জীব নহে। তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসিতে পারে, যখন সে দেখিতে পায়—তাহার ভালবাসার পাত্র খানিকটা মৃত্তিকাখণ্ড নহে, তাহার প্রেমাস্পদ স্বয়ং ভগবান। স্ত্রী যদি ভাবেন—স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তবে তিনি স্বামীকে আরও অধিক ভালবাসিবেন। স্বামীও স্ত্রীকে অধিক ভালবাসিবেন, যদি তিনি জানিতে পারেন—স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। সেইরূপ মাতাও সন্তানগণকে বেশী ভালবাসিবেন, যিনি সন্তানগণকে ব্রহ্মস্বরূপ দেখেন। যিনি জানেন—ঐ শত্রু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি তাঁহার মহাশত্রুকেও ভালবাসিবেন। যিনি জানেন—সাধু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তিনিই সাধুকে ভালবাসিবেন। সেই লোকই আবার অতিশয় অসাধু ব্যক্তিকেও ভালবাসিবেন, যদি তিনি জানেন—অসাধুতম পুরুষেরও পশ্চাতে সেই প্রভু রহিয়াছেন। যাঁহার জীবনে এই ক্ষুদ্র 'অহং' একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং ঈশ্বর সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সেই ব্যক্তি পৃথিবীকে নাড়া দিয়া যান। তাঁহার নিকট সমুদয় জগৎ সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রতিভাত হয়। দুঃখকর ক্লেশকর যাহা কিছু, সবই চলিয়া যায়; সকল প্রকার গোলমাল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। যেখানে আমরা প্রতিদিন এক টুকরা রুটির জন্য ঝগড়া-মারামারি করি—সেই জগৎ তখন তাঁহার পক্ষে কারাগার না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইবে। তখন জগৎ কি সুন্দর ভাবই না ধারণ করিবে! এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বলিবার অধিকার আছে—'এই জগৎ কি সুন্দর!' তিনিই কেবল বলিতে পারেন যে, সবই মঙ্গল-

স্বরূপ। এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে জগতের এই মহৎ কল্যাণ হইবে যে, সকল বিবাদ গণ্ডগোল দূর হইয়া পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য স্থাপিত হইবে। যদি সকল মানুষ আজ এই মহান্ সত্যের এক বিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে সারা পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করিবে; অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি করিয়া সকলকে অতিক্রম করিবার প্রবৃত্তি জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে; উহার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার অশান্তি, সকল প্রকার ঘৃণা, সকল প্রকার ঈর্ষা এবং সকল প্রকার অশুভ চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। তখন দেবতারা এই জগতে বাস করিবেন, তখন এই জগৎই স্বর্গ হইয়া যাইবে। আর যখন দেবতায় দেবতায় খেলা, যখন দেবতায় দেবতায় কাজ, যখন দেবতায় দেবতায় প্রেম, তখন কি আর অশুভ থাকিতে পারে? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা সুফল। সমাজে তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই তখন পরিবর্তিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিবে। তখন তোমরা মানুষকে আর খারাপ বলিয়া দেখিবে না; ইহাই প্রথম মহালাভ। তখন তোমরা আর কোন অন্যায়কারী দরিদ্র নরনারীর দিকে ঘৃণার সহিত দৃষ্টিপাত করিবে না। হে মহিলাগণ, যে-দুঃখিনী নারী রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, আপনারা আর তাহার দিকে ঘৃণাপূর্বক দৃষ্টিপাত করিবেন না; কারণ আপনারা সেখানেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবেন। তখন আপনাদের মনে আর ঈর্ষা বা অপরকে শাস্তি দিবার ভাব উদিত হইবে না; ঐ-সবই চলিয়া যাইবে। তখন প্রেম এত প্রবল হইবে যে, মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করিতে আর চাবুকের প্রয়োজন হইবে না।

যদি পৃথিবীর নরনারীগণের লক্ষ ভাগের এক ভাগও শুধু চুপ করিয়া বসিয়া খানিকক্ষণের জন্যও বলেন, 'তোমরা সকলেই ঈশ্বর; হে মানবগণ, পশুগণ, সর্বপ্রকার প্রাণিগণ, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ', তাহা হইলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদয় জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তখন চতুর্দিকে ঘৃণার বীজ নিক্ষেপ না করিয়া, ঈর্ষা ও অসৎ চিন্তার প্রবাহ বিস্তার না করিয়া সকল দেশের লোকেই চিন্তা করিবে—সবই তিনি। যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সবই তিনি। তোমার মধ্যে অশুভ না থাকিলে তুমি কেমন করিয়া অশুভ দেখিবে? তোমার মধ্যে চোর না থাকিলে তুমি কেমন করিয়া চোর দেখিবে? তুমি নিজে খুনী না হইলে

খুনীকে দেখিবে কিরূপে? সাধু হও, তাহা হইলে তোমার অসাধু-ভাব একেবারে চলিয়া যাইবে। এইরূপে সমুদয় জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। ইহাই সমাজের মহৎ লাভ। সমগ্র মানব জাতির পক্ষে ইহাই মহৎ লাভ।

ভারতে প্রাচীনকালে এই-সকল ভাব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া ব্যক্তিগত জীবনে অনেকে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষাদাতা গুরুগণের সঙ্কীর্ণতা এবং দেশের পরাধীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এই-সকল চিন্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে পায় নাই। তাহা না হইলেও এগুলি মহাসত্য, যেখানেই এগুলির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, সেইখানেই মানুষ দেবভাবাপন্ন হইতেছে। এইরূপ একজন দেবপ্রকৃতির মানুষের দ্বারা আমার সমুদয় জীবন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, ইঁহার সম্বন্ধে আগামী রবিবার তোমাদের নিকট বলিব। এখন এই-সকল ভাব জগতে প্রচারিত হইবার সময় আসিতেছে। মঠে আবদ্ধ না থাকিয়া কেবল পণ্ডিতদের পাঠের জন্য দার্শনিক পুস্তকগুলিতে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিত ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকারে না থাকিয়া, ঐগুলি সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবে, যাহাতে ঐ-সকল ভাব সাধু পাপী আবালবৃদ্ধবনিতা শিক্ষিত অশিক্ষিত—সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে। তখন এই-সকল ভাব জগতের বায়ুতে খেলা করিতে থাকিবে, আর আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসে যে-বায়ু গ্রহণ করিতেছি, তাহার প্রত্যেক তালে তালে ধ্বনিত হইবে—'তত্ত্বমসি'। এই অসংখ্য চন্দ্রসূর্যপূর্ণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে ভাষণক্ষম প্রত্যেক জীবের কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হইবে—'তত্ত্বমসি'।



লণ্ডনে স্বামীজী ১৮৯৬

মায়া ও ঈশ্বর-ধারণার ক্রমাবকাশ

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা : ২০শে অক্টোবর, ১৮৯৬]

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত বেদান্তের অন্যতম মূলভিত্তিস্বরূপ মায়াবাদ অস্ফুটভাবে সংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, আর উপনিষদে যে-সকল তত্ত্ব খুব পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে, সংহিতাতে তাহার সবগুলিই কোন না কোন আকারে বর্তমান। আপনারা অনেকেই এতদিনে মায়াবাদের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন। অনেক সময়ে লোকে ভুলবশতঃ মায়াকে 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাখ্যা করে; অতএব তাঁহারা যখন জগৎকে মায়া বলেন, তখন উহাকেও 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। মায়াকে 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাখ্যা করা ঠিক নহে। মায়া কোন বিশেষ মত নহে, উহা কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপবর্ণনা মাত্র। সেই মায়াকে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে সংহিতা পর্যন্ত যাইতে হইবে এবং প্রথমে মায়া সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহাও দেখিতে হইবে।

আমরা দেখিয়াছি, লোকের দেবতা-জ্ঞান কিরূপে আসিল। বুঝিয়াছি, এই দেবতারা প্রথমে কেবল শক্তিশালী পুরুষমাত্র ছিলেন। গ্রীক, হিব্রু, পারসী বা অপরাপর জাতির প্রাচীন শাস্ত্রে দেবতারা আমাদের দৃষ্টিতে যে-সকল কার্য অতীব ঘৃণিত, সেই-সকল কার্য করিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া আপনারা অনেকে ভীত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই যে, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ, আর এই-সব দেবতা অনেক সহস্র বৎসর পূর্বের জীব; আমরা ইহাও ভুলিয়া যাই যে, ঐ-সকল দেবতার উপাসকেরা তাঁহাদের চরিত্রে অসঙ্গত কিছু দেখিতে পাইতেন না, তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় পাইতেন না, কারণ সেই-সকল দেবতা তাঁহাদেরই মতো ছিলেন। সারা জীবন ধরিয়া আমাদের এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে বিচার করিতে হইবে, অপরের আদর্শ অনুসারে নয়। তাহা না করিয়া আমরা আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা অপরের বিচার কবিয়া থাকি। এরূপ করা উচিত নয়। আমাদের চারিপাশের মানুষের সহিত ব্যবহার করিবার সময় আমরা সর্বদাই এই ভুল করি, আর আমার ধারণা

অপরের সহিত আমাদের যাহা কিছু বিবাদ-বিসংবাদ হয়, তাহা কেবল এই এক কারণেই হয় যে, আমরা অপরের দেবতাকে আমাদের নিজ দেবতা দ্বারা, অপরের আদর্শ আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা এবং অপরের উদ্দেশ্য আমাদের নিজ উদ্দেশ্য দ্বারা বিচার করিতে চেষ্টা করি। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমি হয়তো কোন বিশেষ কার্য করিতে পারি, আর যখন দেখি—আর একজন লোক সেইরূপ কার্য করিতেছে, মনে করিয়া লই তাহারও সেই এক উদ্দেশ্য; আমার মনে একবারও এ-কথা উদিত হয় না যে, ফল সমান হইলেও অন্য বহু কারণ সেই ফল প্রসব করিতে পারে। আমি যে কারণে সেই কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, তিনি সেই কার্য অন্য উদ্দেশ্যে করিতে পারেন। সুতরাং ঐ-সকল প্রাচীন ধর্ম বিচার করিবার সময় আমরা যেন আমাদের মানসিক প্রবণতা দ্বারা বিচার না করি; আমরা যেন সেই প্রাচীনকালের জীবন ও চিন্তাধারার ভাবে নিজদিগকে ভাবিত করিয়া বিচার করি।

ওল্ড টেস্টামেণ্টের নিষ্ঠুর জিহোভার বর্ণনায় অনেকে ভীত হয়; কিন্তু কেন? লোকের এরূপ কল্পনা করিবার কি অধিকার আছে যে, প্রাচীন য়াহুদীদিগের জিহোভা আজকালকার ঈশ্বরের মতো হইবেন? আবার আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আমরা যেভাবে প্রাচীনদের ধর্ম বা ঈশ্বরের ধারণায় হাসিয়া থাকি, আমাদের পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা আমাদের ধর্ম বা ঈশ্বরের ধারণাগুলিকেও সেইভাবে উপহাস করিবেন। তাহা হইলেও এই-সকল বিভিন্ন ঈশ্বর-ধারণার মধ্যে সংযোগসাধক একটি সুবর্ণ-সূত্র বিদ্যমান, আর বেদান্তের উদ্দেশ্য—সেই সূত্র আবিষ্কার করা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'ভিন্ন ভিন্ন মণি যেমন একসূত্রে গ্রথিত, সেইরূপ এই-সকল বিভিন্ন ভাবের ভিতরেও একটি সূত্র রহিয়াছে।'[১] আর আধুনিক ধারণানুসারে সেগুলি যতই বীভৎস ভয়ানক বা ঘৃণিত বলিয়া মনে হউক না কেন, বেদান্তের কর্তব্য—ঐ-সকল ধারণা ও বর্তমান ধারণাগুলির ভিতর এই যোগসূত্র আবিষ্কার করা। অতীতকালের পটভূমিকায় সেগুলি বেশ সঙ্গতই ছিল, আমাদের বর্তমান ভাব ও ধারণা হইতে সেগুলি

১ গীতা, ৭।৭

বেশী বীভৎস ছিল না। যখন আমরা প্রাচীন পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই ভাবগুলিকে দেখিতে যাই, তখনই শুধু ঐগুলির বীভৎসতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রাচীন পরিবেশ এখন তো আর নাই। যেমন প্রাচীন য়াহুদী বর্তমান তীক্ষ্ণবুদ্ধি য়াহুদীতে পরিণত হইয়াছেন, যেমন প্রাচীন আর্যেরা আধুনিক বুদ্ধিমান্ হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন, সেইরূপ জিহোভার ক্রমোন্নতি হইয়াছে, দেবতাদেরও হইয়াছে। আমরা এইটুকু ভুল করি যে, আমরা উপাসকের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু উপাস্যের ক্রমোন্নতি স্বীকার করি না। উন্নতির জন্য উপাসকদিগকে আমরা যেটুকু প্রশংসা করি, উপাস্য ঈশ্বরকে সেটুকু করি না। কথাটা এই—তুমি আমি যেমন কোন বিশেষ ভাবের প্রকাশক বলিয়া ঐ ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমার উন্নতি হইয়াছে, সেইরূপ দেবতারাও বিশেষ বিশেষ ভাবের দ্যোতক বলিয়া ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও উন্নতি হইয়াছে। তোমাদের আশ্চর্য বোধ হইতে পারে যে, দেবতা বা ঈশ্বরেরও উন্নতি হয়! তোমাদের ভাব—ঈশ্বরের উন্নতি হয় না, তিনি অপরিবর্তনীয়। এইভাবে তো ইহাও বলা যায় যে, প্রকৃত মানুষেরও কখন উন্নতি হয় না। আমরা পরে দেখিব—এই মানুষের ভিতর যে প্রকৃত মানুষ রহিয়াছেন, তিনি অচল অপবিণামী শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। যেমন এই মানুষ সেই প্রকৃত মানুষের ছায়ামাত্র, সেইরূপ আমাদের ঈশ্বর-ধারণা আমাদের মনেরই সৃষ্টি; উহা সেই প্রকৃত ঈশ্বরের আংশিক প্রকাশ—আভাসমাত্র। ঐ-সকল আংশিক প্রকাশের পশ্চাতে প্রকৃত ঈশ্বর রহিয়াছেন, তিনি নিত্য-শুদ্ধ—অপরিণামী। কিন্তু ঐ-সকল আংশিক প্রকাশ সর্বদাই পরিণামশীল—ঐগুলি উহাদের অন্তরালে অবস্থিত সত্যের ক্রমাভিব্যক্তি মাত্র; সেই সত্য যখন অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়, তখন উহাকে উন্নতি, আর উহার অধিকাংশ আবৃত থাকিলে তাহাকে অবনতি বলে। এইরূপে যেমন আমাদের উন্নতি হয়, তেমনি দেবতারও উন্নতি হয়। সাধারণ সোজা ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যেমন আমাদের উন্নতি হয়, আমাদের স্বরূপের যেমন প্রকাশ হয়, তেমনি দেবগণও তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন।

এখন আমরা মায়াবাদ বুঝিতে সমর্থ হইব। পৃথিবীর সকল ধর্মই এক প্রশ্ন করিয়াছেন: জগতে এই অসামঞ্জস্য কেন? এই অশুভ কেন? আমরা

ধর্মভাবের প্রথম আরম্ভের সময় এই প্রশ্ন দেখিতে পাই না; তাহার কারণ—আদিম মনুষ্যের পক্ষে জগৎ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ হয় নাই। তাহার চতুর্দিকে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না, কোন প্রকার মতবিরোধ ছিল না, ভালমন্দের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। কেবল তাঁহাদের হৃদয়ে দুইটি জিনিসের সংগ্রাম হইত। একটি বলিত—'এই কাজ কর', আর একটি বলিত—'করিও না।' আদিম মানুষ আবেগপ্রবণ ছিল। তাহার মনে যাহা উদিত হইত, সে তাহাই করিত। সে নিজের এই ভাব সম্বন্ধে বিচার করিবার বা উহা সংযত করিবার চেষ্টা মোটেই করিত না। এই-সকল দেবতা সম্বন্ধেও সেইরূপ; ইঁহারাও আবেগের অধীন। ইন্দ্র আসিলেন, আর দৈত্যবল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। জিহোভা কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট, কাহারও প্রতি বা রুষ্ট; কেন—তাহা কেহ জানে না, জিজ্ঞাসাও করে না। ইহার কারণ, মানুষের তখনও অনুসন্ধানের অভ্যাসই হয় নাই; সুতরাং সে যাহা করে, তাহাই ভাল। তখন ভালমন্দের কোন ধারণাই হয় নাই। আমরা যাহাকে মন্দ বলি, দেবতারা এমন অনেক কাজ করিতেছেন; বেদে দেখিতে পাই—ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা অনেক মন্দ কাজ করিতেছেন, কিন্তু ইন্দ্রের উপাসকদিগের দৃষ্টিতে সেগুলি পাপ বা অসৎ বলিয়া মনেই হইত না, সুতরাং তাহারা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করিত না।

নৈতিক ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে এক যুদ্ধ বাধিল; মানুষের ভিতরে যেন একটি নূতন ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হইল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন জাতি উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছে; কেহ বলেন—উহা ঈশ্বরের বাণী; কেহ বলেন—উহা পূর্বশিক্ষার ফল। যাহাই হউক, উহা প্রবৃত্তির দমনকারী শক্তিরূপে কার্য করিয়াছিল। আমাদের মনের একটি প্রবৃত্তি বলে—'এই কাজ কর'; আর একটি বলে—'করিও না'। আমাদের ভিতরে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে; আর তাহার পশ্চাতে, যতই ক্ষীণ হউক না কেন, আর একটি স্বর বলিতেছে—'বাহিরে যাইও না'। এই দুইটি ব্যাপার দুইটি সুন্দর সংস্কৃত শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিই আমাদের সকল কর্মের মূল। নিবৃত্তি হইতেই ধর্মের উদ্ভব। ধর্ম আরম্ভ হয় এই 'করিও না' হইতে; আধ্যাত্মিকতাও ঐ 'করিও না' হইতেই

আরম্ভ হয়। যেখানে এই 'করিও না' নাই, সেখানে ধর্মের আরম্ভই হয় নাই, বুঝিতে হইবে। যুধ্যমান দেবতার উপাসনা সত্ত্বেও এই 'করিও না' বা নিবৃত্তির ভাবের জন্য মানুষের ধারণা উন্নত হইতে লাগিল।

এখন মানুষের হৃদয়ে একটু ভালবাসা জাগিল। অবশ্য খুব অল্প ভালবাসাই তাহাদের হৃদয়ে আসিয়াছিল, আর এখনও যে উহা বড় বেশী তাহা নহে। প্রথম উহা 'জাতি'তে আবদ্ধ ছিল। এই দেবগণ কেবল তাঁহাদের সম্প্রদায়কেই মাত্র ভালবাসিতেন। প্রত্যেক দেবতাই জাতীয় দেবতা-মাত্রই ছিলেন, কেবল সেই বিশেষ জাতির রক্ষকমাত্রই ছিলেন। আর অনেক সময় ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজদিগকে ঐ দেবতার বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন বংশের লোকেরা নিজদিগকে তাঁহাদের এক সাধারণ গোষ্ঠীপতির বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে কতকগুলি জাতি ছিল, এখনও আছে, যাহারা নিজদিগকে সূর্য ও চন্দ্রের বংশধর বলিয়া মনে করিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে আপনারা সূর্যবংশের বড় বড় বীর সম্রাটগণের কথা পাঠ করিয়াছেন। ইহারা প্রথমে চন্দ্র-সূর্যের উপাসক ছিলেন; ক্রমশঃ তাঁহারা নিজদিগকে ঐ চন্দ্র-সূর্যের বংশধর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুতরাং যখন এই 'জাতীয়'-ভাব আসিতে লাগিল, তখন একটু ভালবাসা আসিল, পরস্পরের প্রতি একটু কর্তব্যের ভাব আসিল, একটু সামাজিক শৃঙ্খলার উৎপত্তি হইল; আর অমনি এই ভাবও আসিতে লাগিল—'আমরা পরস্পরের দোষ সহ্য ও ক্ষমা না করিয়া কিরূপে একত্র বাস করিতে পারি?' মানুষ কি করিয়া অন্ততঃ কোন না কোন সময়ে নিজ মনের প্রবৃত্তি সংযত না করিয়া অপরের—এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত বাস করিতে পারে? উহা অসম্ভব। এইরূপেই সংযমের ভাব আসে। এই সংযমের ভাবের উপর সমগ্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত, আর আমরা জানি, যে নর বা নারী এই সহিষ্ণুতা বা ক্ষমারূপ মহতী শিক্ষা আয়ত্ত করেন নাই, তিনি অতি কষ্টে জীবন যাপন করেন।

অতএব যখন এইরূপ ধর্মের ভাব আসিল, তখন মানুষের মনে কিছু উচ্চতর, অপেক্ষাকৃত অধিক নীতিসঙ্গত একটু ভাবের আভাস আসিল। তখন তাঁহাদের ঐ প্রাচীন দেবতাগণকে—চঞ্চল, যুধ্যমান, মদ্যপায়ী, গোমাংসভুক্ দেবগণকে—যাঁহাদের পোড়া মাংসের গন্ধ এবং তীব্র সুরার আহুতিতেই পরম

আনন্দ হইত—কেমন সামঞ্জস্যহীন ঠেকিতে লাগিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ—বেদে বর্ণিত আছে যে, কখন কখন ইন্দ্র হয়তো এত মদ্যপান করিয়াছেন যে, তিনি মাটিতে পড়িয়া অবোধ্যভাবে বকিতে আরম্ভ করিলেন! এরূপ দেবতাকে সহ্য করা আর লোকের পক্ষে সম্ভব হইল না। তখন উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে আরম্ভ হইল; দেবতাদেরও কার্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু হইল। অমুক দেবতার অমুক কার্যের হেতু কি? কোন হেতুই পাওয়া গেল না, সুতরাং লোকে এই-সকল দেবতা পরিত্যাগ করিল, অথবা তাহারা দেবতা সম্বন্ধে আরও উচ্চতর ধারণা করিতে লাগিল। তাহারা দেবতাদের কার্যগুলির মধ্যে যেগুলি ভাল, যেগুলি তাহারা সামঞ্জস্য করিতে পারিল, সেগুলি সব একত্র করিল; আর যেগুলি বুঝিতে পারিল না বা যেগুলি তাহাদের ভাল বলিয়া বোধ হইল না সেগুলিকেও পৃথক্ করিল; এই ভাল ভাবগুলির সমষ্টিকে তাহারা 'দেবদেব' এই আখ্যা প্রদান করিল। তাহাদের উপাস্য দেবতা তখন কেবলমাত্র শক্তির প্রতীক রহিলেন না, শক্তি হইতে আরও কিছু অধিক তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইল। তিনি নীতি-পরায়ণ দেবতা হইলেন; তিনি মানুষকে ভালবাসিতে লাগিলেন, তিনি মানুষের হিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতার ধারণা তখনও অক্ষুণ্ণ রহিল। তাহারা তাঁহার নীতিপরায়ণতা ও শক্তি বর্ধিত করিল মাত্র। জগতের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিপরায়ণ পুরুষ এবং একরূপ সর্বশক্তিমান্ হইলেন।

কিন্তু জোড়াতালি দিয়া বেশী দিন চলে না। যেমন জগদ্রহস্যের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, তেমনি ঐ রহস্য যেন আরও রহস্যময় হইয়া উঠিল। দেবতা বা ঈশ্বরের গুণ যেভাবে বাড়িতে লাগিল, সন্দেহ তদপেক্ষা বহুগুণ বাড়িতে লাগিল। যখন লোকের জিহোভা নামক নিষ্ঠুর ঈশ্বরের ধারণা ছিল, তখন সেই ঈশ্বরের সহিত জগতের সামঞ্জস্যবিধান করিতে যে কষ্ট পাইতে হইত, তাহা অপেক্ষা এখন যে ঈশ্বরের ধারণা উপস্থিত হইল, তাহার সহিত জগতের সামঞ্জস্যসাধন করা কঠিনতর হইয়া পড়িল। সর্বশক্তিমান্ ও প্রেমময় ঈশ্বরের রাজ্যে এরূপ পৈশাচিক ঘটনা কেন ঘটে? কেন সুখ অপেক্ষা দুঃখ এত বেশী? সাধু ভাব যত আছে, তাহা অপেক্ষা অসাধু ভাব এত বেশী কেন? আমরা এ-সব দেখিব না—বলিয়া চোখ বুজিয়া থাকিতে পারি; কিন্তু তাহাতে জগৎ যে বীভৎস, এ সত্য কিছুই পরিবর্তিত

হয় না। খুব ভাল বলিলে বলিতে হয়, এই জগৎ ট্যাণ্টালাসের[১] নরকস্বরূপ, তাহা অপেক্ষা ইহা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। প্রবল প্রবৃত্তি—ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার প্রবলতর বাসনা রহিয়াছে, কিন্তু পূরণ করিবার উপায় নাই। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে এক তরঙ্গ ওঠে—তাহাতে আমাদিগকে কোন কার্যে অগ্রসর করিয়া দেয়, আর আমরা একপদ যেই অগ্রসর হই, অমনি বাধা পাই। আমরা সকলেই ট্যাণ্টালাসের মতো এই জগতে অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে বাধ্য। অতীন্দ্রিয় আদর্শসমূহ আমাদের মস্তিষ্কে আসিতেছে, কিন্তু অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়া দেখিতে পাই, সেগুলিকে কখনই কার্যে পরিণত করিতে পারা যায় না, বরং আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থাচক্রে পিষ্ট হইয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরমাণুতে পরিণত হই। আবার যদি আমি এই আদর্শের জন্য চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কেবল সাংসারিকভাবে থাকিতে চাই, তাহা হইলেও আমাকে পশুজীবন যাপন করিতে হয়, এবং আমি অবনত হইয়া যাই। সুতরাং কোনদিকেই সুখ নাই। যাহারা এই জগতে জন্মাইয়া জাগতিক জীবনেই সন্তুষ্ট থাকিতে চায়, তাহাদেরও অদৃষ্টে দুঃখ। যাহারা আবার সত্যের জন্য—এই পশু-জীবন অপেক্ষা কিছু উন্নত জীবনের জন্য—অগ্রসর হইতে সাহস করে, উচ্চতর আদর্শ আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের আবার সহস্রগুণ দুঃখ। ইহা বাস্তব ঘটনা; ইহার কোন ব্যাখ্যা নাই, কোন ব্যাখ্যা থাকিতে পারে না। তবে বেদান্ত এই সংসার হইতে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন। মাঝে মাঝে আমাকে এমন অনেক কথা বলিতে হইবে, যাহাতে তোমরা ভয় পাইবে, কিন্তু আমি যাহা বলি তাহা স্মরণ রাখিও, উহা বেশ করিয়া হজম করিও, দিবারাত্র ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিও। তাহা হইলে উহা তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে, উহা তোমাদিগকে উন্নত করিবে এবং তোমাদিগকে সত্য বুঝিতে এবং জীবনে সত্য পালন করিতে সমর্থ করিবে।

এই জগৎ যে ট্যাণ্টালাসের নরকস্বরূপ, ইহা সত্য ঘটনার বর্ণনামাত্র,—আমরা এই জগৎ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি না; আবার জানি না, এ-কথাও বলিতে পারি না। যখন মনে করি আমি জানি না, তখন বলিতে পারি না এই বন্ধন আছে। সবটাই আমার মাথার ভুল হইতে পারে। আমি হয়তো সারাক্ষণ

১ গ্রীকপুরাণে বর্ণিত ট্যাণ্টালাসের কাহিনী—তথ্যপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

স্বপ্ন দেখিতেছি। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, তোমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছি, তোমরা আমার কথা শুনিতেছ। কেহই প্রমাণ করিতে পারে না, যে ইহা স্বপ্ন নয়। 'আমার মস্তিষ্ক' ইহাও একটি স্বপ্ন হইতে পারে, আর বাস্তবিক তো নিজের মস্তিষ্ক কেহ কখন দেখে নাই। আমরা সকলেই উহা মানিয়া লই। সকল ব্যাপারে এইরূপ। আমার নিজের শরীরও আমি মানিয়া লইতেছি মাত্র। আবার আমি জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এই অবস্থান, এই রহস্যময় কুহেলিকা, এই সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ—কোথায় মিশিয়াছে, কেহ জানে না। আমরা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতেছি—অর্ধনিদ্রিত, অর্ধজাগরিত, সারা জীবন এক অস্পষ্টতায় কাটিয়া যায়—ইহাই আমাদের প্রত্যেকের নিয়তি! সব ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ঐ নিয়তি। সকল দর্শনের, সকল বিজ্ঞানের, সকল প্রকার মানবীয় জ্ঞানের—যাহাদিগকে লইয়া আমাদের এত অহঙ্কার, তাহাদেরও এই নিয়তি, এই পরিণাম। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বজগৎ।

ভূতই বলো, আত্মাই বলো, মনই বলো, আর যাহাই বলো না কেন, যে কোন নামই উহাকে দাও না কেন, ব্যাপার সেই একই—আমরা বলিতে পারি না, উহাদের অস্তিত্ব আছে; উহাদের অস্তিত্ব নাই এ-কথাও বলিতে পারি না। আমরা উহাদিগকে একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না। এই আলো-অন্ধকারে খেলা, এই এলোমেলো অবিচ্ছেদ্য ভাব সর্বদা রহিয়াছে। সমুদয় ব্যাপার একবার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, আবার বোধ হইতেছে মিথ্যা। একবার বোধ হইতেছে আমরা জাগরিত, একইকালে বোধ হইতেছে আমরা নিদ্রিত। ইহা ঘটনার বর্ণনা—ইহাকেই মায়া বলে। আমরা এই মায়াতে জন্মিয়াছি, আমরা ইহাতেই জীবিত রহিয়াছি, আমরা ইহাতেই চিন্তা করিতেছি, ইহাতেই স্বপ্ন দেখিতেছি। আমরা এই মায়াতেই দার্শনিক, মায়াতেই সাধু; শুধু তাহাই নহে, আমরা এই মায়াতেই কখন দানব, কখন বা দেবতা হইতেছি। ভাব ও ধারণাকে যতদূর পারো বিস্তৃত কর, উচ্চ হইতে উচ্চতর কর, উহাকে 'অনন্ত' অথবা যে-কোন নাম দিতে ইচ্ছা হয় দাও, ঐ ধারণাও এই মায়ারই ভিতরে। অন্যরূপ হইতেই পারে না; আর মানুষের সমস্ত জ্ঞান—কেবল বিশেষ ধারণা হইতে সামান্যে আসা, উহার প্রতীয়মান স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করা।

এই মায়া নামরূপের কার্য। যে-কোন বস্তুরই আকৃতি আছে, যাহা কিছু তোমার মনের মধ্যে কোনপ্রকার ভাব জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহাই মায়ার অন্তর্গত। জার্মান দার্শনিকগণ বলেন—সবই দেশ-কাল-নিমিত্তের অধীন, আর উহাই মায়া।

ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই প্রাচীন ধারণায় একটু ফিরিয়া যাই। পূর্বে সংসারের যে অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, একজন ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্তকাল ধরিয়া ভালবাসিতেছেন—একজন অনন্ত সর্বশক্তিমান্ ও নিঃস্বার্থ পুরুষ এই জগৎ শাসন করিতেছেন। পূর্বোক্ত এই ঈশ্বর-ধারণা মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। কোথায় তোমার ন্যায়পরায়ণ দয়াময় ঈশ্বর? দার্শনিক জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তিনি কি মনুষ্য বা পশুরূপী তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের বিনাশ দেখিতেছেন না? কারণ এমন কে আছে, যে এক মুহূর্তও অপরকে না মারিয়া জীবনধারণ করিতে পারে? তুমি কি সহস্র সহস্র জীবন সংহার না করিয়া একটি নিঃশ্বাসও গ্রহণ করিতে পারো? লক্ষ লক্ষ জীব মরিতেছে বলিয়া তুমি জীবিত রহিয়াছ। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত, প্রত্যেক নিঃশ্বাস—যাহা তুমি গ্রহণ করিতেছ, তাহা সহস্র সহস্র জীবের মৃত্যুস্বরূপ এবং তোমার প্রত্যেক গতি লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যুস্বরূপ। কেন তাহারা মরিবে? এ সম্বন্ধে পুরাতন মিথ্যাযুক্তি—'উহারা তো অতি নীচ জীব।' মনে কর যেন তাহাই হইল—যদিও উহা অমীমাংসিত বিষয়, কারণ কে বলিতে পারে—কীট মনুষ্য অপেক্ষা বড়, না মনুষ্য কীট অপেক্ষা উচ্চতর? কে প্রমাণ করিতে পারে—এটি ঠিক, কি ওটি ঠিক? যাক সে কথা, তাহারা অতি নিম্নস্তরের জীব ধরিয়া লইলেও তাহারা মরিবে কেন? যদি তাহারা হীন জীব হয়, তাহাদেরই তো বাঁচিয়া থাকা বেশী দরকার। কেন তাহারা বাঁচিবে না? তাহাদের জীবন ইন্দ্রিয়েই বেশী আবদ্ধ, সুতরাং তাহারা তোমার আমার অপেক্ষা সহস্রগুণ সুখ-দুঃখ বোধ করে। কুকুর বাঘ যেরূপ তৃপ্তি সহকারে ভোজন করে, আমরা কি সেরূপ করি? করি না, কারণ আমাদের কর্মশক্তি শুধু ইন্দ্রিয়ে নহে, বুদ্ধিতে—আত্মায়। কিন্তু পশুদের প্রাণ ইন্দ্রিয়েই পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য উন্মত্ত হয়; তাহারা এত আনন্দের সহিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিবে যে, মানুষ সেরূপ কল্পনাও করিতে পারে না; আর এই সুখও যতখানি, দুঃখও তাহার সমপরিমাণ।

যতখানি সুখ, ততখানি দুঃখ। যদি মনুষ্যেতর প্রাণীরা এত তীব্রভাবে সুখ অনুভব করিয়া থাকে, তবে ইহাও সত্য যে তাহাদের দুঃখবোধও তেমনি তীব্র—মনুষ্যের অপেক্ষা সহস্রগুণে তীব্রতর, তথাপি তাহাদিগকে মরিতে হইবে! তাহা হইলে দাঁড়াইল এই, মানুষ মরিতে যত কষ্ট অনুভব করিবে, অপর প্রাণী তাহার শতগুণ কষ্ট ভোগ করিবে; তথাপি তাহাদের কষ্টের বিষয় না ভাবিয়া আমরা তাহাদিগকে হত্যা করি। ইহাই মায়া। আর যদি আমরা মনে করি—একজন সগুণ ঈশ্বর আছেন, যিনি ঠিক মানুষেরই মতো, যিনি সব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ যে-সকল ব্যাখ্যা মত প্রভৃতি, যাহাতে বলে মন্দের মধ্য হইতে ভাল হইতেছে, তাহা যথেষ্ট হয় না। হউক না শত সহস্র উপকার—মন্দের মধ্য দিয়া উহা কেন আসিবে? এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তবে আমিও নিজ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখের জন্য অপরের গলা কাটিব। সুতরাং ইহা কোন যুক্তি হইল না। কেন মন্দের মধ্য দিয়া ভাল হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কিন্তু এই প্রশ্নের তো উত্তর দেওয়া যায় না; ভারতীয় দর্শন ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সকল প্রকার ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে বেদান্তই অধিকতর সাহসের সহিত সত্য-অন্বেষণে অগ্রসর হইয়াছেন। বেদান্ত মাঝখানে এক জায়গায় গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান স্থগিত রাখেন নাই, আর তাঁহার পক্ষে অগ্রসর হইবার এক সুবিধাও ছিল। বেদান্তধর্মের বিকাশের সময় পুরোহিত-সম্প্রদায় সত্যান্বেষি-গণের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। ধর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ভারতে সঙ্কীর্ণতা ছিল—সামাজিক প্রণালীতে। এখানে (ইংলণ্ডে) সমাজ খুব স্বাধীন। ভারতে সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু ধর্মমত সম্বন্ধে ছিল। এখানে লোকে পোশাক যেরূপ পরুক না কেন, কিম্বা যাহা ইচ্ছা করুক না কেন, কেহ কিছু বলে না বা আপত্তি করে না; কিন্তু চার্চে একদিন যাওয়া বন্ধ হইলেই, নানা কথা উঠে। সত্য চিন্তার সময় তাঁহাকে আগে হাজার বার ভাবিতে হয়, সমাজ কি বলে। অপর পক্ষে ভারতবর্ষে যদি একজন অপর জাতির হাতে খায়, অমনি সমাজ তাহাকে জাতিচ্যুত করিতে অগ্রসর হয়। পূর্বপুরুষেরা যেরূপ পোশাক পরিতেন, তাহা হইতে একটু পৃথক্‌রূপ পোশাক পরিলেই ব্যস্, তাহার সর্বনাশ! আমি শুনিয়াছি, প্রথম রেলগাড়ি দেখিতে গিয়াছিল বলিয়া একজন জাতিচ্যুত

হইয়াছিল। আচ্ছা, মানিয়া লইলাম ইহা সত্য নহে। কিন্তু আবার ধর্ম-বিষয়ে দেখিতে পাই—নাস্তিক, জড়বাদী, বৌদ্ধ, সকল রকমের ধর্ম, সকল রকমের মত, অদ্ভুত রকমের ভয়ানক ভয়ানক মত লোকে প্রচার করিতেছে, শিক্ষাও পাইতেছে, এমন কি, মন্দিরের দ্বারদেশে ব্রাহ্মণেরা জড়বাদিগণকেও দাঁড়াইয়া তাঁহাদেরই দেবতার নিন্দা করিতে দিতেছেন। তাঁহাদের এই উদারতা অবশ্য স্বীকার্য।

বুদ্ধ খুব বৃদ্ধবয়সেই দেহরক্ষা করেন। আমার একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বন্ধু বুদ্ধদেবের জীবনচরিত পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি বুদ্ধদেবের মৃত্যুটি ভালবাসিতেন না ; কারণ বুদ্ধদেব ক্রুশে বিদ্ধ হন নাই। কি ভুল ধারণা! বড় লোক হইতে গেলেই খুন হইতে হইবে! ভারতে এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধদেব ভারতের দেবদেবী, এমন কি জগদীশ্বরকে পর্যন্ত অস্বীকার করিয়া সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াও বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। তিনি ৮০ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, আর তিনি অর্ধেক দেশকে তাঁহার ধর্মে আনিয়াছিলেন।

চার্বাকেরা ভয়ানক ভয়ানক মত প্রচার করিতেন—উনবিংশ শতাব্দীতেও লোক এরূপ স্পষ্ট জড়বাদ প্রচার করিতে সাহস করে না। এই চার্বাকগণ মন্দিরে মন্দিরে নগরে নগরে প্রচার করিতেন : ধর্ম মিথ্যা, উহা পুরোহিতগণের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র, বেদ ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরদের রচনা—ঈশ্বর নাই, আত্মাও নাই। যদি আত্মা থাকে, তবে স্ত্রী-পুত্রের ভালবাসার আকর্ষণে কেন ফিরিয়া আসে না। তাঁহাদের এই ধারণা ছিল যে, যদি আত্মা থাকে, তবে মৃত্যুর পরও তাহার ভালবাসা থাকে ; ভাল খাইতে, ভাল পরিতে চায়। এইরূপ ধারণা সত্ত্বেও কেহই চার্বাকদিগের উপরে কোন অত্যাচার করে নাই।

আমরা ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ এখনও আমরা ধর্মজগতে মহাশক্তির অধিকারী। তোমরা সামাজিক বিষয়ে সেই স্বাধীনতা দিয়াছ, তাহার ফলে তোমাদের অতি সুন্দর সামাজিক প্রণালী। আমরা সামাজিক উন্নতি-বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা দিই নাই, সুতরাং আমাদের সমাজ সঙ্কীর্ণ। তোমরা ধর্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা দাও নাই, ধর্মবিষয়ে প্রচলিত মতের ব্যতিক্রম করিলেই অমনি বন্দুক, তরবারি বাহির হইত। তাহার ফল—ইওরোপে ধর্মভাব সঙ্কীর্ণ। ভারতে সমাজের শৃঙ্খল খুলিয়া দিতে হইবে, আর

ইওরোপে ধর্মের শৃঙ্খল খুলিয়া লইতে হইবে। তবেই উন্নতি হইবে। যদি আমরা এই আধ্যাত্মিক নৈতিক বা সামাজিক উন্নতির ভিতরে যে একত্ব রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারি, যদি জানিতে পারি উহারা একই পদার্থের বিভিন্ন বিকাশমাত্র, তবে ধর্ম আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবে, আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তই ধর্মভাবে পূর্ণ হইবে। ধর্ম আমাদের জীবনের প্রতি কার্যে প্রবেশ করিবে—ধর্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সেই-সব আমাদের জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। বেদান্তের আলোকে তোমরা বুঝিবে—সব বিজ্ঞান কেবল ধর্মেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র; জগতের আর সব জিনিসও ঐরূপ।

তবে আমরা দেখিলাম, স্বাধীনতা থাকাতেই ইওরোপে এই-সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে; সকল সমাজেই দুইটি বিভিন্ন দল দেখিতে পাওয়া যায়। একদল জড়বাদী বিরুদ্ধবাদী, আর একদল নিশ্চিত-বাদী সংগঠনকারী। মনে কর সমাজে কোন দোষ আছে, অমনি একদল উঠিয়া গালাগালি করিতে আরম্ভ করিল। ইহারা অনেক সময় গোঁড়া হইয়া দাঁড়ায়। সকল সমাজেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে; আর মেয়েরা প্রায়ই এই চীৎকারে যোগ দিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা স্বভাবতই ভাবপ্রবণ। যে-কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে, তাহারই দলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ভাঙা সহজ; একজন পাগল সহজে যাহা ইচ্ছা ভাঙিতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে কিছু গড়া কঠিন।

সকল দেশেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহারা মনে করে—কেবল গালাগালি দিয়া, কেবল দোষ প্রকাশ করিয়া দিয়াই তাহারা লোককে ভাল করিবে। তাহাদের দিক হইতে দেখিলে মনে হয় বটে, তাহারা কিছু উপকার করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা অনিষ্টই বেশী করিয়া থাকে। কোন জিনিস তো আর একদিনে হয় না। সমাজ একদিনে নির্মিত হয় নাই, আর পরিবর্তন অর্থে—কারণ দূর করা। মনে কর, এখানে অনেক দোষ আছে, কেবল গালাগালি দিলে কিছু হইবে না, কিন্তু মূলে যাইতে হইবে। প্রথমে ঐ দোষের হেতু কি নির্ণয় কর, তারপর উহা দূর কর, তাহা হইলে উহার-ফলস্বরূপ দোষ আপনিই চলিয়া যাইবে। শুধু প্রতিবাদে—চীৎকারে কোন ফল হইবে না; তাহাতে বরং অনিষ্টই হইবে।

আর এক শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে সহানুভূতি ছিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দোষনিবারণ করিতে হইলে উহার কারণ পর্যন্ত যাইতে হইবে। বড় বড় সাধু-মহাত্মাদের লইয়াই এই শ্রেণী গঠিত। একটি কথা তোমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ সকলেই বলিয়া গিয়াছেন—আমরা নষ্ট করিতে আসি নাই, পূর্বে যাহা ছিল তাহাকে পূর্ণ করিতেই আসিয়াছি। অনেক সময় লোকে আচার্যগণের এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া মনে করে, তাঁহারা প্রচলিত মতে সায় দিয়া তাঁহাদের অনুপযুক্ত কার্য করিয়াছেন; এখনও অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, ইঁহারা যাহা সত্য বলিয়া ভাবিতেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস করিতেন না, ইঁহারা কতকটা কাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই-সকল একদেশদর্শীরা মহাপুরুষদের হৃদয়স্থ প্রেমের অনন্ত শক্তি অতি অল্পই বুঝিতে পারে। তাঁহারা জগতের নরনারীগণকে তাঁহাদের সন্তান-স্বরূপ দেখিতেন। তাঁহারাই যথার্থ পিতা, তাঁহারাই যথার্থ দেবতা, তাঁহাদের অন্তরে প্রত্যেকেরই জন্য অনন্ত সহানুভূতি ও ক্ষমা ছিল—তাঁহারা সর্বদা সহ্য ও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন কি করিয়া মানবসমাজ গঠিত হইবে; সুতরাং তাঁহারা অতি ধীরভাবে অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহাদের সঞ্জীবন-ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা লোককে গালাগালি দেন নাই বা ভয় দেখান নাই, কিন্তু অতি ধীরে একটির পর একটি পা ফেলিয়া উন্নতির পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা উপনিষদের রচয়িতা। তাঁহারা বেশ জানিতেন—ঈশ্বরীয় প্রাচীন ধারণাসকল উন্নত নীতি-সঙ্গত ধারণার সহিত মেলে না। তাঁহারা জানিতেন—বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণ যাহা প্রচার করিতেন, তাহার মধ্যেও অনেক মহৎ সত্য আছে; কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন—যাহারা পূর্বমতের সহিত কোন সম্বন্ধ রক্ষা না করিয়া নূতন মত স্থাপন করিতে চায়, যাহারা যে সূত্রে মালা গ্রথিত তাহাকে ছিন্ন করিতে চায়, যাহারা শূন্যের উপর নূতন সমাজ গঠন করিতে চায়, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হইবে।

আমরা কখনই নূতন কিছু নির্মাণ করিতে পারি না, আমরা বস্তুর স্থান পরিবর্তন করিতে পারি মাত্র। বীজই বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সুতরাং আমাদিগকে ধৈর্যের সহিত শান্তভাবে লোকের সত্যানুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত

শক্তিকে পরিচালন করিতে হইবে; যে সত্য পূর্ব হইতেই জ্ঞাত, তাহারই সম্পূর্ণ ভাব জানিতে হইবে। সুতরাং ঐ প্রাচীন ঈশ্বরধারণা বর্তমান কালের অনুপযোগী বলিয়া একেবারে উড়াইয়া না দিয়া, তাঁহারা উহার মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; তাহারই ফল বেদান্তদর্শন। তাঁহারা প্রাচীন দেবতাসকল ও বিশ্বনিয়ন্তা এক ঈশ্বরের ভাব অপেক্ষাও উচ্চতর ভাবসকল আবিষ্কার করিতে লাগিলেন—এইরূপে তাঁহারা যে উচ্চতম সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহাই নির্গুণ পূর্ণব্রহ্ম নামে অভিহিত। এই নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণায় তাঁহারা জগতের মধ্যে এক অখণ্ড সত্তা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

'যিনি এই বহুত্বপূর্ণ জগতে সেই এক অখণ্ডস্বরূপকে দেখিতে পান, যিনি এই মরজগতে সেই এক অনন্ত জীবন দেখিতে পান, যিনি এই জড়তা-ও অজ্ঞানপূর্ণ জগতে সেই একস্বরূপকে দেখিতে পান, তাঁহারই শাশ্বতী শান্তি, আর কাহারও নহে।'[১]

মায়া ও মুক্তি

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা : ২২শে অক্টোবর, ১৮৯৬]

কবি বলেন, 'পিছনে হিরণ্ময় জলদজাল লইয়া আমরা জগতে প্রবেশ করি।' কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, আমরা সকলেই এরূপ মহিমামণ্ডিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করি না; আমাদের অনেকেই কুজ্ঝটিকার কালিমা লইয়া জগতে প্রবেশ করে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা—সকলেই যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। কাঁদিয়া আমাদিগকে এই জগতে প্রবেশ করিতে হইবে—যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই অনন্ত জীবন-সমুদ্রের মধ্যে পথ করিয়া লইতে হইবে—সম্মুখে আমরা অগ্রসর হই, পিছনে অনন্ত যুগ পড়িয়া রহিয়াছে, সম্মুখেও অনন্ত। এইরূপেই আমরা চলিতে থাকি, অবশেষে মৃত্যু

---

১ কঠ উপ., ২।২।১৩

আসিয়া আমাদিগকে এই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দেয়—জয়ী হইলাম, না পরাজিত হইলাম, তাহাও আমরা জানি না ;—ইহাই মায়া।

বালকের হৃদয়ে আশাই বলবতী। তাহার উন্মেষশীল নয়নের সম্মুখে সব-কিছুই যেন একটি সোনার ছবি বলিয়া প্রতিভাত হয় ; সে ভাবে—সকলের উপর আমার ইচ্ছাই চলিবে। কিন্তু যেই সে অগ্রসর হয়, অমনি প্রতি পদক্ষেপে প্রকৃতি বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মতো দাঁড়ায়, এবং তাহার ভবিষ্যৎ গতি রোধ করে। বার বার এই প্রাচীর ভাঙিবার উদ্দেশ্যে সে বেগে তদুপরি পতিত হইতে পারে। সারা জীবন যতই সে অগ্রসর হয়, ততই তাহার আদর্শ যেন তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়—শেষে মৃত্যু আসে, তখন হয়তো নিস্তার ;—ইহাই মায়া।

বৈজ্ঞানিক উঠিলেন—তাঁহার জ্ঞানের পিপাসা। এমন কিছুই নাই যাহা তিনি ত্যাগ করিতে না পারেন, কোন সংগ্রামই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না। তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া একটির পর একটি প্রকৃতির গোপনতত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন—প্রকৃতির অন্তস্তল হইতে আভ্যন্তরীণ গূঢ় রহস্যসকল উদ্ঘাটন করিতেছেন—কিন্তু কেন? এ-সব করিবার উদ্দেশ্য কি? আমরা এই বৈজ্ঞানিকের গৌরব করিব কেন? কেন তিনি যশোলাভ করিবেন? মানুষ যাহা করিতে পারে, প্রকৃতি কি তাহা অনন্তগুণে অধিক করিতে পারে না? তাহা হইলেও প্রকৃতি জড়, অচেতন। অচেতন জড়ের অনুকরণে গৌরব কি? বজ্র যত বিরাট হউক, প্রকৃতি উহাকে যে-কোন দূরদেশে নিক্ষেপ করিতে পারে। যদি কোন মানুষ তাহার তুলনায় সামান্য এতটুকু করিতে পারে, তবে আমরা তাহাকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিই। কিন্তু ইহার কারণ কি? প্রকৃতির অনুকরণ, মৃত্যুর অনুকরণ, জড়ের অনুকরণ, অচেতনের অনুকরণের জন্য কেন তাহার প্রশংসা করিব?

মহাকর্ষশক্তি অতি বৃহত্তম পদার্থকে পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে, তথাপি উহা জড়শক্তি। জড়ের অনুকরণে কি গৌরব? তথাপি আমরা সারা জীবন কেবল উহার জন্যই চেষ্টা করিতেছি ;—ইহাই মায়া।

ইন্দ্রিয়গণ মানুষকে টানিয়া বাহিরে লইয়া যায় ; যেখানে কোনক্রমে সুখ পাওয়া যায় না, মানুষ সেখানে সুখের অন্বেষণ করিতেছে। অনন্ত যুগ ধরিয়া

আমরা সকলেই উপদেশ শুনিতেছি—এ-সব বৃথা; কিন্তু আমরা শিখিতে পারি না। নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া শেখাও অসম্ভব। উপদেশ কাজে লাগাইতে হইবে—হয়তো তীব্র আঘাত পাইব। তাহাতেই কি আমরা শিখিব? না, তখনও নহে। পতঙ্গ যেমন পুনঃ পুনঃ অগ্নির অভিমুখে ধাবমান হয়, আমরাও তেমনি পুনঃ পুনঃ বিষয়সমূহের দিকে বেগে পতিত হইতেছি—যদি কিছু সুখ পাই। বার বার নূতন উৎসাহে ফিরিয়া যাইতেছি। এইরূপে আমরা চলিয়াছি, যতক্ষণ না দেহমন ভাঙিয়া যায়; শেষে প্রতারিত হইয়া মরিয়া যাই; —ইহাই মায়া।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধেও একই কথা। আমরা জগতের রহস্য-মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি—আমরা এই জিজ্ঞাসা, এই অনুসন্ধান-প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি না; কিন্তু আমাদের ইহা জানিয়া রাখা উচিত—জ্ঞান লব্ধব্য বস্তু নহে। কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই দেখা যায়, অনাদি অনন্ত কালের প্রাচীর দণ্ডায়মান, আমরা উহা লঙ্ঘন করিতে পারি না। কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই অসীম দেশের ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয়—উহাও অতিক্রম করা যায় না; সবই অপরিবর্তনীয়ভাবে কার্যকারণরূপ প্রাচীরে সীমাবদ্ধ। আমরা উহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারি না। তথাপি আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি, চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হয়;—ইহাই মায়া।

প্রতি নিঃশ্বাসে, হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে আমাদের প্রত্যেক গতিতে আমরা মনে করি—আমরা স্বাধীন, আবার সেই মুহূর্তেই আমরা দেখিতে পাই—আমরা স্বাধীন নই। ক্রীতদাস, প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা; শরীর, মন, সর্ববিধ চিন্তা এবং সকল ভাবেই আমরা প্রকৃতির ক্রীতদাস;—ইহাই মায়া।

এমন জননীই নাই, যিনি তাঁহার সন্তানকে অসাধারণ শিশু—প্রতিভাবান্ পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস না করেন। তিনি সেই ছেলেটিকে লইয়াই মাতিয়া থাকেন, সেই ছেলেটির উপর তাঁহার সারা মনপ্রাণ পড়িয়া থাকে। ছেলেটি বড় হইল—হয়তো মাতাল, পশুতুল্য হইয়া উঠিল, জননীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। যতই এই অসদ্ব্যবহার বাড়িতে থাকে, মায়ের ভালবাসাও ততই বাড়িতে থাকে। জগৎ উহাকে মায়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসা বলিয়া খুব প্রশংসা করে; তাহারা স্বপ্নেও মনে করে না যে, সেই জননী জন্মাবধি একটি ক্রীতদাসী মাত্র—তিনি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। সহস্রবার

তাঁহার ইচ্ছা হয়—তিনি উহা ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তিনি পারেন না। তিনি উহার উপর পুষ্পরাশি ছড়াইয়া, উহাকেই আশ্চর্য ভালবাসা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন,—ইহাই মায়া।

জগতে আমরা সকলেই এইরূপ। নারদও একদিন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, 'প্রভু, তোমার মায়া কেমন, তাহা দেখাও।' কয়েক দিন গত হইলে কৃষ্ণ নারদকে সঙ্গে করিয়া একটি অরণ্যে লইয়া গেলেন। অনেক দূর গিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, 'নারদ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত, একটু জল আনিয়া দিতে পারো? নারদ বলিলেন 'প্রভু, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন; আমি জল লইয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন। ঐ স্থান হইতে কিছুদূরে একটি গ্রাম ছিল; নারদ সেই গ্রামে জলের সন্ধানে প্রবেশ করিলেন। তিনি একটি দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন, দ্বার উন্মুক্ত হইল, একটি পরমা সুন্দরী কন্যা তাঁহার সম্মুখে আসিল। তাহাকে দেখিয়াই নারদ সব ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রভু যে জলের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি যে তৃষ্ণার্ত, হয়তো তৃষ্ণায় তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, নারদ এ-সব ভুলিয়া গেলেন। তিনি সব ভুলিয়া সেই কন্যাটির সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, ক্রমে পরস্পরের প্রণয়সঞ্চার হইল। তখন নারদ সেই কন্যার পিতার নিকট কন্যাটির পাণি প্রার্থনা করিলেন—বিবাহ হইয়া গেল, তাঁহারা সেই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি হইল। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হইল। শ্বশুরের মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন এবং পুত্র-কলত্র ভূমি-পশু সম্পত্তি-গৃহ প্রভৃতি লইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। অন্ততঃ তাঁহার বোধ হইতে লাগিল—তিনি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। এই সময় সেই দেশে বন্যা আসিল। একদিন রাত্রিকালে নদী দুই কূল প্লাবিত করিল, আর সমগ্র গ্রামটিই জলমগ্ন হইল। অনেক বাড়ি পড়িতে লাগিল—মানুষ পশু সব ভাসিয়া গিয়া ডুবিয়া যাইতে লাগিল, স্রোতের বেগে সবই ভাসিয়া গেল। নারদকে পলায়ন করিতে হইল। এক হাতে তিনি স্ত্রীকে ধরিলেন, অপর হাতে দুইটি ছেলেকে ধরিলেন, কাঁধে আর একটি ছেলেকে লইয়া সেই ভয়ঙ্কর নদী হাঁটিয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তরঙ্গের বেগ অত্যন্ত অধিক বোধ হইল। নারদ কাঁধের শিশুটিকে কোন রকমে রাখিতে পারিলেন না; সে পড়িয়া গিয়া তরঙ্গে

ভাসিয়া গেল। নিরাশায়, দুঃখে নারদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেটিকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একটি—যাহার তিনি হাত ধরিয়া ছিলেন—সে হাত কস্‌কাইয়া ডুবিয়া গেল। তাঁহার পত্নীকে তিনি তাঁহার শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ধরিয়াছিলেন, তরঙ্গের স্রোত অবশেষে তাহাকেও তাঁহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল, তিনি স্বয়ং কূলে নিক্ষিপ্ত হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে অতি কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কে যেন তাঁহার পিঠে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, 'বৎস, কই জল কই? তুমি যে জল আনিতে গিয়াছিলে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আধ ঘণ্টা হইল গিয়াছ।' আধ ঘণ্টা! নারদের মনে দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্ত দৃশ্য তাঁহার মনের ভিতর ঘটিয়া গিয়াছে;—ইহাই মায়া।

কোন না কোনরূপে আমরা এই মায়ার ভিতর রহিয়াছি। এ ব্যাপার বুঝা বড় কঠিন—বিষয়টিও বড় জটিল। ইহার তাৎপর্য কি? ইহার তাৎপর্য এই—ব্যাপার বড় ভয়ানক; সকল দেশেই মহাপুরুষগণ এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সকল দেশের লোকই এই তত্ত্ব শিক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু খুব অল্প লোকেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে; তাহার কারণ নিজে না ভুগিলে, নিজে না ঠেকিলে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। বাস্তবিক বলিতে গেলে—সব কিছুই বৃথা, সবই মিথ্যা।

সর্বসংহারক কাল আসিয়া সবই গ্রাস করে, কিছু আর অবশিষ্ট রাখে না—পাপকে গ্রাস করে, পাপীকে গ্রাস করে; রাজা প্রজা সুন্দর কুৎসিত সকলকেই কাল গ্রাস করে, কাহাকেও ছাড়ে না। সকলেরই এক চরমগতি—সকলেই বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের জ্ঞান শিল্প বিজ্ঞান—সবই সেই এক অনিবার্য মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেহই ঐ তরঙ্গের গতিরোধে সমর্থ নহে, কেহই ঐ বিনাশমুখী গতিকে এক মুহূর্তের জন্যও রোধ করিতে পারে না। আমরা মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, যেমন কোন দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে মদ্যপান নৃত্য ও অন্যান্য বৃথা আমোদ-প্রমোদে লোকে সবকিছু ভুলিবার চেষ্টা করিয়া পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো চলচ্ছক্তিরহিত হয়। আমরাও এইরূপে এই মৃত্যুচিন্তাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি—সর্ব প্রকার ইন্দ্রিয়সুখে ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তাহাতে মৃত্যু নিবারিত হয় না।

লোকের সম্মুখে দুইটি পথ আছে। একটি পথ সকলেই জানেন, তাহা এই : জগতে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে—সব সত্য, কিন্তু ও-সম্বন্ধে মোটেই ভাবিও না। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' দুঃখ আছে বটে, কিন্তু ওদিকে নজর দিও না। যা একটু আধটু সুখ পাও, তাহা ভোগ করিয়া লও; এই সংসারের অন্ধকার দিকটা লক্ষ্য করিও না—কেবল উজ্জ্বল দিকটাই লক্ষ্য করিও। এই মতে কিছু সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহাতে ভয়ানক বিপদের আশঙ্কাও আছে। ইহার মধ্যে সত্য এইটুকু যে, ইহা আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত রাখে। আশা এবং এইরূপ একটা প্রত্যক্ষ আদর্শ আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত করে বটে, কিন্তু উহাতে এই এক বিপদ আছে যে, শেষে হতাশ হইয়া সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়। 'সংসারকে যেমন দেখিতেছ, তেমনই গ্রহণ কর; যতদূর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারো থাকো; দুঃখকষ্ট আসিলেও তাহাতে সন্তুষ্ট থাকো; আঘাত পাইলে বলো—ইহা আঘাত নহে, পুষ্পবৃষ্টি; দাসবৎ পরিচালিত হইলেও বলো—আমি মুক্ত, স্বাধীন; অপরের নিকট এবং নিজের নিকট দিনরাত মিথ্যা বলো, কারণ সংসারে থাকিবার, জীবনধারণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়'—যাঁহারা এ-কথা বলেন, তাঁহাদিগকেও বাধ্য হইয়া অবশেষে সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহাকেই অবশ্য পাকা সাংসারিক জ্ঞান বলে, আর এই উনবিংশ শতাব্দীতে এই জ্ঞান যত প্রচলিত, কোনকালে এতটা ছিল না; তাহার কারণ এই—লোক এখন যেমন তীব্র আঘাত পাইয়া থাকে, কোন কালে এত তীব্র আঘাত পাইত না, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কখন এত তীব্র ছিল না; মানুষ এখন তাহার ভ্রাতার প্রতি যত নিষ্ঠুর, তত নিষ্ঠুর কখন ছিল না, আর এই জন্যই এখন এই সান্ত্বনা দেওয়া হইয়া থাকে। বর্তমানকালে এই উপদেশই অধিক পরিমাণে দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু এই উপদেশে এখন কোন ফল হয় না, কোনকালেই হয় নাই। গলিত শবকে কতকগুলি ফুল চাপা দিয়া রাখা যায় না—ইহা সম্ভব নহে; একদিন ঐ ফুলগুলি সব উড়িয়া যাইবে, তখন সেই শব পূর্বাপেক্ষা বীভৎসরূপে দেখা দিবে। আমাদের সমুদয় জীবনও এই প্রকার। আমরা আমাদের পুরাতন পচা ঘা সোনার আচ্ছাদনে মুড়িয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু একদিন আসিবে যখন সেই সোনার পাত খসিয়া পড়িবে আর সেই ক্ষত অতি বীভৎসভাবে প্রকাশিত হইবে।

তবে কি কোনই আশা নাই? এ-কথা সত্য যে, আমরা সকলেই মায়ার দাস, আমরা মায়াতেই জন্মিয়াছি, মায়াতেই আমরা জীবিত। তবে কি কোন উপায় নাই, কোন আশা নাই? আমরা যে সকলেই অতি দুর্দশাপন্ন, এই জগৎ যে বাস্তবিক একটি কারাগার, আমাদের তথাকথিত পূর্বপ্রাপ্ত মহিমাও যে একটি কারাগৃহ মাত্র, আমাদের বুদ্ধি এবং মনও যে কারাগার-স্বরূপ, তাহা শত শত যুগ ধরিয়া লোকে জানে। লোকে যাহাই বলুক না কেন, এমন কেহই নাই, যে কোন না কোন সময়ে ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিয়াছে। বৃদ্ধেরা এটি আরও তীব্রভাবে অনুভব করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহাদের সারাজীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে; প্রকৃতির মিথ্যা ভাষা তাঁহাদিগকে বড় বেশী ঠকাইতে পারে না। এই বন্ধন-অতিক্রমের উপায় কি? এই বন্ধনগুলিকে অতিক্রম করিবার কি কোন উপায় নাই? আমরা দেখিতেছি, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার, এই বন্ধন আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে সর্বত্র থাকিলেও এই দুঃখকষ্টের মধ্যেই, এই জগতেই—যেখানে জীবন ও মৃত্যু একার্থক —এখানেও এক মহাবাণী সকল যুগে, সকল দেশে, সকল ব্যক্তির হৃদয়ে যেন ধ্বনিত হইতেছে: দৈব হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।[১]—আমার এই দৈবী ত্রিগুণময়ী মায়া অতি কষ্টে অতিক্রম করা যায়। যাহারা আমার শরণাপন্ন, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করে। 'হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত জীবগণ, আমার কাছে এস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম ও শান্তি দিব'[২]—এই বাণীই আমাদিগকে ক্রমাগত সম্মুখের দিকে আগাইয়া লইয়া যাইতেছে। মানুষ ইহা শুনিয়াছে এবং অনন্ত যুগ ধরিয়া শুনিতেছে। যখন মানুষের সবই নষ্টপ্রায় বলিয়া মনে হয়, যখন আশা ভঙ্গ হইতে থাকে, যখন মানুষের নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস চূর্ণ হইয়া যায়, যখন সবই যেন তাহার আঙুলের ফাঁক দিয়া গলিয়া যায় এবং জীবন একটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়, তখন সে এই বাণী শুনিতে পায়। আর ইহাই ধর্ম।

অতএব, একদিকে এই অভয়বাণী, এই আশাপ্রদ বাক্য যে, এ-সব কিছুই নয়, এ সবই মায়া, ইহা উপলব্ধি কর, কিন্তু সেই সঙ্গে এই আশার বাণী যে,

১ গীতা, ৭।১৪

২ St. Matthew, Ch. II, 28

মায়ার বাহিরে যাইবার পথ আছে। অপর দিকে, সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন—'ধর্ম, দর্শন এ-সব বাজে জিনিস লইয়া মাথা ঘামাইও না। সংসারে বাস কর; এই সংসার নিতান্ত অশুভপূর্ণ বটে, কিন্তু যতদূর পারো, ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া লও।' সাদা কথায় ইহার অর্থ এই, দিবারাত্রি ভণ্ডামি, মিথ্যাচার ও প্রতারণার জীবন যাপন কর—তোমার ক্ষতগুলি যতদূর পারো ঢাকিয়া রাখো। তালির উপর তালি দাও, শেষে প্রকৃত জিনিসটিই যেন নষ্ট হইয়া যায়, আর তুমি কেবল একটি জোড়াতালির সমষ্টিতে পরিণত হও। ইহাকেই বলে—সাংসারিক জীবন। যাহারা এইরূপ জোড়াতালি লইয়া সন্তুষ্ট, তাহারা কখন ধর্মলাভ করিতে পারিবে না! যখন জীবনের বর্তমান অবস্থায় ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হয়, যখন নিজের জীবনের উপরও আর মমতা থাকে না, যখন এইরূপ 'তালি' দেওয়ার উপর ভয়ানক ঘৃণা উপস্থিত হয়, যখন মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার উপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা জন্মায়, তখনই ধর্মের আরম্ভ। বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া দৃঢ়স্বরে যাহা বলিয়াছেন, সে কথা যে প্রাণ হইতে বলিতে পারে, সেই কেবল ধার্মিক হইবার যোগ্য। সংসারী হইবার ইচ্ছা তাঁহারও হৃদয়ে একবার উদিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার এই অবস্থা: তিনি স্পষ্ট বুঝিতেছেন, এই সাংসারিক জীবনটা একেবারে ভুল; অথচ ইহা হইতে বাহির হইবার কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন না। প্রলোভন একবার তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল; সে যেন বলিল—সত্যের অনুসন্ধান পরিত্যাগ কর, সংসারে ফিরিয়া গিয়া পূর্বেকার মতো প্রতারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর, সকল জিনিসকে তাহার ভুল নামে ডাকো, নিজের নিকট ও সকলের নিকট দিনরাত মিথ্যা বলিতে থাকো। কিন্তু সেই মহাবীর অতুল বিক্রমে তৎক্ষণাৎ উহাকে জয় করিয়া ফেলিলেন; তিনি বলিলেন—'কেবল খাইয়া পরিয়া মূর্খের মতো জীবনযাপন অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ; পরাজয়ের জীবনযাপন অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে মরা শ্রেয়ঃ।' ইহাই ধর্মের ভিত্তি। যখন মানুষ এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, তখন সে সত্যলাভ করিবার পথে চলিয়াছে, সে ঈশ্বরলাভ করিবার পথে চলিয়াছে, বুঝিতে হইবে। ধার্মিক হইবার জন্যও প্রথমেই এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। আমি নিজের পথ নিজে করিয়া লইব। সত্য জানিব অথবা এই চেষ্টায় প্রাণ দিব; কারণ সংসারের দিকে তো আর কিছু পাইবার আশা নাই, ইহা শূন্য—ইহা

প্রতিদিন লয় পাইতেছে। আজিকার সুন্দর আশাপূর্ণ তরুণ আগামী কাল বৃদ্ধ। আজিকার আশা আনন্দ সুখ—এ-সকল মুকুলের মতো আগামী কাল শিশিরপাতেই নষ্ট হইবে। ইহা যেমন এক দিকের কথা, অপর দিকে তেমনি জয়ের আশা রহিয়াছে—জীবনের সমুদয় অশুভ জয় করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমন কি, জীবন ও জগতের উপর পর্যন্ত জয়ী হইবার আশা রহিয়াছে; এই উপায়েই মানুষ নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। অতএব যাহারা এই জয়লাভের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই ঠিক পথে রহিয়াছে এবং বেদসকল ইহাই প্রচার করেন—'নিরাশ হইও না; পথ বড় কঠিন—যেন ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম; তাহা হইলেও নিরাশ হইও না; উঠ—জাগো এবং তোমাদের চরম আদর্শে উপনীত হও।'[১]

বিভিন্ন ধর্মসমূহ যে আকারেই মানুষের নিকট আপন স্বরূপ অভিব্যক্ত করুক না কেন, তাহাদের সকলেরই এই এক মূলভিত্তি। সকল ধর্মই জগৎ হইতে বাহিরে যাইবার অর্থাৎ মুক্তির উপদেশ দিতেছে। এই-সকল বিভিন্ন ধর্মের উদ্দেশ্য—সংসার ও ধর্মের মধ্যে একটা আপস করিয়া লওয়া নহে, বরং ধর্মকে নিজ আদর্শে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা, সংসারের সঙ্গে আপস করিয়া ঐ আদর্শকে ছোট করিয়া ফেলা নহে। প্রত্যেক ধর্মই এ-কথা প্রচার করিতেছে, আর বেদান্তের কর্তব্য—বিভিন্ন ধর্মভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন; যেমন এইমাত্র আমরা দেখিলাম, এই মুক্তিতত্ত্বে জগতের উচ্চতম ও নিম্নতম সকল ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিযাছে। আমবা যাহাকে অত্যন্ত ঘৃণিত কুসংস্কার বলি, আবার যাহা সর্বোচ্চ দর্শন, সবগুলিরই এই এক সাধারণ ভিত্তি যে, তাহারা সকলেই ঐ এক প্রকার সঙ্কট হইতে নিস্তারের পথ দেখাইয়া দেয় এবং এই-সকল ধর্মের অধিকাংশেই প্রপঞ্চাতীত পুরুষবিশেষের—প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ নহেন এরূপ অর্থাৎ নিত্যমুক্ত পুরুষবিশেষের—সাহায্যে এই মুক্তিলাভ করিতে হয়। এই মুক্ত পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা বিরোধ ও মতভেদ সত্ত্বেও—সেই ব্রহ্ম সগুণ বা নির্গুণ, মানুষের ন্যায় তিনি জ্ঞানসম্পন্ন কি না, তিনি পুরুষ, স্ত্রী বা উভয় ভাব-বর্জিত, এইরূপ অনন্ত বিচারসত্ত্বেও—বিভিন্ন মতের অতিপ্রবল

১ কঠ. উপ., ১।৩।১৪

বিরোধসত্ত্বেও উহাদের সকলের মধ্যেই একত্বের যে স্বর্ণসূত্র উহাদিগকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই; সুতরাং ঐ-সকল বিভিন্নতা বা বিরোধ আমাদের ভীতি উৎপাদন করে না; আর এই বেদান্তদর্শনে এই স্বর্ণসূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আর ইহাতে প্রথমেই এই তত্ত্ব উপলব্ধ হয় যে, আমরা সকলেই বিভিন্ন পথ দ্বারা সেই এক মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। সকল ধর্মেরই এই সাধারণ ভাব।

আমাদের সুখ-দুঃখ, বিপদ-কষ্টের অবস্থার মধ্যেই আমরা এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে, আমরা ধীরে ধীরে সকলেই সেই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রশ্ন হইল: এই জগৎটা বাস্তবিক কি? কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি, কোথায়ই বা ইহার লয়? আর ইহার উত্তর: 'মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, মুক্তিতে স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতেই ইহার লয়।' এই যে মুক্তির ভাব, আমরা যে বাস্তবিক মুক্ত—এই মহান্ ভাব ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্তও চলিতে পারি না, এই ভাব ব্যতীত আমাদের সকল কার্য, এমন কি জীবন পর্যন্ত বৃথা। প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতি আমাদিগকে দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই অপর ভাবও আমাদের মনে উদিত হইতেছে যে, তথাপি আমরা মুক্ত। প্রতি মুহূর্তে যেন আমরা মায়া দ্বারা আহত হইয়া বদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি, কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি হইতেছে, আমরা মুক্ত। আমাদের ভিতরে যেন কিছু আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, আমরা মুক্ত। কিন্তু এই মুক্তিকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে, আমাদের মুক্ত স্বভাবকে প্রকাশ করিতে যে-সকল বাধা উপস্থিত হয়, তাহাও একরূপ অনতিক্রমণীয়। তথাপি ভিতরে, আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে কে যেন সর্বদা বলিতেছে—আমি মুক্ত, আমি মুক্ত। আর যদি তুমি জগতের বিভিন্ন ধর্মমত আলোচনা করিয়া দেখ, তবে তুমি বুঝিবে—তাহাদের সবগুলিতেই কোন না কোনরূপে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু ধর্ম নয়—ধর্ম-শব্দটিকে আপনারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না—সমগ্র সামাজিক জীবনটি কেবল এই এক মুক্তভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। সকল সামাজিক গতিই সেই এক মুক্তভাবের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যেন সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই স্বর শুনিয়াছে—যে স্বর দিবারাত্রি বলিতেছে, 'পরিশ্রান্ত

ও ভারাক্রান্ত সকলে আমার কাছে এস।'[১] একরূপ ভাষায় বা একরূপ ভঙ্গিতে উহা প্রকাশিত না হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির সেই বাণী কোন না কোনরূপে আমাদের সহিত বর্তমান রহিয়াছে। আমরা এখানে যে জন্মিয়াছি, তাহাও ঐ বাণীর জন্য; আমাদের প্রত্যেক গতিই উহার জন্য। আমরা জানি বা না জানি, আমরা সকলেই মুক্তির দিকে চলিয়াছি, আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই বাণীর অনুসরণ করিতেছি। যেমন সেই মোহন বংশীবাদক[২] বংশীধ্বনি দ্বারা গ্রামের বালকগণকে আকর্ষণ করিয়াছিল, আমরাও তেমনি না জানিয়াই এক মোহন বংশীর অনুসরণ করিতেছি।

আমরা যখন সেই বাণী অনুসরণ করি, তখনই আমরা নীতিপরায়ণ। কেবল জীবাত্মা নয়, সেই নিম্নতম জড়পরমাণু হইতে উচ্চতম মানব পর্যন্ত সকলেই সে স্বর শুনিয়াছে, আর ঐ স্বরে গা ঢালিয়া দিতে চাহিয়াছে। আর এই চেষ্টায় পরস্পর মিলিত হইতেছে, এ উহাকে ঠেলিয়া দিতেছে আর এই-ভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আনন্দ চেষ্টা সুখ জীবন মৃত্যু—সব কিছুর উৎপত্তি; আর এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ বাণীর সমীপে উপস্থিত হইবার উন্মত্ত চেষ্টার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা ইহাই করিয়া চলিয়াছি। ইহাই প্রকৃতির অভিব্যক্তি।

এই বাণী শুনিতে পাইলে কি হয়? তখন আমাদের সম্মুখের দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া থাকে। যখনই তুমি ঐ স্বরকে জানিতে পারো, বুঝিতে পারো—উহা কি, তখন সম্মুখের সকল দৃশ্যই পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই জগৎ, যাহা পূর্বে মায়ার বীভৎস যুদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহা একটি সুন্দর ও মনোরম স্থানে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবার তখন আর আমাদের প্রয়োজন থাকে না, জগৎ অতি বীভৎস অথবা এ-সবই বৃথা—ইহা বলিবারও আমাদের প্রয়োজন থাকে না, আমাদের কাঁদিবার অথবা বিলাপ করিবারও কোন প্রয়োজন থাকে না। যখন ঐ বাণীর মর্ম বুঝিতে পারি, তখনই বুঝি—এই-সকল চেষ্টা, এই যুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই গোলমাল, এই নিষ্ঠুরতা, এই-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-সম্ভোগের প্রয়োজন কি। তখন বুঝিতে

১ St. Matthew, Ch. II, 28

২ The Pied Piper of Hamelin

পাওয়া যায় যে, উহারা প্রকৃতির স্বভাববশতই ঘটিয়া থাকে—আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই বাণীর দিকে অগ্রসর হইতেছি বলিয়াই এইগুলি ঘটিয়া থাকে!

অতএব সমুদয় মানবজীবন, সমুদয় প্রকৃতি কেবল সেই মুক্তভাবকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র; সূর্যও সেইদিকে চলিয়াছে, পৃথিবীও ঐজন্য সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও তাই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে এবং বায়ুও বহিতেছে। সেই মুক্তির জন্য বজ্র তীব্র নিনাদ করিতেছে, মৃত্যুও তাহারই জন্য চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সকলেই সেই দিকে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সাধু সেইদিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে উহা কিছু প্রশংসার কথা নহে। পাপীও চলিয়াছে, দানশীল ব্যক্তি সেই বাণী লক্ষ্য করিয়া সোজা সেই দিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না; আবার ভয়ানক কৃপণ ব্যক্তিও সেই লক্ষ্যে চলিয়াছে। মহান্ হিতকারী ব্যক্তিও অন্তরে অন্তরে সেই বাণী শুনিয়াছেন; তিনি সেই হিতকর্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না, আবার ভয়ানক অলস ব্যক্তিও সেইরূপ। একজনের অপেক্ষা অপর ব্যক্তির পদস্খলন বেশী হইতে পারে, আর যে ব্যক্তির খুব বেশী পদস্খলন হয়, তাহাকে আমরা মন্দ বলি; আর যাহার পদস্খলন অল্প হয়, তাহাকে আমরা ভাল বলি। ভাল-মন্দ এই দুইটি ভিন্ন বস্তু নহে, উহারা একই জিনিস; উহাদের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণগত।

এখন দেখ, যদি এই মুক্তভাবরূপ শক্তি বাস্তবিক সমগ্র জগতে কার্য করিতে থাকে, তবে আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়—ধর্মে উহা প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই, সব ধর্মই ঐ এক ভাব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। অতি নিম্ন স্তরের ধর্মগুলির কথা ধর, সেই-সকল ধর্মে হয়তো কোন মৃত পূর্বপুরুষ অথবা ভয়ানক নিষ্ঠুর দেবগণ উপাসিত হন; কিন্তু তাহাদের উপাসিত এই দেবতা বা মৃত পূর্বপুরুষদের মোটামুটি ধারণাটা কি? সেই ধারণা এই যে—তাঁহারা প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নত, এই মায়া দ্বারা তাঁহারা বদ্ধ নন। অবশ্য তাঁহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা খুব সামান্য। উপাসক একজন অজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার ধারণা খুব স্থূল, সে গৃহ-প্রাচীর ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, অথবা

শূন্যে উড়িতে পারে না। সুতরাং এই-সকল বাধা অতিক্রম করা বা না করা ব্যতীত শক্তি সম্বন্ধে তাহার উচ্চতর ধারণা নাই ; সুতরাং সে এমন দেবগণের উপাসনা করে, যাঁহারা প্রাচীর ভেদ করিয়া অথবা আকাশের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, অথবা নিজরূপ পরিবর্তন করিতে পারেন। দার্শনিকভাবে লক্ষ্য করিলে এইরূপ দেবোপাসনার ভিতর কি রহস্য নিহিত আছে? রহস্য এই যে, এখানেও সেই মুক্তির ভাব রহিয়াছে, তাহার দেবতার ধারণা পরিচিত প্রকৃতির ধারণা অপেক্ষা উন্নত। আবার যাহারা তদপেক্ষা উন্নত দেবতার উপাসক, তাহাদেরও সেই একই মুক্তির সম্বন্ধে অন্যপ্রকার ধারণা। যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উন্নত হইতে থাকে, তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর আত্মার ধারণাও উন্নত হইতে থাকে ; অবশেষে আমরা একেশ্বরবাদে উপনীত হই। এই মায়া, এই প্রকৃতি রহিয়াছেন, আর এই মায়ার প্রভু একজন রহিয়াছেন—ইনিই আমাদের আশার স্থল।

যেখানে প্রথম এই একেশ্বরবাদের ভাব উদিত হয়, সেইখানে বেদান্তেরও আরম্ভ। বেদান্ত উহা অপেক্ষাও গভীরতর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চান। বেদান্ত বলেন—এই মায়াপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে চৈতন্য রহিয়াছেন, যিনি মায়ার প্রভু যিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং আমরাও সকলে যে তাঁহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, এই ধারণা সত্য বটে, কিন্তু এখনও যেন ধারণা স্পষ্ট হয় নাই ; এখনও যেন এই দর্শন অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যদিও উহা স্পষ্টতঃ যুক্তির বিরোধী নহে। যেমন আপনাদের স্তবগীতিতে আছে-'আমার ঈশ্বর তোমার অতি নিকটে', বেদান্তীর পক্ষেও এই স্তুতি খাটিবে, তিনি কেবল একটি শব্দ পরিবর্তন করিয়া বলিবেন—'আমার ঈশ্বর আমার অতি নিকটে।' আমাদের চরম উদ্দেশ্য যে আমাদের অনেক দূরে প্রকৃতির পারে ; আমরা যে তাহার নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, এই দূরবর্তী ভাবকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী করিতে হইবে, অবশ্য আদর্শের পবিত্রতা ও উচ্চতা বজায় রাখিয়া ইহা করিতে হইবে। যেন ঐ আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে—অবশেষে সেই স্বর্গস্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতির ঈশ্বররূপে উপলব্ধ হন, শেষে যেন প্রকৃতিতে ও সেই ঈশ্বরে কোন প্রভেদ না থাকে, তিনিই যেন এই দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, অবশেষে এই দেবমন্দিররূপে পরিণত হন,

তিনিই যেন শেষে জীবাত্মা ও-মানুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হন। এইখানেই বেদান্তের শেষ কথা।

যাঁহাকে ঋষিগণ বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে এতক্ষণে জানা গেল। বেদান্ত বলেন—তুমি যে বাণী শুনিয়াছিলে, তাহা সত্য; তবে তুমি উহা শুনিয়া ঠিক পথে চল নাই। মুক্তির যে মহান্ আদর্শ তুমি অনুভব করিয়াছিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি উহা বাহিরে অন্বেষণ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছ। ঐ ভাবকে তোমার কাছে—আরও কাছে অনুভব কর, যতদিন না তুমি জানিতে পারো যে ঐ মুক্তি, ঐ স্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহা তোমার আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ। এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বরূপ ছিল এবং মায়া তোমাকে কখনই বদ্ধ করে নাই। এই প্রকৃতি কখনই তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ নয়। ভয়গ্রস্ত বালকের মতো তুমি স্বপ্ন দেখিতেছিলে যে, প্রকৃতি তোমাকে নাচাইতেছে, এই প্রকৃতি হইতে মুক্ত হওয়াই তোমার লক্ষ্য। ইহা শুধু বুদ্ধিদ্বারা জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা, অপরোক্ষভাবে অনুভব করা—আমরা এই জগৎকে যত স্পষ্টভাবে দেখিতেছি, তাহা অপেক্ষা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা। তখনই আমরা মুক্ত হইব, তখনই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, তখনই হৃদয়ের সকল চঞ্চলতা স্থির হইয়া যাইবে, তখনই সকল কুটিলতা সরল হইয়া যাইবে, তখনই এই বহুত্বের ভ্রান্তি চলিয়া যাইবে, তখনই এই প্রকৃতি—এই মায়া এখনকার মতো ভয়ানক অবসাদকর স্বপ্ন না হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন যেমন কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হইবে, তখন বিপদ বিশৃঙ্খলা, এমন কি আমরা যে-সকল যন্ত্রণা ভোগ করি, সেগুলিও ব্রহ্মভাবে রূপায়িত হইবে—তাহারা তখন তাহাদের প্রকৃত রূপে প্রতিভাত হইবে, সকল বস্তুর পশ্চাতে সারসত্তারূপে তিনিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখা যাইবে, আর বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনিই আমার প্রকৃত অন্তরাত্মা।

শূন্যে উড়িতে পারে না। সুতরাং এই-সকল বাধা অতিক্রম করা বা না করা ব্যতীত শক্তি সম্বন্ধে তাহার উচ্চতর ধারণা নাই; সুতরাং সে এমন দেবগণের উপাসনা করে, যাঁহারা প্রাচীর ভেদ করিয়া অথবা আকাশের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, অথবা নিজরূপ পরিবর্তন করিতে পারেন। দার্শনিকভাবে লক্ষ্য করিলে এইরূপ দেবোপাসনার ভিতর কি রহস্য নিহিত আছে? রহস্য এই যে, এখানেও সেই মুক্তির ভাব রহিয়াছে, তাহার দেবতার ধারণা পরিচিত প্রকৃতির ধারণা অপেক্ষা উন্নত। আবার যাহারা তদপেক্ষা উন্নত দেবতার উপাসক, তাহাদেরও সেই একই মুক্তির সম্বন্ধে অন্যপ্রকার ধারণা। যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উন্নত হইতে থাকে, তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর আত্মার ধারণাও উন্নত হইতে থাকে; অবশেষে আমরা একেশ্বরবাদে উপনীত হই। এই মায়া, এই প্রকৃতি রহিয়াছেন, আর এই মায়ার প্রভু একজন রহিয়াছেন—ইনিই আমাদের আশার স্থল।

যেখানে প্রথম এই একেশ্বরবাদের ভাব উদিত হয়, সেইখানে বেদান্তেরও আরম্ভ। বেদান্ত উহা অপেক্ষাও গভীরতর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চান। বেদান্ত বলেন—এই মায়াপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে চৈতন্য রহিয়াছেন, যিনি মায়ার প্রভু যিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং আমরাও সকলে যে তাঁহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, এই ধারণা সত্য বটে, কিন্তু এখনও যেন ধারণা স্পষ্ট হয় নাই; এখনও যেন এই দর্শন অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যদিও উহা স্পষ্টতঃ যুক্তির বিরোধী নহে। যেমন আপনাদের স্তবগীতিতে আছে--'আমার ঈশ্বর তোমার অতি নিকটে', বেদান্তীর পক্ষেও এই স্তুতি খাটিবে, তিনি কেবল একটি শব্দ পরিবর্তন করিয়া বলিবেন—'আমার ঈশ্বর আমার অতি নিকটে।' আমাদের চরম উদ্দেশ্য যে আমাদের অনেক দূরে প্রকৃতির পারে; আমরা যে তাহার নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, এই দূরবর্তী ভাবকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী করিতে হইবে, অবশ্য আদর্শের পবিত্রতা ও উচ্চতা বজায় রাখিয়া ইহা করিতে হইবে। যেন ঐ আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে—অবশেষে সেই স্বর্গস্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতির ঈশ্বররূপে উপলব্ধ হন, শেষে যেন প্রকৃতিতে ও সেই ঈশ্বরে কোন প্রভেদ না থাকে, তিনিই যেন এই দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, অবশেষে এই দেবমন্দিররূপে পরিণত হন,

তিনিই যেন শেষে জীবাত্মা ও মানুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হন। এইখানেই বেদান্তের শেষ কথা।

যাঁহাকে ঋষিগণ বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে এতক্ষণে জানা গেল। বেদান্ত বলেন—তুমি যে বাণী শুনিয়াছিলে, তাহা সত্য; তবে তুমি উহা শুনিয়া ঠিক পথে চল নাই। মুক্তির যে মহান্ আদর্শ তুমি অনুভব করিয়াছিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি উহা বাহিরে অন্বেষণ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছ। ঐ ভাবকে তোমার কাছে—আরও কাছে অনুভব কর, যতদিন না তুমি জানিতে পারো যে ঐ মুক্তি, ঐ স্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহা তোমার আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ। এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বরূপ ছিল এবং মায়া তোমাকে কখনই বদ্ধ করে নাই। এই প্রকৃতি কখনই তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ নয়। ভয়গ্রস্ত বালকের মতো তুমি স্বপ্ন দেখিতেছিলে যে, প্রকৃতি তোমাকে নাচাইতেছে, এই প্রকৃতি হইতে মুক্ত হওয়াই তোমার লক্ষ্য। ইহা শুধু বুদ্ধিদ্বারা জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা, অপরোক্ষভাবে অনুভব করা—আমরা এই জগৎকে যত স্পষ্টভাবে দেখিতেছি, তাহা অপেক্ষা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা। তখনই আমরা মুক্ত হইব, তখনই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, তখনই হৃদয়ের সকল চঞ্চলতা স্থির হইয়া যাইবে, তখনই সকল কুটিলতা সরল হইয়া যাইবে, তখনই এই বহুত্বের ভ্রান্তি চলিয়া যাইবে, তখনই এই প্রকৃতি—এই মায়া এখনকার মতো ভয়ানক অবসাদকর স্বপ্ন না হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন যেমন কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্র-রূপে প্রতিভাত হইবে, তখন বিপদ বিশৃঙ্খলা, এমন কি আমরা যে-সকল যন্ত্রণা ভোগ করি, সেগুলিও ব্রহ্মভাবে রূপায়িত হইবে—তাহারা তখন তাহাদের প্রকৃত রূপে প্রতিভাত হইবে, সকল বস্তুর পশ্চাতে সারসত্তারূপে তিনিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখা যাইবে, আর বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনিই আমার প্রকৃত অন্তরাত্মা।

ব্রহ্ম ও জগৎ

অনন্ত ব্রহ্ম যিনি, তিনি সসীম হইলেন কিরূপে—অদ্বৈত বেদান্তের এই বিষয়টি ধারণা করা অতি কঠিন। এই প্রশ্ন মানুষ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু এই প্রশ্ন চিরকাল থাকিবে—যিনি অনন্ত অসীম, তিনি সসীম হইলেন কিরূপে? আমি এখন এই প্রশ্নটি লইয়া আলোচনা করিব। ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য এই চিত্রটির সাহায্য গ্রহণ করিব।

চিত্রে (ক) ব্রহ্ম, (খ) জগৎ। ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছেন। এখানে জগৎ অর্থে শুধু জড়জগৎ নহে, সূক্ষ্ম জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে—স্বর্গ-নরক, এক কথায় যাহা কিছু আছে, জগৎ অর্থে সে-সবই বুঝিতে হইবে। একপ্রকার পরিণামের নাম 'মন', আর একপ্রকার পরিণামের নাম 'শরীর'—ইত্যাদি ইত্যাদি, এই-সব লইয়া জগৎ। এই ব্রহ্ম (ক) জগৎ (খ) হইয়াছেন দেশ-কাল-নিমিত্তের (গ-এর) মধ্য দিয়া আসিয়া—ইহাই অদ্বৈতবাদের মূল কথা। দেশকালনিমিত্ত-রূপ কাচের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে আমরা দেখিতেছি, আর ঐরূপে নীচের দিক হইতে দেখিলে এই ব্রহ্ম জগদ্রূপে দৃষ্ট হন। ইহা হইতে বেশ বোধ হইতেছে, যেখানে ব্রহ্ম সেখানে দেশ-কাল-নিমিত্ত নাই। কাল সেখানে থাকিতে পারে না, কারণ সেখানে মন নাই, চিন্তাও নাই। দেশ সেখানে থাকিতে পারে না, কারণ সেখানে কোন পরিবর্তন নাই—পরিবর্তন, গতি এবং নিমিত্ত বা কার্যকারণ-ভাবও থাকিতে পারে না। একমাত্র সত্তা বিরাজমান। এইটি বুঝা এবং বিশেষরূপে ধারণা করা আবশ্যক যে, যাহাকে আমরা কার্যকারণভাব বলি, তাহা ব্রহ্ম প্রপঞ্চরূপে অবনতভাবাপন্ন হইবার পর—যদি আমরা এই ভাষা প্রয়োগ করিতে পারি—তাহার পর আরম্ভ হয়, পূর্বে নহে; আর আমাদের ইচ্ছা বাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু সব তাহার পর হইতে আরম্ভ হয়।

(ক) ব্রহ্ম

(গ)
কাল
নিমিত্ত
দেশ

(খ) জগৎ

আমার বরাবর ধারণা এই যে, শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) বেদান্ত বুঝিতে এই জায়গায় ভুল করিয়াছেন; তিনি এই 'ইচ্ছা'কেই সর্বস্ব করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের স্থানে এই 'ইচ্ছা'কেই বসাইতে চান। কিন্তু

পূর্ণব্রহ্মকে কখন 'ইচ্ছা' (Will) বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে না, কারণ 'ইচ্ছা' জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত ও পরিণামশীল, কিন্তু ব্রহ্মে—'গ'-এর অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের উপরে—কোনরূপ গতি নাই, কোনরূপ পরিণাম নাই। ঐ গ-এর নিম্নেই গতি—বাহ্য বা আন্তর সর্বপ্রকার গতির আরম্ভ; আর এই আন্তর গতিকেই চিন্তা বলে। অতএব গ-এর উপরে কোনরূপ ইচ্ছা থাকিতে পারে না, সুতরাং 'ইচ্ছা' জগতের কারণ হইতে পারে না। আরও নিকটে আসিয়া পর্যবেক্ষণ কর; আমাদের শরীরের সকল গতি ইচ্ছাপ্রযুক্ত নহে। আমি এই চেয়ারখানি নাড়িলাম। ইচ্ছা অবশ্য উহা নাড়াইবার কারণ, ঐ ইচ্ছাই পেশীর শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, এ-কথা ঠিক বটে। কিন্তু যে শক্তি চেয়ারখানি নাড়াইবার কারণ, তাহাই আবার হৃদয় এবং ফুস্ফুস্কেও সঞ্চালিত করিতেছে, কিন্তু 'ইচ্ছা'রূপে নহে। এই দুই শক্তিই এক ধরিয়া লইলেও যখন উহা জ্ঞানের ভূমিতে আরোহণ করে, তখনই উহাকে 'ইচ্ছা' বলা যায়, কিন্তু ঐ ভূমিতে আরোহণ করিবার পূর্বে উহাকে ইচ্ছা বলিলে উহার ভুল নাম দেওয়া হইল বলিতে হইবে। ইহাতেই শোপেনহাওয়ারের দর্শনে বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে।

যাহা হউক, এখন আলোচনা করা যাক—আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি কেন? একটি প্রস্তর পড়িল—আমরা অমনি প্রশ্ন করিলাম, উহার পতনের কারণ কি? এই প্রশ্নের ন্যায্যতা বা সম্ভাবনীয়তা এই অনুমান বা ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, কারণ ব্যতীত কিছুই ঘটে না। বিষয়টি সম্বন্ধে আপনাদিগকে খুব স্পষ্ট ধারণা করিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ যখনই আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'এই ঘটনা কেন ঘটিল?'—তখনই আমরা মানিয়া লইতেছি যে, সব জিনিসেরই, সব ঘটনারই একটি 'কেন' থাকিবে। অর্থাৎ উহা ঘটিবার পূর্বে আর কিছু উহার পূর্ববর্তী থাকিবে। এই পূর্ববর্তিতা ও পরবর্তিতাকেই 'নিমিত্ত' বা 'কার্যকারণ'ভাব বলে, আর যাহা কিছু আমরা দেখি শুনি বা অনুভব করি—সংক্ষেপে জগতের সবকিছুই একবার কারণ, আবার কার্যরূপে অনুভূত হইতেছে। একটি জিনিস তাহার পরবর্তীটির কারণ, উহাই আবার তাহার পূর্ববর্তী কোন কিছুর কার্য। ইহাকেই কার্যকারণের নিয়ম বলে, ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস জগতের প্রত্যেক পরমাণুই অন্যান্য সকল বস্তুর সহিত, তাহা যাহাই হউক না কেন, কোন না কোন

সম্বন্ধে জড়িত রহিয়াছে। আমাদের এই ধারণা কিরূপে আসিল, এই লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। ইওরোপে অনেক স্বজ্ঞা-সম্পন্ন দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস ইহা মানবজাতির স্বভাবগত ধারণা, আবার অনেকের ধারণা ইহা ভূয়োদর্শনলব্ধ, কিন্তু এই প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নাই। বেদান্ত ইহার কি মীমাংসা করেন, তাহা আমরা পরে দেখিব। অতএব আমাদের প্রথম বুঝা উচিত 'কেন' এই প্রশ্নটি এই ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, উহার পূর্ববর্তী কিছু আছে এবং উহার পরে আরও কিছু ঘটিবে। এই প্রশ্নে আর একটি বিশ্বাস অন্তর্নিহিত রহিয়াছে—জগতের কোন পদার্থই স্বতন্ত্র নয়, সকল পদার্থের উপর উহার বাহিরের কোন পদার্থ কার্য করে। জগতের সকল বস্তুই এইরূপ পরস্পর-সাপেক্ষ—একটি অপরটির অধীন, কেহই স্বতন্ত্র নহে। যখন আমরা বলি, 'ব্রহ্মের কারণ কি ? তখন আমরা এই ভুল করি যে, ব্রহ্মকে জগতের সামিল কোন বস্তুর ন্যায় মনে করিয়া বসি। এই প্রশ্ন করিতে গেলেই আমাদিগকে অনুমান করিতে হইবে, সেই ব্রহ্মও অন্য কিছুর অধীন—সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাও অন্য কিছুর দ্বারা বদ্ধ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' বা 'নিরপেক্ষ সত্তা' শব্দটিকে আমরা জগতের ন্যায় মনে করিতেছি। পূর্বোক্ত রেখার উপরে তো আর দেশকালনিমিত্ত নাই, কারণ উহা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—মনের অতীত। যাহা কেবল নিজের অস্তিত্বে নিজে প্রকাশিত, যাহা একমাত্র—'একমেবাদ্বিতীয়ম্,' তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যাহা মুক্তস্বভাব—স্বতন্ত্র, তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না, যেহেতু তাহা হইলে তিনি মুক্ত হইলেন না, বদ্ধ হইয়া গেলেন। যাহার ভিতর আপেক্ষিকতা আছে, তাহা কখন মুক্তস্বভাব হইতে পারে না। অতএব দেখিতেছ, অনন্ত কেন সান্ত হইল—এই প্রশ্নই ভ্রমাত্মক, উহা স্ববিরোধী।

এইসব সূক্ষ্ম বিচার ছাড়িয়া দিয়া সহজ ভাবেও আমরা এ-বিষয় বুঝাইতে পারি। মনে কর আমরা বুঝিলাম—ব্রহ্ম কিরূপে জগৎ হইলেন, অনন্ত কিরূপে সান্ত হইলেন ; তাহা হইলে ব্রহ্ম কি ব্রহ্মই থাকিবেন, অনন্ত কি অনন্তই থাকিবেন ? তাহা হইলে তো অনন্ত ব্রহ্ম আপেক্ষিক হইয়া গেলেন। মোটামুটি আমরা জ্ঞান বলিতে কি বুঝি ? যে-কোন বিষয় আমাদের মনের বিষয়ীভূত হয় অর্থাৎ মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহাই আমরা জানিতে

পারি, আর যখন উহা আমাদের মনের বাহিরে থাকে অর্থাৎ মনের বিষয়ীভূত না হয়, তখন আমরা উহা জানিতে পারি না। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যদি সেই অনন্ত ব্রহ্ম মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হন, তাহা হইলে তিনি আর অনন্ত রহিলেন না; তিনি সসীম হইয়া গেলেন। মনের দ্বারা যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, সে-সবই সসীম। অতএব সেই 'ব্রহ্মকে জানা'—এ-কথা আবার স্ববিরোধী। এই জন্যই এ প্রশ্নের উত্তর এ পর্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই; কারণ যদি ইহার উত্তর পাওয়া যায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম অসীম রহিলেন না; ঈশ্বর 'জ্ঞাত' হইলে তাঁহার আর ঈশ্বরত্ব থাকে না—তিনি আমাদেরই মতো একজন—এই চেয়ারখানার মতো একটা জিনিস হইয়া গেলেন। তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি সর্বদাই অজ্ঞেয়।

তবে অদ্বৈতবাদী বলেন, তিনি শুধু 'জ্ঞেয়' অপেক্ষা আরও কিছু বেশী। এ-কথাটি আবার বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর অজ্ঞেয় মনে করিয়া তোমরা যেন অজ্ঞেয়বাদীদের মতো বসিয়া থাকিও না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—সম্মুখে এই চেয়ারখানি রহিয়াছে, উহাকে আমি জানিতেছি, উহা আমার জ্ঞাত পদার্থ। আবার আকাশের বহির্দেশে কি আছে, সেখানে কোন লোকের বসতি আছে কি না, এ বিষয় হয়তো একেবারে অজ্ঞেয়। কিন্তু ঈশ্বর পূর্বোক্ত পদার্থগুলির ন্যায় জ্ঞাতও নন, অজ্ঞেয়ও নন। ঈশ্বর বরং যাহাকে 'জ্ঞাত' বলা হইতেছে, তাহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী—ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিলে ইহাই বুঝায়, কিন্তু যে অর্থে কেহ কেহ কোন কোন প্রশ্নকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলেন, সে অর্থে নহে। ঈশ্বর জ্ঞাত অপেক্ষা আরও কিছু অধিক। এই চেয়ার আমাদের জ্ঞাত; কিন্তু ঈশ্বর তাহা অপেক্ষাও আমাদের অধিক জ্ঞাত, কারণ ঈশ্বরকে আগে জানিয়া—তাঁহারই ভিতর দিয়া—আমাদিগকে চেয়ারের জ্ঞান লাভ করিতে হয়। তিনি সাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞানের তিনি অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ। যাহা কিছু আমরা জানি, সবই আগে তাঁহাকে জানিয়া—তাঁহারই ভিতর দিয়া—তবে জানিতে হয়। তিনিই আমাদের আত্মার সত্তাস্বরূপ। তিনিই প্রকৃত আমি—সেই 'আমি'ই আমাদের এই 'আমি'র স্বরূপ; আমরা সেই 'আমি'র ভিতর দিয়া ছাড়া কিছুই জানিতে পারি না, সুতরাং সবকিছুই আমাদিগকে ব্রহ্মের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। অতএব এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে ব্রহ্মের মধ্য দিয়া জানিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম চেয়ার অপেক্ষা আমাদের

নিকটবর্তী হইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের নিকট হইতে অনেক দূরে রহিলেন। জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন, কিন্তু উভয় হইতেই অনন্তগুণ ঊর্ধ্বে, তিনি তোমার আত্মস্বরূপ। কে এই জগতে এক মুহূর্তও জীবন ধারণ করিতে পারিত, কে এই জগতে এক মুহূর্তও শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য নির্বাহ করিতে পারিত, যদি সেই আনন্দস্বরূপ ইহার প্রতি পরমাণুতে বিরাজমান না থাকিতেন?[১] কারণ তাঁহারই শক্তিতে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য নির্বাহ করিতেছি এবং তাঁহারই অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব। তিনি যে স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া আমার রক্তসঞ্চালন করিতেছেন, তাহা নহে; ইহার তাৎপর্য এই যে, তিনিই সবকিছুর সত্তাস্বরূপ—তিনি আমার আত্মার আত্মা; তুমি কোনরূপেই বলিতে পার না যে, তুমি তাঁহাকে জানো—ইহা দ্বারা তাঁকে অত্যন্ত নামাইয়া ফেলা হয়। তুমি নিজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে পার না, সুতরাং তুমি তাঁহাকে জানিতেও পার না। জ্ঞান বলিতে 'বিষয়ীকরণ' (objectification)—কোন জিনিসকে বাহিরে আনিয়া বিষয়ের ন্যায়—জ্ঞেয় বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষ করা বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ দেখ, স্মরণকার্যে তোমরা অনেক জিনিসকে জ্ঞানের 'বিষয়' করিতেছ—যেন তোমাদের নিজেদের স্বরূপ হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ! সমুদয় স্মৃতি—যাহা কিছু আমি দেখিয়াছি এবং যাহা কিছু আমি জানি, সবই আমার মনে অবস্থিত। ঐ-সকল বস্তুর ছাপ বা ছবি যেন আমার অন্তরে রহিয়াছে। যখনই উহাদের বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছা করি, উহাদিগকে জানিতে চাই, তখন প্রথমেই ঐগুলিকে বাহিরে প্রক্ষেপ করি। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ করা অসম্ভব, কারণ তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমরা তাঁহাকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে পারি না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, 'স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'[২]—ইহার অর্থ: সেই সূক্ষ্মস্বরূপ জগৎকারণ সকল বস্তুর আত্মা, তিনিই সত্যস্বরূপ; হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই। এই 'তত্ত্বমসি' বাক্য বেদান্তের মধ্যে পবিত্রতম বাক্য, মহাবাক্য বলিয়া কথিত হয়,

১ কো হ্যেবান্যাৎ···। তৈত্তিরীয় উপ., ২।৭

২ ছান্দোগ্য উপ., ৬।১৩।৩

আর ঐ পূর্বোক্ত বাক্যাংশ দ্বারা 'তত্ত্বমসি'র প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও বুঝা গেল। 'তুমিই সেই'—এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় তুমি ঈশ্বরকে বর্ণনা করিতে পার না। ভগবানকে পিতা মাতা ভ্রাতা বা প্রিয় বন্ধু বলিলে তাঁহাকে 'বিষয়ীভূত' করিতে হয়—তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া দেখিতে হয়—তাহা তো কখন হইতে পারে না। তিনি সকল বিষয়ের অনন্ত বিষয়ী। যেমন আমি চেয়ারখানি দেখিতেছি, আমি চেয়ারখানির দ্রষ্টা—আমি উহার বিষয়ী, তেমনি ঈশ্বর আমার আত্মার নিত্যদ্রষ্টা—নিত্যজ্ঞাতা—নিত্যবিষয়ী। কিরূপে তুমি তাঁহাকে—তোমার আত্মার অন্তরাত্মাকে—সকল বস্তুর প্রকৃত সত্তাকে 'বিষয়ীকৃত' করিবে, বাহিরে আনিয়া দেখিবে? অতএব পুনরায় বলিতেছি, ঈশ্বর জ্ঞেয়ও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন—তিনি জ্ঞেয় অজ্ঞেয় অপেক্ষা অনন্তগুণ মহীয়ান্—তিনি আমাদের সহিত অভিন্ন; আর যাহা আমার সহিত এক, তাহা কখন আমার জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় হইতে পারে না, যেমন তোমার আত্মা, আমার আত্মা জ্ঞেয়ও নহে, অজ্ঞেয়ও নহে। তুমি তোমার আত্মাকে জানিতে পার না, তুমি আত্মাকে নাড়িতে পার না, অথবা উহাকে 'বিষয়' করিয়া দৃষ্টিগোচর করিতে পার না, কারণ তুমিই সেই, তুমি নিজেকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিতে পার না। আবার আত্মাকে অজ্ঞেয় বলিতে পার না, কারণ অজ্ঞেয় বলিতে গেলেও আগে আত্মাকে 'বিষয়' করিতে হইবে; তাহা তো করা যায় না। আর তুমি নিজে যেমন তোমার নিকট পরিচিত—জ্ঞাত, আর কোন্ বস্তু তদপেক্ষা তোমার অধিক জ্ঞাত? প্রকৃতপক্ষে উহা আমাদের জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ। ঠিক এই ভাবেই বলা যায় যে, ঈশ্বর জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন, তদপেক্ষা অনন্তগুণে মহীয়ান্, কারণ তিনিই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা।

অতএব প্রথমতঃ আমরা দেখিতেছি, 'পূর্ণব্রহ্মসত্তা হইতে কিরূপে জগৎ হইল?'—এই প্রশ্নই স্ববিরোধী; আর দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরের ধারণা এই একত্ব; সুতরাং আমরা তাঁহাকে 'বিষয়ীভূত' করিতে পারি না, কারণ জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আমরা সর্বদা তাঁহাতেই জীবিত এবং তাঁহাতে থাকিয়াই যাবতীয় কার্যকলাপ করিতেছি। আমরা যাহা করিতেছি, সবই সর্বদা তাঁহারই মধ্য দিয়া করিতেছি। এখন প্রশ্ন—এই দেশ-কাল-নিমিত্ত কি? অদ্বৈতবাদের মর্ম

তো এই—একটিমাত্র বস্তু আছে, তুইটি নাই। আবার কিন্তু বলা হইতেছে সেই অনন্ত ব্রহ্ম দেশ-কাল-নিমিত্তের আবরণের ভিতর দিয়া নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। অতএব এখন বোধ হইতেছে, তুইটি বস্তু আছে—সেই অনন্ত ব্রহ্ম আর মায়া অর্থাৎ দেশ-কাল-নিমিত্তের সমষ্টি। আপাততঃ তুইটি বস্তু আছে, ইহাই যেন স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হইতেছে। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে বলেন, বাস্তবিক ইহাকে তুই বলা যায় না। তুইটি বস্তু থাকিতে হইলে ব্রহ্মের ন্যায়—যাঁহার উপর কোন নিমিত্ত কার্য করিতে পারে না—এরূপ তুইটি স্বতন্ত্র বস্তু থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেশ-কাল-নিমিত্তের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না। আমাদের মনের প্রতি পরিবর্তনের সহিত কাল পরিবর্তিত হইতেছে, সুতরাং উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কখন কখন স্বপ্নে দেখা যায়, যেন অনেক বৎসর জীবনধারণ করিয়াছি—কখন কখন আবার বোধ হয় এক মুহূর্তের মধ্যে কয়েক মাস অতীত হইল।

অতএব দেখা গেল, কাল মনের অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ কালের জ্ঞান সময় সময় একেবারে অন্তর্হিত হয়, আবার অপর সময় আসিয়া থাকে। দেশ সম্বন্ধেও এইরূপ। আমরা দেশের স্বরূপ জানিতে পারি না। তথাপি উহার লক্ষণ নির্দিষ্ট করা অসম্ভব মনে হইলেও উহা যে রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; উহা আবার কোন পদার্থ হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না। নিমিত্ত বা কার্যকারণভাব সম্বন্ধেও এইরূপ। এই দেশ-কাল-নিমিত্তের ভিতর এই একই বিশেষত্ব দেখিতেছি যে, উহারা অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। তোমরা শুদ্ধ 'দেশের' বিষয়-ভাবিতে চেষ্টা কর, যাহাতে কোন বর্ণ নাই, যাহার সীমা নাই, চারিদিকের কোন বস্তুর সহিত যাহার কোন সংস্রব নাই। তুমি উহার বিষয় চিন্তাই করিতে পারিবে না। তোমাকে দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইলে তুইটি সীমার মধ্যস্থিত অথবা তিনটি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে।. তবেই দেখা গেল, দেশের অস্তিত্ব অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে। কাল সম্বন্ধেও তদ্রূপ; শুদ্ধ কাল সম্বন্ধে তুমি কোন ধারণা করিতে পার না; কালের ধারণা করিতে হইলে তোমাকে একটি পূর্ববর্তী আর একটি পরবর্তী ঘটনা লইতে হইবে এবং কালের ধারণা দ্বারা ঐ তুইটিকে যোগ

করিতে হইবে। দেশ যেমন বাহিরের দুইটি বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে, কালও তেমনি দুইটি ঘটনার উপর নির্ভর করিতেছে। আর 'নিমিত্ত' বা 'কার্যকারণ'ভাবে ধারণা এই দেশকালের উপর নির্ভর করিতেছে। 'দেশ-কাল-নিমিত্ত' এই সবগুলিরই ভিতর বিশেষত্ব এই যে, উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই চেয়ারখানা বা ঐ দেয়ালটার যেরূপ অস্তিত্ব আছে, উহার তাহাও নাই। ইহারা যেন সকল বস্তুরই পিছনে ছায়ার মতো, তুমি কোনমতে উহাদিগকে ধরিতে পার না। উহাদের তো কোন সত্তা নাই—আবার উহারা যে কিছুই নয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ উহাদেরই ভিতর দিয়া জগতের প্রকাশ হইতেছে। অতএব আমরা প্রথমতঃ দেখিলাম, এই দেশ-কাল-নিমিত্তের সমষ্টির অস্তিত্ব নাই এবং উহারা একেবারে অসৎ বা অস্তিত্বশূন্যও নহে। দ্বিতীয়তঃ উহারা আবার এক সময়ে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রের উপর তরঙ্গ চিন্তা কর। তরঙ্গ অবশ্যই সমুদ্রের সহিত অভিন্ন, তথাপি আমরা মনে করি—ইহা তরঙ্গ এবং সমুদ্র হইতে পৃথক্। এই পৃথক্-ভাবের কারণ কি? নাম ও রূপ। নাম অর্থাৎ সেই বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের মনে যে একটি ধারণা রহিয়াছে, আর রূপ অর্থাৎ আকার। আবার তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে একেবারে পৃথক্‌রূপে কি আমরা চিন্তা করিতে পারি? কখনই না। উহা সকল সময়েই ঐ সমুদ্রের ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, তবে রূপও অন্তর্হিত হইল, কিন্তু ঐ রূপটি যে একেবারে ভ্রমাত্মক ছিল, তাহা নহে। যতদিন ঐ তরঙ্গ ছিল, ততদিন ঐ রূপটি ছিল এবং তোমাকে বাধ্য হইয়া ঐ রূপ দেখিতে হইত; ইহাই মায়া। অতএব এই সমগ্র জগৎ যেন সেই ব্রহ্মের এক বিশেষ রূপ। ব্রহ্মই সেই সমুদ্র এবং তুমি আমি সূর্য তারা সবই সেই সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গমাত্র। তরঙ্গগুলিকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করে কে? রূপ। আর ঐ রূপ—দেশ-কাল-নিমিত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ দেশ-কাল-নিমিত্ত আবার সম্পূর্ণরূপে ঐ তরঙ্গের উপর নির্ভর করিতেছে। তরঙ্গও যেই চলিয়া যায়, অমনি তাহারাও অন্তর্হিত হয়। জীবাত্মা যখনই এই মায়া পরিত্যাগ করে, তখনই তাহার পক্ষে উহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, সে মুক্ত হইয়া যায়। আমাদের সমুদয় চেষ্টাই এই দেশ-কাল-নিমিত্তের উপর নির্ভরতা হইতে নিজেকে রক্ষা করা। উহারা সর্বদাই আমাদের উন্নতির

পথে বাধা দিতেছে, আর আমরা সর্বদাই উহাদের কবল হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

পণ্ডিতেরা 'ক্রমবিকাশবাদ' কাহাকে বলেন? উহার ভিতর দুইটি ব্যাপার আছে। একটি এই যে, একটি প্রবল অন্তর্নিহিত শক্তি নিজেকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর বাহিরের অনেক ঘটনা উহাকে বাধা দিতেছে—পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি উহাকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। সুতরাং এই অবস্থাগুলির সহিত সংগ্রামের জন্য ঐ শক্তি নব নব রূপ ধারণ করিতেছে। একটি ক্ষুদ্রতম কীটাণু উন্নত হইবার চেষ্টায় আর একটি শরীর ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধাকে জয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণের পর মনুষ্যরূপে পরিণত হয়। এখন যদি এই তত্ত্বটিকে উহার স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়া যায়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন সময় আসিবে, যখন যে শক্তি কীটাণুর ভিতরে ক্রীড়া করিতেছিল এবং যাহা অবশেষে মনুষ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিবে, বাহিরের ঘটনাপুঞ্জ আর উহাকে কোন বাধা দিতে পারিবে না। এই তত্ত্বটি দার্শনিক ভাষায় প্রকাশিত হইলে এইরূপ বলিতে হইবে—প্রত্যেক কার্যের দুইটি করিয়া অংশ আছে, একটি বিষয়ী, অপরটি বিষয়। একজন আমাকে তিরস্কার করিল, আমি দুঃখ বোধ করিলাম—এ ক্ষেত্রেও এই দুইটি ব্যাপার রহিয়াছে। আমার সারাজীবনের চেষ্টা কি? না, নিজের মনকে এতদূর সবল করা, যাহাতে বাহিরের অবস্থাগুলির উপর আমি আধিপত্য করিতে পারি, অর্থাৎ লোকে আমাকে তিরস্কার করিলেও আমি কিছু কষ্ট অনুভব করিব না। এইরূপেই আমরা প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। নীতির অর্থ কি? ব্রহ্মভাবের চরম সুরে বাঁধিয়া 'নিজে'কে শক্ত সবল করা, যাহাতে সসীম প্রকৃতি আর আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে না পারে। আমাদের দর্শনের ইহাই যুক্তিগত সিদ্ধান্ত। এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা সর্বপ্রকার পরিবেশের উপর জয়লাভ করিতে পারিব, কারণ প্রকৃতি সসীম।

এই একটি কথা আবার বুঝিতে হইবে—প্রকৃতি সসীম। প্রকৃতি সসীম কি করিয়া জানিলে? দর্শনের দ্বারা উহা জানা যায়; প্রকৃতি সেই অনন্তেরই সীমাবদ্ধ ভাবমাত্র, অতএব উহা সসীম। অতএব এমন এক সময় আসিবে,

যখন আমরা বাহিরের অবস্থাগুলিকে জয় করিতে পারিব। উহাদিগকে জয় করিবার উপায় কি? আমরা বাস্তবিকপক্ষে বাহিরের বিষয়গুলির কোন পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাদিগকে জয় করিতে পারি না। ক্ষুদ্রকায় মৎস্যটি তাহার জলমধ্যস্থ শত্রু হইতে আত্মরক্ষায় ইচ্ছুক। সে কি করিয়া আত্মরক্ষা করে? আকাশে উড়িয়া—পক্ষী হইয়া। মৎস্যটি জলে বা বায়ুতে কোন পরিবতন সাধন করিল না—পরিবর্তন যাহা কিছু হইল, তাহা তাহার নিজের ভিতরে, পরিবর্তন সর্বদাই 'নিজের' ভিতরেই হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ-ব্যাপারটিতে 'নিজের' পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই প্রকৃতিকে জয় করা হইতেছে। এই তত্ত্বটি ধর্ম এবং নীতিতে প্রয়োগ কর—দেখিবে এখানেও 'অশুভজয়' নিজের ভিতরে পরিবর্তনের দ্বারাই সাধিত হইতেছে। অদ্বৈত বেদান্তের সমগ্র শক্তি মানুষের নিজের মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে। 'অশুভ, দুঃখ'—এ-সকল কথা বলাই ভুল, কারণ বহির্জগতে উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ক্রোধের কারণ পুনঃ পুনঃ ঘটিলেও ঐ-সকল ঘটনায় স্থির থাকা যদি আমার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা হইলেই আমার কখনই ক্রোধের উদ্রেক হইবে না। এইরূপে লোকে আমাকে যতই ঘৃণা করুক, যদি সে-সকল আমি গায়ে না মাখি, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি আমার ঘৃণার উদ্রেক হইবে না। এইরূপে নিজের উন্নতি সাধন করিয়া 'অশুভ' জয় করিতে হয়, অতএব তোমরা দেখিতেছ—অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই শুধু মেলে তাহা নয়, বরং ঐ-সকল সিদ্ধান্ত অপেক্ষাও উচ্চতর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে, আর এইজন্যই ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অন্তর এতখানি স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক ধর্মসমূহ তাঁহাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, উহাতে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে না। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে। মানুষের শুধু বিশ্বাস থাকিলে চলিবে না, এমন বিশ্বাস থাকা চাই, যাহাতে তাহার জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ হয়। যদি মানুষকে বলা হয়—যাহা দেখিবে, তাহাই বিশ্বাস কর, তবে শীঘ্রই তাহাকে উন্মাদাগারে যাইতে হইবে।

একবার জনৈক মহিলা আমার নিকট একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দেন—তাহাতে লেখা ছিল, সবকিছুই বিশ্বাস করা উচিত। ঐ পুস্তকে আরও লেখা

ছিল যে, মানুষের আত্মা বা ঐরূপ কিছুর অস্তিত্বই নাই। তবে স্বর্গে দেবদেবীগণ আছেন, আর একটি জ্যোতিঃসূত্র আমাদের প্রত্যেকের মস্তকের সহিত স্বর্গের সংযোগসাধন করিতেছে। গ্রন্থকর্ত্রী জানিলেন কিরূপে?—তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া এ-সকল তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন, আর তিনি আমাকেও এই-সকল বিশ্বাস করিতে বলিয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহার এ-সকল কথা বিশ্বাস করিতে অস্বীকৃত হইলাম, তিনি বলিলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই অতি দুরাচার —তোমার আর কোন আশা নাই।'

যাহা হউক, এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও 'আমার পিতৃপিতামহের ধর্মই একমাত্র সত্য, অন্য যে-কোন স্থানে যে-কোন ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই মিথ্যা'—বহু স্থানে এইরূপ ধারণা বর্তমান থাকায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের ভিতর এখনও কতকটা দুর্বলতা রহিয়াছে; এই দুর্বলতা দূর করিতে হইবে। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, এই দুর্বলতা শুধু এই দেশেই (ইংলণ্ডে) আছে—ইহা সকল দেশেই আছে; আর আমাদের দেশে যেমন, তেমন আর কোথাও নাই,—সেখানে ইহা অতি ভয়ানক আকারে বর্তমান। সেখানে অদ্বৈতবাদ কখন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে দেওয়া হয় নাই, সন্ন্যাসীরাই অরণ্যে উহার সাধনা করিতেন, সেইজন্যই বেদান্তের এক নাম হইয়াছিল 'আরণ্যক'। অবশেষে ভগবৎকৃপায় বুদ্ধদেব আসিয়া আপামর সাধারণের ভিতর উহা প্রচার করিলেন, তখন সমস্ত জাতি বৌদ্ধধর্মে জাগিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে আবার যখন নাস্তিকেরা সমগ্র জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, তখন জ্ঞানিগণ দেখিলেন—অদ্বৈতবাদই ভারতকে এই জড়বাদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। দুইবার এই অদ্বৈতবাদ ভারতকে জড়বাদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। প্রথম, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বে জড়বাদ অতি প্রবল হইয়াছিল—ইওরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এখন যে ধরনের জড়বাদ আছে, উহা সেরূপ নহে, উহা অপেক্ষা অনেক জঘন্য। আমি একপ্রকারের জড়বাদী, কারণ আমি একটি মাত্র সত্তায় বিশ্বাস করি। আধুনিক জড়বাদীও এইরূপ বিশ্বাস করিতে বলেন, তবে তিনি শুধু উহাকে 'জড়' আখ্যা দেন, আর আমি উহাকে 'ব্রহ্ম' বলি। জড়বাদী বলেন—এই জড় হইতেই মানুষের আশা ভরসা ধর্ম সবই আসিয়াছে। আমি বলি—ব্রহ্ম হইতে সমুদয়

হইয়াছে। এরূপ জড়বাদের কথা এখানে বলিতেছি না, আমি চার্বাক-মতের কথা বলিতেছি : খাও দাও, মজা কর ; ঈশ্বর আত্মা বা স্বর্গ বলিয়া কিছু নাই ; ধর্ম কতকগুলি ধূর্ত দুষ্ট পুরোহিতের কল্পনামাত্র—'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'—এইরূপ নাস্তিকতা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে এত বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, উহার এক নাম ছিল—'লোকায়ত-দর্শন'। এই অবস্থায় বুদ্ধদেব আসিয়া সাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিলেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সহস্র বৎসর পরে আবার ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিল। আচণ্ডাল বৌদ্ধ হইতে লাগিল। নানাপ্রকার মানুষ ও জাতি বৌদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকে অতি নীচজাতি হইলেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বেশ সদাচারপরায়ণ হইল। ইহাদের কিন্তু নানাপ্রকার কুসংস্কার ছিল—নানা মন্ত্রতন্ত্রে, ভূত ও দেবতায় বিশ্বাস ছিল। বৌদ্ধধর্মপ্রভাবে ঐগুলি দিনকতক চাপা থাকিল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম নানাপ্রকার বিষয়ের খিচুড়ি হইয়া দাঁড়াইল। তখন আবার জড়বাদের মেঘে ভারতগগন আচ্ছন্ন হইল—সম্ভ্রান্ত লোক যথেচ্ছাচারী ও সাধারণ লোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইল। এমন সময়ে শঙ্করাচার্য আসিয়া বেদান্তকে পুনরুদ্দীপিত করিলেন। তিনি উহাকে একটি যুক্তিসঙ্গত বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে প্রচার করিলেন। উপনিষদে বিচারভাগ বড় অস্ফুট। বুদ্ধদেব উপনিষদের নীতিভাগের দিকে খুব ঝোঁক দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য উহার জ্ঞানভাগের দিকে বেশী ঝোঁক দিলেন। উহা দ্বারা উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিবিচারের সাহায্যে প্রমাণিত ও প্রণালীবদ্ধরূপে লোকের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে।

ইওরোপেও আজকাল ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত। এই অবিশ্বাসীদের মুক্তির জন্য—তাহারা যাহাতে বিশ্বাস করে সেজন্য—তোমরা জগৎ জুড়িয়া প্রার্থনা করিতে পারো, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবে না ; তাহারা যুক্তি চায়। সুতরাং ইওরোপের মুক্তি এখন এই যুক্তিমূলক ধর্ম—অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে ; আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদই, ব্রহ্মের এই নির্গুণ ভাবই পণ্ডিতদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। যখনই ধর্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ইহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জন্যই ইওরোপ ও আমেরিকায় ইহা প্রবেশ করিয়া দৃঢ়মূল হইতেছে।

এই দর্শন সম্পর্কে আর একটি কথা বলিব। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি অতি উচ্চ স্তরের কবিত্বে পূর্ণ। এই-সকল উপনিষদ্‌বক্তা ঋষিগণ মহাকবি ছিলেন। প্লেটো বলিয়াছেন—কবিত্বের ভিতর দিয়া জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। কবিত্বের মধ্য দিয়া উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে দিবার জন্য বিধাতা যেন উপনিষদের ঋষিগণকে সাধারণ মানব হইতে বহু ঊর্ধ্বে কবিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রচার করিতেন না, দার্শনিক বিচার করিতেন না বা লিখিতেনও না। তাঁহাদের হৃদয় হইতে সঙ্গীতের উৎস প্রবাহিত হইত। বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে যুক্তির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এখন চাই এই প্রখর জ্ঞানের সহিত বুদ্ধদেবের এই হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা যুক্তিমূলক হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, গভীর প্রেম ও করুণার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চনযোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করিবে। ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে, আর যদি আমরা উহা ঠিক ঠিক গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, উহা সর্বকাল ও সর্বাবস্থার উপযোগী হইবে। যদি আপনারা বাড়ি গিয়া স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন সকল বিজ্ঞানেরই কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। তাহা হইলেও নিশ্চয় জানিবেন, আধুনিক বিজ্ঞানকে এই পথেই আসিতে হইবে—এখনই প্রায় এই পথে আসিয়া পড়িয়াছে। যখন কোন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাচার্য বলেন, সবই সেই এক শক্তির বিকাশ, তখন কি আপনাদের মনে হয় না যে, তিনি সেই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মেরই মহিম. কীর্তন করিতেছেন?—

'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥'[১]

—যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, তদ্রূপ সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক ব্রহ্ম নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, আবার

১ কঠ উপ., ২।২।৯

তিনি জগতের বাহিরেও আছেন। বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে, তাহা কি আপনারা বুঝিতেছেন না? হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইওরোপীয় জাতি বাহ্য প্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এখন উভয়ে এক স্থানে পৌঁছিতেছেন। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সেই এক অনন্ত সার্বভৌম সত্তায় পৌঁছিতেছি—যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মা, যিনি সকলের সার ও সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ, যিনি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দময় ও নিত্যসত্তাস্বরূপ। জড়-বিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা সেই একই তত্ত্বে পৌঁছিতেছি। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই একেরই বিকাশ—তিনি জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সকলেরই সমষ্টিস্বরূপ। আর সমগ্র মানবজাতিই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের গতি কখনই বন্ধনের দিকে হইতে পারে না। মানুষ নীতিপরায়ণ হইবে কেন? কারণ নীতিই মুক্তির, এবং দুর্নীতিই বন্ধনের পথ।

অদ্বৈতবাদের আর একটি বিশেষত্ব এই, অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সূত্রপাত হইতেই উহা অন্য ধর্ম বা অন্য মতকে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে না। ইহা অদ্বৈতবাদের আর একটি মহত্ত্ব—ইহা প্রচার করা মহা সাহসের কার্য যে,

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥'[১]

—জ্ঞানীরা অজ্ঞ ও কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না, বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজে যুক্ত থাকিয়া তাহাদিগকে সকলপ্রকার কর্মে যুক্ত করিবেন।

অদ্বৈতবাদ ইহাই বলে—কাহারও মতি বিচলিত করিও না, কিন্তু সকলকেই উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতে সাহায্য কর। অদ্বৈতবাদ যে-ঈশ্বর প্রচার করেন, সেই ঈশ্বর জগতের সমষ্টিস্বরূপ; এই মত যদি সত্য হয়, তবে উহা অবশ্যই সকল মতকে গ্রহণ করিবে। যদি এমন কোন সর্বজনীন ধর্ম থাকে, যাহার লক্ষ্য সকলকেই গ্রহণ করা, তাহা হইলে তাহাকে কেবল কতকগুলি লোকের গ্রহণোপযোগী ঈশ্বরের ভাব প্রচার করিলে চলিবে না, উহা সর্বভাবের সমষ্টি হওয়া আবশ্যক।

---

১ গীতা, ৩।২৬

অন্য কোন মতে এই সমষ্টির ভাব তত পরিস্ফুট নহে। তাহা হইলেও তাঁহারা সকলেই সেই সমষ্টিকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। খণ্ডের অস্তিত্ব কেবল এইজন্য যে, উহা সর্বদাই সমষ্টি হইবার চেষ্টা করিতেছে। এইজন্যই অদ্বৈতবাদের সহিত ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রথম হইতেই কোন বিরোধ ছিল না। ভারতে আজকাল অনেক দ্বৈতবাদী রহিয়াছেন; তাঁহাদের সংখ্যা সর্বাধিক। কারণ দ্বৈতবাদ কম-শিক্ষিত লোকের মন স্বভাবতই আকর্ষণ করে। দ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, দ্বৈতবাদ জগতের খুব স্বাভাবিক সুবিধাজনক ব্যাখ্যা, কিন্তু এই দ্বৈতবাদের সঙ্গে অদ্বৈতবাদীর কোন বিরোধ নাই। দ্বৈতবাদী বলেন: ঈশ্বর জগতের বাহিরে স্বর্গে—স্থানবিশেষে আছেন। অদ্বৈতবাদী বলেন: ঈশ্বর জগতের আত্মার অন্তরাত্মা; ঈশ্বরকে দূরবর্তী বলাই যে নাস্তিকতা। তাঁহাকে স্বর্গে বা অপর কোন দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বলো কি করিয়া? ঈশ্বর হইতে মানুষ পৃথক্—ইহা মনে করাও যে ভয়ানক। তিনি অন্যান্য সকল বস্তু অপেক্ষা আমাদের অধিকতর সন্নিহিত। 'তুমিই তিনি'—এই একত্বসূচক বাক্য ব্যতীত কোন ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই, যাহা দ্বারা এই নিকটত্ব প্রকাশ করা যাইতে পারে। যেমন দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পান, মনে করেন—উহা ঈশ্বর নিন্দা, অদ্বৈতবাদীও তেমনি দ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পান ও বলেন,—'মানুষ কি করিয়া তাঁহাকে জ্ঞেয় বস্তুর ন্যায় ভাবিতে সাহস করে?' তাহা হইলেও তিনি জানেন ধর্মজগতে দ্বৈতবাদের স্থান কোথায়—তিনি জানেন দ্বৈতবাদী তাঁহার দৃষ্টিকোণ হইতে ঠিকই দেখিতেছেন, সুতরাং তাঁহার সহিত কোন বিবাদ নাই। যখন তিনি সমষ্টিভাবে না দেখিয়া ব্যষ্টিভাবে দেখিতেছেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই বহু দেখিতে হইবে। ব্যষ্টিভাবের দিক হইতে দেখিতে গেলে, তাঁহাকে অবশ্যই ভগবানকে বাহিরে দেখিতে হইবে—এরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইতে পারে না। দ্বৈতবাদী বলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মতে থাকিতে দাও। তাহা হইলেও অদ্বৈতবাদী জানেন, দ্বৈতবাদীদের মতে অসম্পূর্ণতা যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহারা সকলে সেই এক চরম লক্ষ্যে চলিয়াছেন। এইখানেই দ্বৈতবাদীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভেদ। পৃথিবীর সকল দ্বৈতবাদী স্বভাবতই এমন এক সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি একজন উচ্চশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যমাত্র, এবং যেমন মানুষের কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে আবার কতকগুলি অপ্রিয় ব্যক্তি থাকে,

দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরেরও তেমনি আছে। তিনি বিনা কারণেই কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট, আবার কাহারও প্রতি বিরক্ত। আপনারা দেখিবেন—সকল জাতির মধ্যেই এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলেন, 'আমরাই ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র, আর কেহ নহেন; যদি অনুতপ্তহৃদয়ে আমাদের শরণাগত হও, তবেই আমাদের ঈশ্বর তোমাকে কৃপা করিবেন।' আবার কতকগুলি দ্বৈতবাদী আছেন, তাঁহাদের মত আরও ভয়ানক। তাঁহারা বলেন, 'ঈশ্বর যাহাদের প্রতি সদয়, যাহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ, তাহারা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট—আর কেহ যদি মাথা কুটিয়া মরে, তথাপি ঐ অন্তরঙ্গ-দলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।' আপনারা দ্বৈতবাদাত্মক এমন কোন ধর্ম দেখান, যাহার ভিতর এই সঙ্কীর্ণতা নাই। এজন্যই এই-সকল ধর্ম চিরকাল পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছে এবং করিবে। আবার এই দ্বৈতবাদের ধর্ম সকল সময়েই লোকপ্রিয় হয়, কারণ ইহা অশিক্ষিতদের মন বেশী আকর্ষণ করে। দ্বৈতবাদী ভাবেন, একজন দণ্ডধারী ঈশ্বর না থাকিলে কোন প্রকার নীতিই দাঁড়াইতে পারে না। মনে কর, একটা ছেক্‌ড়া গাড়ির ঘোড়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল। সে বলিবে লণ্ডনের লোকগুলি বড খারাপ, কারণ প্রত্যহ তাহাদিগকে চাবুক মারা হয় না। সে নিজে চাবুক খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সে ইহা অপেক্ষা আর বেশী কি বুঝিবে? চাবুক কিন্তু লোককে আরও খারাপ করিয়া তোলে। গভীর চিন্তায় অক্ষম সাধারণ লোক সকলদেশেই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে। গরীব বেচারারা চিরকাল নির্যাতিত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং তাহাদের মুক্তির ধারণা শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া। অপরপক্ষে আমরা ইহাও জানি, সকল দেশের চিন্তাশীল মহাপুরুষগণই এই নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব লইয়া কাজ করিয়াছেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই ঈশা বলিয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক।' এইরূপ ব্যক্তিই লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ভিতরে শক্তি-সঞ্চার করিতে সমর্থ। এই শক্তি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবের প্রাণে শুভ মুক্তিপ্রদ শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। আমরা ইহাও জানি, সেই মহাপুরুষ অদ্বৈতবাদী বলিয়া অপরের প্রতি দয়াশীল ছিলেন। তিনি সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন, 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা'। সাধারণ লোকদিগকে, যাহারা সগুণ ঈশ্বর অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর ভাব ধারণা করিতে পারে না, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে শিখাইলেন;

কিন্তু ইহাও বলিলেন: যখন সময় আসিবে তখন তোমরা জানিবে—'আমি তোমাদের মধ্যে, তোমরা আমাতে'। কিন্তু তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে আরও খোলাখুলিভাবে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা সকলেই সেই পিতার সহিত একীভূত হইতে পারো, যেমন আমি ও আমার পিতা অভেদ।'

বুদ্ধদেব দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতি ব্যাপারে মন দিতেন না। সাধারণ লোক তাঁহাকে নাস্তিক ও জড়বাদী আখ্যা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি একটি সামান্য ছাগ-শিশুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। মনুষ্যজাতির পক্ষে সর্বোচ্চ যে নীতি গ্রহণীয় হইতে পারে, বুদ্ধদেব তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। যেখানেই কোনপ্রকার নীতির বিধান দেখিবে, সেখানেই তাঁহার প্রভাব, তাঁহার আলোক লক্ষ্য করিবে। জগতের এই-সকল উচ্চহৃদয় ব্যক্তিকে তুমি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না, বিশেষতঃ এখন মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এমন এক সময় আসিয়াছে, যাহা শতবর্ষ পূর্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই; এখন এমন জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, এমন সব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, যাহা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। এ-সময় কি আর লোককে ঐ-ধরনের সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়। লোকে পশুর মতো চিন্তাশক্তিহীন জড়পদার্থে পরিণত না হইলে ইহা অসম্ভব। এখন প্রয়োজন—উচ্চতম জ্ঞানের সহিত মহত্তম হৃদয়, অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের সংযোগ। সুতরাং বেদান্তবাদী বলেন, সেই অনন্ত সত্তার সঙ্গে এক হওয়াই একমাত্র ধর্ম; আর তিনি ভগবানের এই তিনটি গুণের কথাই বলেন—অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ; আর বলেন, এই তিনই এক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা কখন থাকিতে পারে না। আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত জ্ঞান এবং জ্ঞান ব্যতীত আনন্দ বা প্রেম থাকিতে পারে না। আমরা চাই এই সম্মিলন—এই অনন্ত সত্তা জ্ঞান ও আনন্দের চরম উন্নতি—একদেশী উন্নতি নহে। আমরা চাই—সকল বিষয়ের সমভাবে উন্নতি। শঙ্করের মেধার সহিত বুদ্ধের হৃদয় লাভ করা সম্ভব। আশা করি, আমরা সকলেই সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

জগৎ

বহির্জগৎ

[নিউইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা ১৯শে জানুআরি, ১৮৯৬]

সুন্দর কুসুমরাশি চতুর্দিকে সুবাস ছড়াইতেছে, প্রভাতের সূর্য অতি সুন্দর লোহিতবর্ণ ধরিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি নানা বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হইয়া পরম রমণীয় হইয়াছে। সমগ্র জগৎই সুন্দর, আর মানুষ পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এই সৌন্দর্য সম্ভোগ করিতেছে। গম্ভীরভাবব্যঞ্জক ও ভয়োদ্দীপক শৈলমালা, খরস্রোতা সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বিনী, পদচিহ্নহীন মরুদেশ, অনন্ত অসীম সাগর, তারকামণ্ডিত গগন—এ-সকলই গম্ভীরভাবপূর্ণ ও ভয়োদ্দীপক, অথচ মনোহর; প্রকৃতি-নামক সমুদয় সত্তা স্মরণাতীত কাল হইতে মানবমনের উপর কাজ করিতেছে, মানবচিন্তার উপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আর ঐ প্রভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ক্রমাগত মানবহৃদয়ে এই প্রশ্ন উঠিতেছে—এগুলি কি? এবং ঐগুলির উৎপত্তিই বা কোথায়? মানবের অতি প্রাচীন রচনা বেদের প্রাচীনতম ভাগেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে দেখিতে পাই। কোথা হইতে ইহা আসিল? যখন 'অস্তি, নাস্তি' কিছুই ছিল না, 'অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত'[১] ছিল, তখন কে এই জগৎ সৃষ্টি করিল? কেমন করিয়াই বা করিল? কে এই রহস্য জানে? বর্তমান সময় পর্যন্ত এই প্রশ্ন চলিয়া আসিয়াছে; লক্ষ লক্ষ বার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা হইয়াছে, আরও লক্ষ লক্ষ বার উহার উত্তর দিতে হইবে। ঐ প্রত্যেক উত্তরই যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা নহে। প্রত্যেক উত্তরে কিছু না কিছু সত্য আছে—কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সত্যও ক্রমশঃ বল সংগ্রহ করিতেছে। আমি ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণের নিকট ঐ প্রশ্নের যে উত্তর সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা বর্তমান কালের জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আপনাদের সমক্ষে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা দেখিতে পাই, এই প্রাচীনতম প্রশ্নের কতকগুলি বিষয় পূর্বেই মীমাংসিত হইয়াছে। প্রথম বিষয় এই: এমন এক সময় ছিল, 'যখন অস্তি-

১ ঋগ্বেদ—নাসদীয় সূক্ত

নাস্তি কিছুই ছিল না, জগৎ ছিল না, এই গ্রহ-জ্যোতিষ্কগণ, সাগর মহাসাগর, নদী শৈলমালা, নগর গ্রাম, মনুষ্য ইতরপ্রাণী উদ্ভিদ, বিহঙ্গসহ আমাদের জননী বসুন্ধরা, এই অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি ছিল না—এ বিষয় পূর্ব হইতেই জানা ছিল। আমরা কি এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ? কি করিয়া মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানুষ নিজের চতুর্দিকে কি দেখে? একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লও। মানুষ দেখে, উদ্ভিদটি ধীরে ধীরে মাটি ঠেলিয়া উঠিতেছে, বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে হয়তো একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, আবার মরিয়া যায়—রাখিয়া যায় কেবল বীজ। উহা যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করে। বীজ হইতে উহা আসে, বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, অবশেষে বীজে উহার পুনঃপরিণতি। একটি পাখিকে দেখ, কেমন উহা ডিম হইতে জন্মায়, সুন্দর পাখির রূপ ধরে, কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে, পরে আবার মরিয়া যায়, রাখিয়া যায় কেবল কতকগুলি ডিম, ভবিষ্যৎ পক্ষিকুলের বীজ। তির্যগ্‌জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ, মানুষ সম্বন্ধেও তাহাই। প্রত্যেক পদার্থেরই যেন কতকগুলি বীজ—কতকগুলি মূল উপাদান—কতকগুলি সূক্ষ্ম আকার হইতে আরম্ভ, এগুলি স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে, কিছুকালের জন্য ঐরূপে চলে, পুনরায় সূক্ষ্মরূপে চলিয়া গিয়া উহাদের লয় হয়। বৃষ্টির ফোঁটাটি, যাহার মধ্যে সুন্দর সূর্যকিরণ খেলা করিতেছে, বাতাসে অনেক দূরে চলিয়া গিয়া পাহাড়ে পৌঁছায়, সেখানে বরফে পরিণত হয়, আবার জল হয়, আবার শত শত মাইল ঘুরিয়া উহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রে মিলিত হয়। আমাদের চারিদিকের প্রকৃতির সকল বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ; আর আমরা জানি বর্তমানকালে হিমশিলা ও নদীগুলি বড় বড় পর্বতের উপর কাজ করিতেছে, ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে পর্বতগুলি চূর্ণ করিতেছে, গুঁড়াইয়া বালি করিতেছে, সেই বালি আবার সমুদ্রে বহিয়া চলিতেছে—সমুদ্রতলে স্তরে স্তরে জমিতেছে, পরিশেষে আবার পাহাড়ের মতো শক্ত হইতেছে, স্তূপীকৃত হইয়া ভবিষ্যতে পর্বত হইবে। আবার উহা পিষ্ট হইয়া গুঁড়া হইবে—এইরূপ চলিবে। বালুকা হইতে এই শৈলমালার উদ্ভব, আবার বালুকায় পরিণতি। বড় বড় জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধেও এই কথা; আমাদের এই পৃথিবীও নীহারিকাময় পদার্থ হইতে আসিয়াছে—ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইয়া বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট আমাদের নিবাস-ভূমি হইয়াছে।

ভবিষ্যতে উহা আবার শীতল হইতে শীতলতর হইয়া নষ্ট হইবে, খণ্ড খণ্ড হইবে, শেষে সেই মূল নীহারিকাময় সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইবে। প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে ইহা ঘটিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতেই ইহা হইতেছে। ইহাই মানুষের ইতিহাস, ইহাই প্রকৃতির সমগ্র ইতিহাস, ইহাই জীবনের সমগ্র ইতিহাস।

যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি সর্বত্রই একরূপ ; যদি ইহা সত্য হয় এ পর্যন্ত কোন মনুষ্যজ্ঞানই ইহা খণ্ডন করে নাই—যে, একটি ক্ষুদ্র বালুকণা যে-প্রণালী ও যে-নিয়মে সৃষ্ট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য তারা এমন কি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডও সেই একই প্রণালীতে—একই নিয়মে সৃষ্ট ; ইহা যদি সত্য হয় যে, একটি পরমাণু যে কৌশলে নির্মিত, সমুদয় জগৎও সেই কৌশলে নির্মিত ; যদি ইহা সত্য হয় যে, একই নিয়ম সমুদয় জগতে প্রতিষ্ঠিত, তবে প্রাচীন বৈদিক ভাষায় আমরা বলিতে পারি—'একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিয়া আমরা জগতের সমস্ত মৃত্তিকাকে জানিতে পারি।'[১] একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লইয়া উহার জীবন-চরিত আলোচনা করিলে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ জানিতে পারি। একটি বালুকণার গতি পর্যবেক্ষণ করিলে সমুদয় জগতের রহস্য জানিতে পারা যাইবে। সুতরাং আমাদের পূর্ব আলোচনার ফল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উপর প্রয়োগ করিয়া প্রথমতঃ ইহাই পাইতেছি যে, আদি ও অন্ত প্রায় সদৃশ। পর্বতের উৎপত্তি বালুকা হইতে, বালুকায় আবার উহার পরিণতি ; নদী বাষ্প হইতে আসে, আবার বাষ্পে যায় ; উদ্ভিদ্জীবন আসে বীজ হইতে, আবার বীজেই যায় ; মনুষ্যজীবন আসে জীবাণু হইতে, আবার জীবাণুতেই ফিরিয়া যায়। নক্ষত্রপুঞ্জ, নদী, গ্রহ-উপগ্রহ নীহারিকাময় অবস্থা হইতে আসিয়াছে, আবার সেই নীহারিকায় লয় পায়। ইহা হইতেই আমরা শিখি কি ? শিখি এই যে, ব্যক্ত অর্থাৎ স্থূল অবস্থা—কার্য ; আর সূক্ষ্মভাব—উহার কারণ। সর্ব দর্শনের জনকস্বরূপ মহর্ষি কপিল অনেক দিন পূর্বে প্রমাণ করিয়াছেন, 'নাশঃ কারণলয়ঃ'।

যদি এই টেবিলটির নাশ হয় তো উহা কেবল উহার কারণরূপে ফিরিয়া যায় মাত্র—সেই সূক্ষ্মরূপও পরমাণুতে ফিরিয়া যাইবে, যাহাদের সম্মিলনে

১ ছান্দোগ্য উপ., ৬।১।৪

এই টেবিল নামক পদার্থটি উৎপন্ন হইয়াছিল। মানুষ যখন মরে, তখন যে-সকল পদার্থে তাহার দেহ নির্মিত, সেইগুলিতেই ফিরিয়া যায়। এই পৃথিবীর ধ্বংস হইলে যে পদার্থ-সমষ্টি ইহাকে এই আকার দিয়াছিল, তাহাতে ফিরিয়া যাইবে। ইহাকেই বলে নাশ—কারণে লয়। সুতরাং আমরা শিখিলাম, কার্য কারণের সহিত অভেদ—ভিন্ন নহে, কারণটিই রূপ-বিশেষ ধারণ করিয়া কার্য নামে পরিচিত হয়। যে উপাদানগুলিতে ঐ টেবিলের উৎপত্তি, তাহাই কারণ; আর টেবিলটি কার্য, এবং ঐ কারণগুলি এখানে টেবিলরূপে বর্তমান। এই গেলাসটি একটি কার্য—উহার কতকগুলি কারণ ছিল, সেই কারণগুলি এই কার্যে এখনও বর্তমান দেখিতেছি। কাচ নামক কতকটা জিনিস আর সেই সঙ্গে গঠনকারীর হাতের শক্তি নিমিত্ত ও উপাদান এই দুইটি কারণ মিলিয়া গেলাস-নামক এই আকারটি হইয়াছে। ঐ দুই কারণই উহাতে বর্তমান। যে শক্তিটি কোন যন্ত্রের চাকায় ছিল তাহা সংহতিশক্তিরূপে ইহাতে রহিয়াছে, তাহা না থাকিলে গেলাসের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলির সব খসিয়া পড়িবে এবং উহার উপাদান কাচও ইহাতে বর্তমান। গেলাসটি কেবল ঐ সূক্ষ্ম কারণগুলির আর একরূপে পরিণতি এবং যদি এই গেলাসটি ভাঙিয়া ফেলা হয়, তবে যে শক্তিটি সংহতিরূপে উহাতে বর্তমান ছিল, তাহা ফিরিয়া নিজ উপাদানে মিশিবে, আর গেলাসের ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি আবার পূর্বরূপ ধরিবে এবং সেইরূপেই থাকিবে, যতদিন না পুনরায় নূতন আকার লাভ করে।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম, কার্য কখন কারণ হইতে ভিন্ন নয়; উহা সেই কারণের পুনরাবির্ভাব মাত্র। তাহার পর আমরা শিখিলাম এই ক্ষুদ্র বিশেষ বিশেষ রূপ বা আকৃতি—যেগুলিকে আমরা উদ্ভিদ তির্যগ্‌জাতি বা মানব বলি, সেগুলি অনন্তকাল ধরিয়া উঠিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ আবার বীজ হয়, আবার উহা আর এক বৃক্ষ হয়—আবার অন্য বীজ হয়, আবার আর এক বৃক্ষ হয়—এইরূপ চলিতেছে, ইহার শেষ নাই। জলবিন্দু পাহাড়ের গা বাহিয়া সমুদ্রে যায়, আবার বাষ্প হইয়া উঠে—পাহাড়ে যায়, আবার সমুদ্রে ফিরিয়া আসে। উঠিতেছে, পড়িতেছে—চক্র ঘুরিতেছে। সমুদয় জীবন সম্বন্ধেই এইরূপ—সমুদয় অস্তিত্ব, যাহা কিছু দেখিতে শুনিতে ভাবিতে বা কল্পনা করিতে পারি,

যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে তাহাই এই ভাবে চলিতেছে ঠিক্ মনুষ্যদেহে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। সমুদয় সৃষ্টিই এইরূপে চলিয়াছে, একটি তরঙ্গ উঠিতেছে, একটি পড়িতেছে, আবার উঠিয়া আবার পড়িতেছে। প্রত্যেক তরঙ্গেরই সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া গহ্বর, প্রত্যেক গহ্বরের সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া তরঙ্গ। সর্বত্র একরূপ বলিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেই বিভিন্ন অংশের মধ্যে সঙ্গতি থাকার দরুন একই নিয়ম খাটিবে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই যেন এককালে কারণে লীন হইতে বাধ্য; সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা পৃথিবী মন শরীর—যাহা কিছু এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে, সকল বস্তুই যেন নিজ সূক্ষ্ম কারণে লীন বা অন্তর্হিত হইবে—আপাতদৃষ্টিতে বিনষ্ট হইবে। বাস্তবিক কিন্তু উহারা সূক্ষ্মরূপে উহাদের কারণে থাকিবে; এইসব সূক্ষ্মরূপ হইতে আবার তাহারা পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারা রূপে বাহির হইবে।

এই উত্থান-পতন সম্বন্ধে আর একটি বিষয় জানিবার আছে। বৃক্ষ হইতে বীজ আসে। বীজ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হয় না। উহার কতকটা বিশ্রামের বা অতি সূক্ষ্ম অব্যক্ত কার্যের জন্য সময়ের প্রয়োজন। বীজকে খানিকক্ষণ মাটির নীচে থাকিয়া কার্য করিতে হয়। বীজ নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, নিজেকে যেন খানিকটা অধঃপতিত করে, এবং ঐ অবনতি হইতে উহার পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই কিছু সময় অদৃশ্য ও অব্যক্তভাবে সূক্ষ্মরূপে কার্য করিতে হয়, যাহাকে প্রলয় বা সৃষ্টির পূর্বাবস্থা বলে, তাহার পর আবার সৃষ্টি হয়। জগৎপ্রবাহের একটি প্রকাশকে অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাবে ইহার পরিণতি, কিছুকাল সেই অবস্থায় স্থিতি এবং পুনরাবির্ভাবকে সংস্কৃতে 'কল্প' বলে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই এইরূপে কল্পে কল্পে চলিয়াছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড হইতে উহার অন্তর্বর্তী প্রত্যেক পরমাণু পর্যন্ত সব জিনিসই এই তরঙ্গাকারে চলিয়াছে।

এখন আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসিল—বিশেষতঃ বর্তমান কালের পক্ষে। আমরা দেখিতেছি সূক্ষ্মতর রূপগুলি ধীরে ধীরে ব্যক্ত হইতেছে, ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে, কারণ ও কার্য অভেদ—কার্য কারণের রূপান্তর মাত্র। অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কিছুই আসিতে পারে না; শুধু তাহা নহে, কারণই কার্যের ভিতর আর একরূপে বর্তমান। তবে

এই ব্রহ্মাণ্ড কোন্ বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে? পূর্ববর্তী সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড হইতে। মানুষ কোন্ বস্তু হইতে উদ্ভূত? পূর্ববর্তী সূক্ষ্মরূপ হইতে। বৃক্ষ কোথা হইতে হইল? বীজ হইতে। সমুদয় বৃক্ষটি বীজে বর্তমান ছিল—উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এই জগতেরই সূক্ষ্মাবস্থা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। এখন উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। উহা পুনরায় ঐ সূক্ষ্মরূপে যাইবে, আবার ব্যক্ত হইবে। এখন আমরা দেখিলাম, সূক্ষ্মরূপগুলি ব্যক্ত হইয়া স্থূল হইতে স্থূলতর হয়, যতদিন না উহারা উহাদের চরম সীমায় পৌঁছে; চরমে পৌঁছিলে তাহারা আবার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়। এই সূক্ষ্ম হইতে আবির্ভাব, ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতররূপে পরিণতি কেবল যেন উহাদের অংশগুলির অবস্থান-পরিবর্তন—ইহাকেই বর্তমানকালে 'ক্রমবিকাশ'-বাদ বলে। ইহা অতি সত্য, সম্পূর্ণরূপে সত্য; আমরা আমাদের জীবনে ইহা দেখিতেছি; বিচারশক্তিসম্পন্ন কোন মানুষই সম্ভবতঃ এই 'ক্রমবিকাশ'-বাদীদের সহিত বিবাদ করিবেন না। কিন্তু আমাদিগকে আরও একটি বিষয় জানিতে হইবে—তাহা এই যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বর্তমান। বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার ঐ বীজের জনক। বীজই সেই সূক্ষ্মরূপ, যাহা হইতে বৃহৎ বৃক্ষটি আসিয়াছে, আবার আর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঐ বীজরূপে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছে। সমুদয় বৃক্ষটিই ঐ বীজে বর্তমান। শূন্য হইতে কোন বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, কিন্তু আমরা দেখিতেছি বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, আর বীজবিশেষ হইতে বৃক্ষবিশেষই উৎপন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ হয় না। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই বৃক্ষের কারণ ঐ বীজ—কেবল ঐ বীজমাত্র; আর সেই বীজে সমুদয় বৃক্ষটিই রহিয়াছে। সমুদয় মানুষটাই একটি জীবাণুর ভিতরে, ঐ জীবাণুই আবার ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া মানবাকারে পরিণত হয়। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই—সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডে ছিল। সবই কারণে—উহার সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে। অতএব 'ক্রমবিকাশ'-বাদ সত্য। তবে ঐ সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া রহিয়াছে; অতএব যে ক্ষুদ্র অণুটি পরে মহাপুরুষ হইল, উহা প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপুরুষেরই ক্রমসঙ্কুচিত ভাব, উহাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকশিত হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে ক্রমবিকাশবাদীদের (Darwin's Evolution) সহিত

আমাদের কোন বিবাদ নাই, কারণ আমরা ক্রমশঃ দেখিব, যদি তাঁহারা এই ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়াটি স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ধর্মের বিনাশক না হইয়া সহায়ক হইবেন।

আমরা দেখিলাম শূন্য হইতে কিছুর উৎপত্তি হয় না। সকল জিনিসই অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। কেবল তরঙ্গের ন্যায় একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে একবার লয়, আবার স্থূল ব্যক্তভাবে প্রকাশ, সমুদয় প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া চলিতেছে। সুতরাং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের পূর্বে অবশ্যই ক্রমসঙ্কুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, এখন বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—আবার ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্তভাব ধারণ করিবে। উদাহরণস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জীবন ধর। আমরা দেখি দুইটি বিষয় একত্র মিলিত হইয়াই ঐ উদ্ভিদ্‌কে এক অখণ্ড বস্তুরূপে প্রতীত করাইতেছে—উহার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং উহার ক্ষয় ও বিনাশ। এই দুইটি মিলিয়াই উদ্ভিদ্-জীবন নামক এই একত্ব বিধান করিতেছে। এইরূপে ঐ উদ্ভিদ্-জীবনকে প্রাণ-শৃঙ্খলের একটি পর্ব বলিয়া ধরিয়া আমরা সমুদয় বস্তুরাশিকেই এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া কল্পনা করিতে পারি—জীবাণু হইতে উহার আরম্ভ এবং পূর্ণমানবে উহার সমাপ্তি। মানুষ ঐ শৃঙ্খলের একটি পর্ব; আর যেমন ক্রমবিকাশবাদীরা বলেন—নানারূপ বানর, তার পর আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌গণ যেন ঐ প্রাণ-শৃঙ্খলের অন্যান্য পর্ব। এখন যে ক্ষুদ্রতম কোষ হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেখান হইতে এই সমুদয়কে এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া ধর, আর প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই যে ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বিদ্যমান, ইতঃপূর্বে লব্ধ ঐ নিয়ম এস্থলে প্রয়োগ করিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, অতি নিম্নতম জন্তু হইতে সর্বোচ্চ পূর্ণতম মানুষ পর্যন্ত সকল শ্রেণীই অবশ্য অপর কিছুর ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। কিসের ক্রমসঙ্কোচ? ইহাই প্রশ্ন। কোন্ পদার্থ ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিল? ক্রমবিকাশবাদী বলিবেন: ইহা যে ঈশ্বরের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা—তোমাদের এ ধারণা ভুল। কারণ তোমরা বলো, চৈতন্যই জগতের স্রষ্টা, কিন্তু আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি যে, চৈতন্য অনেক পরে আসে। মানুষে ও উচ্চতর জন্তুতেই কেবল আমরা চৈতন্য দেখিতে পাই, কিন্তু এই চৈতন্য জন্মিবার পূর্বে এই জগতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই ক্রমবিকাশবাদীদের আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা এই মাত্র যে নিয়ম আবিষ্কার করিলাম, তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখা যাক—কি সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়। বীজ হইতে বৃক্ষের উদ্ভব আবার বীজে উহার পরিণাম—সুতরাং আরম্ভ ও পরিণাম একই। পৃথিবীর উৎপত্তি তাহার কারণ হইতে, আবার কারণেই উহার বিলয়। সকল বস্তু সম্বন্ধেই এই কথা—আমরা দেখিতেছি, আদি অন্ত উভয়ই সমান। এই সমুদয় শৃঙ্খলের শেষ কি? আমরা জানি, আরম্ভ জানিতে পারিলে পরিণামও জানিতে পারিব। এইরূপে অন্ত জানিতে পারিলেই আদি জানিতে পারিব। এই সমুদয় 'ক্রমবিকাশশীল' জীব-প্রবাহের—যাহার এক প্রান্ত জীবাণু, অপর প্রান্ত পূর্ণমানব—এই-সবকে একটি জীবন বলিয়া ধর। এই শ্রেণীর অন্তে আমরা পূর্ণ মানবকে দেখিতেছি, সুতরাং আদিতেও যে তিনি অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব ঐ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা স্পষ্টরূপে না দেখিতে পারো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসঙ্কুচিত চৈতন্যই নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইরূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন না উহা পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই তত্ত্ব গণিতের দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে। 'শক্তির নিত্যতা' নিয়ম (Law of Conservation of Energy) যদি সত্য হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি তুমি কোন যন্ত্রে পূর্ব হইতেই কোন শক্তি-প্রয়োগ না করিয়া থাকো, তবে তুমি উহা হইতে কোন কার্যই পাইতে পার না। তুমি ইঞ্জিনে জল ও কয়লারূপে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ কর, উহা হইতে ঠিক ততটুকু কার্য পাইয়া থাকো, এতটুকু বেশী নয়, কমও নয়। আমি আমার দেহের ভিতরে বায়ু খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থরূপে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিয়াছি, ঠিক ততটুকু কার্য করিতে সমর্থ হই। কেবল ঐ শক্তিগুলি অন্যরূপে পরিণত হইয়াছে মাত্র। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একবিন্দু জড় বা এতটুকুও শক্তি বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারা যায় না। যদি তাই হয়, তবে এই চৈতন্য কি? যদি উহা জীবাণুতে বর্তমান না থাকে, তবে উহাকে অবশ্যই অকস্মাৎ উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, 'অসৎ' (কিছু না) হইতে 'সতে'র (কিছুর) উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাহা হইলে ইহা একেবারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে—যেমন অন্য অন্য বিষয়ে দেখা যায়, যেখানে আরম্ভ

সেইখানেই শেষ ; তবে কখন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত ; সেইরূপ পূর্ণমানব, মুক্তপুরুষ দেবমানব যিনি প্রকৃতির নিয়মের বাহিরে গিয়াছেন, যিনি সমুদয় অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহাকে আর এই জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া যাইতে হয় না, যাঁহাকে খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টমানব বলেন, বৌদ্ধগণ বুদ্ধমানব বলেন, যোগীরা মুক্ত বলেন, সেই পূর্ণমানব এই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত, আর তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া শৃঙ্খলের অপর প্রান্তে জীবাণুরূপে প্রকাশিত।

এখন এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হইল—আলোচনা করা যাক। জগৎ-সম্বন্ধে মানুষের চরম ধারণা কি? চৈতন্য—এক অংশের সহিত অপর অংশের সামঞ্জস্য-বিধান, বুদ্ধির বিকাশ। প্রাচীন 'উদ্দেশ্য-বাদ' (Design Theory) এই ধারণারই অস্ফুট আভাস। আমরা জড়বাদীদের সহিত মানিয়া লইতেছি যে, চৈতন্যই জগতের শেষ বস্তু—সৃষ্টিক্রমের ইহাই শেষ বিকাশ, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমরা ইহাও বলিয়া থাকি যে, ইহাই যদি শেষ বিকাশ হয়, তবে আদিতেও ইহা বর্তমান ছিল। জড়বাদী বলিতে পারেন—বেশ কথা, কিন্তু মানুষ জন্মিবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে, তখন তো জ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল না। এ-কথায় আমাদের উত্তর এই, ব্যক্ত চৈতন্য তখন ছিল না বটে, কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল—আর সৃষ্টির শেষ—পূর্ণমানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্য ; তবে আদি কি ছিল? আদিও সেই চৈতন্য। প্রথমে সেই চৈতন্যই ক্রমসঙ্কুচিত হয়, শেষে আবার উহাই ক্রমবিকশিত হয়। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডে এখন যে জ্ঞানরাশি অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহার সমষ্টি অবশ্যই সেই ক্রমসঙ্কুচিত সর্বব্যাপী চৈতন্যের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যের নাম 'ঈশ্বর'। উহাকে অন্য যে-কোন নামে অভিহিত কর না কেন, ইহা স্থির যে, আদিতে সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ছিলেন। সেই বিশ্বজনীন চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, আবার তিনিই নিজেকে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন—যতদিন না পূর্ণমানব, খ্রীষ্টমানব, বুদ্ধমানবে পরিণত হন। তখন তিনি নিজ উৎপত্তি-স্থানে ফিরিয়া আসেন। এই জন্য সকল শাস্ত্রই বলেন, 'আমরা তাঁহাতেই জীবিত, তাঁহাতেই চলি ফিরি, তাঁহাতেই আমাদের সত্তা।'[১] এই জন্যই সকল শাস্ত্রই বলেন, 'আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি এবং

১ তৈত্তি. উপ., ৩।১

তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইব।' বিভিন্ন পরিভাষা দেখিয়া ভয় পাইও না—পরিভাষায় যদি ভয় পাও, তবে তোমরা দার্শনিক হইবার যোগ্য হইবে না। এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকেন।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন: আপনি পুরাতন শব্দ 'ঈশ্বর' (God) ব্যবহার করেন কেন? ইহার উত্তর এই—পূর্বোক্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বুঝাইতে যত শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে, তন্মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। উহা অপেক্ষা ভাল শব্দ আর খুঁজিয়া পাইবে না, কারণ মানুষের সকল আশা-ভরসা, সকল সুখ ঐ এক শব্দে কেন্দ্রীভূত। এখন ঐ শব্দ পরিবর্তন করা অসম্ভব। যখন বড় বড সাধু-মহাত্মা ঐরূপ শব্দ গড়েন, তখন তাঁহারা উহাদের অর্থ খুব ভালরূপেই বুঝিতেন। ক্রমে সমাজে যখন ঐ শব্দগুলি প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন অজ্ঞ লোকেরা ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার ফলে শব্দগুলির মহিমা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। 'ঈশ্বর' শব্দটি স্মরণাতীত কাল হইতে আসিয়াছে, আর যাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র, এবং এক সর্বব্যাপী চৈতন্যের ভাব ঐ শব্দের ভিতর রহিয়াছে। কোন নির্বোধ ঐ শব্দ-ব্যবহারে আপত্তি করিলেই কি উহা ত্যাগ করিতে বলো? একজন আসিয়া বলিবে—আমার এই শব্দটি লও, অপরে আবার তাহার শব্দটি লইতে বলিবে। সুতরাং এই ধরনের বৃথা শব্দের কোন অন্ত থাকিবে না। তাই বলি, সেই প্রাচীন শব্দটিই ব্যবহার কর, কিন্তু মন হইতে কুসংস্কার দূর করিয়া দিয়া, এই মহৎ প্রাচীন শব্দের অর্থ কি—তাহা ভালভাবে বুঝিয়া ঐ শব্দ আরও ভালভাবে ব্যবহার কর। যদি তোমরা 'ভাবানুষঙ্গ-বিধানে'র (Law of Association of Ideas) শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হও, তবে জানিবে এই শব্দের সহিত নানাপ্রকার মহান্ ওজস্বী ভাব সংযুক্ত রহিয়াছে; লক্ষ লক্ষ মানুষ এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঐ শব্দের পূজা করিয়াছে, আর উহার সহিত যাহা কিছু অতি উচ্চ ও সুন্দর, যাহা কিছু যুক্তিযুক্ত, যাহা কিছু প্রেমাস্পদ, মনুষ্য-প্রকৃতিতে যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর, তাহাই যোগ করিয়াছে। অতএব উহা ঐ-সকল ভাবের উদ্দীপক কারণস্বরূপ, সুতরাং উহাকে ত্যাগ করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, আমি যদি আপনাদিগকে শুধু এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনাদের নিকট উহা

কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করিত না। তথাপি এই-সকল বিচারের পর আমরা সেই প্রাচীন পরম পুরুষের নিকটেই পৌঁছিলাম।

আমরা এখন দেখিলাম যে, জড় শক্তি মন চৈতন্ত বা অন্য নামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যেরই প্রকাশ। আমরা ভবিষ্যতে তাঁহাকে 'পরম প্রভু' বলিয়া অভিহিত করিব। যাহা কিছু দেখ, শোন বা অনুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি—ঠিক বলিতে গেলে, তাঁহারই পরিণাম—আরও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি স্বয়ং। তিনি সূর্য ও তারকারূপে উজ্জলভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই জননী বসুন্ধরা, তিনিই স্বয়ং সমুদ্র। তিনিই মৃদু বৃষ্টিধারারূপে পড়িতেছেন, তিনিই মৃদু বাতাস—যাহা আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি, তিনিই দেহে শক্তিরূপে কার্য করিতেছেন। তিনিই বক্তৃতা, তিনিই বক্তা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী। তিনিই এই বক্তৃতা-মঞ্চ—যাহার উপর আমি দণ্ডায়মান, তিনিই ঐ আলোক—যাহা দ্বারা আমি তোমাদের মুখ দেখিতেছি, এ-সবই তিনি। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু হন, আবার ক্রমবিকশিত হইয়া পুনরায় ঈশ্বর হন; তিনিই নীচে নামিয়া আসিয়া অতি নিম্নতম পরমাণু হন; আবার ধীরে ধীরে নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়া স্বরূপে পুনর্মিলিত হন—ইহাই জগতের রহস্য। 'তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই যৌবন-গর্বে ভ্রমণশীল যুবা, তুমিই কুমারী, তুমিই বৃদ্ধ—দণ্ড ধরিয়া কোনরূপে চলিতেছ, তুমিই সকল বস্তুতে—হে প্রভু, তুমিই সবকিছু'[১]—জগৎপ্রপঞ্চের এই ব্যাখ্যাতেই কেবল মানবযুক্তি মানববুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা তাঁহা হইতেই জন্মগ্রহণ করি, তাঁহাতেই জীবিত এবং তাঁহাতেই আবার প্রত্যাবর্তন করি।[২]

১ শ্বেতাশ্ব. উপ., ৪।৩

২ তৈত্তি. উপ., ৩।১

জগৎ (২)

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড

[নিউইয়র্কে প্রদত্ত, ২৬শে জানুআরি, ১৮৯৬]

মনুষ্যমন স্বভাবতই বহির্মুখী। মন যেন শরীরের বাহিরে ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়া উঁকি মারিতে চায়। চক্ষু অবশ্যই দেখিবে, কর্ণ অবশ্যই শুনিবে, ইন্দ্রিয়গণ অবশ্যই বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে। তাই স্বভাবতই প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব প্রথমেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানবাত্মা প্রথমেই বহির্জগতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আকাশ নক্ষত্রপুঞ্জ, অন্তরীক্ষে অন্যান্য পদার্থনিচয়, পৃথিবী নদী পর্বত সমুদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, আর আমরা সকল প্রাচীন ধর্মেই ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাই। প্রথমে মানবমন অন্ধকারে অনুসন্ধান করিতে করিতে বাহিরে যাহা কিছু দেখিত, তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে সে নদীর একজন দেবতা, আকাশের অধিষ্ঠাত্রী আর একজন, মেঘের অধিষ্ঠাত্রী একজন, আবার বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী আর এক দেবতায় বিশ্বাসী হইল। যেগুলিকে আমরা প্রকৃতির শক্তি বলিয়া জানি, তাহারাই সচেতন পদার্থে রূপান্তরিত হইল। কিন্তু যতই গভীর হইতে গভীরতর অনুসন্ধান হইতে লাগিল, ততই এই বাহ্য দেবতাগণে আর মানুষের তৃপ্তি হইল না। তখন মানুষের সমগ্র শক্তি তাহার নিজের ভিতরে চালিত হইল—তাহার নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। বহিজগৎ হইতে ঐ প্রশ্ন গিয়া অন্তর্জগতে পৌঁছিল। বহির্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া শেষে মানুষ অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিল। উচ্চতর সভ্যতার স্তরে, প্রকৃতির সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি হইতে, উন্নতির উচ্চতর ভূমিতে এই ভিতরের মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হয়।

এই ভিতরের মানুষই আজিকার অপরাহ্ণের আলোচ্য বিষয়। এই ভিতরের মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষের যতখানি প্রিয় ও তাহার হৃদয়ের যত সন্নিহিত, আর কিছুই তত নহে। কত দেশে কত লক্ষ বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। কি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী, কি রাজা, কি দরিদ্র, কি ধনী, কি সাধু, কি পাপী, প্রত্যেক নরনারী সকলেই কোন না কোন সময়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনে নিত্য কি কিছুই নাই? এই শরীর

মরিলেও এমন কিছু কি নাই, যাহা মরে না? যখনই এই শরীর ধূলিমাত্রে পরিণত হয়, তখন কি কিছুই জীবিত থাকে না? অগ্নি শরীরকে ভস্মসাৎ করিলে তাহার পর আর কিছুই কি অবশিষ্ট থাকে না? যদি থাকে, তবে তাহার নিয়তি কি? উহা যায় কোথায়? কোথা হইতেই বা উহা আসিয়াছিল? এই প্রশ্নগুলি বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছে আর যতদিন এই সৃষ্টি থাকিবে, যতদিন মানব-মস্তিষ্ক চিন্তা করিবে, ততদিনই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে। ইহার উত্তর যে কখনও পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে; যখনই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তখনই উত্তর আসিয়াছে; আর যত সময় যাইতেছে, ততই উহা উত্তরোত্তর অধিক বল সংগ্রহ করিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্বে ঐ প্রশ্নের উত্তর চিরদিনের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল, আর পরবর্তী সময়ে ঐ উত্তরই আবার কথিত, স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া আমাদের বুদ্ধির নিকট উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। অতএব আমাদিগকে কেবল ঐ উত্তরের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। সকলের চিত্তাকর্ষক এই সমস্যা-গুলির উপর নূতন আলোকপাত করিব, এমন ভান করি না। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, সেই সনাতন মহান্ সত্য বর্তমান কালের ভাষায় প্রকাশ করিব, প্রাচীনদিগের চিন্তা আধুনিকদিগের ভাষায় ব্যক্ত করিব, দার্শনিকদিগের চিন্তা লৌকিক ভাষায় বলিব—দেবতাদের চিন্তা মানবের ভাষায় বলিব, ঈশ্বরের চিন্তা দুর্বল মানুষের ভাষায় প্রকাশ করিব, যাহাতে লোকে উহা বুঝিতে পারে। কারণ আমরা পরে দেখিব, যে ঐশী সত্তা হইতে ঐ-সকল ভাব প্রসূত, তাহা মানবেও বর্তমান—যে সত্তা ঐ চিন্তাগুলিকে সৃজন করিয়াছিলেন, তিনিই মানুষে প্রকাশিত হইয়া নিজেই ইহা বুঝিবেন।

আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি। এই দর্শনক্রিয়ার জন্য কতগুলি জিনিসের আবশ্যক? প্রথমতঃ চক্ষু—চক্ষু অবশ্যই থাকা চাই। আমার অন্যান্য ইন্দ্রিয় অবিকল থাকিতে পারে, কিন্তু যদি আমার চক্ষু না থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। অতএব প্রথমতঃ অবশ্যই আমার চক্ষু থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ চক্ষুর পশ্চাতে আর একটা কিছু থাকা আবশ্যক, সেটিই প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয়। তাহা না থাকিলে দর্শনক্রিয়া অসম্ভব। চক্ষু বাস্তবিক ইন্দ্রিয় নয়, উহা দর্শনের যন্ত্রমাত্র; যথার্থ ইন্দ্রিয়টি চক্ষুর পশ্চাতে অবস্থিত—উহা মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্র। যদি ঐ কেন্দ্রটি নষ্ট হইয়া যায়, তবে মানুষের

অতি নির্মল দুটি চক্ষু থাকিতেও সে কিছুই দেখিতে পাইবে না।, অতএব দর্শনক্রিয়ার জন্য ঐ প্রকৃত ইন্দ্রিয়টি থাকা বিশেষ আবশ্যক। আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেও সেইরূপ। বাহিরের কর্ণ কেবল ভিতরে শব্দ লইয়া যাইবার যন্ত্রমাত্র। উহা মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে পৌছানো চাই। তবু ইহাই শ্রবণক্রিয়ার পক্ষে যথেষ্ট হইল না। কখন কখন এরূপ হয়, তুমি তোমার গ্রন্থাগারে বসিয়া একাগ্রমনে কোন পুস্তক পড়িতেছ—এমন সময় ঘড়িতে বারোটা বাজিল, কিন্তু তুমি শুনিতে পাইলে না। কেন শুনিতে পাইলে না? এখানে কিসের অভাব ছিল? মন ঐ ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত ছিল না। অতএব আমরা দেখিতেছি, তৃতীয়তঃ মন অবশ্যই থাকা চাই। প্রথম বাহ্যযন্ত্র; তার পর এই বাহ্যযন্ত্রটি ইন্দ্রিয়ের নিকট যেন ঐ বিষয়কে বহন করিয়া লইয়া যায়; তারপর আবার মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হওয়া চাই। যখন মন ঐ মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে যুক্ত না থাকে, তখন কর্ণ-যন্ত্রে এবং মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে বিষয়ের ছাপ পড়িতে পারে, কিন্তু আমরা উহা বুঝিতে পারিব না। মনও কেবল বাহক মাত্র, উহাকে এই বিষয়ের ছাপ আরও ভিতরে বহন করিয়া বুদ্ধিকে প্রদান করিতে হয়। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। তবু যথেষ্ট হইল না। বুদ্ধিকে আবার আরও ভিতরে লইয়া গিয়া এই শরীরের অধীশ্বর আত্মার নিকট উহাকে সমর্পণ করিতে হয়। তাঁহার নিকট পৌছিলে তবে তিনি আদেশ করেন—'কর' অথবা 'করিও না'। তখন যে যে ক্রমে উহা ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার বাহিরে আসে—প্রথমে বুদ্ধিতে, তারপর মনে, তারপর মস্তিষ্ককেন্দ্রে, তারপর বহির্যন্ত্রে; তখনই বিষয়জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল, বলা যায়।

যন্ত্রগুলি মানুষের স্থূলদেহে—বাহিরেই অবস্থিত। মন কিন্তু তাহা নহে, বুদ্ধিও নহে। হিন্দু দর্শনে উহাদের নাম সূক্ষ্ম শরীর, খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রে আধ্যাত্মিক শরীর। উহা এই শরীর হইতে অনেক সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু উহা আত্মা নহে। আত্মা এই সকলের অতীত। স্থূল শরীর অল্প দিনেই ধ্বংস হইয়া যায়—খুব সামান্য কারণে উহার ভিতরে গোলযোগ ঘটে এবং উহা ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। সূক্ষ্ম শরীর এত সহজে নষ্ট হয় না, কিন্তু উহাও কখন সবল, কখন বা দুর্বল হয়। আমরা দেখিতে পাই—বৃদ্ধ লোকের মনে তত বল থাকে না, আবার শরীর সবল থাকিলে মনও সবল থাকে, নানাবিধ ঔষধ মনের উপর কার্য করে, বাহিরের সকল বস্তুই মনের উপর কার্য

করে, আবার মনও বাহ্য জগতের উপর কার্য করিয়া থাকে। শরীরের যেমন উন্নতি-অবনতি আছে, মনেরও তেমনি আছে; অতএব মন কখনও আত্মা হইতে পারে না। কারণ আত্মার ক্ষয় বা অধঃপতন নাই। আমরা কিভাবে উহা জানিতে পারি? কি করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, মনের পশ্চাতে আরও কিছু আছে? কারণ স্বপ্রকাশ জ্ঞান কখন জড়ের ধর্ম হইতে পারে না। এমন কোন জড় বস্তু দেখা যায় না, চৈতন্য যাহার স্বরূপ। অচেতন জড় পদার্থ কখন নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না। জ্ঞানই সমুদয় জড়কে প্রকাশ করে। এই যে সম্মুখে হল (hall) দেখিতেছ, জ্ঞানই ইহার মূল বলিতে হইবে, কারণ কোন না কোন জ্ঞানের সহায়তা ছাড়া উহার অস্তিত্বই জানা যাইত না। এই শরীর স্বপ্রকাশ নহে। যদি তাহা হইত, তবে মৃত ব্যক্তির দেহও স্বপ্রকাশ হইত। মন বা আধ্যাত্মিক শরীরও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, উহা চৈতন্যস্বরূপ নহে। যাহা স্বপ্রকাশ, তাহার কখনও ক্ষয় হয় না। যাহা অপরের আলোকে আলোকিত, তাহার আলোক কখন থাকে, কখন থাকে না। কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরূপ, তাহার আলোকের আবির্ভাব-তিরোভাব, হ্রাস-বৃদ্ধি আবার কি? আমরা দেখিতে পাই, চন্দ্রের ক্ষয় হয়, আবার উহার কলাবৃদ্ধি হইতে থাকে—তাহার কারণ উহা সূর্যের আলোকে আলোকিত। যদি অগ্নিতে লৌহপিণ্ড ফেলিয়া দেওয়া যায়, আর যদি উহাকে লোহিত-তপ্ত করা যায়, তবে উহা আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে, কিন্তু ঐ আলোক অপরের বলিয়া উহা চলিয়া যাইবে। অতএব ক্ষয় কেবল সেই আলোকেই সম্ভব, যাহা অপরের নিকট হইতে গৃহীত, যাহা স্বপ্রকাশ তাহাতে নহে।

আমরা দেখিলাম এই স্থূলদেহ স্বপ্রকাশ নহে, উহা নিজেকে নিজে জানিতে পারে না। মনও নিজেকে নিজে জানিতে পারে না। কেন? কারণ মনের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, কখন উহা সবল, আবার কখন দুর্বল হয়; বাহ্য সকল বস্তুই উহার উপর কার্য করিয়া উহাকে সবল বা দুর্বল করিতে পারে। অতএব মনের মধ্য দিয়া যে আলোক আসিতেছে, তাহা মনের নিজের নহে। তবে ঐ আলো কাহার? উহা অবশ্যই এমন কাহারও যাহার পক্ষে উহা নিজস্বরূপ, যাহা অপর আলোকের প্রতিফলন নহে, কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরূপ; অতএব সেই আলোক বা জ্ঞান সেই পুরুষের স্বরূপ বলিয়া তাহার

কখন নাশ বা ক্ষয় হয় না, উহা কখন প্রবল বা কখন মৃদু হইতে পারে না। উহা স্বপ্রকাশ—উহা আলোকস্বরূপ। আত্মা জানেন—তাহা নহে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; আত্মার অস্তিত্ব আছে—তাহা নহে, আত্মা অস্তিত্বস্বরূপ; আত্মা সুখী—তাহা নহে, আত্মা সুখস্বরূপ। যে সুখী, তাহার সুখ অপর কাহারও নিকট প্রাপ্ত। যাহার জ্ঞান আছে, সে অপর কাহারও নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সেই অস্তিত্ব অপর কাহারও অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে, উহা অপর কাহারও অস্তিত্বের প্রতিফলন। যেখানেই গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, সেখানেই বুঝিতে হইবে সেই গুণগুলি গুণীর উপর প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান, অস্তিত্ব বা আনন্দ—এগুলি আত্মার ধর্ম নহে, আত্মার স্বরূপ।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে আমরা এ-কথা স্বীকার করিয়া লইব কেন? কেন আমরা স্বীকার করিব যে, আনন্দ অস্তিত্ব-জ্ঞান আত্মার স্বরূপ, অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে? ইহার উত্তর এই—আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, শরীরের প্রকাশ মনের প্রকাশে; যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ উহার প্রকাশ, মন চলিয়া গেলে আর দেহের প্রকাশ থাকে না। চক্ষু হইতে মন চলিয়া গেলে আমি তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তোমায় দেখিতে পাইব না, অথবা শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে মন চলিয়া গেলে তোমাদের কথা মোটেই শুনিতে পাইব না। সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এইরূপ। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম শরীরের প্রকাশ—মনের প্রকাশে। আবার মন সম্বন্ধেও সেইরূপ। বহির্জগতের সকল বস্তুই উহার উপর কার্য করিতেছে, সামান্য কারণেই উহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে, মস্তিষ্কের মধ্যে একটু সামান্য গোলযোগ হইলেই উহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অতএব মনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, কারণ আমরা সমুদয় প্রকৃতিতেই দেখিতেছি, যাহা কোন বস্তুর স্বরূপ, তাহার পরিবর্তন হইতে পারে না। কেবল যাহা অপর বস্তুর ধর্ম, যাহা অপর বস্তু হইতে গৃহীত, তাহারই পরিবর্তন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—আত্মার প্রকাশ, আত্মার জ্ঞান, আত্মার আনন্দও ঐরূপ অপরের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার কর না কেন? এইরূপ স্বীকার করিলে দোষ এই হইবে যে, এরূপ স্বীকৃতির কোন অন্ত পাওয়া যাইবে না। আবার প্রশ্ন উঠিবে, সে কাহার নিকট হইতে আলোক পাইল? যদি বলো, অপর কোন আত্মা

হইতে, তবে আবার প্রশ্ন উঠিবে, সেই বা কোথা হইতে আলোক পাইল? অতএব অবশেষে আমাদিগকে এমন এক জায়গায় আসিতে হইবে, যাহার আলো অপরের নয়, নিজের। অতএব ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত এই—যেখানে প্রথমেই স্বপ্রকাশত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেইখানেই থামা, এবং আর অগ্রসর না হওয়া।

অতএব আমরা দেখিলাম, মানুষের প্রথমতঃ এই স্থূল দেহ, তারপর সূক্ষ্ম শরীর, উহার পশ্চাতে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা রহিয়াছেন; আমরা দেখিয়াছি, স্থূল দেহের সমুদয় গুণ ও শক্তি মন হইতে গৃহীত—মন আবার আত্মার আলোকে আলোকিত।

আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আবার নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। আত্মা স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দই আত্মার স্বরূপ—এই যুক্তি হইতে যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে স্বভাবতই প্রমাণিত হইতেছে যে, উহা শূন্য হইতে সৃষ্ট হইতে পারে না। যাহা স্বপ্রকাশ—অপর বস্তু-নিরপেক্ষ, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, এই জড়জগৎও শূন্য হইতে হয় নাই—আত্মা তো দূরের কথা। অতএব সর্বদাই উহার অস্তিত্ব ছিল। এমন সময় কখন ছিল না, যখন উহার অস্তিত্ব ছিল না; কারণ যদি বলো—এক সময়ে আত্মার অস্তিত্ব ছিল না, তবে 'কাল' কোথায় অবস্থিত ছিল; কাল তো আত্মার মধ্যেই অবস্থিত। যখন আত্মার শক্তি মনের উপর প্রতিফলিত হয়, আর মন চিন্তা করে, তখনই কালের উৎপত্তি। সুতরাং যখন আত্মা ছিল না, তখন চিন্তাও ছিল না, আর চিন্তা না থাকিলে কালও থাকিতে পারে না। অতএব যখন কাল আত্মাতে রহিয়াছে, তখন আত্মা যে কালে অবস্থিত, ইহা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, উহা কেবল বিভিন্ন সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে মাত্র। উহা ধীরে ধীরে নিজেকে নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ ভাবে প্রকাশ করিতেছে। আত্মা মনের ভিতর দিয়া শরীরের উপর কার্য করিয়া নিজ মহিমা বিকাশ করিতেছে, এবং শরীরের দ্বারা বাহ্য জগৎ গ্রহণ করিয়া উহাকে বুঝিতেছে। উহা একটি শরীর গ্রহণ করিয়া উহাকে ব্যবহার করিতেছে, এবং যখন সেই শরীরের দ্বারা আর কোন কাজ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন আত্মা আর এক শরীর গ্রহণ করে।

এখন আবার আত্মার পুনর্জন্ম[১] সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা দিল। অনেক সময় লোকে এই পুনর্জন্মের কথা শুনিলেই ভয় পায়, আর লোকের কুসংস্কার এত প্রবল যে, চিন্তাশীল লোকেও বিশ্বাস করিবে—আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তারপর আবার চমৎকার যুক্তির সহিত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে, যদিও আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন, পরে আমরা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিব। যাহারা শূন্য হইতে আসিয়াছে তাহারা অবশ্যই শূন্যে যাইবে। তুমি আমি বা উপস্থিত কেহই শূন্য হইতে আসে নাই, সুতরাং শূন্যে যাইবে না। আমরা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি এবং থাকিব, আর ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদিগকে শূন্যে পরিণত করিতে পারে। এই পুনর্জন্মবাদে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই, উহাই মানুষের নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ইহাই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত। যদি পরে তোমার অনন্তকাল অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে ইহাও সত্য যে, তুমি অনন্তকাল ধরিয়া ছিলে; অন্য কোনরূপ হইতে পারে না। এই মতের বিরুদ্ধে যে-সকল আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, সেগুলি নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। যদিও তোমরা অনেকে এই আপত্তি-গুলিকে অকিঞ্চিৎকর বোধ করিবে, তথাপি ঐগুলির উত্তর দিতে হইবে, কারণ কখন কখন আমরা দেখিতে পাই, মহাচিন্তাশীল ব্যক্তিও অতি মূর্খোচিত কথা বলিয়া থাকে। লোকে যে বলিয়া থাকে, 'এমন অসঙ্গত মতই নাই, যাহা সমর্থন করিবার জন্য কোন-না-কোন দার্শনিক অগ্রসর না হন'—এ-কথা অতি সত্য। এ-বিষয়ে প্রথম আপত্তি এই—জন্মান্তরের কথা আমাদের স্মরণ থাকে না কেন? আমরা কি এই জন্মেরই অতীত ঘটনা সব স্মরণ করিতে পারি? তোমাদের মধ্যে কয়জনের শৈশবকালের কথা মনে পড়ে? শৈশবকালের কথা তোমাদের কাহারও মনে পড়ে না; আর যদি স্মৃতি-শক্তির উপর তোমার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে তোমার মনে নাই বলিয়া ঐ শৈশবাবস্থায় তোমার অস্তিত্বও ছিল না—এই কথা বলিতে হইবে। আমরা যদি স্মরণ করিতে পারি, তবেই পূর্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিব, ইহা বলা চরম নির্বুদ্ধিতা। আমাদের পূর্বজন্মের কথা যে স্মরণ থাকিবেই—ইহার কি

১ Reincarnation or transmigration of the Soul

কোন হেতু আছে? সেই মস্তিষ্ক নাই, তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এবং নূতন একটি মস্তিষ্ক হইয়াছে। অতীতে অর্জিত সংস্কারগুলির সমষ্টি আমাদের মস্তিকে আসিয়াছে—উহা লইয়া মন এই শরীরে বাস করিতেছে।

এইক্ষণে আমি ঠিক যেমনটি আছি, তাহা আমার অনন্ত অতীতের কর্মফলস্বরূপ। আর সেই সমগ্র অতীতকে স্মরণ করারই বা আমার কি প্রয়োজন? কুসংস্কারের এমনি প্রভাব যে, যাহারা এই পুনর্জন্মবাদ অস্বীকার করে, তাহারাই আবার বিশ্বাস করে, এক সময়ে আমরা বানর ছিলাম; কিন্তু তাহাদের বানরজন্ম কেন স্মরণ হয় না—এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেও ভরসা করে না। যখন শুনি, কোন প্রাচীন ঋষি বা সাধু সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমরা আধুনিকেরা তাঁহাকে নির্বোধ বলিয়া থাকি; কিন্তু যদি কেহ বলে, হাক্সলি ইহা বলিয়াছেন, টিণ্ডাল ইহা বলিয়াছেন, তখন আমরা বলি উহা অবশ্যই সত্য হইবে—অমনি আমরা তাহা মানিয়া লই। প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্তে আমরা আধুনিক কুসংস্কার আনিয়াছি, ধর্মের প্রাচীন পোপের পরিবর্তে আমরা বিজ্ঞানের আধুনিক পোপ বসাইয়াছি। অতএব আমরা দেখিলাম, স্মৃতি সম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা সত্য নহে। আর এই পুনর্জন্ম সম্বন্ধে যে গুরুতর আপত্তি উঠিয়া থাকে, তাহার মধ্যে ইহাই একমাত্র আপত্তি, যাহা বিজ্ঞ লোকে আলোচনা করিতে পারেন। যদিও দেখিয়াছি, পুনর্জন্মবাদ প্রমাণ করিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও থাকিবে—ইহা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি আমরা ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, অনেকের এরূপ স্মৃতি দেখা যায়, আর তোমরাও সকলে যে-জন্মে মুক্তিলাভ করিবে, সেই জন্মে এই স্মৃতি লাভ করিবে। কেবল তখনই জানিতে পারিবে—জগৎ স্বপ্নমাত্র, তখনই অন্তরের অন্তরে বুঝিবে যে, আমরা এই জগতে অভিনেতামাত্র, আর এই জগৎ রঙ্গভূমি, তখনই প্রবলবেগে অনাসক্তির ভাব তোমাদের ভিতর আসিবে, তখনই যত ভোগতৃষ্ণা—জীবনের উপর এই তীব্র আগ্রহ—এই সংসার চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। তখন তুমি স্পষ্টই দেখিবে, তুমি জগতে কতবার আসিয়াছ, কত লক্ষ লক্ষ বার তুমি পিতামাতা পুত্রকন্যা স্বামী-স্ত্রী বন্ধু ঐশ্বর্য শক্তি লইয়া কাটাইয়াছ। কতবার এই-সকল আসিয়াছে, কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার তুমি সংসার-তরঙ্গের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়াছ, আবার কতবার তুমি নৈরাশ্যের গভীর গহ্বরে

নিমজ্জিত হইয়াছ। যখন স্মৃতি তোমার নিকট এই-সকল আনিয়া দিবে, তখনই কেবল তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইবে, এবং জগৎ তোমায় ভ্রূভঙ্গী করিলে তুমি শুধু হাসিবে। তখনই তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে—'মৃত্যু, তোমাকেও আমি গ্রাহ্য করি না, তুমি আমাকে কি ভয় দেখাও?' যখন তুমি জানিতে পারিবে, তোমার উপর মৃত্যুর কোন শক্তি নাই, তখনই তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে। আর সকলেই কালে এই অবস্থা লাভ করিবে।

আত্মার যে পুনর্জন্ম হয়, তাহার কি কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে? এতক্ষণ আমরা কেবল শঙ্কানিরাস করিতেছিলাম, দেখাইতেছিলাম, পুনর্জন্মবাদ খণ্ডন করিবার যুক্তিগুলি অকিঞ্চিৎকর। এখন পুনর্জন্মের সপক্ষে যে-সব যুক্তি আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে। পুনর্জন্মবাদ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। মনে কর, আমি রাস্তায় গিয়া একটা কুকুরকে দেখিলাম। উহাকে কুকুর বলিয়া জানিলাম কিরূপে? যখনই উহার ছাপ আমার মনের উপর পড়িল, উহার সহিত মনের ভিতরকার পূর্বসংস্কারগুলিকে মিলাইতে লাগিলাম। দেখিলাম—আমার যাবতীয় পূর্বসংস্কার স্তরে স্তরে সাজানো রহিয়াছে। নূতন কোন বিষয় আসিবামাত্রই আমি ঐটিকে সেই প্রাচীন সংস্কারগুলির সহিত মিলাইয়া দেখি। যখনই দেখি, সেই ভাবের আর কতকগুলি সংস্কার রহিয়াছে, অমনি আমি উহাদিগকে তাহাদের সহিত মিলাই, তখনই আমার তৃপ্তি আসে। আমি তখন উহাকে কুকুর বলিয়া জানিতে পারি, কারণ উহা পূর্বাবস্থিত কতকগুলি সংস্কারের সহিত মেলে। যখন উহার তুল্য সংস্কার আমার ভিতরে দেখিতে পাই না, তখনই আমার অতৃপ্তি আসে, এইরূপ হইলে উহাকে 'অজ্ঞান' বলে। আর তৃপ্তি হইলেই উহাকে 'জ্ঞান' বলে। যখন একটি আপেল পড়িল, তখনই মানুষের মধ্যে অতৃপ্তি আসিল। তারপর মানুষ ক্রমশঃ ঐরূপ কতকগুলি ঘটনার মধ্যে একটি শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাইল। কি সেই শ্রেণী? সকল আপেলই পড়িয়া থাকে। মানুষ উহার 'মাধ্যাকর্ষণ' সংজ্ঞা দিল। অতএব আমরা দেখিলাম—পূর্বে কতকগুলি অনুভূতি না থাকিলে নূতন অনুভূতি অসম্ভব, কারণ ঐ নূতন অনুভূতির সহিত মিলাইবার আর কিছু পাওয়া যাইবে না। অতএব কতিপয় ইওরোপীয় দার্শনিকের মতে 'বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সংস্কারশূন্য মন লইয়া আসে'—এ-কথা

যদি সত্য হয়, তবে এরূপ বালক কখনও কিছুমাত্র মানসিক শক্তি অর্জন করিতে পারিবে না, কারণ তাহার নূতন অনুভূতিগুলি মিলাইবার জন্য আর কোন সংস্কার নাই। অতএব দেখিলাম, এই পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ব্যতীত নূতন কোন জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক আমাদের সকলকেই পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছে। অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞানলাভ হয়, আর কোন পথ নাই। যদি আমরা এখানে ঐ জ্ঞান লাভ না করিয়া থাকি, অবশ্যই আমরা অপর কোথাও উহা লাভ করিয়া থাকিব। মৃত্যুভয় সর্বত্রই দেখিতে পাই কেন? একটি কুক্কুট এইমাত্র ডিম হইতে বাহির হইয়াছে—একটি বাজপাখি আসিল, অমনি সে ভয়ে মায়ের কাছে পলাইয়া গেল। কোথা হইতে ঐ কুক্কুটশাবকটি শিখিল যে, কুক্কুট বাজের ভক্ষ্য? ইহার একটি পুরাতন ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যাই বলা যাইতে পারে না। উহাকে স্বাভাবিক সংস্কার (instinct) বলা হয়। যে ক্ষুদ্র কুক্কুটটি এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার এরূপ মরণভীতি আসে কোথা হইতে? ডিম্ব হইতে সদ্য বহির্গত হংস জলের নিকট আসিলেই, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে এবং সাঁতার দিতে থাকে কেন? উহা কখন সাঁতার দেয় নাই, অথবা কাহাকেও সাঁতার দিতে দেখে নাই। লোকে বলে উহা 'স্বাভাবিক জ্ঞান'। 'স্বাভাবিক জ্ঞান' বলিলে একটা খুব লম্বা-চওড়া কথা বলা হইল বটে, কিন্তু উহা আমাদিগকে নূতন কিছুই শিখাইল না।

এই স্বাভাবিক জ্ঞান কি, তাহা আলোচনা করা যাক। আমাদের নিজেদের ভিতরই শত প্রকারের স্বাভাবিক জ্ঞান রহিয়াছে। মনে কর, একজন পিয়ানো বাজাইতে শিখিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহাকে প্রত্যেক পরদার দিকে নজর রাখিয়া তবে উহার উপর অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হয়; কিন্তু অনেক মাস, অনেক বৎসর অভ্যাস করিতে করিতে উহা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, আপনা-আপনি হইতে থাকে। এক সময়ে ইহাতে জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছার প্রয়োজন হইত, এখন আর উহার প্রয়োজন থাকে না, জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছা ব্যতীতই উহা নিষ্পন্ন হইতে পারে, ইহাকেই বলে স্বাভাবিক জ্ঞান। প্রথমে ইহা ইচ্ছাসহ কৃত ছিল, পরিশেষে উহাতে আর ইচ্ছার প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞানের তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণ বলা হয়

নাই, অর্ধেক কথা বলিতে এখনও বাকি আছে। যে-সকল কার্য এখন আমাদের স্বাভাবিক, তাহার প্রায় সবগুলিকেই আমাদের ইচ্ছার অধীনে আনা যাইতে পারে। শরীরের প্রত্যেক পেশীই আমাদের অধীনে আনা যাইতে পারে। এ বিষয়টি আজকাল সাধারণের ভালভাবেই জানা আছে। অতএব অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী—দুই উপায়েই প্রমাণিত হইল যে, যাহাকে আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা ইচ্ছাকৃত কার্যের অবনত ভাব মাত্র। অতএব যখন সমুদয় প্রকৃতিতেই এক নিয়ম রাজত্ব করিতেছে, তখন সমগ্র সৃষ্টিতে 'উপমান'-প্রমাণের প্রয়োগ করিয়া অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, নিম্নতর প্রাণীতে এবং মানুষে যাহা স্বাভাবিক জ্ঞান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ইচ্ছার অবনত ভাবমাত্র।

আমরা বহির্জগতে যে নিয়ম পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ার পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বর্তমান, আর ক্রমসঙ্কোচ হইলেই উহার সঙ্গে ক্রমবিকাশও থাকিবে—এই নিয়ম খাটাইয়া আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানের কি ব্যাখ্যা লাভ করি? স্বাভাবিক জ্ঞান তাহা হইলে বিচার-পূর্বক কার্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইয়া দাঁড়াইল। অতএব মানুষে বা পশুতে যাহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা অবশ্যই পূর্ববর্তী ইচ্ছাকৃত কার্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইবে। আর ইচ্ছাকৃত কার্য বলিলেই পূর্বে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম, স্বীকার করা হইল। পূর্বকৃত কার্য হইতে ঐ সংস্কার আসিয়াছিল, আর ঐ সংস্কার এখনও বর্তমান। এই মৃত্যুভীতি, এই জন্মিবামাত্র জলে সন্তরণ আর মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু অনিচ্ছাকৃত স্বাভাবিক কার্য রহিয়াছে, সবই পূর্ব কার্য ও পূর্ব অনুভূতির ফল—এখন স্বাভাবিক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে।

এতক্ষণ আমরা বিচারে বেশ অগ্রসর হইলাম, আর এতদূর পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের সহায়। আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা ক্রমে ক্রমে প্রাচীন ঋষিদের সহিত একমত হইতেছেন, এবং তাঁহাদের যতটুকু প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে মিলে ততটুকুতে কোন গোল নাই। বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জীবজন্তুই কতকগুলি অনুভূতির সমষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; তাঁহারা ইহাও মানেন যে, মনের এই-সকল কার্য পূর্ব অনুভূতির ফল। কিন্তু তাঁহারা এইখানে আর এক শঙ্কা তুলিয়া থাকেন।

তাঁহারা বলেন, ঐ অনুভূতিগুলি যে আত্মার, ইহা বলিবার আবশ্যকতা কি? উহা কেবল শরীরেরই ধর্ম বলিলেই তো হয়। উহা 'বংশানুক্রমিক সঞ্চার' (Hereditary transmission) এ-কথা বলিলেই তো হয়। ইহাই শেষ প্রশ্ন। আমি যে-সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি, তাহা আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত সংস্কার, ইহাই বলো না কেন? ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য পর্যন্ত সকলেরই কর্মসংস্কার আমার ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু উহা বংশানুক্রমিক সঞ্চারবশেই আমাতে আসিয়াছে। এইরূপ হইলে আর কি গোল থাকে? এই প্রশ্নটি অতি সুন্দর। আমরা এই বংশানুক্রমিক সঞ্চারের কতক অংশ মানিয়াও থাকি। কতটুকু মানি? মানি কেবল এইটুকু যে উহা আমাদিগকে ভবিষ্যৎ শরীরের উপাদান প্রদান করে; আমরা আমাদের পূর্বকর্মের দ্বারা শরীরবিশেষ আশ্রয় করিয়া থাকি, আর যে-সকল পিতামাতা তাঁহাদের কার্যের দ্বারা ঐ আত্মাকে সন্তানরূপে পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই নূতন শরীরের উপাদান সংগৃহীত হয়।

বংশানুক্রমিক সঞ্চারবাদ বিনা প্রমাণেই একটি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া থাকে যে, মনের সংস্কাররাশির ছাপ জড়ে সঞ্চিত হইতে পারে। যখন আমি তোমার দিকে তাকাই, তখন আমার চিত্তহ্রদে একটি তরঙ্গ উঠে। ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম তরঙ্গাকার থাকে। আমরা ইহা বুঝিতে পারি। শরীরের সংস্কার যে শরীরে থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু শরীর যখন নষ্ট হয়, তখন মানসিক সংস্কার শরীরে বাস করে, ইহার প্রমাণ কি? কিসের দ্বারা ঐ সংস্কার সঞ্চারিত হয়? মনে কর, মনের প্রত্যেক সংস্কারের শরীরে বাস করা সম্ভব; মনে কর, আদিম মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া বংশানুক্রমে সকল পূর্বপুরুষের সংস্কার আমার পিতার শরীরে রহিয়াছে এবং পিতার শরীর হইতে আমাতে আসিতেছে। কেমন করিয়া? তোমরা বলিবে—জীবাণু-কোষের (bio-plasmic cell) দ্বারা। কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে, কারণ পিতার শরীর তো সন্তানে সম্পূর্ণ আসে না? একই পিতামাতার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি থাকিতে পারে। সুতরাং এই বংশানুক্রমিক সঞ্চার-বাদ স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে যে, পিতা-মাতা প্রত্যেক সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিজ মনোবৃত্তির কিঞ্চিদংশ হারাইবেন, কারণ তাঁহাদের মতে সঞ্চারক ও সঞ্চার্য এক অর্থাৎ ভৌতিক;

আর যদি বলো, তাঁহাদের মনোবৃত্তিই সঞ্চারিত হয়, তবে বলিতে হয় প্রথম সন্তানের জন্মের পরই তাঁহাদের মন সম্পূর্ণরূপে শূন্য হইয়া যাইবে।

আবার যদি জীবাণুকোষে চিরকালের অনন্ত সংস্কারসমষ্টি থাকে, তবে জিজ্ঞাস্য এই, উহা কোথায় কিরূপেই বা থাকে? ইহা একটি অত্যন্ত অসম্ভব দৃষ্টি-ভঙ্গী। আর যতদিন না এই জড়বাদীরা প্রমাণ করিতে পারেন, কি করিয়া ঐ সংস্কার ঐ কোষে থাকিতে পারে, আর কোথায়ই বা থাকিতে পারে, এবং 'মনোবৃত্তি শরীর কোষে নিদ্রিত থাকে', এই বাক্যেরই বা অর্থ কি, যতদিন না তাঁহারা বুঝাইতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এ পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই সংস্কার মনেরই মধ্যে বাস করে, মনই জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিতে আসে; মনই আপন উপযোগী উপাদান গ্রহণ করে, আর যে মন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম করিয়াছে, যতদিন পর্যন্ত না সে তাহা নির্মাণ করিবার উপযোগী উপাদান পাইতেছে, ততদিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহা আমরা বুঝিতে পারি। অতএব আত্মার দেহ গঠনের উপযোগী উপাদান প্রস্তুত করা পর্যন্তই বংশানুক্রমিক সঞ্চারবাদ স্বীকার করা যাইতে পারে। আত্মা কিন্তু জন্মান্তর গ্রহণ করেন—শরীরের পর শরীর নির্মাণ করেন; আর আমরা যে-কোন চিন্তা করি, যে-কোন কার্য করি, তাহাই সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায়, আবার সময় হইলেই উহারা স্থূল ব্যক্তভাব ধারণ করিতে উন্মুখ হয়।

আমার যাহা বক্তব্য, তাহা তোমাদিগকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। যখনই আমি তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার মনে একটি তরঙ্গ উঠে। উহা যেন চিত্তহ্রদের ভিতর ডুবিয়া যায়, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, কিন্তু উহার একেবারে নাশ হয় না। যে-কোন মুহূর্তে স্মৃতিরূপ তরঙ্গাকারে উঠিতে প্রস্তুত হইয়া উহা মনের মধ্যেই বর্তমান থাকে। এইরূপেই এই সমুদয় সংস্কারসমষ্টি আমার মনেই রহিয়াছে, আর মৃত্যুকালে উহাদের সমষ্টি আমার সঙ্গেই বাহির হইয়া যায়। মনে কর, এই ঘরে একটি বল রহিয়াছে, আর আমরা প্রত্যেকেই হাতে একটি ছড়ি লইয়া সব দিক হইতে ইহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলাম; বলটি ঘরের এক ধার হইতে আর এক ধারে যাইতে লাগিল, দরজার কাছে পৌঁছিবামাত্র, উহা বাহিরে চলিয়া গেল। উহা কোন্ শক্তি লইয়া বাহিরে চলিয়া যায়?—যতগুলি ছড়ি

মায়া হইতেছিল, তাহাদের সমবেত শক্তি। উহার গতি কোন্ দিকে হইবে, তাহাও ঐ-সকলের সমবেত ফলে নির্ণীত হইবে। এইরূপ, শরীরের পতন হইলে আত্মার কোন্ দিকে গতি হইবে, তাহা কে নির্ণয় করে? ঐ আত্মা যে-সকল কার্য করিয়াছে, যে-সকল চিন্তা করিয়াছে, সেইগুলিই উহাকে কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত করিবে। ঐ আত্মা নিজের মধ্যে ঐ-সকলের সংস্কার লইয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবে। যদি সমবেত কর্মফল এরূপ হয় যে, পুনর্বার ভোগের জন্য উহাকে একটি নূতন শরীর গড়িতে হইবে, তবে উহা এমন পিতা-মাতার নিকট যাইবে, যাহাদের নিকট হইতে সেই শরীরগঠনের উপযোগী উপাদান পাওয়া যাইতে পারে, আর সেই-সকল উপাদান লইয়া উহা একটি নূতন শরীর গ্রহণ করিবে। এইরূপে ঐ আত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবে, কখন স্বর্গে যাইবে, আবার পৃথিবীতে আসিয়া মানবদেহ পরিগ্রহ করিবে; অথবা অন্য কোন উচ্চতর বা নিম্নতর জীবশরীর পরিগ্রহ করিবে। এইরূপে উহা অগ্রসর হইতে থাকিবে, যতদিন না উহার অভিজ্ঞতা অর্জন শেষ হয়, এবং পূর্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তখনই উহা নিজের স্বরূপ জানিতে পারে। তখন সমুদয় অজ্ঞান চলিয়া যায়, নিজের শক্তিসমূহ প্রকাশিত হয়। তিনি তখন সিদ্ধ হইয়া যান, পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তাঁহার পক্ষে স্থূলশরীরের সাহায্যে কার্য করার কোন প্রয়োজন থাকে না—সূক্ষ্মশরীরের দ্বারা কার্য করিবারও প্রয়োজন থাকে না। তখন তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ ও মুক্ত হইয়া যান, তাঁহার আর জন্ম বা মৃত্যু কিছুই হয় না।

এ সম্বন্ধে আমরা এখন আর বিশেষ আলোচনা করিব না। পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়াই নিবৃত্ত হইব। এই মতই কেবল জীবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই মতই কেবল আমাদের সমুদয় দুর্বলতার দোষ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপায় না। নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানোটা মানুষের সাধারণ দুর্বলতা। আমরা নিজেদের দোষ দেখিতে পাই না। চক্ষু কখনও নিজেকে দেখিতে পায় না। উহা অপর সকলের চক্ষু দেখিতে পায়। মানুষ আমরা, যতক্ষণ অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে পারি, ততক্ষণ নিজেদের দুর্বলতা, নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিতে বড় নারাজ। মানুষ সাধারণতঃ নিজের দোষগুলি, নিজের ভ্রমত্রুটিগুলি তাহার প্রতিবেশীর ঘাড়ে চাপাইতে চায়, তাহা যদি না পারে, তবে ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপায়; তাহা না হইলে

অদৃষ্ট নামক একটি ভূতের কল্পনা করে এবং তাহারই উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়; কিন্তু কথা এই, 'অদৃষ্ট' নামে এই বস্তুটির স্বরূপ কি এবং উহা থাকেই বা কোথায়? আমরা তো যাহা বপন করি, তাহাই পাইয়া থাকি।

আমরাই আমাদের অদৃষ্টের নির্মাতা। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হইলে কাহাকেও দোষী করিতে পারা যায় না, আবার ভাল হইলে প্রশংসাও অপর কেহ পায় না। বাতাস সর্বদাই বহিতেছে। যে-সকল জাহাজের পাল খাটানো থাকে, সেইগুলিতেই বাতাস লাগে—তাহারাই পালভরে অগ্রসর হয়। যাহাদের পাল গুটানো থাকে, তাহাদিগের উপর বাতাস লাগে না। ইহা কি বায়ুর দোষ? আমরা যে কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী, ইহা কি সেই করুণাময় পিতার দোষ? তাঁহার কৃপা-বাতাস দিবারাত্র অবিরত বহিতেছে, তাঁহার দয়ার শেষ নাই। আমরাই আমাদের অদৃষ্টের রচয়িতা। তাঁহার সূর্য দুর্বল বলবান্—সকলের জন্য উদিত হয়। তাঁহার বায়ু সাধু পাপী—সকলের জন্যই সমানভাবে বহিতেছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের পিতা, দয়াময়, সমদর্শী। তোমরা কি মনে কর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, তিনিও সেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন? ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহা কি ক্ষুদ্র ধারণা! আমরা ছোট ছোট কুকুরছানার মতো এখানে জীবন-মরণ সংগ্রাম করিতেছি এবং নির্বোধের মতো মনে করিতেছি, ভগবানও ঐ বিষয়গুলি ঠিক তেমনি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিবেন। এই কুকুরছানার খেলার অর্থ কি, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তাঁহার উপর সব দোষ চাপানো, তাঁহাকে দণ্ড-পুরস্কারের কর্তা বলা নির্বুদ্ধিতামাত্র। তিনি কাহারও দণ্ডবিধান করেন না, কাহাকেও পুরস্কার দেন না।[১] সর্ব দেশে, সর্ব কালে, সর্ব অবস্থায় সকলেই তাঁহার অনন্ত দয়া পাইবার অধিকারী। উহার ব্যবহার কিরূপে করিব, তাহা আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। মানুষ, ঈশ্বর বা অপর কাহারও উপর দোষারোপ করিও না। যখন নিজে কষ্ট পাও, তখন তাহার জন্য নিজেকেই দোষী বলিয়া স্থির কর এবং যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, তাহারই চেষ্টা কর।

পূর্বোক্ত সমস্যার ইহাই মীমাংসা। যাহারা নিজেদের দুঃখ-কষ্টের জন্য অপরের উপর দোষারোপ করে—দুঃখের বিষয়, এমন লোকের সংখ্যাই দিন

---

১ গীতা, ৫।১৫

দিন বাড়িতেছে—তাহারা সাধারণতঃ হতভাগ্য দুর্বলমস্তিষ্ক লোক; তাহারা নিজেদের কর্মদোষে এ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, এখন তাহারা অন্যের উপর দোষারোপ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, উহাতে তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হয় না বরং অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার এই চেষ্টা তাহাদিগকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলে। অতএব তোমার নিজের দোষের জন্য কাহাকেও নিন্দা করিও না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও, সমুদয় দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ কর। বলো, আমি যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা আমারই কৃতকর্মের ফল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমার দ্বারাই এই দুঃখকষ্ট দূরীভূত হইবে। আমি যাহা সৃষ্টি করিয়াছি, আমিই তাহা ধ্বংস করিতে পারি; অপরে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, আমি কখনও তাহা ধ্বংস করিতে সমর্থ হইব না। অতএব উঠ, সাহসী হও, বীর্যবান্ হও। সব দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ কর—জানিয়া রাখো, তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা। তুমি যে কিছু শক্তি বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। অতএব তুমি এখন এই জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাকো। 'গতস্য শোচনা নাস্তি'—অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে। সর্বদা মনে রাখিও, তোমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্যই সঞ্চিত থাকিবে; ইহাও স্মরণ রাখিবে, যেমন তোমার কৃত প্রত্যেক অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্য তোমার উপর ব্যাঘ্রের মতো লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত, তেমনি তোমার সৎচিন্তা ও সৎকার্যগুলি সহস্র দেবতার শক্তি লইয়া সর্বদা তোমাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত।

১ গীতা, ৫।১৫

অমৃতত্ব

[আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

জীবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষ যতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ঐ তত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে মানুষ সমগ্র জগৎ যত অধিক খুঁজিয়াছে, ঐ প্রশ্ন মানব-হৃদয়ের যেমন অন্তরতর ও প্রিয়তর, ঐ প্রশ্ন আমাদের অস্তিত্বের সহিত যেমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তেমন আর কোন্ প্রশ্ন হইতে পারে? কবিদিগের ইহা কল্পনার বিষয়, সাধু মহাত্মা জ্ঞানী—সকলেরই ইহা মহা চিন্তার বিষয়, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা ইহা আলোচনা করিয়াছেন, পথের ভিখারীও এই অমরত্বের স্বপ্ন দেখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ মানবগণ এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছেন—অপকৃষ্ট মানুষেরাও ইহা পাইবার আশা করিয়াছে। এই বিষয়ে লোকের আগ্রহ এখনও চলিয়া যায় নাই এবং যতদিন মানবপ্রকৃতি থাকিবে, ততদিন যাইবে না। জগতে এই সম্বন্ধে অনেকে অনেক উত্তর দিয়াছেন। আবার ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে দেখা যায় যে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই আলোচনা একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি এই প্রশ্ন তেমনি চিরনূতন রহিয়াছে। অনেক সময় জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত থাকিয়া এই প্রশ্ন আমরা যেন ভুলিয়া যাই। হঠাৎ কেহ কালগ্রাসে পতিত হইল—এমন কেহ যাহাকে আমি হয়তো খুব ভালবাসিতাম, যে আমার প্রাণের প্রিয়তম ছিল, হঠাৎ মৃত্যু তাহাকে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইল, তখন যেন মুহূর্তের জন্য এই সংসারের দ্বন্দ্ব কোলাহল—সব থামিয়া গেল, আর আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল—ইহার পরে কি? দেহান্তে আত্মার কি গতি হয়?

অভিজ্ঞতা হইতেই মানুষের জ্ঞান হয়; সুখ দুঃখ সব অনুভব না করিলে আমরা কোন বিষয় শিক্ষা করিতে পারি না। আমাদের বিচার, আমাদের জ্ঞান এই-সকল সামান্যীকৃত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। শ্রেণীবদ্ধ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও উহাদের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াই আমরা জ্ঞান লাভ করি। চতুর্দিকে চাহিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? ক্রমাগত পরিবর্তন! বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, আবার ঘুরিয়া উহা বীজরূপে পরিণত হয়। কোন প্রাণী জন্ম গ্রহণ করিল, কিছুদিন বাঁচিয়া মরিয়া গেল—এইরূপে যেন

একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হইল। মানুষ সম্বন্ধেও তেমনি। এমন কি, পর্বতসমূহ পর্যন্ত ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে গুঁড়াইয়া যাইতেছে, নদীসকল ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে শুকাইয়া যাইতেছে। সমুদ্র হইতে বৃষ্টি আসিতেছে, উহা আবার সমুদ্রে যাইতেছে। সর্বত্রই এক একটি বৃত্ত—জন্ম বৃদ্ধি ও নাশ যেন নির্ভুল-ভাবে যথাসময়ে একটির পর আর একটি আসিতেছে। ইহাই আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। তথাপি ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ প্রকারে বিভিন্ন নামরূপযুক্ত বস্তুরাশির অভ্যন্তরে ও অন্তরালে আমরা এক অখণ্ডভাব দেখিতে পাই। প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাই, যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এক পদার্থ হইতে আর এক পদার্থকে পৃথক্ করিতেছে বলিয়া মনে করা হইত, তাহা আজ ভাঙিয়া যাইতেছে; আধুনিক বিজ্ঞান সমুদয় পদার্থকে একই বস্তু বলিয়া বুঝিতেছে, কেবল যেন সেই এক প্রাণশক্তিই নানাভাবে ও নানারূপে আকারে প্রকাশ পাইতেছে, উহা যেন সব কিছুর মধ্যে এক শৃঙ্খলরূপে বিদ্যমান—এই-সকল বিভিন্ন রূপ যেন তাহার এক একটি অংশ—অনন্তরূপে বিস্তৃত অথচ সেই এক শৃঙ্খলেরই অংশ। ইহাকেই ক্রমোন্নতিবাদ বলে। এই ধারণা অতি প্রাচীন—মনুষ্যসমাজ যত প্রাচীন, এই ধারণাও তত প্রাচীন। কেবল মানুষের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই উহা যেন আমাদের চক্ষে আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রাচীনেরা আর একটি বিষয় বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন—'ক্রমসঙ্কোচ'। কিন্তু আধুনিকেরা এই তত্ত্বটি তত ভালরূপ বুঝেন না। বীজই বৃক্ষ হয়, একবিন্দু বালুকণা কখনও বৃক্ষ হয় না। পিতাই পুত্র হয়, মৃত্তিকাখণ্ড কখন সন্তান-রূপে জন্মে না। প্রশ্ন এই—এই ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্বের অবস্থাটি কি? বীজ পূর্বে কি ছিল? উহা সেই বৃক্ষরূপে ছিল। ঐ বীজে ভবিষ্যৎ একটি বৃক্ষের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশুতে ভবিষ্যৎ মানুষের সমুদয় শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সর্বপ্রকার ভবিষ্যৎ জীবনই অব্যক্তভাবে বীজে রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য কি? ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইহাকে 'ক্রমসঙ্কোচ' বলিতেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের আদিতেই একটি 'ক্রমসঙ্কোচ'-প্রক্রিয়া রহিয়াছে। যাহা পূর্ব হইতেই ছিল না, তাহার কখন ক্রমবিকাশ হইতে পারে না। এখানেও আধুনিক বিজ্ঞান আমাদিগকে সাহায্য করিয়া

থাকেন। গণিতের যুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহাদের সমষ্টি সর্বদাই সমান। তুমি একবিন্দু জড় বা একটুকু শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পার না। অতএব শূন্য হইতে কখনই ক্রমবিকাশ হয় না; তবে কোথা হইতে হয়? অবশ্য ইহার পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া হইয়া থাকিবে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্রমসঙ্কোচে শিশুর উৎপত্তি, আবার শিশু হইতে ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ায় মানুষের উৎপত্তি। সর্বপ্রকার জীবনের উৎপত্তির সম্ভাবনা তাহাদের বীজে রহিয়াছে। এখন এই সমস্যা যেন কিছু সরল হইয়া আসিতেছে। এখন এই তত্ত্বটির সঙ্গে পূর্বকথিত সমুদয় জীবনের অখণ্ডত্বের বিষয় আলোচনা কর। ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্যন্ত বাস্তবিক একটি সত্তা—একটি জীবনই বর্তমান। যেমন এক জীবনেই আমরা শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা দেখিতে পাই, সেইরূপ শৈশব-অবস্থার পূর্বে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া দেখ, যতক্ষণ না তুমি জীবাণুতে উপনীত হও। এইরূপে ঐ জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানুষে পর্যন্ত যেন একটি জীবনসূত্র বিদ্যমান। ইহাকেই ক্রমবিকাশ বলে এবং আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ রহিয়াছে। যে জীবনীশক্তি এই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতম মানব বা পৃথিবীতে আবির্ভূত ঈশ্বরাবতাররূপে ক্রমবিকশিত হয়—এই সবগুলি অবশ্যই জীবাণুতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছিল। এই সমগ্র শ্রেণীটি সেই এক জীবনেরই অভিব্যক্তি মাত্র, আর এই সমুদয় ব্যক্ত জগৎ সেই এক জীবাণুতেই অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল। এই সমগ্র প্রাণশক্তি—এমন কি মর্ত্যে অবতীর্ণ ঈশ্বর পর্যন্ত উহার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিলেন, অবতার-শ্রেণীর মানব পর্যন্ত অন্তর্নিহিত ছিলেন; কেবল ধীরে ধীরে, অতি ধীরে ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে মাত্র। সর্বোচ্চ চরম অভিব্যক্তি যাহা, তাহাও অবশ্যই বীজভাবে সূক্ষ্মাকারে উহার ভিতরে বর্তমান ছিল—তাহা হইলে যে এক শক্তি হইতে সমগ্র শ্রেণী বা শৃঙ্খলটি আসিয়াছে, উহা কাহার ক্রম-সঙ্কোচ? সেই সর্বব্যাপী প্রাণশক্তির ক্রমসঙ্কোচ আর এই যে ক্ষুদ্রতম জীবাণু নানা জটিল-যন্ত্রসমন্বিত উচ্চতম বুদ্ধিশক্তির আধাররূপ মানবাকারে অভিব্যক্ত হইতেছে, কোন্ বস্তু ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া ঐ জীবাণু-আকারে অবস্থান

করিতেছিল? উহা সর্বব্যাপী চৈতন্য—উহাই ঐ জীবাণুতে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া বর্তমান ছিল। উহা প্রথম হইতে পূর্ণভাবে বর্তমান ছিল। উহা যে একটু একটু করিয়া বাড়িতেছে, তাহা নয়। বৃদ্ধির ভাব মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। বৃদ্ধি বলিলেই যেন বোধ হয়, বাহির হইতে কিছু আসিতেছে। বৃদ্ধি মানিলে অস্বীকার করিতে হয়—অনন্ত সকল প্রাণে অন্তর্নিহিত আছে এবং উহা সর্বপ্রকার বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ। এই সর্বব্যাপী চৈতন্যের কখন বৃদ্ধি হয় না, উহা সর্বদাই পূর্ণভাবে বর্তমান ছিল, কেবল এখানে অভিব্যক্ত হইল মাত্র।

বিনাশের অর্থ কি? এই একটি গ্লাস রহিয়াছে। আমি উহা ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম, উহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। প্রশ্ন এই—গ্লাসটির কি হইল? উহা সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইল মাত্র। তবে বিনাশের কি অর্থ হইল? স্থূলের সূক্ষ্মভাবে পরিণতি। উহার উপাদান-পরমাণুগুলি একত্র হইয়া গ্লাস নামক 'কার্যে' পরিণত হইয়াছিল। উহারা আবার উহাদের কারণে চলিয়া যায়, আর ইহারই নাম নাশ—কারণে লয়। কার্য কি? না, কারণের ব্যক্তভাব। নতুবা কার্য ও কারণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। আবার ঐ গ্লাসের কথাই ধর। উহার উপাদানগুলি এবং উহার নির্মাতার ইচ্ছার সহযোগে উহা উৎপন্ন। এই দুইটিই উহার কারণ এবং উহাতে বর্তমান। নির্মাতার ইচ্ছাশক্তি এখন উহাতে কি ভাবে বর্তমান?—সংহতিশক্তিরূপে। ঐ শক্তি না থাকিলে উহার প্রত্যেক পরমাণু পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যাইত। তবে এখন কার্যটি কি? উহা কারণের সহিত অভেদ, কেবল উহা আর একরূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র। যখন কারণ নির্দিষ্ট কালের জন্য বা নির্দিষ্ট স্থানের ভিতর পরিণত, ঘনীভূত ও সীমাবদ্ধ ভাবে অবস্থান করে, তখন ঐ কারণটিকেই 'কার্য' বলে। আমাদের ইহা মনে করিয়া রাখা উচিত। এই তত্ত্বটিকে আমাদের জীবনের ধারণা-সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই যে, জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানুষ পর্যন্ত সমুদয় শ্রেণীই অবশ্য সেই বিশ্বব্যাপিনী প্রাণশক্তির সহিত অভেদ।

কিন্তু অমৃতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন এখানেও মিটিল না। আমরা কি পাইলাম? আমরা পূর্বোক্ত বিচার হইতে এইটুকু পাইলাম যে, জগতে কিছুরই ধ্বংস হয় না। নূতন কিছুই নাই—কিছু হইবেও না। সেই একই প্রকারের বস্তুরাশি চক্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতেছে। জগতে যত গতি আছে,

সবই তরঙ্গাকারে একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মতর রূপ হইতে প্রসূত হইতেছে—স্থূল রূপ ধারণ করিতেছে; আবার লয়প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করিতেছে। আবার ঐ সূক্ষ্মভাব হইতে তাহাদের স্থূলভাবে আগমন—কিছুদিনের জন্য সেই অবস্থায় স্থিতি, আবার ধীরে ধীরে সেই কারণে গমন। তবে কি যায়? না—রূপ, আকৃতি। সেই রূপটি নষ্ট হইয়া যায়, আবার আসে। একভাবে ধরিতে গেলে, এই শরীর পর্যন্ত অবিনাশী। একভাবে দেহসকল এবং রূপসকলও নিত্য। মনে কর, আমরা পাশা খেলিতেছি, ৬।৩।৯ পড়িল। আমরা আবার খেলিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্রমাগত খেলিতে খেলিতে এমন এক সময় নিশ্চয় আসিবে, যখন আবার ৬।৩।৯ পড়িবে। আবার খেলিতে থাকো, আবার উহা পড়িবে, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে। আমি এই জগতের প্রত্যেক পরমাণুকেই এক একটি পাশার সহিত তুলনা করিতেছি। এইগুলিকেই বার বার ফেলা হইতেছে, উহারা বারংবার নানাভাবে পড়িতেছে। এই তোমাদের সম্মুখে যে-সকল পদার্থ রহিয়াছে, তাহারা পরমাণুগুলির এক বিশেষ প্রকার সন্নিবেশে উৎপন্ন। এই এখানে গেলাস, টেবিল, জলের কুঁজা প্রভৃতি রহিয়াছে। উহারা ঐ পরমাণুগুলির সমবায়বিশেষ—মুহূর্ত পরেই হয়তো ঐ সমবায়গুলি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে, যখন আবার ঠিক ঐ সমবায়গুলি আসিয়া উপস্থিত হইবে—যখন তোমরা এখানে উপস্থিত থাকিবে, এই কুঁজা ও অন্যান্য যাহা কিছু রহিয়াছে, তাহারাও ঠিক তাহাদের যথাস্থানে থাকিবে, আর ঠিক এই বিষয়েই আলোচনা হইবে। অনন্ত বার এইরূপ হইয়াছে এবং অনন্ত বার এইরূপ হইবে। আমরা স্থূল, বাহ্য বস্তুসমূহের আলোচনা করিয়া উহা হইতে কি তত্ত্ব পাইলাম? পাইলাম, অনন্তকাল ধরিয়া এই ভৌতিক পদার্থসমূহের সমবায়ের পুনরাবৃত্তি হইতেছে।

এই সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আসে—ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব কি না? আপনারা অনেকে হয়তো এমন লোক দেখিয়াছেন, যিনি কোন ব্যক্তির ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারেন। যদি ভবিষ্যৎ কোন নিয়মের অধীন না হয়, তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, অতীত ঘটনারই ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহাতে কিন্তু আত্মার

কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নাগরদোলার কথা মনে কর। উহা অনবরত ঘুরিতেছে। একদল লোক আসিতেছে—তাহার এক একটাতে বসিতেছে। সেটি ঘুরিয়া আবার নীচে আসিতেছে। সেই দল নামিয়া গেল—আর একদল আসিল। ক্ষুদ্রতম জন্তু হইতে উচ্চতম মানুষ পর্যন্ত প্রকৃতির এই প্রত্যেক রূপটিই যেন এই একটি দল, আর প্রকৃতিই এই বৃহৎ নাগরদোলা ও প্রত্যেক শরীর বা রূপ এই নাগরদোলার এক একটি ঘরস্বরূপ। এক এক দল নূতন আত্মা উহাদের উপর আরোহণ করিতেছে এবং যতদিন না পূর্ণ হইতেছে, ততদিন উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতেছে এবং ঐ নাগরদোলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ নাগরদোলা থামিতেছে না, উহা সর্বদা চলিতেছে—সর্বদাই অপরকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে; এবং যতদিন শরীরগুলি এই চক্রের ভিতর, এই নাগরদোলার ভিতর রহিয়াছে, ততদিন নিশ্চয়ই গণিতের মতো সঠিকভাবে বলা যাইতে পারে যে, ঐগুলি কোথায় যাইবে, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাহা বলা অসম্ভব। অতএব প্রকৃতির ভূত ও ভবিষ্যৎ গণিতের মতো সঠিকভাবে বলা সম্ভব।

আমরা দেখিলাম, জড়-পরমাণুসকল এখন যেভাবে সংহত রহিয়াছে, সময়বিশেষে পুনরায় তাহাদের অনুরূপ সংহতি হইয়া থাকে। অনন্তকাল ধরিয়া এই জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য। কিন্তু ইহাতে তো আত্মার অমরত্ব প্রতিপন্ন হইল না। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, কোন শক্তিরই নাশ হয় না, কোন জড়বস্তুকে একেবারে ধ্বংস করা যাইতে পারে না।

তবে জড়বস্তুর কি হয়? উহার নানারূপ পরিণাম হইতে থাকে, অবশেষে যেখান হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইখানে উহা পুনরাবৃত্ত হয়। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পূর্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়, কারণ সরলরেখা অনন্তভাবে বর্ধিত করিলে বৃত্তে পরিণত হয়। তাহাই যদি হইল, তবে কোন আত্মারই অনন্তকালের জন্য অবনতি হইতে পারে না—উহা হইতেই পারে না। এই জগতে প্রত্যেক জিনিসই শীঘ্র বা বিলম্বে নিজ নিজ বৃত্তগতি সম্পূর্ণ করিয়া আবার নিজের উৎপত্তিস্থানে উপনীত হয়। তুমি, আমি আর এই-সকল আত্মা কি? আমরা পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ-ও ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব আলোচনা করিবার সময় দেখিয়াছি, তুমি আমি সেই বিরাট বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বা প্রাণ বা

মনের অংশবিশেষ; আমরা উহারই ক্রমসঙ্কোচ। সুতরাং আমরা আবার ঘুরিয়া ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া অনুসারে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যে ফিরিয়া যাইব—ঐ বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে—জড়বাদীরা উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা ইহাকেই সেই অনন্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত বস্তু বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ।

কিন্তু আত্মার অমরত্ব-প্রমাণে ইহাও পর্যাপ্ত হইল না। এখনও অনেক সংশয়—অনেক আশঙ্কা রহিয়া গেল। কোন শক্তির নাশ নাই—এ-কথা শুনিতে খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমরা যত শক্তি দেখিতে পাই, সবই মিশ্রণোৎপন্ন; যত রূপ দেখিতে পাই, তাহাও মিশ্রণোৎপন্ন। যদি তুমি শক্তিসম্বন্ধে বিজ্ঞানের মত ধরিয়া উহাকে কতকগুলি শক্তির সমষ্টিমাত্র বলো, তবে তোমার 'আমিত্ব' থাকে কোথায়? যাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই শীঘ্র বা বিলম্বে ইহাদের উপাদান-পদার্থে লয় পাইবে; যাহা কিছু কতকগুলি কারণের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহারই মৃত্যু—বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। শীঘ্র বা বিলম্বে উহা বিশ্লিষ্ট হইবে, ভগ্ন হইবে, উহাদের উপাদান-পদার্থে পরিণত হইবে। আত্মা শারীরিক শক্তি বা চিন্তাশক্তি নহে। উহা চিন্তাশক্তির স্রষ্টা; কিন্তু উহা চিন্তাশক্তি নহে। উহা শরীরের গঠনকর্তা, কিন্তু উহা শরীর নহে। কেন? শরীর কখন আত্মা হইতে পারে না; কারণ শরীর চৈতন্যবান্ নহে। মৃত ব্যক্তি অথবা কসাই-এর দোকানের একখণ্ড মাংস কখন চৈতন্যবান্ নহে। আমরা 'চৈতন্য' শব্দে কি বুঝি?—প্রতিক্রিয়া-শক্তি।

আর একটু গভীরভাবে এই তত্ত্বটি আলোচনা করা যাক। সম্মুখে এই কুঁজাটি দেখিতেছি। এখানে ঘটিতেছে কি? ঐ কুঁজা হইতে কতকগুলি আলোককিরণ আসিয়া আমার চক্ষে প্রবেশ করিতেছে। উহারা আমার অক্ষিজালের (retina) উপর একটি চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে। আর ঐ ছবি যাইয়া আমার মস্তিষ্কে উপনীত হইতেছে। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহাদিগকে সংজ্ঞাবহ স্নায়ু বলেন, তাহাদিগের দ্বারা ঐ চিত্র ভিতরে মস্তিষ্কে নীত হয়। তথাপি তখন পর্যন্ত দর্শনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কারণ এ পর্যন্ত ভিতর হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আসে নাই। মস্তিষ্কের ভিতর স্নায়ুকেন্দ্র উহাকে

মনের নিকট লইয়া যাইবে, আর মন উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এই প্রতিক্রিয়া হইবামাত্র ঐ কুঁজা আমার সম্মুখে ভাসিতে থাকিবে। একটি সহজ উদাহরণের দ্বারা ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। মনে কর, খুব একাগ্র-মনে আমার কথা শুনিতেছ, আর একটি মশা তোমার নাসিকাগ্রে দংশন করিতেছে, কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিতে এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, তুমি মশার কামড় মোটেই অনুভব করিতেছ না। এখানে কি ব্যাপার হইতেছে? মশাটি তোমার চামড়ার খানিকটা দংশন করিয়াছে; সেই স্থানে অবশ্য কতকগুলি স্নায়ু আছে; ঐ স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে; সেই ধারণা সেখানে রহিয়াছে; কিন্তু মন অন্যদিকে নিযুক্ত থাকায় প্রতিক্রিয়া করে নাই, সুতরাং তুমি মশকের দংশন টের পাও নাই। আমাদের সামনে নূতন চিত্র আসিল, কিন্তু মনে প্রতিক্রিয়া হইল না—এরূপ হইলে আমরা উহার সম্বন্ধে জানিতেই পারিব না, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হইলেই উহার জ্ঞান আসিবে—তখনই আমরা দেখিতে, শুনিতে এবং অনুভব করিতে সমর্থ হইব। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব আমরা বুঝিতেছি, শরীর প্রকাশ করিতে পারে না, কারণ আমরা দেখিতেছি যে, যখন আমার মনোযোগ ছিল না, তখন আমি অনুভব করি নাই। এমন ঘটনা জানা গিয়াছে, যাহাতে বিশেষ অবস্থায় একজন—যে-ভাষা কখন শিখে নাই, সেই ভাষা বলিতে সমর্থ হইয়াছে। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি অতি শৈশবাবস্থায় এমন জাতির ভিতর বাস করিত, যাহারা ঐ ভাষায় কথা বলিত—সেই সংস্কার তার মস্তিষ্কের মধ্যেই ছিল। সেইগুলি সেখানে সঞ্চিত ছিল; তারপর কোন কারণে মনে প্রতিক্রিয়া হইল—তখনই জ্ঞান আসিল। আর সেই ব্যক্তি সেই ভাষা বলিতে সমর্থ হইল। ইহাতেই আবার দেখা যাইতেছে, কেবল মনই পর্যাপ্ত নয়, মনও কাহারও হাতে যন্ত্র মাত্র। ঐ লোকটির বাল্যকালে তাহার মনের ভিতরই সেই ভাষা ছিল—কিন্তু সে উহা জানিত না, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিল, যখন সে উহা জানিতে পারিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মন ছাড়া আর কেহ আছেন—লোকটির শৈশবে সেই 'আর কেহ' ঐ শক্তির ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু যখন সে বড় হইল তখন তিনি উহার ব্যবহার করিলেন। প্রথম—এই শরীর, তারপর মন অর্থাৎ চিন্তার যন্ত্র, তারপর এই মনের পশ্চাতে

সেই 'আত্মা'। আধুনিক দার্শনিকগণ যেহেতু মনে করেন, চিন্তা মস্তিষ্কস্থ পরমাণুর পরিবর্তনের সহিত অভিন্ন, সেজন্য তাঁহারা পূর্বোক্ত ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিতে পারেন না; সেইজন্য তাঁহারা সাধারণতঃ উহা একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, মনের সহিত কিন্তু মস্তিষ্কের বিশেষ সম্বন্ধ এবং শরীরের নাশ হইলে উহা কার্য করিতে পারে না। আত্মাই একমাত্র প্রকাশক—মন উহার যন্ত্রস্বরূপ; বহিঃস্থ চক্ষুরাদি যন্ত্রে বিষয়ের চিত্র পতিত হয়, উহারা আবার ঐ চিত্রকে ভিতরে মস্তিষ্ককেন্দ্রে লইয়া যায়—কারণ তোমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি কেবল ঐ চিত্রের গ্রাহকমাত্র; ভিতরের যন্ত্র অর্থাৎ মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহই কার্য করিয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ঐ মস্তিষ্ককেন্দ্রগুলিকেই ইন্দ্রিয় বলে—তাহারা ঐ চিত্রগুলিকে লইয়া মনের নিকট সমর্পণ করে; মন আবার উহাদিগকে আরও ভিতরে নিজেরই আর এক স্তর চিত্তের মধ্য দিয়া সিংহাসনে আসীন মহামহিমান্বিত রাজার রাজা আত্মার সম্মুখে স্থাপন করে। তিনি সব দেখিয়া যাহা আবশ্যক, তাহা আদেশ করেন। তখনই মন ঐ মস্তিষ্ককেন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির উপর কার্য করে, উহারা আবার স্থূল শরীরের উপর কার্য করে। মানুষের আত্মাই বাস্তবিক এই সমুদয়ের অনুভবকর্তা, শাস্তা, স্রষ্টা—সবই। আমরা দেখিয়াছি, আত্মা শরীর নহে, মনও নহে। আত্মা কোন যৌগিক পদার্থ হইতে পারে না। কেন? কারণ যাহা কিছু যৌগিক পদার্থ, তাহাই আমাদের দর্শন বা কল্পনার বিষয়। যে জিনিস আমরা দর্শন বা কল্পনা করিতে পারি না, যাহাকে আমরা ধরিতে পারি না, যাহা শক্তি বা পদার্থ নহে, যাহা কারণ বা কার্য কিছুই নহে, তাহা যৌগিক হইতে পারে না। মনোজগৎ পর্যন্তই যৌগিক পদার্থের অধিকার—চিন্তাজগৎ আরও ব্যাপক। যৌগিক পদার্থ সমুদয়ই নিয়মের রাজ্যের মধ্যে—নিয়মের রাজ্যের বাহিরে উহারা থাকিতে পারে না; যদি থাকে তবে আর যৌগিক অবস্থায় নয়।

আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। এই গেলাস একটি যৌগিক পদার্থ —ইহার কারণগুলি মিলিত হইয়া এই কার্যরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই কারণগুলির সংহতি-রূপ গেলাস নামক যৌগিক পদার্থটি কার্যকারণ-নিয়মের অন্তর্গত। এইরূপে যেখানে যেখানে কার্যকারণ-সম্বন্ধ দেখা যাইবে—সেখানে সেখানেই যৌগিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাহার বাহিরে

উহার অস্তিত্বের কথা বলা বাতুলতা মাত্র। উহাদের বাহিরে আর কার্যকারণ-সম্বন্ধ খাটিতে পারে না—আমরা যে-জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা বা কল্পনা করিতে পারি, অথবা যাহা দেখিতে শুনিতে পারি, তাহারই ভিতর কেবল নিয়ম খাটিতে পারে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, যাহা আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব বা কল্পনা করিতে পারি, তাহাই আমাদের জগৎ; উহা বাহ্যবস্তু হইলে আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আর ভিতরের বস্তু হইলে উহা মানস-প্রত্যক্ষ বা কল্পনা করিতে পারি; অতএব যাহা আমাদের শরীরের বাহিরে, তাহা ইন্দ্রিয়ের বাহিরে এবং যাহা কল্পনার বাহিরে, তাহা আমাদের মনের বাহিরে, সুতরাং আমাদের জগতের বাহিরে। অতএব কার্যকারণ-সম্বন্ধের বাহিরে স্বাধীন শাস্তা আত্মা রহিয়াছেন; এবং এই আত্মা কার্যকারণ-নিয়মের অন্তর্গত সব কিছু শাসন করিতেছেন। এই আত্মা নিয়মের অতীত, সুতরাং অবশ্যই তিনি মুক্তস্বভাব; তিনি কোনরূপ মিশ্রণোৎপন্ন পদার্থ হইতে পারেন না অথবা কোন কারণের কার্য হইতে পারেন না। তাঁহার কখন বিনাশ হইতে পারে না, কারণ 'বিনাশ' অর্থে কোন যৌগিক পদার্থের স্বীয় মৌলিক উপাদানে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং যাহা কখন সংযোগোৎপন্ন ছিল না, তাহার বিনাশ হইবে কিরূপে? তাহার মৃত্যু হয় বা বিনাশ হয় বলা নিছক প্রলাপোক্তি।

কিন্তু এখানেই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না। এইবারে আমরা বড় কঠিন জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি—বড় সূক্ষ্ম সমস্যায় আসিয়া পড়িয়াছি। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো ভয় পাইবে। আমরা দেখিয়াছি—পদার্থ শক্তি ও চিন্তা-রূপ ক্ষুদ্র জগতের অতীত বলিয়া আত্মা একটি মূলবস্তু; সুতরাং উহার বিনাশ অসম্ভব। যাহার মৃত্যু নাই, তাহার জীবনও অসম্ভব। জন্ম ও মৃত্যু একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ মাত্র। মৃত্যুর আর এক নাম জীবন এবং জীবনের আর এক নাম মৃত্যু। অভিব্যক্তির একটি রূপকে আমরা জীবন বলি, আবার উহারই অন্যপ্রকার রূপকে মৃত্যু বলি। তরঙ্গের উত্থানকে জীবন, আর পতনকে মৃত্যু বলি। যদি কোন বস্তু মৃত্যুর অতীত হয়, তবে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তাহা জন্মেরও অতীত। প্রথম সিদ্ধান্তই এখন স্মরণ কর যে, মানবাত্মা সেই সর্বব্যাপী শক্তি অথবা ঈশ্বরের প্রকাশমাত্র। আমরা এখন পাইলাম, আত্মা জন্মমৃত্যু উভয়েরই অতীত। তোমার কখনও জন্ম হয় নাই, তোমার মৃত্যুও কখন হইবে না। জন্মমৃত্যু কি, কাহারই বা

হয়? জন্মমৃত্যু দেহের—আত্মা তো সদা সর্বদা বর্তমান। এ কিরূপে সম্ভব? আমরা এই এখানে এতগুলি লোক বসিয়া রহিয়াছি, আর আপনি বলিতেছেন আত্মা সর্বব্যাপী! নিশ্চয়, যে-জিনিস নিয়মের বাহিরে, কার্যকারণ-সম্বন্ধের বাহিরে, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? এই গেলাসটি সসীম—ইহা সর্বব্যাপী নহে, কারণ চারিদিকের জড়রাশি উহাকে ঐরূপ বিশেষ আকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছে—উহাকে সর্বব্যাপী হইতে দিতেছে না। চারিদিকের সমুদয় বস্তুই উহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে—এই হেতু উহা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যাহা সকল নিয়মের বাহিরে, যাহার উপর কার্য করিবার কেহই নাই, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? উহা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে। তুমি জগতের সর্বত্রই রহিয়াছ। তবে 'আমি জন্মিলাম, মরিব'—এ-সকল ভাব কি? এগুলি অজ্ঞানের কথা মাত্র, বুঝিবার ভুল। তুমি কখন জন্মাও নাই, মরিবেও না। তোমার জন্ম হয় নাই, পুনর্জন্মও কখন হইবে না। যাওয়া-আসার অর্থ কি? কেবল পাগলামি মাত্র। তুমি সর্বত্রই রহিয়াছ। তবে এই যাওয়া-আসার অর্থ কি? উহা কেবল সূক্ষ্ম শরীর—যাহাকে তোমরা মন বলো, তাহারই নানাবিধ পরিণাম-প্রসূত ভ্রম-মাত্র। যেন আকাশের উপর দিয়া একখণ্ড মেঘ যাইতেছে। উহা যখন চলিতে থাকে, তখন মনে হয় আকাশই চলিতেছে। অনেক সময় তোমরা দেখিয়া থাকিবে, চাঁদের উপর মেঘ চলিতেছে। তোমরা মনে কর, চাঁদই এখান হইতে ওখানে যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মেঘই চলিতেছে। আরও দেখ, যখন রেলগাড়িতে যাও, মনে হয় সম্মুখের গাছপালা মাঠ—সব যেন দৌড়াইতেছে; যখন নৌকায় চলিতে থাকো, তখন মনে হয় যে জলই চলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, তুমি কোথাও যাইতেছ না, আসিতেছ না—তোমার জন্ম হয় নাই, কখন হইবেও না; তুমি অনন্ত, সর্বব্যাপী, সকল কার্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, নিত্যমুক্ত, অজ ও অবিনাশী। যখন জন্মই নাই, তখন বিনাশের আবার অর্থ কি? বাজে কথা মাত্র—তোমরা সকলেই সর্বব্যাপী।

কিন্তু নির্দোষ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আর এক ধাপ অগ্রসর হইতে হইবে। মধ্যপথে আপস করা চলিবে না।

তোমরা দার্শনিক, তোমরা যদি খানিক দূর বিচারে অগ্রসর হইয়া বলো, 'আর পারি না, ক্ষমা করুন,' তাহা তোমাদের পক্ষে সাজে না। যখন আমরা সমুদয় নিয়মের অতীত, তখন অবশ্যই আমরা সর্বজ্ঞ, নিত্যানন্দস্বরূপ; অবশ্য সকল জ্ঞানই আমাদের ভিতরে আছে, সর্বপ্রকার শক্তি—সর্বপ্রকার কল্যাণ আমাদের মধ্যে নিহিত আছে। অবশ্য তোমরা সকলেই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী; কিন্তু এমন পুরুষ কি জগতে বহু থাকিতে পারে? কোটি কোটি সর্বব্যাপী পুরুষ কেমন করিয়া থাকিবে? অবশ্যই থাকিতে পারে না। তবে আমাদের কি হইবে? বাস্তবিক একজনই আছেন, একটি আত্মাই আছেন, আর সেই এক আত্মা তুমিই। এই ক্ষুদ্র প্রকৃতির পশ্চাতে রহিয়াছে সেই এক আত্মা। এক পুরুষই আছেন—যিনি একমাত্র সত্তা, যিনি নিত্যানন্দ-স্বরূপ, যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, জন্ম ও মৃত্যু-রহিত। তাঁহার আজ্ঞায় আকাশ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য কিরণ দিতেছে, সকলেই প্রাণধারণ করিতেছে। তিনিই প্রকৃতির ভিত্তিস্বরূপ; প্রকৃতি সেই সত্যস্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি তোমার আত্মারও ভিত্তিস্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, তুমিই তিনি। তুমি তাঁহার সহিত অভেদ।[1] যেখানেই দুই—সেখানেই ভয়, সেইখানেই বিপদ, সেইখানেই দ্বন্দ্ব, সেইখানেই বিবাদ। যখন সবই এক, তখন কাহাকে ঘৃণা করিব, কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিব? যখন সবই তিনি, তখন কাহার সহিত যুদ্ধ করিব? ইহাতেই জীবন-সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়, ইহাতেই বস্তুর স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়া যায়। ইহাই সিদ্ধি বা পূর্ণতা এবং ইহাই ঈশ্বর। যখন তুমি বহু দেখিতেছ, তখনই বুঝিতে হইবে—তুমি অজ্ঞানের ভিতর রহিয়াছ।[2] এই বহুত্বপূর্ণ জগতের ভিতর, এই পরিবর্তনশীল জগতের অন্তরে অবস্থিত নিত্য পুরুষকে যিনি নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন—নিজের স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন। অতএব জানিয়া রাখো যে, তুমিই তিনি, তুমিই জগতের ঈশ্বর—'তত্ত্বমসি'; আর এই যে আমাদের বিভিন্ন ধারণা—যথা, আমি পুরুষ

১ বৃহ. উপ., ৪।৪।১৫; ছান্দোগ্য উপ., ৭।২৪

২ কঠ উপ., ২।১।১১

বা স্ত্রী, দুর্বল বা সবল, সুস্থ বা অসুস্থ, আমি অমুককে ঘৃণা করি বা অমুককে ভালবাসি, আমার ক্ষমতা অল্প বা আমার অনেক শক্তি আছে, এগুলি ভ্রমমাত্র। এই-সব ভাব ছাড়িয়া দাও। কিসে তোমাকে দুর্বল করিতে পারে? কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে? একমাত্র তুমিই জগতে বিরাজ করিতেছ। কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে? অতএব উঠ, মুক্ত হও। জানিয়া রাখো, যে-কোন চিন্তা বা বাক্য আমাদিগকে দুর্বল করে, একমাত্র তাহাই অশুভ; যাহা কিছু মানুষকে দুর্বল করে, ভীত করে, একমাত্র তাহাই অশুভ; তাহাই পরিহার করিতে হইবে। কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে? যদি শত শত সূর্য স্থানচ্যুত হয়, কোটি কোটি চন্দ্র গুঁড়াইয়া যায়, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হয়, তাহাতে তোমার কি? অচলবৎ দণ্ডায়মান হও, তুমি অবিনাশী। তুমি জগতের আত্মা, ঈশ্বর। বলো, 'শিবোঽহং শিবোঽহং, আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ'। সিংহ যেমন পিঞ্জর ভাঙিয়া ফেলে, সেইরূপ এই শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলো এবং অনন্তকালের জন্য মুক্ত হও। কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে? কিসে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে?—কেবল অজ্ঞান, কেবল ভ্রম; আর কিছুই তোমাকে বাঁধিতে পারে না; তুমি শুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়।

নির্বোধেরাই বলিয়া থাকে—তোমরা পাপী, অতএব এক কোণে বসিয়া হা-হুতাশ কর। এরূপ বলা নির্বুদ্ধিতা—দুষ্টামি ও শঠতা। তোমরা সকলেই ঈশ্বর। তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখিতেছ না এবং তাঁহাকেই মানুষ বলিতেছ না? অতএব যদি তোমরা সাহসী হও, তবে এই বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র জীবনকে ঐ ছাঁচে গঠন কর। যদি কোন ব্যক্তি তোমার গলা কাটিতে আসে, তাহাকে 'না' বলিও না, কারণ তুমি নিজেই নিজের গলা কাটিতেছ। কোন গরীব লোকের যদি কিছু উপকার কর, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র অহঙ্কৃত হইও না। উহা তোমার পক্ষে উপাসনা মাত্র; উহাতে অহঙ্কারের কিছুই নাই। সমুদয় জগৎই কি তুমি নও? এমন কোথায় কি জিনিস আছে, যাহা তুমি নও? তুমি জগতের আত্মা। তুমিই সূর্য, চন্দ্র, তারা। সমুদয় জগৎই তুমি। কাহাকে ঘৃণা করিবে? কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিবে? অতএব জানিয়া রাখো, তিনিই তুমি—আর সমুদয় জীবন ঐ ছাঁচে গঠন কর। যে-ব্যক্তি এই তত্ত্ব জানিয়া এই ভাবে তাহার জীবন গঠন করে, সে আর কখনও অন্ধকারে লুটাইয়া পড়িবে না।

বহুত্বে একত্ব

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ৩রা নভেম্বর, ১৮৯৬]

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্‌।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌ ॥[1]

—'স্বয়ম্ভূ সৃষ্টিকর্তা ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করিয়া দিয়াছেন, সেইজন্যই মনুষ্য বাহিরের দিকে—বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্তচক্ষু সংযতেন্দ্রিয় এবং অমৃতত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অন্তরস্থ আত্মাকে দেখিতে থাকেন। আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে এবং আরও অন্যান্য গ্রন্থে জগতের যে তত্ত্বানুসন্ধান হইতেছিল, তাহাতে বহিঃপ্রকৃতির তত্ত্ব আলোচনা করিয়াই জগৎকারণের অনুসন্ধান-চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার পর এই সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে এক নূতন আলোকের প্রকাশ হইল; তাঁহারা বুঝিলেন, বহির্জগতে অনুসন্ধান দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানিবার উপায় নাই। তবে কি করিয়া জানিতে হইবে? বাহিরের দিকে চাহিয়া নয়, ভিতরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া। আর এখানে আত্মার বিশেষণ-রূপে যে 'প্রত্যক্‌' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও বিশেষ ভাবব্যঞ্জক। 'প্রত্যক্‌' কি না, যিনি ভিতর দিকে গিয়াছেন—আমাদের অন্তরতম বস্তু হৃদয়কেন্দ্র, সেই পরমবস্তু যাহা হইতে সব-কিছুই যেন বাহির হইয়াছে, সেই মধ্যবর্তী সূর্য—আত্মা, মন, শরীর, ইন্দ্রিয় এবং আর যাহা কিছু আমাদের আছে, সবই যেন তাঁহার কিরণজাল।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্‌।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥[2]

—বালকবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহিরের কাম্যবস্তুর অনুসরণ করে। এইজন্যই তাহারা সর্বতোব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্তু জ্ঞানীরা অমৃতত্বকে জানিয়া অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করেন না। এখানেও ঐ একই ভাব পরিস্ফুট হইল যে, সসীম-বস্তুপূর্ণ বাহ্যজগতে অনন্তকে

---

১ কঠ. উপ., ২।১।১

২ ঐ., ২।১।২

দেখিবার চেষ্টা করা বৃথা—অনন্তেই অনন্তকে অন্বেষণ করিতে হইবে এবং আমাদের অন্তর্বর্তী আত্মাই একমাত্র অনন্ত বস্তু। শরীর, মন—যে জগৎপ্রপঞ্চ আমরা দেখিতেছি, অথবা আমাদের চিন্তারাশি—কিছুই অনন্ত হইতে পারে না। উহাদের সকলেরই কালে উৎপত্তি ও কালে বিলয়। যে দ্রষ্টা সাক্ষী পুরুষ সব-কিছু দেখিতেছেন, অর্থাৎ মানুষের আত্মা, যিনি সদা জাগ্রত, তিনিই একমাত্র অনন্ত, তিনিই জগতের কারণ-স্বরূপ; অনন্তকে অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে অনন্ত আত্মাতেই যাইতে হইবে—সেইখানেই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥[১]

—যিনি এখানে, তিনিই সেখানে; যিনি সেখানে, তিনিই এখানে। যিনি এখানে 'নানা' দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন। সংহিতাভাগে দেখিতে পাই, আর্যগণের স্বর্গে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা। যখন তাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তখন স্বভাবতই তাঁহাদের এমন একস্থানে যাইবার ইচ্ছা হইল, যেখানে কেবল দুঃখসম্পর্কশূন্য সুখ। এই স্থানগুলির নাম স্বর্গ—যেখানে কেবল আনন্দ, যেখানে শরীর অজর অমর হইবে, মনও পরিপূর্ণ হইবে, তাঁহারা সেখানে চিরকাল পিতৃগণের সহিত বাস করিবেন। কিন্তু দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয়ে এইরূপ স্বর্গের ধারণা অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্ত কাল স্থানবিশেষে বিদ্যমান—এই ভাবই যে স্ববিরোধী। দেশ অবশ্যই কালে উৎপন্ন ও নষ্ট হইবে, সুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা ত্যাগ করিতে হইল। আর্যগণ ক্রমশঃ বুঝিলেন, এই স্বর্গনিবাসী দেবতাগণ এককালে এই জগতে মনুষ্য ছিলেন, পরে হয়তো কোন সৎকর্মবশে দেবতা হইয়াছেন; সুতরাং এই দেবত্ব বিশেষ অবস্থা বা বিভিন্ন পদের নাম মাত্র। বৈদিক কোন দেবতাই স্থায়ী ব্যক্তিবিশেষ নন।

ইন্দ্র বা বরুণ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। উহারা বিভিন্ন পদের নাম। তাঁহাদের মতে যিনি পূর্বে ইন্দ্র ছিলেন, এখন আর তিনি ইন্দ্র নহেন, তাঁহার এখন আর ইন্দ্রত্ব-পদ নাই, আর একজন এখান হইতে গিয়া সেই পদ

১ কঠ উপ., ২।১।১১

অধিকার করিয়াছেন। সকল দেবতার সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। যে-সকল মানুষ কর্মবলে দেবত্ব-পদের যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই এই-সকল পদে সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইঁহাদেরও বিনাশ আছে। প্রাচীন ঋগ্বেদে দেবতাগণ সম্বন্ধে এই 'অমরত্ব' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে উহা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ ঋষিরা দেখিতে পাইলেন—এই অমরত্ব দেশকালের অতীত বলিয়া কোন শরীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, উহা যতই সূক্ষ্ম হউক। উহা যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, দেশকালে উহার উৎপত্তি, কারণ আকৃতির প্রধান উপাদান দেশ। দেশ-ব্যতীত আকৃতি ভাবিতে চেষ্টা কর, উহা অসম্ভব। দেশই আকার নির্মাণ করিবার একটি বিশিষ্ট উপাদান—এই আকৃতির নিরন্তর পরিবর্তন হইতেছে। দেশ ও কাল মায়ার ভিতরে। আর স্বর্গ যে এই পৃথিবীরই মতো দেশকালে সীমাবদ্ধ—এই ভাবটি উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকাংশে ব্যক্ত হইয়াছে: 'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ'[১]—যাহা এখানে তাহা সেখানে, যাহা সেখানে তাহা এখানে। যদি এই দেবতারা থাকেন, তবে এখানে যে নিয়ম, সেই নিয়ম সেখানেও খাটিবে; আর সকল নিয়মের চরম উদ্দেশ্য—ধ্বংস এবং পুনরায় নূতন রূপ-ধারণ। এই নিয়মের দ্বারা সমুদয় জড় বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইতেছে, আবার ভগ্ন হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সেই জড়কণায় পরিণত হইতেছে। যে-কোন বস্তুর উৎপত্তি আছে, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব যদি স্বর্গ থাকে, তবে তাহাও এই নিয়মের অধীন।

আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে সর্বপ্রকার সুখের পশ্চাতে ছায়ার মতো দুঃখ আসিয়া থাকে। জীবনের পশ্চাতে উহার ছায়াস্বরূপ মৃত্যু রহিয়াছে। উহারা সর্বদা একসঙ্গেই থাকে। কারণ উহারা পরস্পর বিরোধী নহে, উহারা দুইটি পৃথক্ সত্তা নহে, উহারা একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ, সেই এক বস্তুই জীবন-মৃত্যু, দুঃখ-সুখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভাল আর মন্দ—এই দুইটি যে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, আর উহারা যে অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, এ ধারণা একেবারেই অসঙ্গত। উহারা বাস্তবিক একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ—উহা কখন ভালরূপে, কখন বা মন্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র।

১ কঠ উপ., ২।১।১০

বিভিন্নতা প্রকারগত নহে, পরিমাণগত। বস্তুতঃ উহাদের প্রভেদ মাত্রার তারতম্যে। আমরা বাস্তবিক দেখিতে পাই, একই স্নায়ুপ্রণালী ভাল-মন্দ উভয়বিধ প্রবাহই বহন করিয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলী যদি কোনরূপে বিকৃত হয়, তাহা হইলে কোনরূপ অনুভূতিই হইবে না। মনে কর, কোন একটি বিশেষ স্নায়ু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল, তখন তাহার মধ্য দিয়া যে সুখকর অনুভূতি আসিত, তাহা আসিবে না,—আবার দুঃখকর অনুভূতিও আসিবে না। এই সুখ-দুঃখ কখনই পৃথক্ নয়, উহারা সর্বদাই যেন একত্র রহিয়াছে। আবার একই বস্তু জীবনে বিভিন্ন সময়ে কখন সুখ, কখন বা দুঃখ উৎপাদন করে। একই বস্তু কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ উৎপাদন করে। মাংসভোজনে ভোক্তার সুখ হয় বটে, কিন্তু যে প্রাণীর মাংস খাওয়া হয়, তাহার তো ভয়ানক কষ্ট। এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা সকলকে সমভাবে সুখ দিতেছে। কতকগুলি লোক সুখী হইতেছে, আবার কতকগুলি লোক অসুখী হইতেছে। এইরূপ চলিবে। অতএব স্পষ্টই দেখা গেল, দ্বৈতভাব বাস্তবিক মিথ্যা। ইহা হইতে কি পাওয়া গেল? আমি পূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি, জগতে এমন অবস্থা কখন আসিতে পারে না, যখন সবই ভাল হইয়া যাইবে, মন্দ কিছুই থাকিবে না। ইহাতে অনেকের চিরপোষিত আশা চূর্ণ হইতে পারে বটে, অনেকে ইহাতে ভয়ও পাইতে পারেন বটে, কিন্তু ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমি অন্য উপায় দেখিতেছি না। অবশ্য আমাকে যদি কেহ বিপরীতটি বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে আমি বুঝিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যতদিন না কেহ আমাকে উহা বুঝাইয়া দিতেছে, আমি ঐরূপ বলিতে পারি না।

আমার এই দৃঢ় উক্তির বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি আছে: ক্রমবিকাশের গতিক্রমে কালে যাহা কিছু অশুভ দেখিতেছি, সব চলিয়া যাইবে—ইহার ফল এই হইবে যে, এইরূপ কমিতে কমিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন সমুদয় অশুভের উচ্ছেদ হইয়া কেবল শুভ অবশিষ্ট থাকিবে। আপাততঃ ইহা খুবই অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা সত্য হইলে বড়ই সুখের হইত, কিন্তু এই যুক্তিতে একটি দোষ আছে। তাহা এই: উহা ধরিয়া লইতেছে যে, শুভ ও অশুভ—এই দুইটির পরিমাণ চিরনির্দিষ্ট। উহা স্বীকার করিয়া লইতেছে যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অশুভ আছে, ধর তাহা যেন ১০০, আবার

এইরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ শুভও আছে, আর অশুভ ক্রমশঃ কমিতেছে, শুভটি কেবল অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, শুভের ন্যায় অশুভও একটি ক্রমবর্ধমান সামগ্রী। সমাজের খুব নিম্নস্তরের ব্যক্তির কথা ধর—সে জঙ্গলে বাস করে, তাহার ভোগসুখ অতি অল্প, সুতরাং তাহার দুঃখও অল্প। তাহার দুঃখ কেবল ইন্দ্রিয়বিষয়েই আবদ্ধ। সে যদি প্রচুর আহার না পায়, তবে সে দুঃখিত হয়। তাহাকে প্রচুর খাদ্য দাও, তাহাকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ ও শিকার করিতে দাও, সে ঠিক ঠিক সুখী হইবে। তাহার সুখ-দুঃখ সবই কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ। মনে কর, সেই ব্যক্তির জ্ঞানের উন্নতি হইল। তাহার সুখ বাড়িতেছে, তাহার বুদ্ধি খুলিতেছে, সে পূর্বে ইন্দ্রিয়ে যে সুখ পাইত, এখন বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া সেই সুখ পাইতেছে। সে এখন একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করিয়া অপূর্ব সুখ আস্বাদন করে। গণিতের যে-কোন সমস্যার মীমাংসায় তাহার সারা জীবন কাটিয়া যায়, তাহাতেই সে পরম সুখ ভোগ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অসভ্য অবস্থায় যে তীব্র যন্ত্রণা সে অনুভব করে নাই, তাহার স্নায়ুগণ সেই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়াছে, অতএব সে তীব্র মানসিক কষ্ট ভোগ করে। একটি খুব সোজা উদাহরণ লও: তিব্বতে বিবাহ নাই, সুতরাং সেখানে প্রেমের ঈর্ষাও নাই; কিন্তু তথাপি আমরা জানি, বিবাহ অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের পরিচায়ক। তিব্বতীরা নিষ্কলঙ্ক স্বামী ও নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীর বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেমের সুখ জানে না। কিন্তু তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানে না—একজন ভ্রষ্ট বা ভ্রষ্টা হইলে অপরের মনে কি ভয়ানক ঈর্ষা, কি ভয়ানক অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়! একদিকে এই উচ্চ ধারণায় তাহাদের সুখের বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু অপর দিকে ইহাতে দুঃখেরও বৃদ্ধি হইল।

তোমাদের নিজেদের দেশের কথাই ধর—পৃথিবীতে ইহার মতো ধনী দেশ, বিলাসিতার দেশ আর নাই—আবার কি গভীর দুঃখকষ্ট এখানে বিরাজ করিতেছে, তাহাও দেখ। অন্যান্য জাতির তুলনায় এদেশে পাগলের সংখ্যা কত অধিক! ইহার কারণ এখানকার লোকের বাসনাসমূহ অতি তীব্র, অতি প্রবল। এখানে লোককে সর্বদাই উঁচু চাল বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। তোমরা এক বছরে যত টাকা খরচ কর, একজন ভারতবাসীর পক্ষে তাহা সারাজীবনের সম্পদ্। তোমরা অপরকে উপদেশ দিতে পার না যে, অপেক্ষাকৃত

অল্প টাকায় জীবনযাত্রানির্বাহ করিতে চেষ্টা কর, কারণ এখানে সামাজিক অবস্থাই এইরূপ যে, এত টাকার কমে চলিবেই না। এই সমাজ-চক্র দিবারাত্র ঘুরিতেছে—উহা বিধবার অশ্রু বা অনাথের চীৎকারে কর্ণপাতও করিতেছে না। এখানে সর্বত্রই এই অবস্থা। তোমাদের ভোগের ধারণাও অনেক পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমাদের সমাজও অন্যান্য সমাজ হইতে অনেক সুন্দর। তোমাদের ভোগেরও নানাবিধ উপায় আছে। কিন্তু যাহাদের ঐরূপ ভোগের উপকরণ অল্প, তাহাদের আবার তোমাদের অপেক্ষা দুঃখ অল্প। এরূপই সর্বত্র দেখিতে পাইবে। তোমার মনে যতদূর উচ্চাভিলাষ থাকিবে, তোমার তত বেশী সুখ, আবার সেই পরিমাণেই দুঃখ। একটি যেন অপরটির ছায়াস্বরূপ। অশুভ চলিয়া যাইতেছে, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে শুভও চলিয়া যাইতেছে, বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দুঃখ যেমন একদিকে কমিতেছে, তেমনি কি আবার অন্যদিকে কোটিগুণ বাড়িতেছে না? প্রকৃত কথা এই, সুখ যদি সমযুক্তান্তর নিয়মানুসারে বাড়িতে থাকে, দুঃখ তাহা হইলে সমগুণিতান্তর নিয়মানুসারে বাড়িতেছে, বলিতে হইবে। ইহার নামই মায়া। ইহা কেবল সুখবাদ নহে, কেবল দুঃখবাদও নহে। বেদান্ত বলে না যে, জগৎ কেবল দুঃখময়। এরূপ বলাই ভুল। আবার এই জগৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ, এরূপ বলাও ঠিক নহে। এই জগৎ কেবল মধুময়—এখানে কেবল সুখ, এখানে কেবল ফুল, এখানে কেবল সৌন্দর্য, কেবল মধু—বালকদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া ভুল। আমরা সারা জীবনটাই এই রূপ স্বপ্ন দেখি। আবার কোন ব্যক্তি অন্যের অপেক্ষা অধিক দুঃখভোগ করিয়াছে বলিয়া সবই দুঃখময়, বলাও ভুল। জগৎ এই দ্বৈতভাবপূর্ণ ভাল-মন্দের খেলা। বেদান্ত আবার ইহার উপর আর একটি কথা বলে। মনে করিও না যে, ভাল-মন্দ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, বাস্তবিক উহারা একই বস্তু, সেই এক বস্তুই বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন আকারে আবির্ভূত হইয়া এক ব্যক্তিরই মনে বিভিন্ন ভাব সৃষ্টি করিতেছে। অতএব বেদান্তের প্রথম কার্যই হইতেছে, এই বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান বাহ্যজগতের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করা। পারসীকদের মত—দুইটি দেবতা মিলিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; এ মতটি অবশ্য অতি অনুন্নত মনের পরিচায়ক। তাঁহাদের মতে ভাল দেবতা যিনি, তিনি সব সুখ বিধান করিতেছেন, আর মন্দ দেবতা সব মন্দ বিষয়

বিধান করিতেছেন। ইহা যে অসম্ভব, তাহা তো স্পষ্টই বোধ হইতেছে; কারণ বাস্তবিক এই নিয়মে কার্য হইলে প্রত্যেক প্রাকৃতিক নিয়মেরই দুইটি করিয়া অংশ থাকিবে—কখন একজন দেবতা উহা চালাইতেছেন, তিনি সরিয়া গেলেন, আবার আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখিতে পাই, যে-শক্তি আমাদিগকে খাদ্য দিতেছে, তাহাই আবার দৈবদুর্বিপাক দ্বারা অনেককে সংহার করিতেছে। এই মত স্বীকার করিলে আর একটি মুশকিল হয় এই যে, একই সময়ে দুই জন দেবতা কার্য করিতেছেন। একস্থানে এক দেবতা কাহারও উপকার করিতেছেন, অন্যস্থানে অন্য দেবতা কাহারও অপকার করিতেছেন। অথচ দুইজনে আপনাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতেছেন—ইহা কি করিয়া হইতে পারে? অবশ্য এ মত জগতের দ্বৈততত্ত্ব প্রকাশ করিবার খুব অপরিণত প্রণালীমাত্র—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এখন উচ্চতর দর্শনসমূহে এই বিষয়ের কিরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাক। ঐগুলিতে স্থূল তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্ম ভাবের দিক দিয়া বলা হয়, জগৎ কতক ভাল, কতক মন্দ। পূর্বে যে যুক্তিপরম্পরা বিবৃত হইয়াছে, তদনুসারে ইহাও অসম্ভব।

অতএব দেখিতেছি, কেবল সুখবাদ বা কেবল দুঃখবাদ—কোন মতের দ্বারাই জগতের ব্যাখ্যা বা যথার্থ বর্ণনা হয় না। এ জগৎ সুখ-দুঃখের মিশ্রণ। ক্রমশঃ আমরা দেখিব, সমুদয় দোষ প্রকৃতির স্কন্ধ হইতে আমাদের নিজেদের উপর লওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত আমাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে। বেদান্ত অমঙ্গল অস্বীকার না করিয়া জগতের সমুদয় ঘটনার সম্মুখীন হইয়া বিশ্লেষণ করে,—কোন বিষয় গোপন করিতে চাহে না; উহা মানুষকে একেবারে নিরাশা-সাগরে ভাসাইয়া দেয় না। উহা অজ্ঞেয়-বাদীও নহে। উহা এই সুখদুঃখ প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, আর ঐ প্রতীকারের উপায় বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা এমন কোন উপায়ের কথা বলে না, যাহাতে কেবল ছেলেদের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় বা তাহাদের চোখে ধূলি দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা উহা সহজেই ধরিয়া ফেলিবে। আমার মনে আছে—যখন আমি বালক ছিলাম, তখন কোন যুবকের পিতা মারা যায়, সে অতি দরিদ্র

হইয়া পড়ে, একটি বড় পরিবার তাহার ঘাড়ে পড়িল। সে দেখিল, তাহার পিতার বন্ধুগণই তাহার প্রধান শত্রু। একদিন একজন ধর্মযাজকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে তাহার নিজ দুঃখের কাহিনী তাঁহাকে বলিতে লাগিল—তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ধর্মযাজকটি বলিলেন, 'যাহা হইতেছে, সবই মঙ্গলের জন্য; যাহা কিছু হয়, সব ভালোর জন্যই হয়।' পুরাতন ক্ষতকে সোনার পাত দিয়া মুড়িয়া রাখা যেমন, ধর্মযাজকের পূর্বোক্ত বাক্যটিও ঠিক তেমনি। ইহা আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও অজ্ঞানের পরিচয় মাত্র। ছয় মাস বাদে সেই ধর্মযাজকের একটি সন্তান হইল, সেই উপলক্ষে উৎসবে যুবকটি নিমন্ত্রিত হইল। ধর্মযাজক ভগবানের উপাসনা আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঈশ্বরের কৃপার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।' তখন যুবকটি উঠিয়া বলিল, 'কি বলিতেছেন—তাঁহার কৃপা কোথা? এ যে ঘোর অভিশাপ!' ধর্মযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?' যুবক উত্তর দিল, 'যখন আমার পিতার মৃত্যু হইল, তখন তাহা আপাততঃ অমঙ্গল হইলেও উহাকে মঙ্গল বলিয়াছিলেন। এখন আপনার সন্তানের জন্মও আপাততঃ মঙ্গলকর বলিয়া প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা আমার নিকট মহা অমঙ্গল বলিয়া বোধ হইতেছে।' এইভাবে জগতের দুঃখ, অমঙ্গলের বিষয় চাপিয়া রাখাই কি জগতের দুঃখনিবারণের উপায়? নিজে ভাল হও এবং যাহারা কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ কর। জোড়াতালি দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিও না, তাহাতে জাগতিক দুঃখ দূর হইবে না। আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে।

এই জগৎ সর্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণ। যেখানে ভাল দেখিবে, জানিবে—তাহার পশ্চাতে মন্দও রহিয়াছে। কিন্তু এই-সকল ব্যক্ত ভাবের পশ্চাতে—এই-সকল বিরোধী ভাবের পশ্চাতে—বেদান্ত সেই একত্বই খুঁজিয়া পায়। বেদান্ত বলে, মন্দ ত্যাগ কর, আবার ভালও ত্যাগ কর। তাহা হইলে বাকি রহিল কি? বেদান্ত বলে, শুধু ভালমন্দেরই অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে। ইহাদের পশ্চাতে এমন্ জিনিস রহিয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমার, যাহা তোমার স্বরূপ, যাহা সর্বপ্রকার শুভ ও সর্বপ্রকার অশুভের বাহিরে—সেই বস্তুই শুভ বা অশুভরূপে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে এই তত্ত্ব জানো—তখন, কেবল তখনই তুমি পূর্ণ সুখবাদী হইতে পারিবে। তাহার পূর্বে নহে।

তাহা হইলেই তুমি সমুদয় জয় করিতে পারিবে। এই আপাতপ্রতীয়মান ব্যক্তভাবগুলি আয়ত্ত কর, তাহা হইলে তুমি সেই সত্যবস্তুকে যেরূপে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবে। তখনই তুমি উহাকে—শুভরূপেই হউক আর অশুভরূপেই হউক—যেভাবে ইচ্ছা, প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমেই তোমাকে নিজের প্রভু হইতে হইবে। উঠ, নিজেকে মুক্ত কর, এই-সকল নিয়মের বাহিরে যাও, কারণ এই নিয়মগুলি তোমাকে সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত করে না, উহারা তোমার প্রকৃত স্বরূপের অতি সামান্য মাত্র প্রকাশ করে। প্রথমে জানো—তুমি প্রকৃতির দাস নও, কখনও ছিলে না, কখন হইবেও না; প্রকৃতিকে আপাততঃ অনন্ত বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা সসীম, উহা সমুদ্রের এক বিন্দুমাত্র; তুমিই বাস্তবিক সমুদ্রস্বরূপ, তুমি চন্দ্র সূর্য তারা—সকলেরই অতীত। তোমার অনন্ত স্বরূপের তুলনায় উহারা বুদ্বুদমাত্র। ইহা জানিলে তুমি ভালমন্দ দুই-ই জয় করিতে পারিবে। তখনই তোমার সমগ্র দৃষ্টি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, তখন তুমি দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে: মঙ্গল কি সুন্দর! অমঙ্গল কি অদ্ভুত!

বেদান্ত ইহাই করিতে বলে। বেদান্ত বলে না, সোনার পাত মুড়িয়া ক্ষতস্থান ঢাকিয়া রাখো, আর যতই ক্ষত পচিতে থাকে, আরও বেশী সোনার পাত দিয়া মুড়িতে থাকো। এই জীবন একটা কঠিন সমস্যা, সন্দেহ নাই। যদিও ইহা বজ্রবৎ দুর্ভেদ্য মনে হয়, তথাপি যদি পারো, সাহসপূর্বক ইহার বাহিরে যাইবার চেষ্টা কর—আত্মা এই দেহ অপেক্ষা অনন্তগুণে শক্তিমান্। বেদান্ত তোমার কর্মফলের জন্য ছোটখাটো দেবতাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে না, তুমি নিজেই তোমার অদৃষ্টের নির্মাতা। তুমি নিজ কর্মফলে ভালমন্দ দুই-ই ভোগ করিতেছ, তুমি নিজেই নিজের চোখে হাত দিয়া বলিতেছ—অন্ধকার। হাত সরাইয়া লও—আলো দেখিতে পাইবে। তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ—তুমি পূর্ব হইতেই সিদ্ধ। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'[১]—এখন আমরা এই শ্রুতির অর্থ বুঝিতে পারিতেছি।

কি করিয়া আমরা এই তত্ত্ব জানিতে পারিব? এই মন যাহা এত ভ্রান্ত, এত দুর্বল, যাহা এত সহজে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়, এই মনকেও সবল

১ কঠ উপ, ২।১।১০

করা যাইতে পারে, যাহাতে উহা সেই জ্ঞানের—সেই একত্বের আভাস পায়। তখন সেই জ্ঞানই আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। 'যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥'[১]—উচ্চ দুর্গম ভূমিতে বৃষ্টি হইলে জল যেমন পর্বতসমূহের পার্শ্ব দিয়া বিকীর্ণভাবে ধাবিত হয়, সেইরূপ যে শক্তিসমূহকে পৃথক্ করিয়া দেখে সে তাহাদেরই অনুবর্তন করে। বাস্তবিক শক্তি এক, কেবল মায়াতে বহু হইয়াছে। বহুর পিছনে ধাবিত হইও না, সেই একের দিকে অগ্রসর হও।

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥[২]

—সেই আত্মা আকাশবাসী সূর্য, অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদিতে অবস্থিত অগ্নি ও কলসস্থিত সোমরস। তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে আছেন। তিনি জলে, পৃথিবীতে, যজ্ঞে এবং পর্বতে আছেন; তিনি সত্য ও মহান্।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥[৩]

—যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন, তেমনি এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে সেই সেই বস্তুরূপ ধারণ করিয়াছেন, এবং সমুদয়ের বাহিরেও আছেন। যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবস্তুভেদে সেই সেই রূপ লাভ করিয়াছেন, তেমনি সেই এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে সেই সেই রূপ ধারণ করিয়াছেন এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন।

যখন তুমি এই একত্ব উপলব্ধি করিবে, তখনই এই অবস্থা হয়, তাহার পূর্বে নহে। সর্বত্র তাঁহাকে দর্শন করাই প্রকৃত সুখবাদ। এখন প্রশ্ন এই, যদি ইহা সত্য হয়, যদি সেই শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত আত্মা এই-সকলের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তিনি কেন সুখদুঃখ ভোগ করেন, কেন তিনি

১ কঠ উপ., ২।১।১৪
২ ঐ., ২।২।২
৩ ঐ., ২।২।৯-১০

অপবিত্র হইয়া দুঃখভোগ করেন? উপনিষদ্ বলেন, তিনি দুঃখ অনুভব করেন না।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥[১]

—সর্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি একমাত্র সর্বভূতান্তরাত্মা সংসারের দুঃখের সহিত লিপ্ত হন না, কারণ তিনি আবার জগতের অতীত। আমার এমন রোগ থাকিতে পারে, যাহাতে আমি সবই পীতবর্ণ দেখি, কিন্তু তাহাতে সূর্যের কিছুই হয় না।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥[২]

—যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা; যিনি স্বকীয় এক রূপকে বহুপ্রকার করেন, তাঁহাকে যে-জ্ঞানিগণ নিজেদের মধ্যে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অন্যের নহে।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥[৩]

—যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবান্‌দিগের মধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কাম্যবস্তুসকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপরের নহে।

বাহ্য জগতে তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? সূর্য চন্দ্র বা তারায় তাঁহাকে কিরূপে পাইবে?

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।[৪]

—সেখানে সূর্য, চন্দ্র, তারকা সব নিষ্প্রভ, বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি সেখানে কোথায়? তাঁহারই আলোতে সকলে আলোকিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সব কিছু দীপ্তি পাইতেছে।

১ কঠ উপ, ২।২।১১
২ ঐ., ২।২।১২
৩ ঐ., ২।২।১৩
৪ ঐ., ২।২।১৫

'ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ।'[১] —ঊর্ধ্বমূল ও নিম্নগামী শাখা সহ এই চিরন্তন অশ্বত্থবৃক্ষ অর্থাৎ সংসারবৃক্ষ রহিয়াছে। তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপ উক্ত হন। সমুদয় লোক তাঁহাতে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে নানাবিধ স্বর্গের কথা আছে। উপনিষদের মত এই যে, এই স্বর্গে যাইবার বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ইন্দ্রলোকে, বরুণলোকে যাইলেই যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা নহে, বরং এই আত্মার ভিতরেই ব্রহ্মদর্শন সুস্পষ্টরূপে হইয়া থাকে।

'যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥'[২]—যেমন আরশিতে মানুষ আপনার প্রতিবিম্ব পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায়, তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন স্বপ্নে আপনাকে অস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়, তেমনি পিতৃলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন জলে লোকে আপনার রূপ দর্শন করে, তেমনি গন্ধর্বলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন আলোক ও ছায়া পরস্পর পৃথক্‌, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম ও জগতের পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কিন্তু তথাপি পূর্ণরূপে ব্রহ্মদর্শন হয় না। অতএব বেদান্ত বলে, আমাদের নিজ আত্মাই সর্বোচ্চ স্বর্গ, মানবাত্মাই পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, সর্বপ্রকার স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ এই আত্মার মধ্যে যেভাবে সেই সত্যকে সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়, আর কোথাও তত স্পষ্ট অনুভব হয় না। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গেলেই যে এই আত্মদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সাহায্য হয়, তাহা নহে। ভারতবর্ষে যখন ছিলাম, তখন মনে হইত, কোন গুহায় বাস করিলে হয়তো খুব স্পষ্ট ব্রহ্মানুভূতি হইবে; দেখিলাম, তাহা নহে। তারপর ভাবিলাম, হয়তো বনে গেলে সুবিধা হইবে, তারপর কাশীর কথা মনে হইল। সব স্থানই একরূপ, কারণ আমরা নিজেরাই নিজেদের জগৎ গঠন করিয়া লই। যদি আমি অসাধু হই, সমুদয়

১ কঠ উপ., ২।৩।১

২ ঐ., ২।৩।৫

জগৎ আমার পক্ষে মন্দ বলিয়া মনে হইবে। উপনিষদ্ ইহাই বলেন। আর সেই একই নিয়ম সর্বত্র খাটিবে। যদি এখানে আমার মৃত্যু হয় এবং যদি স্বর্গে যাই, সেখানেও এখানকারই মতো দেখিব। যতক্ষণ না তুমি পবিত্র হইতেছ, ততক্ষণ গুহা অরণ্য বারাণসী অথবা স্বর্গে যাওয়ায় বিশেষ কিছু লাভ নাই; আর যদি তোমার চিত্তদর্পণকে নির্মল করিতে পারো, তবে যেখানেই থাকো না কেন, তুমি প্রকৃত সত্য অনুভব করিবে। অতএব এখানে ওখানে যাওয়া বৃথা শক্তিক্ষয় মাত্র—সেই শক্তি যদি চিত্তদর্পণের নির্মলতা-সাধনে ব্যয়িত হয়, তবেই ঠিক হয়। নিম্নলিখিত শ্লোকে আবার ঐ ভাব বর্ণিত হইয়াছে :

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥[১]

—ইহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না। কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। যাঁহারা এই আত্মাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।

যাঁহারা আমার রাজযোগের বক্তৃতাগুলি শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য বলিতেছি, সে-যোগ জ্ঞানযোগ হইতে কিছু ভিন্ন রকমের। জ্ঞানযোগের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে :

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥[২]

—যখন ইন্দ্রিয়গুলি—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত হয়, মানুষ যখন ঐগুলিকে নিজের দাসের মতো করিয়া রাখে, যখন উহারা আর মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, তখনই যোগী পরমগতি লাভ করেন।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥
যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্ ॥[৩]

—যে-সকল কামনা মর্ত্যজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদয় যখন

১ কঠ উপ, ২।৩।৯ ২ ঐ., ২।৩।১০ ৩ ঐ., ২।৩।১৪-১৫

বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অমর হয় এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্য অমর হয়—এইমাত্র উপদেশ।

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে বেদান্ত, শুধু বেদান্ত কেন, ভারতীয় সকল দর্শন ও ধর্মপ্রণালীই এই জগৎ ছাড়িয়া উহার বাহিরে যাইতে বলিতেছে। কিন্তু পূর্বোক্ত শ্লোকদ্বয় হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, আমাদের দার্শনিকগণ স্বর্গ অথবা আর কোথাও যাইতে চাহিতেন না, বরং তাঁহারা বলেন, স্বর্গের ভোগ ও সুখ-দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। যতদিন আমরা দুর্বল থাকিব, ততদিন আমাদিগকে স্বর্গ-নরকে ঘুরিতেই হইবে, কিন্তু বস্তুতঃ আত্মাই একমাত্র সত্য। তাঁহারা ইহাও বলেন, আত্মহত্যা দ্বারা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ অতিক্রম করা যায় না। তবে অবশ্য প্রকৃত পথ পাওয়া বড় কঠিন। পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় হিন্দুরাও সব হাতে-কলমে করিতে চান; তবে জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক্। পাশ্চাত্যগণ বলেন: বেশ ভাল একখানি বাড়ি কর, উত্তম খাদ্য ও পরিচ্ছদ সংগ্রহ কর, বিজ্ঞানের চর্চা কর, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি কর। এইগুলি করিবার সময় তাঁহারা খুব কাজের লোক। কিন্তু হিন্দুরা বলেন, জ্ঞান-অর্থে আত্মজ্ঞান—তাঁহারা সেই আত্মজ্ঞানের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে চাহেন।

আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বক্তা[১] আছেন—তিনি খুব ভাল লোক এবং সুবক্তা। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন; তাহাতে তিনি বলেন, ধর্মের কোন প্রয়োজন নাই, পরলোক লইয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। তাঁহার মত বুঝাইবার জন্য তিনি এই উপমাটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন: জগৎরূপ এই কমলালেবুটি আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহার সব রসটা আমরা বাহির করিয়া লইতে চাই। আমার সঙ্গে তাঁহার একবারমাত্র সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহাকে বলি, আমিও আপনার সঙ্গে একমত, আমারও নিকট একটি ফল রহিয়াছে—আমিও ইহার রসটুকু সব খাইতে চাই। তবে আমাদের মতভেদ কেবল ঐ ফলটি কি, এই লইয়া। আপনি উহাকে কমলালেবু মনে করিতেছেন—আমি ভাবিতেছি আম। আপনি মনে করেন, জগতে আসিয়া খাইতে পরিতে পাইলেই যথেষ্ট হইল এবং কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতে পারিলেই চূড়ান্ত হইল; কিন্তু

১ Robert Ingersoll.

আপনার বলিবার কোনই অধিকার নাই যে, উহা ছাড়া মানুষের আর কিছু কর্তব্য নাই। আমার পক্ষে ঐ ধারণা একেবারে কিছুই নয়।'

আপেল ভূমিতে কিরূপে পড়ে, অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিরূপে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, যদি কেবল এইটুকু জানাই জীবনের একমাত্র কাজ হয়, তবে তো আমি এখনই আত্মহত্যা করি। আমার সংকল্প—সকল বস্তুর মর্মস্থল অনুসন্ধান করিব—জীবনের প্রকৃত রহস্য কি, তাহা জানিব। তোমরা প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের আলোচনা কর, আমি প্রাণের স্বরূপ জানিতে চাই। আমার দর্শন বলে—জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যই জানিতে হইবে—স্বর্গ নরক প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করিয়া দিতে হইবে, যদিও এই পৃথিবীর মতো ঐগুলির ব্যাবহারিক সত্তা রহিয়াছে। আমি এই আত্মার অন্তরাত্মাকে জানিব—উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিব—উহা কি, তাহা জানিব ; শুধু উহা কিভাবে কাজ করিতেছে এবং উহার প্রকাশ কি, তাহা জানিলেই আমার তৃপ্তি হইবে না। আমি সকল জিনিসের 'কেন ?' জানিতে চাই ; 'কেমন করিয়া হয় ?'—এ অনুসন্ধান বালকেরা করুক। বিজ্ঞান আর কি ? তোমাদের দেশের একজন বলিয়াছেন, 'সিগারেট খাইবার সময় যাহা যাহা ঘটে, তাহা যদি আমি লিখিয়া রাখি, তাহাই সিগারেটের বিজ্ঞান হইবে।' অবশ্য বিজ্ঞানবিৎ হওয়া খুব ভাল এবং গৌরবের বিষয় বটে, ঈশ্বর বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানে সহায়তা করুন, তাঁহাদের আশীর্বাদ করুন ; কিন্তু যখন কেহ বলে, এই বিজ্ঞানচর্চাই সব, ইহা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, তখন সে নির্বোধের মতো কথা বলিতেছে, বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে—সে কখনও জীবনের মূল রহস্য জানিতে চেষ্টা করে নাই, প্রকৃত বস্তু কি, সে-সম্বন্ধে সে কখনও আলোচনা করে নাই। আমি অনায়াসেই যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারি যে, তোমাদের যত কিছু জ্ঞান, সব ভিত্তিহীন। প্রাণের বিভিন্ন বিকাশগুলি লইয়া তোমরা আলোচনা করিতেছ, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি, 'প্রাণ কি ?' বলিবে, জানি না। অবশ্য তোমাদের যাহা ভাল লাগে, তাহা করিতে তোমাদিগকে কেহ বাধা দিতেছে না, কিন্তু আমাকে আমার ভাবে থাকিতে দাও।

আর ইহাও লক্ষ্য করিও যে, আমি আমার ভাবে খুবই কাজের লোক। অতএব অমুক কাজের লোক নয়, অমুক কাজের লোক, এ-সব বাজে কথা।

তুমি একভাবে কাজের লোক, আমি আর একভাবে। প্রাচ্যদেশে কাহাকেও যদি বলা যায়, এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে সত্যবস্তু লাভ করিবে, তবে সে ঐ প্রণালী অবলম্বন করিবে। আর পাশ্চাত্যে কেহ যদি শোনে—অমুক জায়গায় সোনার খনি আছে, কিন্তু উহার চতুর্দিকে অসভ্য লোকের বাস, হাজার লোক সোনার আশায় বিপদের সম্মুখীন হইবে, হয়তো একজন কৃতকার্য হইবে। ঐ-সকল লোক এ-কথাও শুনিয়াছে—আত্মা বলিয়া কিছু আছে, কিন্তু তাহারা পুরোহিতবর্গের উপর উহার ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত। প্রথমোক্ত ব্যক্তি কিন্তু সোনার জন্য অসভ্যদিগের কাছে যাইতে রাজি নয়। সে বলে, উহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে; কিন্তু যদি তাহাকে বলা যায়, এভারেস্ট পর্বতের শিখরে, সমুদ্র-পৃষ্ঠের ৩০,০০০ ফিট উপরে এমন একজন আশ্চর্য সাধু আছেন, যিনি তাহাকে আত্মজ্ঞান দিতে পারেন, অমনি সে কাপড়-চোপড় লইয়া অথবা কিছুমাত্র না লইয়াই একেবারে যাইতে প্রস্তুত; এই চেষ্টায় হয়তো ৪০,০০০ লোক মারা যাইতে পারে, একজন হয়তো সত্য লাভ করিবে। ইহারাও একদিকে খুব কাজের লোক, তবে লোকের ভুল হয় এইটুকু—তুমি যেটুকুকে জগৎ বলো, সেইটুকুই সব, এই চিন্তা করা। তোমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগমাত্র—উহাতে নিত্য কিছুই নাই, বরং উহা উত্তরোত্তর দুঃখ আনয়ন করে। আমার পথে অনন্ত শান্তি, তোমার পথে অনন্ত দুঃখ।

আমি বলি না যে, তুমি যাহাকে প্রকৃত কাজের পথ বলিতেছ, তাহা ভ্রম। তুমি নিজে যেরূপ বুঝিয়াছ, তাহা কর। ইহাতে পরম মঙ্গল হইবে, কিন্তু তা বলিয়া আমার মতকে নিন্দা করিও না। আমার পথও আমার ভাবে আমার পক্ষে কার্যকর পথ। এস, আমরা সকলে নিজ নিজ প্রণালীতে কাজ করি। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা উভয় দিকেই কর্মকুশল হইতাম, তাহা হইলে বড় ভাল হইত। আমি এমন অনেক বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছি, যাঁহারা বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মতত্ত্ব—উভয়দিকেই কাজের লোক; আর আমি আশা করি, কালে সমুদয় মানবজাতি ঐভাবে উভয়ত্র কাজের লোক হইবে। মনে কর, এক কড়া জল গরম হইতেছে—সেই সময় কি হইতেছে, তাহা যদি লক্ষ্য কর, দেখিবে এক কোণে একটি বুদ্বুদ উঠিতেছে, অপর কোণে আর একটি উঠিতেছে। এই বুদ্বুদগুলি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে—চার-পাঁচটি একত্র

হয়, অবশেষে সবগুলি একত্র হইয়া এক প্রবল গতি আরম্ভ হয়। এই জগৎও এইরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক একটি বুদ্বুদ, আর বিভিন্ন জাতি যেন কতকগুলি বুদ্বুদের সমষ্টি। ক্রমশঃ জাতিতে জাতিতে মিলন হইতেছে—আমার নিশ্চয় ধারণা, এমন এক দিন আসিবে, যখন জাতি বলিয়া কিছু থাকিবে না—জাতিতে জাতিতে প্রভেদ চলিয়া যাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমরা যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশিত হইবেই হইবে। বাস্তবিক আমাদের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ স্বাভাবিক—কিন্তু আমরা এখন সকলে পৃথক্ হইয়া রহিয়াছি। এমন সময় অবশ্য আসিবে, যখন এই-সকল ভিন্ন ভাব একত্র মিলিত হইবে—প্রত্যেক ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তেমনি কাজের লোক হইবে—তখন সেই একত্ব, সেই মিলন জগতে প্রকাশিত হইবে। তখন সকলে জীবন্মুক্ত হইবে। আমাদের ঈর্ষা, ঘৃণা, মিলন ও বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা সেই একদিকে চলিতেছি। একটি প্রবল নদী সমুদ্রের দিকে চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা, খড়কুটা প্রভৃতি এদিকে ওদিকে যাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে অবশ্যই সমুদ্রে যাইতে হইবে। এইরূপ তুমি আমি—এমন কি সমুদয় প্রকৃতিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরার মতো সেই অনন্ত পূর্ণতার সাগর—ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি ; আমরা এদিক ওদিক যাইবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু অবশেষে সেই জীবন ও আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে পৌছিব।

সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৭শে অক্টোবর, ১৮৯৬]

আমরা দেখিয়াছি, আমরা দুঃখ দূর করিতে যতই চেষ্টা করি না কেন, আমাদের জীবনের বেশীর ভাগই অবশ্য দুঃখপূর্ণ থাকিবে। আর এই দুঃখরাশি আমাদের পক্ষে একরূপ সীমাহীন। আমরা অনাদি কাল হইতে এই দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক উহা যেমন তেমনই রহিয়াছে। আমরা যতই দুঃখ-প্রতিকারের উপায় বাহির করি, ততই আমরা নিজেদের সূক্ষ্মতর দুঃখরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিতে পাই। আমরা আরও দেখিয়াছি, সকল ধর্মই বলিয়া থাকে, এই দুঃখ-চক্রের বাহিরে যাইবার একমাত্র উপায় ঈশ্বর। সকল ধর্মই বলিয়া থাকে—আধুনিক কর্মকুশল লোকদের উপদেশমত জগৎকে যেমন দেখিতেছ, তেমনি গ্রহণ করিলে আমাদের ভাগ্যে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু সকল ধর্মই বলে—এই জগতের অতীত আরও কিছু আছে। এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনই সবটুকু নয়, উহা প্রকৃত জীবনের অতি সামান্য অংশ মাত্র, বাস্তবিক উহা অতি স্থূল ব্যাপার। উহার পশ্চাতে, উহার অতীত প্রদেশে সেই অনন্ত রহিয়াছেন, যেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই—উহাকে কেহ গড, কেহ আল্লা, কেহ জিহোভা, কেহ জোভ্, কেহ বা আর কিছু বলিয়া থাকেন। বেদান্তীরা উহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন।

কিন্তু জগতের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে, এ-কথা সত্য হইলেও আমাদিগকে এই জগতে জীবনধারণ করিতে তো হইবে? এখন ইহার মীমাংসা কোথায়?

জগতের বাহিরে যাইতে হইবে—সকল ধর্মের এই উপদেশ হইতে আপাততঃ এই ভাবই মনে উদিত হয় যে, আত্মহত্যা করাই বুঝি শ্রেয়ঃ। প্রশ্ন এই—জীবনের দুঃখরাশির প্রতিকার কি? আর তাহার যে উত্তর দেওয়া হয়, তাহাতে আপাততঃ মনে হয়—জীবনটাকে ত্যাগ করাই ইহার একমাত্র প্রতিকার। ইহার উত্তরে আমাদের একটি প্রাচীন গল্পের কথা মনে পড়ে। একজনের মাথার উপরে একটা মশা বসিয়াছিল, তাহার এক বন্ধু ঐ মশাটাকে মারিতে গিয়া তাহার মস্তকে এমন তীব্র আঘাত করিল যে, সেই লোকটি

মায়া গেল, মশাটিও মরিল। দুঃখ প্রতিকারের যে উপায়ের কথা ধর্ম বলে, তাহা এইরূপই।

জীবন যে দুঃখপূর্ণ, জগৎ যে দুঃখপূর্ণ—তাহা জগৎকে যে বিশেষরূপে জানিয়াছে, সে আর অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সকল ধর্ম ইহার প্রতিকারের কি উপায় বলে? ধর্মগুলি বলে, জগৎ কিছুই নয়; এই জগতের বাহিরে এমন কিছু আছে, যাহা প্রকৃত সত্য। এইখানেই বিবাদ। উপায়টি যেন আমাদের যাহা কিছু আছে, সবই নষ্ট করিয়া ফেলিতে উপদেশ দিতেছে। তবে কি করিয়া উহার প্রতিকারের উপায় হইবে? তবে কি কোনই উপায় নাই? প্রতিকারের অন্ততঃ আর একটি উপায় প্রস্তাবিত হইয়াছে। বেদান্ত বলে, বিভিন্ন ধর্ম যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ঐ কথার যথার্থ তাৎপর্য কি, তাহা বুঝিতে হইবে। অনেক সময় লোকে বিভিন্ন ধর্মের উপদেশ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে বুঝিয়া থাকে, ধর্মগুলিও ঐ বিষয়ে খুব স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না। আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়ই প্রয়োজন। হৃদয় অবশ্য খুব বড় জিনিস—হৃদয়ের ভিতর দিয়াই জীবনের মহৎ প্রেরণাগুলির স্ফুরণ হয়। হৃদয়শূন্য কেবল মস্তিষ্ক অপেক্ষা যদি আমার মস্তিষ্ক না-ই থাকে, শুধু একটু হৃদয় থাকে, তাহা আমি শতবার পছন্দ করিব। যাহার হৃদয় আছে, তাহারই যথার্থ জীবন—তাহারই উন্নতি সম্ভব; কিন্তু যাহার এতটুকু হৃদয় নাই, কেবল মস্তিষ্ক আছে, সে শুষ্কতায় মরিয়া যায়।

কিন্তু আমরা ইহাও জানি, যিনি কেবল নিজের হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহাকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কারণ তাঁহার প্রায়ই ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। আমরা চাই—হৃদয় ও মস্তিষ্কের মিলন। আমার কথার তাৎপর্য ইহা নহে যে, কিছুটা হৃদয় ও কিছুটা মস্তিষ্কের মধ্যে আপস করিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনন্ত হৃদয়ানুভূতি থাকুক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচারবুদ্ধিও থাকুক।

এই জগতে আমরা যাহা কিছু চাই, তাহার কি কোন সীমা আছে? জগৎ কি অনন্ত নয়? জগতে অনন্তপরিমাণ ভাববিকাশের এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্তপরিমাণ শিক্ষানুশীলন ও বিচারের অবকাশ আছে। অব্যাহতভাবে ঐ দুই ভাবই একসঙ্গে আসুক—উভয়েই সমান্তরালভাবে চলিতে থাকুক।

অধিকাংশ ধর্মই, জগতে যে দুঃখরাশি বিদ্যমান—এ ব্যাপারটি বুঝেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই উহার উল্লেখ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সকলেই বোধ হয় একই ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হৃদয়ের দ্বারা, ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। জগতে দুঃখ আছে, অতএব সংসারত্যাগ কর—ইহা খুব বড় উপদেশ এবং একমাত্র উপদেশ, সন্দেহ নাই। 'সংসারত্যাগ কর'—সত্য জানিতে হইলে অসত্য ত্যাগ করিতে হইবে—ভাল পাইতে হইলে মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মৃত্যু ত্যাগ করিতে হইবে—এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না।

কিন্তু যদি এই মতবাদের তাৎপর্য এই হয় যে, পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন—আমরা যাহাকে জীবন বলিয়া জানি, আমরা জীবন বলিতে যাহা বুঝি, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তবে আর আমাদের থাকে কি? যদি আমরা উহা ত্যাগ করি, তবে তো আমাদের আর কিছুই থাকে না।

যখন আমরা বেদান্তের দার্শনিক অংশের আলোচনা করিব, তখন আমরা এই তত্ত্ব আরও ভালভাবে বুঝিব, কিন্তু আপাততঃ আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদান্তেই কেবল এই সমস্যার যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যায়। এখানে কেবল বেদান্তের প্রকৃত উপদেশ কি, তাহাই বলিব—বেদান্ত শিক্ষা দেয় জগৎকে ব্রহ্মভাবে দর্শন করিতে।

বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চায় না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, তেমন আর কোথাও নাই, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নহে—নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে। বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ জগতের ব্রহ্মভাব—জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেমন জানি, উহা যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ত্যাগ কর এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। জগৎকে ব্রহ্মভাবে দেখ—বাস্তবিকও উহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই কারণেই আমরা প্রাচীনতম উপনিষদে—বেদান্ত সম্বন্ধে লিখিত প্রথম পুস্তকে—দেখিতে পাই, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'[১]—জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।

১ ঈশ উপ.,—১ম শ্লোক

সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে—জগতে যে অশুভ দুঃখ আছে তাহার দিকে না চাহিয়া, মিছামিছি সবই মঙ্গলময়—সবই সুখময় বা সবই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য—এরূপ ভ্রান্ত সুখবাদ অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া। এই ভাবে আমাদিগকে 'সংসার' ত্যাগ করিতে হইবে—আর যখন সংসারত্যাগ হয়, তখন অবশিষ্ট থাকে কি?—ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই—তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা নয়; কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমাকে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ কর—ইহার অর্থ কি? ছেলেগুলিকে লইয়া কি রাস্তায় ফেলিয়া দিতে হইবে—যেমন সকল দেশে নর-পশুরা করিয়া থাকে? কখনই নয়; উহা তো পৈশাচিক কাণ্ড—উহা তো ধর্ম নহে। তবে কি? সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন কর। এইরূপ সকল বস্তুতেই, জীবনে-মরণে, সুখে-দুঃখে—সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ; কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। বেদান্ত ইহাই বলে; তুমি জগৎকে যেরূপ অনুমান করিয়াছ, তাহা ত্যাগ কর; কারণ তোমার অনুমান আংশিক অনুভূতির উপর—খুব সামান্য যুক্তির উপর—মোট কথা, তোমার নিজের দুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ আনুমানিক জ্ঞান ত্যাগ কর—আমরা এতদিন জগৎকে যেরূপ ভাবিতেছিলাম, এতদিন যে-জগতে আসক্ত ছিলাম, তাহা আমাদের নিজেদের সৃষ্ট মিথ্যা জগৎ মাত্র; উহা ত্যাগ কর। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, আমরা যেভাবে এতদিন জগৎকে দেখিতেছিলাম, প্রকৃত পক্ষে কখনই উহার সেরূপ অস্তিত্ব ছিল না—আমরা স্বপ্নে ঐরূপ দেখিতেছিলাম —মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আমাদের ঐরূপ ভ্রম হইতেছিল, অনন্তকাল ধরিয়া সেই প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান। তিনিই সন্তান-সন্ততির ভিতরে, তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে, তিনিই ভালয় মন্দে, তিনিই পাপে ও পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীতে, তিনিই জীবনে এবং মরণেও তিনিই রহিয়াছেন।

বিষম প্রস্তাব বটে! কিন্তু বেদান্ত ইহাই প্রমাণ করিতে, শিক্ষা দিতে ও প্রচার করিতে চায়। ইহা তো শুধু বেদান্তের আরম্ভ!

আমরা এইভাবে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়াই জীবনের বিপদ ও দুঃখরাশি এড়াইতে পারি। কিছু চাহিও না। আমাদিগকে অসুখী করে কিসে? আমরা

যে-সকল দুঃখভোগ করিয়া থাকি, বাসনা হইতেই সেগুলির উৎপত্তি। তোমার কিছু অভাব আছে, আর সেই অভাব পূর্ণ হইতেছে না, ফল—দুঃখ। অভাব যদি না থাকে, তবে দুঃখও থাকিবে না। যখন আমরা সকল বাসনা ত্যাগ করিব, তখন কি হইবে? দেয়ালের কোন বাসনা নাই, উহা কখন দুঃখ ভোগ করে না। ইহা সত্য, কিন্তু দেয়ালের কোনরূপ উন্নতিও হয় না। এই চেয়ারের কোন বাসনা নাই, কোন কষ্টও নাই, কিন্তু উহা যে চেয়ার, সেই চেয়ারই থাকে। সুখভোগের ভিতরেও এক মহান্ ভাব আছে, দুঃখ-ভোগের ভিতরেও আছে। যদি সাহস করিয়া বলা যায়, তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি যে, দুঃখেরও উপকারিতা আছে। আমরা সকলেই জানি, দুঃখ হইতে কি মহৎ শিক্ষা হয়। জীবনে শত শত কাজ করিয়াছি; পরে বোধ হয়, না করিলেই ছিল ভাল, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ-সকল কাজ আমাদের মহান্ শিক্ষকের কাজ করিয়াছে। নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি, কিছু ভাল করিয়াছি বলিয়া আমি আনন্দিত, আবার অনেক খারাপ কাজ করিয়াছি বলিয়াও সুখী—আমি কিছু সৎকার্য করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত, আবার অনেক ভ্রমে পড়িয়াছি বলিয়াও সুখী, কারণ উহাদের প্রত্যেকটিই আমাকে মহৎ শিক্ষা দিয়াছে।

আমি এখন যাহা, তাহা আমার পূর্ব কর্ম ও চিন্তাসমষ্টির ফলস্বরূপ। প্রত্যেক কার্য ও চিন্তারই একটি না একটি ফল আছে, এবং এই ফলগুলির সমষ্টি আমার এই অগ্রগতি—এই উন্নতি। তবেই এখন সমস্যা কঠিন হইয়া পড়িল। আমরা সকলেই বুঝি—বাসনা বড় খারাপ জিনিস, কিন্তু বাসনা-ত্যাগের অর্থ কি? বাসনা ত্যাগ করিলে দেহযাত্রানির্বাহ হইবে কিরূপে? ইহাও কি সেই মশা মারার জন্য মানুষ মারা নয়? বাসনাকে সংহার কর, তাহার সঙ্গে বাসনাযুক্ত মানুষটাকেও মারিয়া ফেলো! তবে শোন ইহার উত্তর কি: তোমার যে বিষয়-সম্পত্তি থাকিবে না, তাহা নহে; প্রয়োজনীয় জিনিস, এমন কি বিলাসের জিনিস পর্যন্ত রাখিবে না, তাহা নহে। যাহা কিছু তোমার আবশ্যক, এমন কি তদতিরিক্ত জিনিস পর্যন্ত তুমি রাখিতে পারো—তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য এই যে, সত্যকে জানিতে হইবে—প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

এই ধন—ইহা কাহারও নয়। কোন পদার্থে স্বামিত্বের ভাব রাখিও না। তুমি তো কেহ নও, আমিও কেহ নহি, কেহই কিছু নহে। সবই সেই প্রভুর

বস্তু; ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে—ঈশ্বরকে সর্ববস্তুর ভিতরে স্থাপন কর। ঈশ্বর তোমার ভোগ্য ধনে রহিয়াছেন, তোমার মনে যে-সকল বাসনা উঠিতেছে, তাহাতে রহিয়াছেন; তোমার বাসনা থাকাতে তুমি যে যে দ্রব্য ক্রয় করিতেছ, সেগুলির মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর বস্ত্রের মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর অলঙ্কারেও তিনি। এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এইভাবে সকল জিনিস দেখিতে আরম্ভ করিলে তোমার দৃষ্টিতে সকলই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। যদি তোমার প্রত্যেক চালচলনে, তোমার বস্ত্রে, তোমার কথাবার্তায়, তোমার শরীরে—আকৃতিতে, সকল জিনিসে ভগবানকে স্থাপন কর, তবে তোমার চক্ষে সকল দৃশ্য বদলাইয়া যাইবে এবং জগৎ দুঃখরূপে প্রতিভাত না হইয়া স্বর্গরূপে পরিণত হইবে।

যীশু বলিয়াছেন, 'স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে'। বেদান্তও বলে, উহা পূর্ব হইতেই তোমার অভ্যন্তরে অবস্থিত। সকল ধর্মই এই কথা বলিয়া থাকে, সকল মহাপুরুষই ইহা বলিয়া থাকেন। 'যাহার দেখিবার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার শুনিবার কর্ণ আছে, সে শুনুক।' আমরা যে-সত্য এতদিন অন্বেষণ করিতেছি, তাহা পূর্ব হইতেই আমাদের অন্তরে বর্তমান, আর বেদান্ত শুধু যে উহার উল্লেখমাত্র করে তাহা নহে, ইহা যুক্তিবলে প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত। অজ্ঞানবশতঃ আমরা মনে করি, আমরা সত্য হারাইয়া ফেলিয়াছি, এবং উহা পাইবার জন্য কেবল কাঁদিয়া, কষ্টে ভুগিয়া সমগ্র জগতে ঘুরিতেছিলাম, কিন্তু উহা সর্বদাই আমাদের নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে বর্তমান ছিল। এই তত্ত্বদৃষ্টি-সহায়ে জগতে জীবনযাপন করিতে হইবে।

'সংসার ত্যাগ কর'—এই উপদেশ যদি সত্য হয়, আর যদি স্থূল এবং প্রতীয়মান অর্থে ইহা গ্রহণ করা যায়, তবে এই দাঁড়ায়—আমাদের কোন কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই, অলস হইয়া মাটির ঢিপির মতো বসিয়া থাকিলেই হইল, কিছু চিন্তা করিবার বা কোন কাজ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই; অদৃষ্টবাদী হইয়া, ঘটনাচক্রে তাড়িত হইয়া, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিলেই হইল। ইহাই ফল দাঁড়াইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত উপদেশের অর্থ বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদিগকে অবশ্য কার্য করিতে হইবে। সাধারণ মানুষ, যাহারা বৃথা বাসনায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা কাজের কি জানে? যে-ব্যক্তি নিজের ভাবরাশি ও

ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত, সে কাজের কি বুঝে? তিনিই কাজ করিতে পারেন, যিনি কোনরূপ বাসনা দ্বারা, কোনরূপ স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত নন। তিনিই কাজ করিতে পারেন, যাঁহার অন্য কোন কামনা নাই। তিনিই কাজ করিতে পারেন, যাঁহার কোন লাভের প্রত্যাশা নাই।

একখানি চিত্র কে বেশী উপভোগ করে? চিত্র-বিক্রেতা, না চিত্রদ্রষ্টা? বিক্রেতা তাহার হিসাব-কেতাব লইয়াই ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তাতেই মগ্ন। ঐ-সকল বিষয়ই তাহার মাথায় ঘুরিতেছে। সে কেবল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে এবং দর কত চড়িল, তাহা শুনিতেছে। দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কখন? তিনিই চিত্র সম্ভোগ করিতে পারেন, যাঁহার বেচা-কেনার কোন মতলব নাই। তিনি ছবিখানির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি চিত্রস্বরূপ; যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনই মানুষ জগৎকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক অধিকার-বোধ থাকিবে না। তখন ঋণদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি সুন্দর চিত্রের মতো। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মতো সুন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই: তিনিই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত, এবং নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত। বাসনা-ত্যাগ হইলেই আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্ব-কবিতা পাঠ করিয়া সম্ভোগ করিতে পারিব। তখন সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। আনাচ-কানাচ, গলি-ঘুঁজি, অন্ধকার স্থান—যাহা আমরা পূর্বে এত অপবিত্র ভাবিয়াছিলাম, উহাদের উপর যে-সকল দাগ এত কালো বোধ হইয়াছিল, সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। তাহারা সকলেই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবে। তখন আমরা নিজেরাই নিজেদের পূর্ব আচরণের কথা ভাবিয়া হাসিয়া উঠিব—এই-সকল কান্না-চীৎকার কেবল ছেলেখেলা মাত্র, আর আমরা জননীর মতো বরাবর কাছে দাঁড়াইয়া ঐ খেলা দেখিতেছিলাম।

বেদান্ত বলে, এইরূপ ভাব আশ্রয় করিলেই আমরা ঠিক ঠিক কার্য করিতে সক্ষম হইব। বেদান্ত আমাদিগকে কার্য করিতে নিষেধ করে

না, তবে ইহাও বলে যে, প্রথমে 'সংসার' ত্যাগ করিতে হইবে, এই আপাতপ্রতীয়মান মায়ার জগৎ ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের অর্থ কি? পূর্বে বলা হইয়াছে, ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য—সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন। সর্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে কার্য করিতে সক্ষম হইবে। যদি ইচ্ছা হয়, শতবর্ষ বাঁচিবার ইচ্ছা কর, যত কিছু সাংসারিক বাসনা আছে ভোগ করিয়া লও, কেবল ঐগুলিকে ব্রহ্মরূপে দর্শন কর, স্বর্গীয় ভাবে পরিণত করিয়া লও, তারপর শতবর্ষ জীবনযাপন কর। এই জগতে দীর্ঘকাল আনন্দে পূর্ণ হইয়া কার্য করিয়া জীবন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা কর। এইরূপে কার্য করিলে তুমি প্রকৃত পথ পাইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। যে-ব্যক্তি সত্য কি, না জানিয়া নির্বোধের ন্যায় সংসারের বিলাস-বিভ্রমে নিমগ্ন হয়, বুঝিতে হইবে সে প্রকৃত পথ পায় নাই, তাহার পা পিছলাইয়া গিয়াছে। অপরদিকে যে-ব্যক্তি জগৎকে অভিসম্পাত করিয়া বনে গিয়া নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে থাকে, ধীরে ধীরে শুকাইয়া আপনাকে মারিয়া ফেলে, নিজের হৃদয় একটি শুষ্ক মরুভূমি করিয়া ফেলে, নিজের সকল ভাব মারিয়া ফেলে, কঠোর বীভৎস শুষ্ক হইয়া যায়, সেও পথ ভুলিয়াছে—বুঝিতে হইবে। এই দুইটিই বাড়াবাড়ি—দুইটিই ভ্রম, এদিক আর ওদিক। উভয়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট—উভয়েই পথভ্রষ্ট।

বেদান্ত বলে, এইভাবে কার্য কর—সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, সর্বভূতেই তিনি আছেন জানো, নিজের জীবনকেও ঈশ্বরানুপ্রাণিত, এমন কি ঈশ্বর-স্বরূপ চিন্তা কর—জানিয়া রাখো, ইহাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য, ইহাই আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য, কারণ ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইবে? প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক ভাবে তিনি পূর্ব হইতেই অবস্থিত। এইরূপ জানিয়া আমাদিগকে অবশ্য কার্য করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই একমাত্র পথ—আর কোন পথ নাই। এইরূপ করিলে কর্মফল আমাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারিবে না। কর্মফল আর আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা দেখিয়াছি, আমরা যত কিছু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি, তাহার কারণ এই-সকল বৃথা বাসনা। কিন্তু যখন এই বাসনাগুলি ঈশ্বরবুদ্ধি দ্বারা বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে, ঈশ্বর-স্বরূপ হইয়া যায়, তখন

উহারা আর কোন অনিষ্ট করে না। যাহারা এই রহস্য জানে নাই, তাহাদিগকে ইহা না জানা পর্যন্ত এই আসুরিক জগতে বাস করিতে'হইবে। লোকে জানে না, এখানে তাহাদের চতুর্দিকে সর্বত্র কি অনন্ত আনন্দের খনি রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা এখনও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আসুরিক জগতের অর্থ কি ? বেদান্ত বলে—অজ্ঞান।

বেদান্ত বলে, আমরা বিশাল স্রোতস্বতীর তীরে বসিয়া তৃষ্ণায় মরিতেছি। রাশীকৃত খাদ্যের সম্মুখে বসিয়া আমরা ক্ষুধায় মরিতেছি। এইখানেই আনন্দময় জগৎ রহিয়াছে, আমরা উহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা উহার মধ্যে রহিয়াছি, উহা সর্বদাই আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা সর্বদাই উহাকে অন্য কিছু বলিয়া ভুল করিতেছি। বিভিন্ন ধর্ম আমাদিগকে সেই আনন্দময় জগৎ দেখাইয়া দিতে অগ্রসর। সকল হৃদয়ই এই আনন্দময় জগতের অন্বেষণ করিয়াছে। সকল জাতিই ইহার অন্বেষণ করিয়াছে, ইহাই ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য, আর এই আদর্শই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে ; বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামান্য মতভেদ আছে, সেগুলি ভাষার বিভিন্নতা মাত্র —বাস্তবিক কিছু নয়। একজন একটি ভাব একরূপে প্রকাশ করিতেছে, আর একজন একটু অন্যভাবে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তুমি হয়তো অন্য ভাষায় ঠিক তাহাই বলিতেছ। কেহ হয়তো সুখ্যাতি-লাভের আশায় অথবা সবকিছু নিজের মনের মতো করিতে চায় বলিয়া বলে, 'এ আমার মৌলিক মত।' ইহা হইতেই আমাদের জীবনে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের উৎপত্তি।

এ-সম্বন্ধে আবার এখন নানা তর্ক উঠিতেছে। যাহা বলা হইল, তাহা মুখে বলা তো খুব সহজ। ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি : সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি কর—সব ব্রহ্মময় দেখ, তবেই ঠিকঠিক এ সংসার সম্ভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু যখনই সংসারক্ষেত্রে নামিয়া কয়েকটি ধাক্কা খাই, অমনি ব্রহ্মবুদ্ধি উড়িয়া যায়। আমি রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি, সকল মানুষেই ঈশ্বর বিরাজমান—একজন বলবান লোক আসিয়া আমায় ধাক্কা দিল, অমনি চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেলাম, চটপট উঠিলাম, রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল—মুষ্টি বদ্ধ হইল—বিচারশক্তি হারাইলাম, একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, স্মৃতিভ্রংশ হইল—সেই ব্যক্তির ভিতর ঈশ্বর না দেখিয়া শয়তান

দেখিলাম। জন্মিবামাত্র উপদেশ পাইতেছি, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন কর। সকল ধর্মই ইহা শিখাইয়াছে—সর্ববস্তুতে, সর্বপ্রাণীর ভিতরে সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন কর। নিউ টেস্টামেণ্টে যীশুখ্রীষ্টও এ-বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। সকলেই আমরা এই উপদেশ পড়িয়াছি, কিন্তু কাজের বেলাতেই আমাদের অসুবিধা শুরু হয়।

ঈশপ-রচিত একটি গল্পে আছে : এক বৃহৎ সুন্দর হরিণ হ্রদে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার শাবককে বলিতেছিল, 'দেখ, আমি কেমন বলবান্, আমার মাথা দেখ—কেমন চমৎকার! আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখ—কেমন দৃঢ় ও মাংসল! আমি কত শীঘ্র দৌড়াইতে পারি!' সে এ-কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে দূর হইতে কুকুরের ডাক শুনিতে পাইল। যাই শোনা, অমনি দ্রুতপদে পলায়ন। অনেক দূরে দৌড়িয়া গিয়া আবার হাঁপাইতে হাঁপাইতে শাবকের নিকট ফিরিয়া আসিল। হরিণশাবক বলিল, 'এইমাত্র বলিতেছিলে, তুমি খুব বলবান্—তবে কুকুরের ডাকে পলাইলে কেন?' উত্তরে হরিণ বলিল, 'তাই তো, কুকুর ডাকিলেই আমার আর কিছু জ্ঞান থাকে না।' আমরাও সারাজীবন এরূপ করিতেছি। আমরা দুর্বল মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে কত উচ্চ আশা পোষণ করিতেছি, কিন্তু কুকুর ডাকিলেই হরিণের মতো পলাইয়া যাই। তাই যদি হইল, তবে এ-সকল শিক্ষার কি প্রয়োজন? বিশেষ প্রয়োজন আছে। বুঝিয়া রাখা উচিত, একদিনে কিছু হয় না।

'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।'[১]—আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করিতে হইবে, পরে ক্রমাগত ধ্যান করিতে হইবে। সকলেই আকাশ দেখিতে পায়, এমন কি, যে সামান্য কীট ভূমিতে বিচরণ করে, সেও উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীলবর্ণ আকাশ দেখিতে পায়, কিন্তু উহা আমাদের নিকট হইতে কত—কত দূরে রহিয়াছে, বলো দেখি! ইচ্ছা করিলে তো মন সর্বস্থানে গমন করিতে পারে, কিন্তু এই শরীরের পক্ষে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে শিখিতেই কত সময় অতিবাহিত হয়! আমাদের সমুদয় আদর্শ সম্বন্ধেও এইরূপ। আদর্শগুলি আমাদের অনেক দূরে রহিয়াছে, আর আমরা কত নীচে পড়িয়া

১ বৃহ. উপ., ২।৪।৫ ; ৪।৫।৬

রহিয়াছি। তথাপি আমরা জানি, আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ থাকাই আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ ব্যক্তি এই জগতে কোনরূপ আদর্শ ছাড়াই জীবনের অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। যাহার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ আছে, সে যদি হাজারটি ভ্রমে পতিত হয়, যাহার কোনরূপ আদর্শ নাই, সে তবে পঞ্চাশ হাজার ভ্রমে পতিত হইবে; ইহা নিশ্চয়। অতএব একটি আদর্শ থাকা ভাল। এই আদর্শ সম্বন্ধে যত বেশী পারা যায়, শুনিতে হইবে; ততদিন শুনিতে হইবে—যতদিন না উহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, যতদিন না আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে, যতদিন না উহা আমাদের প্রতি শোণিতবিন্দুতে ধ্বনিত হয়, যতদিন না উহা আমাদের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব আমাদিগকে প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। কথিত আছে যে, 'হৃদয় পূর্ণ হইলেই মুখ কথা বলে', সেইরূপ হৃদয় পূর্ণ হইলে হাতও কাজ করিয়া থাকে।

চিন্তাই আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির প্রেরণাশক্তি। মনকে সর্বোচ্চ চিন্তা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখো, দিনের পর দিন ঐ-সকল ভাব শুনিতে থাকো, মাসের পর মাস উহা চিন্তা করিতে থাকো। প্রথম প্রথম সফল না হও, ক্ষতি নাই, এই বিফলতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ইহা মানবজীবনের সৌন্দর্য। এরূপ বিফলতা না থাকিলে জীবনটা কি হইত? যদি জীবনে এই বিফলতাকে জয় করিবার চেষ্টা না থাকিত, তবে জীবন ধারণ করিবার কোন মূল্য থাকিত না। উহা না থাকিলে জীবনে কবিত্ব কোথায় থাকিত? এই বিফলতা, এই ভ্রম থাকিলই বা; গরুকে কখন মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই, কিন্তু উহা চিরকাল গরুই থাকে, কখনই মানুষ হয় না। অতএব বার বার বিফল হও, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; সহস্রবার ঐ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ কর, আর যদি সহস্রবার অকৃতকার্য হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই মানুষের আদর্শ—উদ্দেশ্য। যদি সকল বস্তুতে তাঁহাকে দেখিতে না পারো, অন্ততঃ যাহাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসো, এমন এক ব্যক্তির মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিতে চেষ্টা কর—তারপর আর এক ব্যক্তির মধ্যে; এইরূপে অগ্রসর হইতে পারো। আত্মার সম্মুখে তো অনন্ত জীবন পড়িয়া রহিয়াছে,—অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলে তোমার শুভ বাসনা পূর্ণ হইবে।

'অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥'[১]

—তিনি অচল, এক, মন অপেক্ষাও দ্রুত কম্পনশীল! ইন্দ্রিয়গণ পূর্বে গমন করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও অন্যান্য দ্রুতগামী পদার্থের অগ্রবর্তী। তাঁহাতে থাকিয়াই হিরণ্যগর্ভ সকলের কর্মফল বিধান করিতেছেন। তিনি সচল, তিনি স্থিব, তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি এই সকলের ভিতরে, আবার তিনি এই সকলের বাহিরে। যিনি আত্মাব মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, আবার সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কিছু গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। যে অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সর্বভূত আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সেই একত্বদর্শী পুরুষের সেই অবস্থায় শোক বা মোহের বিষয় কি থাকে?

সর্ব পদার্থের এই একত্ব বেদান্তের আর একটি প্রধান বিষয়। আমরা পরে দেখিব, বেদান্ত কিরূপে প্রমাণ করে যে, আমাদের সমুদয় দুঃখ অজ্ঞান-প্রসূত, অজ্ঞান আর কিছুই নয়—এই বহুত্বের ধারণা—এই ধারণা যে, মানুষে মানুষে ভিন্ন, নর নারী ভিন্ন, যুবা ও শিশু ভিন্ন, জাতি হইতে জাতি পৃথক্, চন্দ্র হইতে পৃথিবী পৃথক্, সূর্য হইতে চন্দ্র পৃথক, একটি পরমাণু হইতে আর একটি পরমাণু পৃথক্। এই পৃথক্ জ্ঞানই সকল দুঃখের কারণ। বেদান্ত বলেন, এই প্রভেদ বাস্তবিক নাই। এই প্রভেদ প্রাতিভাসিক, উপরে উপরে দেখা যায় মাত্র। বস্তুর অন্তস্তলে সেই একত্ব এখনও বিরাজমান। যদি ভিতরে চলিয়া যাও, তবে এই একত্ব দেখিতে পাইবে—মানুষে মানুষে একত্ব, নরনারীতে একত্ব, জাতিতে জাতিতে একত্ব, উচ্চনীচে একত্ব, ধনী-দরিদ্রে একত্ব, দেবতা-

১ ঈশোপনিষৎ, ৪, ৭

মনুষ্যে একত্ব, সকলেই এক ; যদি আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ কর—দেখিবে ইতর জীবজন্তু—সবই এক। যিনি এইরূপ একত্বদর্শী হইয়াছেন, তাঁহার আর মোহ থাকে না। তিনি তখন সেই একত্বে পৌছিয়াছেন, ধর্মবিজ্ঞানে যাহাকে 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকে। তাঁহার আর মোহ কিরূপে থাকিবে ? কিসে তাঁহার মোহ জন্মাইতে পারে ? তিনি সকল বস্তুর আভ্যন্তরিক সত্য জানিয়াছেন, সকল বস্তুর রহস্য জানিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে আর দুঃখ থাকিবে কিরূপে ? তিনি আর কি বাসনা করিবেন ? তিনি সকল বস্তুর মধ্যে প্রকৃত সত্য অন্বেষণ করিয়া জগতের কেন্দ্রস্বরূপ ঈশ্বরে পৌছিয়াছেন, তিনি সকল বস্তুর একত্ব-স্বরূপ ; তিনিই অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ। সেখানে মৃত্যু নাই, রোগ নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই। আছে কেবল পূর্ণ একত্ব—পূর্ণ আনন্দ। তখন তিনি কাহার জন্য শোক করিবেন ? বাস্তবিক সেই কেন্দ্রে, সেই পরম সত্যে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, কাহারও জন্য শোক করিবার নাই, কাহারও জন্য দুঃখ করিবার নাই।

'স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥'[১]

—তিনি চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন, তিনি উজ্জ্বল দেহশূন্য ব্রণশূন্য স্নায়ুশূন্য পবিত্র ও নিষ্পাপ, তিনি কবি, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভূ ; তিনিই চিরকাল যথাযোগ্যরূপে সকলের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন।

যাহারা এই অবিদ্যাময় জগতের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা এই জগৎকে ব্রহ্মের ন্যায় সত্যজ্ঞান করিয়া উহার উপাসনা করে, তাহারাও অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু যাহারা চিরজীবন এই সংসারের উপাসনা করে, উহা হইতে উচ্চতর আর কিছুই লাভ করিতে পারে না, তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।[২] যিনি এই পরমসুন্দর প্রকৃতির রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি প্রকৃতির সাহায্যে দৈবী প্রকৃতির চিন্তা করেন, তিনি মৃত্যু অতিক্রম করেন এবং দৈবী প্রকৃতির সাহায্যে অমৃতত্ব সম্ভোগ করেন।

১ ঈশ উপ., ৮

২ ঈশ উপ., ৯-১২

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥
…তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥'[১]

—হে সূর্য, হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ। সত্যধর্মা আমি যাহাতে তাহা দেখিতে পারি, এই জন্য আবরণ অপসারিত কর। …আমি তোমার পরম রমণীয় রূপ দেখিতেছি—তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রহিয়াছেন, তাহা আমিই।

অপরোক্ষানুভূতি

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৯শে অক্টোবর, ১৮৯৬]

আমি তোমাদিগকে আর একখানি উপনিষদ্ হইতে পাঠ করিয়া শুনাইব। ইহা অতি সরল অথচ অতিশয় কবিত্বপূর্ণ; ইহার নাম 'কঠোপনিষদ্'। তোমাদের অনেকে বোধ হয়, সার এডুইন আর্নল্ড-কৃত ইহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, জগতের আদি কোথায়, সৃষ্টি কি ভাবে হইল, এই প্রশ্নের উত্তর বহির্জগৎ হইতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য সন্ধান-চেষ্টা অন্তর্জগতে প্রবেশ করিল। কঠোপনিষদে এই মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বে প্রশ্ন হইতেছিল, 'কে এই বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিল? ইহার উৎপত্তি কি করিয়া হইল?' ইত্যাদি। কিন্তু এখন এই প্রশ্ন আসিল, মানুষের ভিতর এমন কি বস্তু আছে, যাহা তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে, যাহা তাহাকে চালাইতেছে এবং মৃত্যুর পরই বা মানুষের কি হয়? পূর্বে লোকে এই জড় জগৎ লইয়া ক্রমশঃ ইহার অন্তর্দেশে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহাতে পাইয়াছিল বড় জোর জগতের একজন শাসনকর্তা—একজন ব্যক্তি—একজন মনুষ্য মাত্র; হইতে পারে—মানুষের

১ ঈশ উপ., ১৫, ১৬

গুণরাশি অনন্ত পরিমাণে বর্ধিত করিয়া তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যতঃ তিনি একটি মনুষ্যমাত্র। এই মীমাংসা কখনই পূর্ণসত্য হইতে পারে না। খুব জোর আংশিক সত্য বলিতে পারো। আমরা মনুষ্যদৃষ্টিতে এই জগৎ দেখিতেছি, আর আমাদের ঈশ্বর ইহারই মানবীয় ব্যাখ্যা মাত্র।

মনে কর, একটি গরু যেন দার্শনিক ও ধর্মজ্ঞ হইল—সে জগৎকে তাহার গরুর দৃষ্টিতে দেখিবে, সে এই সমস্যার মীমাংসা গরুর ভাবেই করিবে, সে যে আমাদের ঈশ্বরকেই দেখিবে, তা না-ও হইতে পারে। বিড়ালেরা যদি দার্শনিক হয়, তাহারা 'বিড়াল-জগৎ' দেখিবে, তাহারা সিদ্ধান্ত করিবে, এক বিরাট বিড়াল এই জগৎ শাসন করিতেছে।

অতএব আমরা দেখিতেছি, জগৎ সম্বন্ধে মানবীয় ধারণা সবটুকু ব্যাখ্যা করিতে পারে না, জগৎসমস্যার সমাধান করা তো দূরের কথা! জগৎ সম্বন্ধে মানুষ যে দারুণ স্বার্থপর মীমাংসা করে, তাহা গ্রহণ করিলে প্রচণ্ড ভ্রমে পড়িতে হইবে। বাহ্যজগৎ হইতে জগৎসম্বন্ধে যে মীমাংসা পাওয়া যায়, তাহার দোষ এই যে, আমরা যে-জগৎ দেখি, তাহা আমাদের নিজেদের জগৎমাত্র, সত্য সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু দৃষ্টি, ততটুকু মাত্র। প্রকৃত সত্য—সেই পরমার্থ বস্তু কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, কিন্তু আমরা জগৎকে ততটুকুই জানি, যতটুকু পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। মনে কর, আমাদের আর একটি ইন্দ্রিয় হইল—তাহা হইলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্যই আর একরূপ ধারণ করিবে। মনে কর, আমাদের একটি চৌম্বক ইন্দ্রিয় হইল, জগতে হয়তো এমন লক্ষ লক্ষ শক্তি আছে, যাহা অনুভব করিবার জন্য আমাদের কোন ইন্দ্রিয় নাই—তখন সেইগুলির উপলব্ধি হইতে লাগিল। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সীমাবদ্ধ—বাস্তবিক অতি সীমাবদ্ধ, আর ঐ সীমার মধ্যেই আমাদের সমগ্র জগৎ অবস্থিত, এবং আমাদের ঈশ্বর আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতের মীমাংসা মাত্র। কিন্তু তাহা কখনও যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। কিন্তু মানুষ তো থামিতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী—সে এমন এক মীমাংসা করিতে চায়, যাহাতে জগতের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার কর, এমন এক পদার্থ আবিষ্কার কর, যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্বস্বরূপ—যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু যাহাকে যুক্তিবলে সকল জগতের

ভিত্তিভূমি, সকল জগতের ভিতরে মণিগণমধ্যস্থ সূত্রস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি, যাহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে না পারিলেও কেবল অকাট্য যুক্তিবলে উচ্চ নীচ সর্বপ্রকার স্তরের সাধারণ ভূমি—সর্বপ্রকার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি—বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমস্যা কতকটা মীমাংসার কাছাকাছি হইল বলা যাইতে পারে; সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর এই জ্ঞাত জগৎ হইতে মীমাংসার সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহা সমগ্র ভাবের আংশিক অনুভূতি মাত্র।

অতএব এই সমস্যার মীমাংসার একমাত্র উপায়—অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। অতি প্রাচীন মননশীল ব্যক্তিরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেন্দ্র হইতে তাঁহারা যতদূরে যাইতেছেন, ততই বিভেদ বাড়িতেছে, আর যতই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইতেছেন, ততই একত্ব বাড়িতেছে। আমরা যতই এই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হই, ততই আমরা একটি সাধারণ ভূমিতে সকলে একত্র হইতে পারি, আর যতই উহা হইতে দূরে সরিয়া যাই, ততই অপরের সহিত আমাদের পার্থক্য আরম্ভ হয়। এই বাহ্যজগৎ সেই কেন্দ্র হইতে অনেক দূরে, অতএব ইহার মধ্যে এমন কোন সাধারণ ভূমি থাকিতে পারে না, যেখানে সকল অস্তিত্বের একটি সাধারণ মীমাংসা হইতে পারে। যত কিছু ব্যাপার আছে, এই জগৎ বড় জোর, তাহার একটি অংশ মাত্র। আরও কত ব্যাপার রহিয়াছে, মনোজগতের ব্যাপার, নৈতিক জগতের ব্যাপার, বুদ্ধিরাজ্যের ব্যাপার—এইরূপ আরও কত ব্যাপার রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল একটি মাত্র লইয়া তাহা হইতে সমুদয় জগৎ-সমস্যার মীমাংসা করা অসম্ভব। অতএব আমাদিগকে প্রথমতঃ কোথাও এমন একটি কেন্দ্র বাহির করিতে হইবে, যেখান হইতে অন্যান্য বিভিন্ন 'লোক' উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কেন্দ্র হইতে আমরা এই প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করিব। ইহাই এখন প্রস্তাবিত বিষয়। সেই কেন্দ্র কোথায়? উহা আমাদের ভিতরে—এই মানুষের ভিতর যে-মানুষ রহিয়াছেন, তিনিই সেই কেন্দ্র। ক্রমাগত অন্তরের অন্তরে যাইয়া, মহাপুরুষেরা দেখিতে পাইলেন, জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। যত প্রকার অস্তিত্ব আছে, সবই আসিয়া সেই এক কেন্দ্রে মিলিত হইতেছে। এখানেই বাস্তবিক সবকিছুর একটি

সাধারণ ভূমি—এখানে দাঁড়াইয়া আমরা একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। অতএব কে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রশ্নটিই বড় দার্শনিকযুক্তি-সিদ্ধ নহে, এবং উহার মীমাংসাও বিশেষ কিছু কাজের নহে।

পূর্বে যে কঠোপনিষদের কথা বলা হইয়াছে, উহার ভাষা বড় অলঙ্কারপূর্ণ। অতি প্রাচীনকালে এক অতিশয় ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক সময়ে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে এই নিয়ম ছিল যে, সর্বস্ব দান করিতে হইবে। এই ব্যক্তির ভিতর বাহির এক ছিল না। তিনি যজ্ঞ করিয়া খুব মান-যশ পাইবার ইচ্ছা করিতেন। এদিকে কিন্তু তিনি এমন সব জিনিস দান করিতেছিলেন, যাহা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী—তিনি কতকগুলি জরাজীর্ণ মৃতপ্রায় বন্ধ্যা কানা খোঁড়া গাভী লইয়া সেগুলিই ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেছিলেন। নচিকেতা নামে তাঁহার এক অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল। পিতা ঠিক ঠিক তাঁহার ব্রত পালন করিতেছেন না, বরং উহা ভঙ্গ করিতেছেন দেখিয়া সে মর্মে মর্মে পীড়িত হইল। ভারতবর্ষে পিতামাতা প্রত্যক্ষ জীবন্ত দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, সন্তানেরা তাঁহাদের সম্মুখে কিছু বলিতে বা করিতে সাহস পায় না, কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। অতএব সেই বালক পিতার সম্মুখীন হইয়া অতিশয় শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত তাঁহাকে কেবলমাত্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, 'পিতা, আপনি আমায় কাহাকে দিবেন? আপনি তো যজ্ঞে সর্বস্ব-দানের সঙ্কল্প করিয়াছেন।' পিতা অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'ও কি বলিতেছ, বৎস! পিতা নিজ পুত্রকে দান করিবে—এ কেমন কথা?' বালকটি দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিল; তখন পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তোকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করিব—যমকে দিব।' তারপর আখ্যায়িকা এই:

বালকটি সত্যই যমের নিকট গেল। মৃত্যুমুখে পতিত প্রথম মানব যম-দেবতা হন—তিনি স্বর্গে গিয়া সমুদয় পিতৃগণের অধিপতি হইয়াছেন। সাধু-ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাঁহারা ইঁহার নিকট গিয়া অনেক দিন ধরিয়া বাস করেন। এই যম একজন অতি শুদ্ধস্বভাব সাধুপুরুষ বলিয়া বর্ণিত। বালকটি যমলোকে গমন করিল। দেবতারাও সময়ে সময়ে বাড়ি থাকেন না, অতএব নচিকেতাকে তিন দিন সেখানে তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে হইল। চতুর্থ দিনে যম বাড়ি ফিরিলেন।

যম কহিলেন, 'হে বিদ্বন্, তুমি পূজার যোগ্য অতিথি হইয়াও তিন দিন আমার গৃহে অনাহারে অবস্থান করিতেছ। হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে প্রণাম, আমার কল্যাণ হউক! আমি গৃহে ছিলাম না বলিয়া বড় দুঃখিত। কিন্তু এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাকে আমি প্রতিদিনের জন্য একটি করিয়া তিনটি বর দিতে প্রস্তুত, তুমি বর প্রার্থনা কর।' বালক এই প্রার্থনা করিল, 'আমায় প্রথম বর এই দিন যে, আমার প্রতি পিতার ক্রোধ যেন চলিয়া যায়, তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হন, আর আপনি আমাকে এস্থান হইতে বিদায় দিলে যখন পিতার নিকট যাইব, তিনি যেন আমায় চিনিতে পারেন।' যম বলিলেন, 'তথাস্তু'।

নচিকেতা দ্বিতীয় বরে স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ-বিশেষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে আমরা কেবল স্বর্গের কথা পাই—সেখানে সকলের জ্যোতির্ময় শরীর, সেখানে তাঁহারা পিতৃপুরুষদিগের সহিত বাস করেন। ক্রমশঃ অন্যান্য ভাব আসিল, কিন্তু এ-সকলে কিছুতেই মানুষ সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইল না। এই স্বর্গ অপেক্ষা আরও উচ্চতর কিছুর আবশ্যক। স্বর্গে বাস এই জগতে বাস হইতে বড় কিছু ভিন্ন রকমের নহে। বড় জোর একজন সুস্থকায় ধনীর জীবন যেরূপ, ইহা সেইরূপই—সম্ভোগের জিনিস অপর্যাপ্ত, আর নীরোগ সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর। উহা তো এই জড়জগৎই হইল, না হয় আর একটু উঁচু স্তরের; আর আমরা পূর্বেই যখন দেখিয়াছি, এই জড়জগৎ পূর্বোক্ত সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে পারে না, তখন এই স্বর্গ হইতেই বা উহার কি মীমাংসা হইবে? অতএব যতই স্বর্গের উপর স্বর্গ কল্পনা কর না কেন, কিছুতেই সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। যদি এই জগৎ ঐ সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে না পারিল, তবে এইরূপ কতকগুলি জগৎ কেমন করিয়া উহার মীমাংসা করিবে? কারণ, আমাদের মনে রাখা উচিত—স্থূল প্রপঞ্চ প্রাকৃতিক সমুদয় ব্যাপারের অতি সামান্য অংশমাত্র।

আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে দেখ না কেন, ইহাতে কতটা আমাদের চিন্তার ব্যাপার, আর কতটাই বা বাহিরের ঘটনা! কতটা তুমি কেবল অনুভব কর, আর কতটাই বা বাস্তবিক দর্শন ও স্পর্শ কর! এই জীবন-প্রবাহ কি প্রবল বেগেই চলিতেছে—ইহার কার্যক্ষেত্রও কি বিস্তৃত—

কিন্তু ইহাতে মানসিক ঘটনাবলীর তুলনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারসমূহ কতটুকু! স্বর্গবাদের ভ্রম এই যে, উহা বলে, আমাদের জীবন ও জীবনের ঘটনাবলী কেবল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই স্বর্গে, যেখানে জ্যোতির্ময় দেহ পাইবার কথা, অধিকাংশ লোকের তৃপ্তি হইল না। তথাপি এখানে নচিকেতা স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান দ্বিতীয় বরের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছে। বেদের প্রাচীন ভাগে আছে, দেবতারা যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া মানুষকে স্বর্গে লইয়া যান। সকল ধর্ম আলোচনা করিলে নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে, যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই কালে পবিত্রতা-মণ্ডিত হইয়া থাকে। আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভূর্জ-ত্বকে লিখিতেন, অবশেষে তাঁহারা কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিলেন, কিন্তু আজও ভূর্জ-ত্বক পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রায় নয় দশ সহস্র বর্ষ পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন, সেই প্রণালী আজও বর্তমান। যজ্ঞের সময় অন্য কোন প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন করিলে চলিবে না। এশিয়াবাসী আর্যগণের আর এক শাখা সম্বন্ধেও সেইরূপ। এখনও তাহাদের বর্তমান বংশধরগণ বৈদ্যুতাগ্নি রক্ষা করিতে ভালবাসে। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, ইহারা পূর্বে এইভাবে অগ্নি উৎপন্ন করিত; ক্রমে ইহারা দুইখানি কাঠ ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিল; পরে যখন অগ্নি উৎপাদন করিবার অন্যান্য উপায় শিখিল, তখনও প্রথমোক্ত উপায়গুলি তাহারা ত্যাগ করিল না; সেগুলি পবিত্র আচার হইয়া দাঁড়াইল।

হিব্রুদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তাহারা পূর্বে পার্চমেণ্টে লিখিত। এখন তাহারা কাগজে লিখিয়া থাকে, কিন্তু পার্চমেণ্টে লেখা তাহাদের চক্ষে মহা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত। এইরূপ সকল জাতি সম্বন্ধেই। এখন যে-আচারকে শুদ্ধাচার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তাহা প্রাচীন প্রথামাত্র। এই যজ্ঞগুলিও সেইরূপ প্রাচীন প্রথামাত্র ছিল। কালক্রমে যখন মানুষ পূর্বাপেক্ষা উত্তম প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল, তখন তাহাদের ধারণাসকল পূর্বাপেক্ষা উন্নত হইল, কিন্তু ঐ প্রাচীন প্রথাগুলি রহিয়া গেল। সময়ে সময়ে ঐগুলির অনুষ্ঠান হইত—উহারা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত হইত। তারপর একদল লোক এই যজ্ঞকার্য নির্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। ইঁহারাই পুরোহিত। ইঁহারা যজ্ঞ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতে লাগিলেন—

যজ্ঞই তাঁহাদের যথাসর্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের এই ধারণা তখন বদ্ধমূল হইল—দেবতারা যজ্ঞের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে আসেন, যজ্ঞের শক্তিতে জগতে সবই হইতে পারে। যদি নির্দিষ্টসংখ্যক আহুতি দেওয়া যায়, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্তোত্র গীত হয়, বিশেষাকৃতিবিশিষ্ট কতকগুলি বেদী প্রস্তুত হয়, তবে দেবতারা সব করিতে পারেন, এই প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইল। নচিকেতা এই জন্যই দ্বিতীয় বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিভাবে যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে।

তারপর নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, আর এখান হইতেই প্রকৃত উপনিষদের আরম্ভ। নচিকেতা বলিলেন, 'কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে; কেহ বলেন, থাকে না; আপনি আমাকে এই বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন।'

যম ভীত হইলেন। তিনি পরম আনন্দের সহিত নচিকেতার অন্য দুইটি বর পূর্ণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি বলিলেন, 'প্রাচীনকালে দেবতাদের এ বিষয়ে সংশয় ছিল। এই সূক্ষ্ম ধর্ম সুবিজ্ঞেয় নহে। হে নচিকেতা, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, এ বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ করিও না—আমাকে ছাড়িয়া দাও।'

নচিকেতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি বলিলেন, 'হে যমরাজ! মৃত্যু! দেবতারাও এ বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, আর ইহা বুঝাও সহজ ব্যাপার নহে, সত্য বটে! কিন্তু আমি আপনার ন্যায় এ বিষয়ের বক্তাও পাইব না, আর এই বরের তুল্য অন্য বরও নাই।'

যম বলিলেন, 'শতায়ু পুত্র-পৌত্র, পশু-হস্তী, সুবর্ণ-অশ্ব প্রার্থনা কর। এই পৃথিবীতে রাজত্ব কর এবং যতদিন তুমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, ততদিন বাঁচিয়া থাকো। অন্য কোন বর যদি তুমি ইহার সমান মনে কর, তবে তাহাও প্রার্থনা কর—অর্থ এবং দীর্ঘজীবন প্রার্থনা কর। হে নচিকেতা, তুমি বিস্তৃত পৃথিবীমণ্ডলে রাজত্ব কর, আমি তোমাকে সর্বপ্রকার কাম্যবস্তুর অধিকারী করিব। পৃথিবীতে যে-সকল কাম্যবস্তু দুর্লভ, সেগুলি প্রার্থনা কর। এই রথাধিরূঢ়া গীতবাদ্যনিপুণা রমণীগণকে মানুষ লাভ করিতে পারে না। হে নচিকেতা, আমার প্রদত্ত এই-সকল কামিনী তোমার সেবা করুক, কিন্তু তুমি মৃত্যু-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিও না।'

নচিকেতা বলিলেন, 'এ-সকল বস্তু কেবল দুদিনের জন্য—ইহারা ইন্দ্রিয়ের তেজ হরণ করে। অতি দীর্ঘ জীবনও অনন্তকালের তুলনায় বাস্তবিক অতি অল্প। অতএব এই-সকল হস্তী অশ্ব রথ গীতবাদ্য আপনারই থাকুক। মানুষ বিত্তদ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না। আপনাকে যখন দেখিতে হইবে—মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত, তখন কি এই ধনসম্পদ রাখিতে পারিব? আপনি যতদিন ইচ্ছা করিবেন, ততদিনই আমরা জীবিত থাকিব। আমি যে-বর প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা ছাড়া আর কিছু চাহি না।'

বালকের সঙ্কল্পে সন্তুষ্ট হইয়া যম বলিলেন, 'পরম কল্যাণ (শ্রেয়ঃ) ও আপাতরম্য ভোগ (প্রেয়ঃ)—এই দুইটির উদ্দেশ্য ভিন্ন; কিন্তু ইহারা উভয়েই মানুষকে বদ্ধ করে। যিনি দুইটির মধ্যে 'শ্রেয়ঃ'কে গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যে আপাতরম্য 'প্রেয়ঃ' গ্রহণ করে, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—উভয়ই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি বিচার করিয়া একটি হইতে অপরটি পৃথক্ বলিয়া জানেন। তিনি শ্রেয়ঃকে প্রেয়ঃ অপেক্ষা বড় বলিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু অ-জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ দেহের সুখের জন্য 'প্রেয়ঃ'কেই গ্রহণ করে। হে নচিকেতা, তুমি আপাতরম্য বিষয়গুলির নশ্বরতা চিন্তা করিয়া সেগুলি পরিত্যাগ করিয়াছ।' এই কথার পর নচিকেতাকে প্রশংসা করিয়া অবশেষে যম তাঁহাকে পরম তত্ত্বের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

এখন আমরা বৈদিক বৈরাগ্য ও নীতির এই সমুন্নত ধারণা পাইলাম যে, যতদিন না মানুষ ভোগবাসনা জয় করিতেছে, ততদিন তাহার হৃদয়ে সত্য-জ্যোতির প্রকাশ হইবে না। যতদিন এই-সকল বৃথা বিষয়-বাসনা তুমুল কোলাহল করিতেছে, যতদিন উহারা প্রতিমুহূর্তে আমাদিগকে যেন বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং আমাদিগকে প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর—একবিন্দু রূপের, একবিন্দু আস্বাদের, একবিন্দু স্পর্শের দাস করিতেছে, ততদিন আমরা যতই জ্ঞানের গরিমা করি না কেন, সত্য কিভাবে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে?

যম বলিতেছেন, 'যে-আত্মার সম্বন্ধে, যে-পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা চিন্তাশূন্য বালকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। এই জগতেরই অস্তিত্ব আছে, পরলোকের অস্তিত্ব নাই—এরূপ চিন্তা করিয়া মানুষ পুনঃ পুনঃ আমার বশে আসে।'

আবার এই সত্য বুঝাও বড় কঠিন। অনেকে ক্রমাগত এই বিষয় শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, এ বিষয়ের বক্তাও 'আশ্চর্য' হইবেন, শ্রোতাও অনুরূপ হইবেন। গুরুর অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, শিষ্যেরও তেমনি হওয়া চাই। মনকে আবার বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করা উচিত নহে। কারণ পরমার্থতত্ত্ব তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষের বিষয়। আমরা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি, প্রত্যেক ধর্মই বিশ্বাসের উপর খুব জোর দেয়। আমরা অন্ধবিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছি। অবশ্য এই অন্ধবিশ্বাস যে মন্দ জিনিস, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস ব্যাপারটিকে একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিব, ইহার পশ্চাতে একটি মহান্ সত্য আছে। যাহারা অন্ধবিশ্বাসের কথা বলে, তাহাদের বাস্তবিক উদ্দেশ্য এই অপরোক্ষানুভূতি —আমরা এখন ইহার আলোচনা করিতেছি। মনকে বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করিলে চলিবে না, কারণ তর্কদ্বারা কখন ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন। সমুদয় যুক্তি ও তর্কই কতকগুলি অনুভূতির উপর স্থাপিত। এইগুলি ব্যতীত তর্ক হইতেই পারে না। আমরা পূর্বে যে-সকল বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন কতকগুলি বিষয়ের তুলনার প্রণালীকে যুক্তি বলে। এই সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি না থাকিলে যুক্তি সম্ভব নয়! বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, তবে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেই বা তাহা না হইবে কেন?

আমরা পুনঃ পুনঃ এই মহাভ্রমে পড়িয়া থাকি, আমরা স্বীকার করিয়া লই, বহির্বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। সেখানে কেহ বিশ্বাস করিয়া লইতে বলে না, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-বিষয়ক নিয়মাবলী কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে না; প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারাই উহারা লব্ধ হয়। আবার সকল তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিদ্ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন—তাহা হইতে আর কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল। ইহা একটি ঘটনা। আমরা উহা স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া রসায়নের সকল বিচার করিয়া থাকি। পদার্থবিদ্‌রাও তাহাই করিয়া থাকেন—সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ। সর্বপ্রকার জ্ঞানই কতকগুলি বিষয়ের অনুভূতির উপর স্থাপিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা যুক্তি-বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অধিকাংশ লোক বিশেষতঃ

বর্তমানকালে ভাবিয়া থাকে, ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু নাই; যদি ধর্ম লাভ করিতে হয়, তবে বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই তাহা লাভ করিতে হইবে। ধর্ম কিন্তু কথোপকথনের ব্যাপার নয়—প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদিগকে আমাদের আত্মার ভিতরে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, সেখানে কি আছে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আর যাহা বুঝিব, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম। যতই কথা বলো না কেন, তাহা দ্বারা ধর্ম লাভ হইবে না। অতএব একজন ঈশ্বর আছেন কি না, তাহা বৃথা তর্কের দ্বারা প্রমাণিত হইবার নহে, কারণ যুক্তি উভয় দিকেই সমান। কিন্তু যদি একজন ঈশ্বর থাকেন, তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। তুমি কি কখন তাঁহাকে দেখিয়াছ? ইহাই প্রশ্ন। জগতের অস্তিত্ব আছে কি না—এই প্রশ্ন এখনও মীমাংসিত হয় নাই, প্রত্যক্ষবাদ ও বিজ্ঞানবাদের (Realism and Idealism) তর্ক অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই তর্ক চলিতেছে সত্য, কিন্তু আমরা জানি—জগৎ রহিয়াছে এবং চলিতেছে। আমরা কেবল একটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া এই তর্ক করিয়া থাকি। আমাদের জীবনের অন্যান্য সকল প্রশ্ন সম্বন্ধেও তাই—আমাদিগকে প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিতে হইবে। যেমন বহির্বিজ্ঞানে তেমন পরমার্থবিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতকগুলি সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, মতামত সেগুলির উপরই স্থাপিত হইবে। অবশ্য ধর্মের যে-কোন মতবাদ হউক না, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে—এই অযৌক্তিক দাবী স্বীকার করা অসম্ভব, ইহা মানুষের মন অবনত করে। যে-ব্যক্তি তোমাকে সকল বিষয় বিশ্বাস করিতে বলে, সে নিজেকে অবনত করে, আর তুমি যদি তাহার কথায় বিশ্বাস কর, তুমিও অবনত হইবে। জগতের সাধুপুরুষদের আমাদিগকে শুধু এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যের কথাই তাঁহারা বলিতেছেন; তাঁহারা আশ্বাস দেন যে, আমরা সত্য লাভ করিব। ঐরূপ করিলে তখনই আমরা বিশ্বাস করিব, তাহার পূর্বে নহে। ধর্মের মূল ভিত্তি এইখানে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখিবে যাহারা ধর্মের বিরুদ্ধে তর্ক করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই, তাহারা সত্য লাভ করিবার চেষ্টাই করে নাই। অতএব ধর্মের বিরুদ্ধে তাহাদের যুক্তির কোন মূল্য নাই। যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া

বলে, 'তোমরা, যাহারা সূর্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাহারা সকলেই ভ্রান্ত'—তাহার কথার যতটুকু মূল্য, ইহাদের কথারও মূল্য ততটুকু। অতএব যাহারা নিজেদের মন বিশ্লেষণ করে নাই, অথচ ধর্মকে একেবারে উড়াইয়া দিতে—লোপ করিতে অগ্রসর, তাহাদের কথায় আমাদের কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই।

এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া বুঝা এবং অপরোক্ষানুভূতির ভাব সর্বদা মনে জাগরূক রাখা উচিত। ধর্ম লইয়া এই-সকল গণ্ডগোল, মারামারি, বিবাদ-বিসম্বাদ তখনই চলিয়া যাইবে, যখনই আমরা বুঝিব, ধর্ম—গ্রন্থ বা মন্দিরে আবদ্ধ নয় অথবা ইন্দ্রিয় দ্বারাও উহার অনুভূতি সম্ভব নয়। ধর্ম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের প্রত্যক্ষানুভূতি। যিনি ঈশ্বর ও আত্মা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। প্রত্যক্ষানুভূতিশূন্য উচ্চতম ধর্মশাস্ত্রবিৎ, যিনি অনর্গল ধর্মবক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহার সহিত অতি সামান্য অজ্ঞ জড়বাদীর কোন প্রভেদ নাই। আমরা সকলেই নাস্তিক—ইহা স্বীকার করি না কেন? কেবল তর্ক বিচার করিয়া ধর্মের তত্ত্বগুলিতে সম্মতি দিলেই ধার্মিক হওয়া যায় না। একজন খ্রীষ্টান বা মুসলমান অথবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর কথা ধর; খ্রীষ্টের সেই 'শৈলোপদেশের' কথা মনে কর; যে-কোন ব্যক্তি ঐ উপদেশ কার্যে পালন করে, সে তৎক্ষণাৎ দেবতা হইয়া যায়, সিদ্ধ হইয়া যায়; তথাপি লোকে বলে, পৃথিবীতে কোটি কোটি খ্রীষ্টান আছে। তুমি কি বলিতে চাও, ইহারা সকলে খ্রীষ্টান? বাস্তবিক ইহার অর্থ এই, ইহারা কোন-না-কোন সময়ে এই উপদেশানুযায়ী কার্য করিবার চেষ্টা করিতে পারে। দুই কোটি লোকের ভিতর একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান আছে কিনা সন্দেহ।

ভারতবর্ষেও বলা হয়, ত্রিশ কোটি বৈদান্তিক আছেন; যদি প্রত্যক্ষানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তি সহস্রে একজনও থাকিতেন, তবে এই জগৎ পাঁচ মিনিটে আর এক আকার ধারণ করিত। আমরা সকলেই নাস্তিক, কিন্তু যে-ব্যক্তি উহা স্পষ্ট স্বীকার করে, তাহার সহিতই আমরা বিবাদে প্রবৃত্ত হই। সকলেই আমরা অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছি। ধর্ম আমাদের কাছে যেন কিছু নয়, কেবল বিচারলব্ধ কতকগুলি মতের অনুমোদন মাত্র, কেবল কথার কথা—অমুক বেশ ভাল বলিতে পারে, অমুক পারে না। কিন্তু ইহা ধর্ম নয়; 'শব্দ-যোজনা করিবার সুন্দর কৌশল, আলঙ্কারিক বর্ণনার ক্ষমতা, নানাপ্রকারে

শাস্ত্রের শ্লোকব্যাখ্যা—এই-সকল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের নিমিত্ত, মুক্তির জন্য নয়।'[১] যখনই আত্মা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইবে, তখনই ধর্ম আরম্ভ হইবে। তখনই তুমি ধার্মিক হইবে, তখন—কেবল তখনই নৈতিক জীবনও আরম্ভ হইবে। আমরা এখন পশুদের অপেক্ষা বড় বেশী নীতি-পরায়ণ নই। আমরা এখন কেবল সমাজের শাসন-ভয়েই বড় উচ্চবাচ্য করি না। যদি সমাজ আজ বলে, চুরি করিলে আর শাস্তি হইবে না, আমরা অমনি অপরের সম্পত্তি চুরি করিতে ছুটিব। আমাদের সচ্চরিত্র হইবার কারণ পুলিশ। সামাজিক প্রতিপত্তি-লোপের আশঙ্কাই আমাদের নীতিপরায়ণ হইবার অনেকটা কারণ, আর বাস্তবিক আমরা পশুদের চেয়ে অতি সামান্যই উন্নত। আমরা যখন নিজ নিজ গৃহের নিভৃত কোণে বসিয়া নিজেদের ভিতরটা অনুসন্ধান করি, তখনই বুঝিতে পারি, এ-কথা কতদূর সত্য। অতএব এস, আমরা এই কপটতা ত্যাগ করি। এস, স্বীকার করি—আমরা ধার্মিক নই এবং অপরের প্রতি ঘৃণা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। আমাদের সকলের মধ্যে বাস্তবিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ, আর আমাদের ধর্মের প্রত্যক্ষানুভূতি হইলেই আমরা নীতিপরায়ণ হইবার আশা করিতে পারি।

মনে কর, তুমি কোন দেশ দেখিয়াছ। কোন ব্যক্তি তোমায় কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তুমি নিজের অন্তরের অন্তরে কখন এ-কথা বলিতে পারিবে না যে, তুমি সেই দেশ দেখ নাই। অবশ্য অতিরিক্ত শারীরিক বলপ্রয়োগ করিলে তুমি মুখে বলিতে পারো বটে—আমি সেই দেশ দেখি নাই; কিন্তু তুমি মনে মনে জানিতেছ, তুমি তাহা দেখিয়াছ। বাহ্যজগৎকে তুমি যেরূপ প্রত্যক্ষ কর, যখন তাহা অপেক্ষাও ঐকান্তিকভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবে, তখন কিছুই তোমার বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারিবে না, তখনই প্রকৃত বিশ্বাস আরম্ভ হইবে। বাইবেলের কথা, 'যাহার একসর্ষপ-পরিমাণ বিশ্বাস আছে, সে পাহাড়কে সরিয়া যাইতে বলিলে পাহাড় তাহার কথা শুনিবে'[২]—এ কথার তাৎপর্য এই, তখন তুমি স্বয়ং সত্যস্বরূপ হইয়া গিয়াছ বলিয়াই সত্যকে জানিতে পারিবে, কেবল বিচারপূর্বক সত্যে সম্মতি দেওয়াতে কোন লাভ নাই।

১ বিবেকচূড়ামণি, ৬০

২ St. Matthew, Ch. 17, V. 20

একমাত্র প্রশ্ন এই—প্রত্যক্ষ হইয়াছে কি? ইহাই বেদান্তের মূলকথা—ধর্ম সাক্ষাৎ কর, কেবল কথায় কিছু হইবে না; কিন্তু সাক্ষাৎকার বড় কঠিন। যিনি পরমাণুর অভ্যন্তরে অতি গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরাণ পুরুষ প্রত্যেক মানবহৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন।[১] সাধুগণ তাঁহাকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সুখ দুঃখ উভয়েরই পারে গিয়াছেন। আমরা যাহাকে ধর্ম বলি, আমরা যাহাকে অধর্ম বলি—শুভাশুভ সকল কর্ম, সৎ-অসৎ—সকলেরই পারে তিনি গিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন। তিনি যথার্থই সত্য দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে স্বর্গের কথা কি হইল? স্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, উহা দুঃখশূন্য সুখ; অর্থাৎ আমরা চাই সংসারের সব সুখ, উহার দুঃখগুলিকে কেবল বাদ দিতে চাই। অবশ্য ইহা অতি সুন্দর ধারণা বটে, ইহা স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ ধারণাটি একেবারে আগাগোড়াই ভুল, কারণ চরম সুখ বা চরম দুঃখ বলিয়া কোন জিনিস নাই।

রোমে একজন খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন জানিলেন, তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে দশ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে। শুনিয়াই তিনি বলিলেন, 'তবে আমি কাল কি করিব?'—বলিয়াই আত্মহত্যা করিলেন। দশ লক্ষ পাউণ্ড তাঁহার পক্ষে দারিদ্র্য, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। উহা আমার সারা জীবনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বাস্তবিক সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি? উহারা ক্রমাগত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, তখন আমার মনে হইত—কোচোয়ান হইতে পারিলে সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিব। এখন তাহা মনে হয় না। এখন তুমি কোন্ সুখকে ধরিয়া থাকিবে? এইটি আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত।

এই কুসংস্কারই আমাদের অনেক বিলম্বে ঘুচে; প্রত্যেকের সুখের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। আমি একটি লোককে দেখিয়াছি, সে প্রতিদিন একতাল আফিম না খাইলে সুখী হয় না। সে হয়তো ভাবিবে, স্বর্গের মাটি সব আফিম-নির্মিত। কিন্তু আমার পক্ষে সে-স্বর্গ বড় সুবিধাজনক হইবে না। আমরা আরবী কবিতায় পাঠ করিয়া থাকি, স্বর্গ নানা মনোহর উদ্যানে পূর্ণ, সেখানে অসংখ্য

১ কঠ উপ., ১।২।২০; শ্বেতাশ্ব উপ., ৩।২০

নদী প্রবাহিত হইতেছে। আমার জীবনের অধিকাংশ সময় আমি এমন এক দেশে বাস করিয়াছি, যেখানে অত্যন্ত অধিক জল, প্রতি বৎসর অনেক গ্রাম এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি জলপ্লাবনে মারা যায়। অতএব আমার স্বর্গ নিম্নদেশে নদী-প্রবাহযুক্ত উদ্যানপূর্ণ হইলে চলিবে না; আমার স্বর্গে অল্প স্বল্প বৃষ্টি হইবে। আমাদের জীবন সম্বন্ধেও তদ্রূপ, আমাদের সুখের ধারণা ক্রমাগত বদলাইতেছে। যুবক যদি স্বর্গের ধারণা করিতে যায়, তবে তাহার কল্পনায় উহা পরমাসুন্দরী স্ত্রীগণের দ্বারা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। সেই ব্যক্তিই আবার বৃদ্ধ হইলে তাহার আর স্ত্রীর আবশ্যকতা থাকিবে না। আমাদের প্রয়োজনই আমাদের স্বর্গের নির্মাতা, আর আমাদের প্রয়োজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বর্গও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যদি আমরা এমন এক স্বর্গে যাই, যেখানে অনন্ত ইন্দ্রিয়সুখলাভ হইবে, সেখানে আমাদের বিশেষ কিছু উন্নতি হইবে না—যাহারা বিষয়ভোগকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে, তাহারাই এইরূপ স্বর্গ প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহা বাস্তবিক মঙ্গলকর না হইয়া মহা অমঙ্গলকর হইবে। এই কি আমাদের চরম গতি—একটু হাসিকান্না, তার পর কুকুরের মতো মৃত্যু? যখন এই-সকল বিষয়ভোগের প্রার্থনা কর, তখন তোমরা মানবজাতির যে কি ঘোর অমঙ্গল কামনা করিতেছ, তাহা জান না। বাস্তবিক ঐহিক সুখভোগের কামনা করিয়া তুমি তাহাই করিতেছ, কারণ তুমি জান না, প্রকৃত আনন্দ কি। বাস্তবিক, দর্শনশাস্ত্র আনন্দ বা সুখ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আনন্দ কি তাহাই শিক্ষা দেয়। নরওয়েবাসীদের স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা—উহা একটি ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে সকলে ওডিন (Odin) দেবতার সম্মুখে উপবেশন করিয়া থাকে—কিয়ৎকাল পরে বন্যবরাহ-শিকার আরম্ভ হয়। পরে তাহারা নিজেরাই যুদ্ধ করে এবং পরস্পরকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলে। কিন্তু এরূপ যুদ্ধের খানিকক্ষণ পরেই কোন না কোনরূপে ইহাদের ক্ষতগুলি আরোগ্য হইয়া যায়—তাহারা তখন একটি বৃহৎ কক্ষে গিয়া সেই শূকরের মাংস পোড়াইয়া ভোজন করে ও আমোদ-প্রমোদ করিতে থাকে। পরদিন আবার সেই বরাহটি জীবিত হয়, আবার সেইরূপ শিকারাদি হইয়া থাকে। এ আমাদের ধারণারই অনুরূপ, তবে আমাদের ধারণাটি না হয় একটু মার্জিত। আমরা সকলেই এইরূপ 'শূকর' শিকার করিতে ভালবাসি—আমরা এমন

একস্থানে যাইতে চাই, যেখানে এই ভোগ পূর্ণমাত্রায় ক্রমাগত চলিবে, যেখানে ঐ নরওয়েবাসীরা যেমন কল্পনা করে—যাহারা স্বর্গে যায়, তাহারা প্রতিদিন বন্যশূকর শিকার করিয়া উহা খাইয়া থাকে, আবার পরদিন শূকরটি পুনরায় বাঁচিয়া উঠে—সেইরূপ ঘটিবে।

দর্শনশাস্ত্রের মতে, নিরপেক্ষ অপরিণামী আনন্দ বলিয়া কিছু আছে, অতএব আমরা সাধারণতঃ যে ঐহিক সুখভোগ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে এ-সুখের কোন সম্বন্ধ নাই। আবার বেদান্তই প্রমাণ করে যে, এই জগতে যাহা কিছু আনন্দকর আছে, তাহা সেই প্রকৃত আনন্দের অংশমাত্র, কারণ বাস্তবিক সেই ব্রহ্মানন্দেরই অস্তিত্ব আছে। আমরা প্রতিমুহূর্তেই সেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছি, কিন্তু উহাকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া জানি না। যেখানেই দেখিবে কোনরূপ আনন্দ, এমন কি চোরের চৌর্য-কার্যে যে আনন্দ, তাহাও বাস্তবিক সেই পূর্ণানন্দ, কেবল উহা কতকগুলি বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে মলিন হইয়াছে। কিন্তু সেই আনন্দ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে সমুদয় ঐহিক সুখভোগ ত্যাগ করিতে হইবে। উহা ত্যাগ করিলেই প্রকৃত আনন্দ লাভ হইবে। প্রথমে অজ্ঞান এবং যাহা কিছু মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সত্যের প্রকাশ হইবে। যখন আমরা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিব, তখন প্রথমে আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আর একরূপ ধারণ করিবে, নূতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তখন সবই—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই—ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে, তখন সবই উন্নত ভাব ধারণ করিবে, তখন আমরা সকল পদার্থকে নূতন আলোকে বুঝিব। কিন্তু প্রথমে আমাদিগকে সে-সব ত্যাগ করিতেই হইবে, পরে সত্যের অন্ততঃ এক বিন্দু আভাস পাইলে আবার তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, কিন্তু অন্যরূপে—ব্রহ্মাকারে পরিণতরূপে। অতএব আমাদিগকে ছোটখাটো সুখ দুঃখ—সব ত্যাগ করিতে হইবে। এগুলি একই অনুভূতির বিভিন্ন মাত্রা। 'বেদসকল যাঁহাকে ঘোষণা করেন, সকল প্রকার তপস্যা যাঁহাকে পাওয়ার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য লোকে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করে, আমি সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে তোমাকে বলিব—তিনি ওঁ।'[১] বেদে এই ওঁকারের অতিশয় মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষিত হইয়াছে।

১ কঠ উপ., ১।২।১৫

যম নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন : মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কি অবস্থা হয়?—'বিপশ্চিৎ' বা অবিলুপ্তচৈতন্য আত্মা কখন মরেন না, কখন জন্মানও না; ইনি কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন না; ইনি অজ নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ। দেহ নষ্ট হইলেও ইনি নষ্ট হন না। 'হন্তা যদি মনে করেন, আমি কাহাকেও হনন করিতে পারি, অথবা হত ব্যক্তি যদি মনে করেন, আমি হত হইলাম, তবে উভয়কেই সত্যসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বুঝিতে হইবে। আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না অথবা নিজেও হত হন না।'[১] এ তো ভয়ানক কথা দাঁড়াইল। প্রথম শ্লোকে আত্মার বিশেষণ 'বিপশ্চিৎ'-শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর। ক্রমশঃ দেখিবে, বেদান্তের প্রকৃত মত এই যে, সমুদয় জ্ঞান, সমুদয় পবিত্রতা প্রথম হইতেই আত্মায় অবস্থিত, কোথাও হয়তো উহার বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। এই মাত্র প্রভেদ। মানুষের সহিত মানুষের অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন বস্তুর পার্থক্য প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। প্রত্যেকের অন্তরে অবস্থিত সত্য সেই একমাত্র অনন্ত নিত্যানন্দময় নিত্যশুদ্ধ নিত্যপূর্ণ ব্রহ্ম। তিনিই সেই আত্মা—তিনি পুণ্যবান্ পাপী, সুখী দুঃখী, সুন্দর কুৎসিত, মনুষ্য পশু—সর্বত্র একরূপ। তিনিই জ্যোতির্ময়। তাঁহার প্রকাশের তারতম্যেই নানারূপ প্রভেদ। কাহারও ভিতর তিনি বেশী প্রকাশিত, কাহারও ভিতর অল্প; কিন্তু সেই আত্মার নিকট এই ভেদের কোন অর্থই নাই। কাহারও পোশাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অধিকাংশ দেখা যাইতেছে, আর এক জনের পোশাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অল্পাংশ দেখা যাইতেছে—ইহাতে শরীরে কোন পার্থক্য হইতেছে না। কেবল দেহের অধিকাংশ বা অল্পাংশ আবরণকারী পরিচ্ছদেই ভেদ দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ দেহ ও মনের তারতম্য অনুসারে আত্মার শক্তি ও পবিত্রতা প্রকাশ পাইতে থাকে। অতএব এইখানেই বুঝিয়া রাখা ভাল যে, বেদান্তদর্শনে ভাল মন্দ বলিয়া দুইটি পৃথক্ বস্তু নাই। সেই এক জিনিসই ভাল মন্দ—দুই হইতেছে, আর উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা কেবল পরিমাণগত, এবং বাস্তবিক কার্যক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতেছি। আজ যে-জিনিসকে আমি সুখকর বলিতেছি, কাল আবার একটু ভাল অবস্থা হইলে তাহা দুঃখকর বলিয়া ঘৃণা

১ কঠ উপ., ১।২।১৮

করিব। অতএব বাস্তবিক বস্তুটির বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার জন্যই ভেদের উপলব্ধি হয়, সেই জিনিসটিতে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। বাস্তবিক ভাল-মন্দ বলিয়া কিছু নাই। যে-অগ্নি আমার শীতনিবারণ করিতেছে, তাহাই কোন শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহা কি অগ্নির দোষ? অতএব যদি আত্মা শুদ্ধস্বরূপ ও পূর্ণ হয়, তবে যে-ব্যক্তি অসৎকার্য করিতে যায়, সে স্বরূপের বিপরীত আচরণ করিতেছে—সে নিজ স্বরূপ জানে না। ঘাতক-ব্যক্তির ভিতরেও শুদ্ধস্বভাব আত্মা রহিয়াছেন। সে ভ্রমবশতঃ উঁহাকে আবৃত রাখিয়াছে মাত্র, উঁহার জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে দিতেছে না। আর যে-ব্যক্তি মনে করে, সে হত হইল, তাহারও আত্মা হত হন না। আত্মা নিত্য—কখন তাঁহার ধ্বংস হইতে পারে না।[1] 'অণুর অণু, বৃহতেরও বৃহৎ, সেই সকলের প্রভু প্রত্যেক মানবহৃদয়ের গভীরে অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপ ব্যক্তি বিধাতার কৃপায় তাঁহাকে দেখিয়া শোক-শূন্য হন। যিনি দেহশূন্য হইয়া দেহে অবস্থিত, যিনি দেশবিহীন হইয়াও দেশে অবস্থিতের ন্যায়, সেই অনন্ত ও সর্বব্যাপী আত্মাকে এইরূপ জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা একেবারে দুঃখশূন্য হন।'[2] 'এই আত্মাকে বক্তৃতাশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা বা বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না।'[3]

এই যে 'বেদের দ্বারা লাভ করা যায় না,' এ-কথা বলা ঋষিদের পক্ষে বড় সাহসের কার্য। পূর্বেই বলিয়াছি, ঋষিরা চিন্তাজগতে বড় সাহসী ছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই থামিবার পাত্র ছিলেন না। হিন্দুরা বেদকে যেরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, খ্রীষ্টানরা বাইবেলকে কখন সেরূপ ভাবে দেখে নাই। খ্রীষ্টানের ঈশ্বরবাণীর ধারণা এই, কোন মনুষ্য ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া উহা লিখিয়াছে, কিন্তু হিন্দুদের ধারণা জগতে যে-সকল বিভিন্ন পদার্থ রহিয়াছে, তাহার কারণ—বেদে ঐ-সকল বস্তুর নাম উল্লিখিত আছে। তাঁহাদের বিশ্বাস—বেদের দ্বারাই জগৎসৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সবই বেদে আছে। যেমন জীবাত্মা অনাদি অনন্ত, তেমনি বেদের প্রত্যেকটি শব্দ পবিত্র ও অনন্ত। সৃষ্টিকর্তার মনের সমুদয় ভাবই যেন এই গ্রন্থে

১ কঠ উপ., ১।২।২০ ২ ঐ ১।২।২২

৩ ঐ ১।২।২৩

প্রকাশিত। তাঁহারা এইভাবে বেদকে দেখিতেন। এই কার্য নীতিসঙ্গত কেন? না, বেদ উহা বলিতেছেন। এই কার্য অন্যায় কেন? না, বেদ বলিতেছেন। বেদের প্রতি প্রাচীনদিগের এতটা শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এই ঋষিগণের সত্যানুসন্ধানে কি সাহস দেখ, তাঁহারা বলিলেন, 'না, বারংবার বেদপাঠ করিলেও সত্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। সেই আত্মা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার নিকটেই তিনি নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন।'[১] কিন্তু ইহাতে এই এক আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, তাঁহার পক্ষপাতিত্বদোষ হইল। এইজন্য নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও এই সঙ্গে কথিত হইয়াছে। 'যাহারা অসৎ-কর্মকারী ও যাহাদের মন শান্ত নহে, তাহারা কখন আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।'[২] কেবল যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, যাঁহাদের কার্য পবিত্র, যাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ সংযত, তাঁহাদিগের নিকটেই সেই আত্মা প্রকাশিত হন।[৩]

আত্মা সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা দেওয়া হইয়াছে। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে রশ্মি এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে। যে-রথে অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত থাকে, যে-রথের লাগাম খুব মজবুত ও সারথির হস্তে দৃঢ়রূপে ধৃত থাকে, সেই রথই বিষ্ণুর সেই পরমপদে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু যে-রথে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ দৃঢ়ভাবে সংযত থাকে না, মনরূপ রশ্মিও দৃঢ়ভাবে সংযত থাকে না, সেই রথ অবশেষে বিনষ্ট হয়।[৪] সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত আত্মা—চক্ষু অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাঁহাদের মন পবিত্র হইয়াছে, তাঁহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান।[৫] যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অতীত, যিনি অব্যয়, যাঁহার আদি-অন্ত নাই, যিনি প্রকৃতির অতীত, অপরিণামী, তাঁহাকে যে উপলব্ধি করে, সে মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়।[৬] কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করা বড় কঠিন —এই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। পথ বড় দীর্ঘ ও বিপৎসঙ্কুল, কিন্তু নিরাশ হইও না, দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হও, 'উঠ, জাগো এবং যে পর্যন্ত না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারো, সে পর্যন্ত নিবৃত্ত হইও না।'[৭]

১ কঠ উপ., ১।২।২৩
২ ঐ ১।২।২৪ ৩ ঐ ১।৩।৮
৪ ঐ ১।৩।৩-৯ ৫ ঐ ১।৩।১২
৬ ঐ ১।৩।১৫ ৭ ঐ ১।৩।১৪

এখন দেখিতেছি, সমগ্র উপনিষদের ভিতর প্রধান কথা এই 'অপরোক্ষানুভূতি'। এই বিষয়ে সময়ে সময়ে মনে নানা প্রশ্ন উঠিবে—বিশেষতঃ আধুনিক ব্যক্তিগণের মনে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিবে—আরও নানা সন্দেহ উঠিবে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে দেখিব, আমরা আমাদের পূর্ব-সংস্কারের দ্বারা চালিত হইতেছি। আমাদের মনে এই পূর্ব সংস্কারের প্রভাব খুব বেশী। যাহারা বাল্যকাল হইতে কেবল সগুণ ঈশ্বরের এবং মনের ব্যক্তিত্বের কথা শুনিতেছে, তাহাদের পক্ষে পূর্বোক্ত কথাগুলি অবশ্য কর্কশ লাগিবে, কিন্তু যদি আমরা ঐগুলি শ্রবণ করি, আর যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করি, তবে সেগুলি আমাদের প্রাণে গাঁথিয়া যাইবে, আমরা আর ভয় পাইব না। প্রধান প্রশ্ন অবশ্য দর্শনের উপকারিতা—কার্যকারিতা সম্বন্ধে। উহার কেবল একই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। যদি প্রয়োজন-বাদীদের মতে সুখের অন্বেষণ করা মানুষের কর্তব্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক চিন্তায় যাহাদের সুখ, তাহারা কেন না আধ্যাত্মিক চিন্তায় সুখ অন্বেষণ করিবে? অনেকে বিষয়ভোগে সুখী হয় বলিয়া বিষয়-সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু আবার এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহারা উচ্চতর ভোগের অন্বেষণ করে। কুকুর সুখী কেবল আহারে ও পানে। বৈজ্ঞানিক কিন্তু বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কয়েকটি তারার অবস্থান জানিবার জন্য হয়তো কোন পর্বতচূড়ায় বাস করিতেছেন; তিনি যে অপূর্ব সুখের আস্বাদ লাভ করিতেছেন, কুকুর তাহা বুঝিতে অক্ষম। কুকুর তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিবে, তাঁহাকে পাগল মনে করিবে। হয়তো বৈজ্ঞানিক বেচারার বিবাহ পর্যন্ত করিবার সঙ্গতি নাই। তিনি হয়তো কয়েক টুকরা রুটি ও একটু জল খাইয়াই পর্বতচূড়ায় বসিয়া আছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিলেন, 'ভাই কুকুর, তোমার সুখ কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ; তুমি ঐ সুখ ভোগ করিতেছ; উহা হইতে উচ্চতর সুখ তুমি কিছুই জান না; কিন্তু আমার পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা সুখকর। আর তোমার যদি নিজের ভাবে সুখ-অন্বেষণ করিবার অধিকার থাকে, তবে আমারও আছে।' এইটুকু আমাদের ভ্রম হয় যে, আমরা সমগ্র জগৎকে নিজের ভাবে পরিচালিত করিতে চাই। আমরা আমাদের মনকেই সমগ্র জগতের মাপকাঠি করিতে চাই। তোমার পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ, কিন্তু আমার সুখও যে ঐ

ভাবেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যখন তুমি ঐ বিষয় লইয়া জেদ কর, তখন তোমার সহিত আমার মতভেদ হয়। সাংসারিক উপযোগবাদীর (Utilitarian) সহিত ধর্মতত্ত্ববাদীর এই প্রভেদ। সাংসারিক উপযোগবাদী বলেন, 'দেখ, আমি কেমন সুখী। আমার কিছু টাকা আছে, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব লইয়া আমি মাথা ঘামাই না। ধর্ম অনুসন্ধানের অতীত; উহার অন্বেষণে না যাইয়া আমি বেশ সুখে আছি।' বেশ, ভাল কথা। উপযোগবাদিগণ, তোমরা যাহাতে সুখে থাকো, তাহা বেশ। কিন্তু এই সংসার বড় ভয়ানক। যদি কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার কোন অনিষ্ট না করিয়া সুখলাভ করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার উন্নতি করুন। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে তাহার মতানুযায়ী কার্য করিতে পরামর্শ দেয়, আর বলে, 'যদি এরূপ না কর, তবে তুমি মূর্খ'; আমিও বলি, 'তুমি ভ্রান্ত, কারণ তোমার পক্ষে যাহা সুখকর, তাহা যদি আমাকে করিতে হয়, আমি প্রাণধারণে সমর্থ হইব না। যদি আমাকে কয়েক টুকরা সোনার পিছনে দৌড়াইতে হয়, তবে আমার জীবনধারণ বৃথা হইবে। ধার্মিক ব্যক্তি হিতবাদীকে এই মাত্র উত্তর দিবেন। বাস্তবিক কথা এই, যাহাদের এই নিম্নতর ভোগবাসনা শেষ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই ধর্মাচরণ সম্ভব। ভোগ করিয়া ঠেকিয়া আমাদিগকে শিখিতে হইবে; যতদূর আমাদের দৌড়, দৌড়াইয়া লইতে হইবে। যখন আমাদের ইহসংসারে দৌড় নিবৃত্ত হয়, তখনই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে পরলোক প্রতিভাত হইতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ সমস্যা আমার মনে উদিত হইতেছে। কথাটা শুনিতে খুব কর্কশ বটে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সত্য কথা। এই বিষয়ভোগবাসনা কখন কখন আর এক রূপ ধারণ করিয়া উদিত হয়—তাহাতে বড় বিপদাশঙ্কা আছে, অথচ উহা আপাতরমণীয়। এ-কথা তোমরা সকল সময়েই শুনিতে পাইবে। অতি প্রাচীনকালেও এই ধারণা ছিল—ইহা প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসেরই অন্তর্গত। উহা এই যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন জগতের সকল দুঃখ চলিয়া যাইবে, কেবল সুখগুলিই অবশিষ্ট থাকিবে, আর পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়া যাইবে। আমি এ-কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের পৃথিবী যেমন তেমনই থাকিবে। অবশ্য এ-কথা বলা বড় ভয়ানক বটে, কিন্তু না বলিয়া তো আর পথ

দেখিতেছি না। জগতের দুঃখ দেহে পুরাতন বাতব্যাধির মতো; শরীরের এক অঙ্গ হইতে তাড়াইয়া দিলে বাত পায়ে যাইবে, পা হইতে তাড়াইয়া দিলে অন্যত্র যাইবে। যাহা কিছু কর না কেন, উহা কোনমতে দূর হইবে না, কোথাও না কোথাও থাকিবেই। দুঃখও সেইরূপ। অতি প্রাচীনকালে লোকে বনে বাস করিত এবং পরস্পরকে মারিয়া খাইয়া ফেলিত। বর্তমান-কালে পরস্পরের মাংস খায় না বটে, কিন্তু পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। লোকে প্রতারণা করিয়া নগরকে নগর দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। অবশ্য ইহা খুব উন্নতির পরিচায়ক নহে। আর তোমরা যাহাকে উন্নতি বলো, তাহাও তো আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না—উহা তো বাসনারই ক্রমাগত বৃদ্ধি। যদি আমি কোন বিষয় অতি স্পষ্টভাবে বুঝিয়া থাকি, তাহা এই যে, বাসনা কেবল দুঃখই আনে—উহা তো ভিক্ষুকের অবস্থা। সর্বদাই কিছু চাওয়া—কোন দোকানে গিয়া কিছু দেখিয়া তৃপ্তি হইতে পারে না—অমনি কিছু পাইবার ইচ্ছা হয়, কেবল চাই—চাই—সব জিনিস চাই। সমগ্র জীবন কেবল তৃষ্ণাতুর যাচকের অবস্থা—বাসনার দুরপনেয় তৃষ্ণা। বাসনা পূরণ করিবার শক্তি যে-নিয়মে বর্ধিত হয়, বাসনার শক্তি তদপেক্ষা বহুগুণ বেগে বর্ধিত হইয়া থাকে। অনন্ত জগতের সমুদয় সুখদুঃখের সমষ্টি সর্বদাই সমান। সমুদ্রে কোথাও যদি একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়, আর কোথাও নিশ্চয়ই একটি গহ্বর উৎপন্ন হইবে। যদি কোন মানুষের সুখ উৎপন্ন হয়, তবে নিশ্চয়ই অন্য কোন মানুষের অথবা কোন জীবজন্তুর দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে—পশুর সংখ্যা কমিতেছে। আমরা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ভূমি কাড়িয়া লইতেছি; আমরা তাহাদের সমুদয় খাদ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইতেছি। তবে কেমন করিয়া বলিব—সুখ ক্রমাগত বাড়িতেছে? প্রবল জাতি দুর্বল জাতিকে গ্রাস করিতেছে, কিন্তু তোমরা কি মনে কর, প্রবল জাতি বেশী সুখী হইবে? না. তাহারা আবার পরস্পরকে সংহার করিবে। কিভাবে সুখের যুগ আসিবে, তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না। এ তো প্রত্যক্ষের বিষয়। আনুমানিক বিচার দ্বারাও আমি দেখিতে পাই, ইহা কখনও হইবার নয়।

পূর্ণতা সর্বদাই অনন্ত। আমরা বাস্তবিক সেই অনন্তস্বরূপ—সেই নিজস্বরূপ অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। তুমি, আমি—সকলেই সেই নিজ

নিজ অনন্ত স্বরূপ অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এ পর্যন্ত বেশ কথা, কিন্তু ইহা হইতে কয়েকজন জার্মান দার্শনিক বড় এক অদ্ভুত দার্শনিক সিদ্ধান্ত বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহা এই যে, এইরূপে অনন্ত ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ব্যক্ত হইতে থাকিবেন, যতদিন না আমরা পূর্ণ ব্যক্ত হই, যতদিন না আমরা সকলে পূর্ণমানব হইতে পারি। পূর্ণ অভিব্যক্তির অর্থ কি? পূর্ণতার অর্থ অনন্ত, আর অভিব্যক্তির অর্থ সীমা—অতএব ইহার এই তাৎপর্য দাঁড়াইল যে, আমরা অসীমভাবে সসীম হইব—এ-কথা তো অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। শিশুগণ এ মতে সন্তুষ্ট হইতে পারে; ছেলেদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইহা বেশ উপযোগী বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদিগকে মিথ্যাবিষে জর্জরিত করা হয়—ধর্মের পক্ষে ইহা মহা অনিষ্টকর। আমাদের জানা উচিত, জগৎ এবং মানব—ঈশ্বরের অবনত ভাবমাত্র; তোমাদের বাইবেলেও আছে—আদম প্রথমে পূর্ণমানব ছিলেন, পরে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কোন ধর্মই নাই, যাহা শিক্ষা দেয় না যে, মানুষ পূর্বাবস্থা হইতে হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছে। আমরা পশু হইয়া পড়িয়াছি। এখন আমরা আবার উন্নতির পথে যাইতেছি, এই বন্ধন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমরা কখনও অনন্তকে এখানে অভিব্যক্ত করিতে পারিব না। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু দেখিব—ইহা অসম্ভব। এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা দেখিব যে, যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন পূর্ণতালাভ অসম্ভব; তখন আমরা যে-দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেই দিক হইতে ফিরিয়া মূল অবস্থা—অনন্তের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিব।

ইহারই নাম ত্যাগ। আমরা যে-জালের ভিতর পড়িয়াছি, তাহা হইতে আমাদের বাহির হইতে হইবে—তখনই নীতি ও দয়াধর্ম আরম্ভ হইবে। সমুদয় নৈতিক অনুশাসনের মূলমন্ত্র কি? 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' আমাদের পশ্চাতে যে অনন্ত রহিয়াছেন, তিনি নিজেকে বহির্জগতে ব্যক্ত করিতে গিয়া এই 'অহং'-এর আকার ধারণ করিয়াছেন। সেই অনন্ত হইতেই এই ক্ষুদ্র আমি-তুমির উৎপত্তি। অভিব্যক্তির চেষ্টায় ইহার উৎপত্তি—এখন এই 'আমি'কে আবার পিছু হটিয়া গিয়া উহার নিজ স্বরূপ অনন্তে মিশিতে হইবে। তিনি বুঝিবেন, এতদিন তিনি বৃথা চেষ্টা করিতে-

ছিলেন; নিজেকে চক্রে ফেলিয়াছেন—তাঁহাকে ঐ চক্র হইতে বাহির হইতে হইবে। প্রতিদিনই ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে। যতবার তুমি বলো—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু,' ততবারই ফিরিবার চেষ্টা কর, আর যতবার তুমি অনন্তকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা কর, ততবারই তোমাকে বলিতে হয়—'আমি' আমি; তুমি নও।' ইহা হইতে জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ ও অনিষ্টের উৎপত্তি, কিন্তু অবশেষে ত্যাগ—অনন্ত ত্যাগ আরম্ভ হইবেই হইবে। 'আমি, মরিয়া যাইবে। আমার জীবনের জন্য তখন কে যত্ন করিবে? এখানে থাকিয়া এই জীবন সম্ভোগ করিবার যে-সব বৃথা বাসনা, আবার তারপর স্বর্গে গিয়া এইরূপভাবে থাকিবার বাসনা—সর্বদা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সুখে লিপ্ত থাকিবার বাসনাই মৃত্যু আনয়ন করে।

আমরা যদি পশুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে-বিচারে ঐ সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, পশুগণ মানুষের অবনত অবস্থামাত্র। তুমি কেমন করিয়া জানিলে তাহা নয়? তোমরা দেখিয়াছ, ক্রমবিকাশবাদের প্রমাণ কেবল এই: নিম্নতম হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সকল দেহই পরস্পর সদৃশ; কিন্তু উহা হইতে তুমি কি করিয়া সিদ্ধান্ত কর যে, নিম্নতম প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণী জন্মিয়াছে এবং উচ্চতম হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর জন্মে নাই? দুদিকেই যুক্তি সমান—আর যদি এই মতবাদে বাস্তবিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, একবার নিম্ন হইতে উচ্চে, আবার উচ্চ হইতে নিম্নে যাইতেছে—ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্তন হইতেছে। ক্রমসঙ্কোচবাদ স্বীকার না করিলে ক্রমবিকাশবাদ কিভাবে সত্য হইতে পারে? যাহা হউক, আমি যে-কথা বলিতেছিলাম যে, মানুষের ক্রমাগত অনন্ত উন্নতি হইতে পারে না, তাহা বেশ বুঝা গেল।

'অনন্ত'—জগতে অভিব্যক্ত হইতে পারে, ইহা যদি আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা বুঝিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমরা ক্রমাগত সরলরেখায় উন্নতি করিয়া চলিতেছি, এ-কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইহা অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। যদি তুমি তোমার সম্মুখদিকে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সময় আসিবে, যখন উহা ঘুরিয়া বৃত্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তোমরা কি গণিতের সেই স্বতঃসিদ্ধ পড় নাই যে, সরলরেখা অনন্তরূপে বর্ধিত

হইলে বৃত্তাকার ধারণ করে? অবশ্য ইহা এইরূপই হইবে, তবে হয়তো পথে ঘুরিবার সময় একটু এদিক ওদিক হইতে পারে। এই কারণে আমি সর্বদা পুরাতন ভাবকেই ধরিয়া থাকি। যখন দেখি—কি খ্রীষ্ট, কি বুদ্ধ, কি বেদান্ত, কি বাইবেল সকলেই বলিতেছেন: এই অপূর্ণ জগৎকে ত্যাগ করিয়াই কালে আমরা পূর্ণতা লাভ করিব। এই জগৎ কিছুই নয়। খুব জোর, উহা সেই সত্যের একটি ভয়ানক বিসদৃশ অনুকৃতি—ছায়ামাত্র। সকল জ্ঞানহীন ব্যক্তিই এই ইন্দ্রিয়সুখ সম্ভোগ করিবার জন্য দৌড়াইতেছে।

ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হওয়া খুব সহজ। আরও সহজ—আমাদের পুরাতন অভ্যাসের বশবর্তী থাকিয়া কেবল পানাহারে মত্ত থাকা। কিন্তু আমাদের আধুনিক দার্শনিকেরা চেষ্টা করেন, এই-সকল সুখকর ভাব লইয়া তাহার উপর ধর্মের ছাপ দিতে। কিন্তু ঐ মত সত্য নহে। ইন্দ্রিয়ের মৃত্যু আছে—আমাদিগকে মৃত্যুর অতীত হইতে হইবে। মৃত্যু কখনই সত্য নহে। ত্যাগই আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাইবে। নীতির অর্থই ত্যাগ। আমাদের প্রকৃত জীবনের ভিত্তিই ত্যাগ। আমরা জীবনের সেই সেই মুহূর্তেই বাস্তবিক সাধু-ভাবাপন্ন হই এবং প্রকৃত জীবন যাপন করি, যে যে মুহূর্তে আমরা 'আমি'র চিন্তা হইতে বিরত হই। 'আমি'র যখন বিনাশ হয়—আমাদের ভিতরের 'পুরাতন মানুষ'—ক্ষুদ্র আমিত্বের মৃত্যু হয়, তখনই আমরা সত্যে উপনীত হই। আর বেদান্ত বলেন—সেই সত্যই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—তিনি সর্বদাই আমাদের সহিত আছেন, শুধু তাহাই নহে, আমাদের মধ্যেই রহিয়াছেন। তাঁহাতেই আমরা সর্বদা বাস করিব। যদিও ইহা বড় কঠিন বোধ হয়, তথাপি ক্রমশঃ ইহা সহজ হইয়া আসিবে। তখন আমরা দেখিব, তাঁহাতে অবস্থানই একমাত্র আনন্দপূর্ণ অবস্থা—আর সকল অবস্থাই মৃত্যু। আত্মার ভাবে পূর্ণ থাকাই জীবন—আর সকল ভাবই মৃত্যুমাত্র। আমাদের বর্তমান জীবনকে কেবল শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় বলিতে পারা যায়। প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে।

আত্মার মুক্তস্বভাব

[লণ্ডনে প্রদত্ত—৫ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

আমরা পূর্বে যে কঠোপনিষদের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহা এখন যাহার আলোচনা করিব, সেই ছান্দোগ্য উপনিষদের অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। কঠোপনিষদের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, উহার চিন্তাপ্রণালীও সর্বাপেক্ষা অধিক প্রণালীবদ্ধ। প্রাচীনতর উপনিষদ্গুলির ভাষা আর একরূপ, অতি প্রাচীন—অনেকটা বেদের সংহিতাভাগের ভাষার মতো। আবার উহাদের মধ্যে—অনেক সময় অনেক অনাবশ্যক বিষয়ের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তবে ভিতরের সার মতগুলিতে আসিতে হয়। এই প্রাচীন উপনিষদ্‌টিতে বেদের কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট প্রভাব আছে—এই কারণে ইহার অর্ধাংশের বেশী এখনও কর্মকাণ্ডাত্মক। কিন্তু অতি প্রাচীন উপনিষদ্গুলি পাঠ করিলে একটি পরম লাভ হইয়া থাকে। লাভ এই যে, ঐগুলি অধ্যয়ন করিলে আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের ঐতিহাসিক বিকাশ বুঝিতে পারা যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদ্গুলিতে আধ্যাত্মিক ভাবগুলি একত্র সংগৃহীত ও সজ্জিত—উদাহরণস্বরূপ আমরা ভগবদ্গীতার উল্লেখ করিতে পারি। এই ভগবদ্গীতাকে সর্বশেষ উপনিষদ্ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, উহাতে কর্মকাণ্ডের লেশমাত্র নাই। গীতার প্রতি শ্লোক কোন-না-কোন উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত—যেন কতকগুলি পুষ্প লইয়া একটি তোড়া নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে তুমি ঐ-সকল তত্ত্বের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাইবে না।

এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ক্রমবিকাশ বুঝিবার সুবিধাই অনেকে বেদপাঠের একটি বিশেষ উপকারিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা সত্য কথা; কারণ বেদকে লোকে এত পবিত্র চক্ষে দেখে যে, জগতের অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের ভিতর যেমন নানাবিধ গোঁজামিল আছে, বেদে তাহা নাই। বেদে অতি উচ্চ চিন্তা, আবার অতি নিম্ন চিন্তার সমাবেশ—সার, অসার, অতি উন্নত চিন্তা, আবার সামান্য খুঁটিনাটি—সবই সন্নিবেশিত আছে, কেহই উহার কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে সাহস করে নাই। অবশ্য টীকাকারেরা আসিয়া ব্যাখ্যার বলে অতি প্রাচীন বিষয়সমূহ হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত নূতন ভাব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, সাধারণ অনেক বর্ণনার ভিতরে

তাঁহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মূল যেমন তেমনই রহিয়া গেল—এই মূলের ভিতর ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় যথেষ্ট আছে। আমরা জানি, লোকের চিন্তাশক্তি যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহারা প্রত্যেকটি ধর্মের পূর্বভাব পরিবর্তিত করিয়া তাহাতে নূতন নূতন উচ্চ ভাবের সংযোজন করিতে থাকে। এখানে একটি, ওখানে একটি নূতন কথা বসানো হয়—কোথাও বা এক-আধটি কথা উঠাইয়া দেওয়া হয়—তারপর টীকাকারেরা তো আছেনই। সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যে এরূপ কখন করা হয় নাই—আর যদি হইয়া থাকে, তাহা ধরাই যায় না। আমাদের ইহাতে লাভ এই যে, আমরা চিন্তার মূল উৎপত্তিস্থলে যাইতে পারি—দেখিতে পাই, কি করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর চিন্তার, কি করিয়া স্থূল আধিভৌতিক ধারণা হইতে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক ধারণাগুলির বিকাশ হইতেছে—অবশেষে কিভাবে বেদান্তে ঐগুলি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে অনেক প্রাচীন আচার-ব্যবহারেরও আভাস পাওয়া যায়, তবে উপনিষদে ঐ-সকলের বর্ণনা বড় বেশী নাই। উহা এমন এক ভাষায় লিখিত, যাহা খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব সহজে মনে রাখা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থের লেখকগণ যেন কেবল কতকগুলি ঘটনা মনে রাখিবার উপায়-স্বরূপ লিখিতেছেন; তাঁহাদের যেন ধারণা—এ-সকল কথা সকলেই জানে; ইহাতে মুশকিল হয় এইটুকু যে, আমরা উপনিষদে লিখিত গল্পগুলির বাস্তবিক তাৎপর্য সংগ্রহ করিতে পারি না। ইহার কারণ এই—ঐগুলি যাঁহাদের সময়ে লেখা, তাঁহারা অবশ্য ঘটনাগুলি জানিতেন, কিন্তু এখন সেগুলির কিংবদন্তী পর্যন্ত নাই—আর সামান্য যেটুকু আছে, তাহা আবার অতিরঞ্জিত হইয়াছে। ঐগুলির এত নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে যে, যখন আমরা পুরাণে ঐ-সকলের বিবরণ পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই সেগুলি উচ্ছ্বাসাত্মক কাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতিগুলির রাজনীতিক উন্নতির বিষয়ে আমরা একটি বিশেষ ভাব লক্ষ্য করি যে, তাহারা কোনপ্রকার স্বেচ্ছাতন্ত্র বা একনায়কত্ব সহ্য করিতে পারে না; সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে সর্বদা সংগ্রাম করিয়া তাহারা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, বাহ্য স্বাধীনতার উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতেছে; ভারতেও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার

ঘটিয়াছে, তবে দর্শন ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে—এইমাত্র প্রভেদ। বহুদেববাদ হইতে ক্রমশঃ মানুষ একেশ্বরবাদে উপনীত হয়—উপনিষদে আবার যেন এই একেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইয়াছে। জগতের অনেক শাসনকর্তা তাঁহাদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, শুধু এই ধারণাই তাঁহাদের অসহ্য হইল তাহা নহে, একজন তাঁহাদের অদৃষ্টের বিধাতা হইবেন, এ ধারণাও তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। উপনিষদ্ আলোচনা করিতে গিয়া এইটিই প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ধারণা ধীরে ধীরে বাড়িয়া অবশেষে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রায় সকল উপনিষদের শেষেই দেখিতে পাই—জগতের 'একেশ্বর' সিংহাসনচ্যুত!

ঈশ্বরের সগুণ ধারণা দূর হইয়া নির্গুণ ধারণা উপস্থিত হয়। ঈশ্বর আর জগতের শাসনকর্তা একজন ব্যক্তি নন, তিনি আর অনন্তগুণসম্পন্ন মনুষ্যধর্মবিশিষ্ট কেহ নন, তিনি তখন ভাব-মাত্র, এক পরম তত্ত্বমাত্ররূপে জ্ঞাত হন—আমাদের ভিতর, জগতের সকল প্রাণীর ভিতর, এমন কি সমুদয় জগতে সেই তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। আর অবশ্য যখন ঈশ্বরের সগুণ ধারণা হইতে নির্গুণ ধারণায় পৌছানো গেল, তখন মানুষও আর সগুণ থাকিতে পারে না। অতএব মানুষের সগুণত্বও তিরোহিত হইল, মানুষেরও একটি ভাবরূপ গড়িয়া উঠিল। সগুণ ব্যক্তি বাহিরে দৃশ্যমান, প্রকৃত তত্ত্ব অন্তরে। এইরূপে উভয় দিক হইতেই ক্রমশঃ সগুণভাব চলিয়া যাইতে থাকে এবং নির্গুণ ভাবের আবির্ভাব হয়। সগুণ ঈশ্বর ক্রমশঃ নির্গুণের কাছে আসিতে থাকেন; এবং সগুণ মানুষও নির্গুণ মানুষভাবের কাছে আসিতে থাকে; তারপর নির্গুণ মানুষভাব ও নির্গুণ ঈশ্বর-ভাব ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কয়েকটি স্তরের অনুভূতির পর মিলিত হয়। আর এই দুইটি ধারা যে-যে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মিলিত হয়, উপনিষদ্ তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক উপনিষদের শেষ বাণী—'তত্ত্বমসি'। একমাত্র নিত্য আনন্দময় পুরুষই আছেন, এবং সেই পরমতত্ত্বই এই জগৎরূপে—বহুভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন।

এইবার দার্শনিকেরা আসিলেন। উপনিষদের কার্য এইখানেই ফুরাইল—দার্শনিকেরা তাহার পর অন্যান্য প্রশ্ন লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। উপনিষদে মুখ্য কথাগুলি পাওয়া গেল—বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিচার দার্শনিকদিগের জন্য রহিল। স্বভাবতই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে নানা প্রশ্ন মনে উদিত হয়। যদিই

স্বীকার করা যায়, এক নির্গুণভাবই পরিদৃশ্যমান নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাস্য—'এক' কেন 'বহু' হইল ? এ সেই প্রাচীন প্রশ্ন—যাহা মানুষের অমার্জিত বুদ্ধিতে স্থূলভাবে উদিত হয় : জগতে দুঃখ—অশুভ রহিয়াছে কেন ? সেই প্রশ্নটিই স্থূলভাব পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এখন আর আমাদের বাহ্যদৃষ্টি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতেছে না, এখন ভিতর হইতে—দার্শনিক দৃষ্টিতে ঐ প্রশ্নের বিচার। সেই এক তত্ত্ব কেন বহু হইল ? আর উহার উত্তর—শ্রেষ্ঠ উত্তর—ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর—মায়াবাদ ; বাস্তবিক সেই এক তত্ত্ব বহু হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। এই বহুত্ব আপাত-প্রতীয়মান মাত্র, মানুষ আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্গুণ। ঈশ্বরও আপাততঃ সগুণ বা ব্যক্তিরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, বাস্তবিক তিনি এই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত নির্গুণ পুরুষ।

এই উত্তরও একেবারে আসে নাই, ইহারও বিভিন্ন সোপান আছে। এই উত্তর সম্বন্ধে দার্শনিকগণের ভিতর মতভেদ আছে। মায়াবাদ ভারতীয় সকল দার্শনিকের সম্মত নয়। সম্ভবতঃ তাঁহাদের অধিকাংশই এ মত স্বীকার করেন না। দ্বৈতবাদীরা আছেন—তাঁহাদের মত দ্বৈতবাদ, অবশ্য তাঁহাদের ঐ মত বড় উন্নত বা মার্জিত নয়। তাঁহারা এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে দিবেন না—ঐ প্রশ্নের উদয় হইতে না হইতে তাঁহারা উহাকে চাপিয়া দেন। তাঁহারা বলেন : তোমার এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই—কেন এরূপ হইল, ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। উহা ঈশ্বরের ইচ্ছা—শান্তভাবে আমাদিগকে উহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। জীবাত্মার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। সবই পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট—আমরা কি করিব, আমাদের কি কি অধিকার, কি কি সুখ-দুঃখ ভোগ করিব—সবই পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট আছে ; আমাদের কর্তব্য—ধীরভাবে সেইগুলি ভোগ করিয়া যাওয়া। যদি তাহা না করি, আমরা আরও বেশী কষ্ট পাইব। কেমন করিয়া তুমি ইহা জানিলে ?—বেদ বলিতেছেন। তাঁহারাও বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করেন ; তাঁহাদের মতানুযায়ী বেদের অর্থও আছে ; প্রমাণ বলিয়া তাঁহারা সেইগুলিই সকলকে মানিতে বলেন এবং তদনুসারে উপদেশ দেন।

আরও অনেক দার্শনিক আছেন, তাঁহারা মায়াবাদ স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের মত মায়াবাদী ও দ্বৈতবাদিগণের মাঝামাঝি। তাঁহারা পরিণাম-বাদী। তাঁহারা বলেন: সমুদয় জগৎ যেন ভগবানের শরীর। ঈশ্বর সমগ্র প্রকৃতির ও সকল আত্মার আত্মা। সৃষ্টির অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপের বিকাশ—কিছুকাল এই বিকাশ চলিয়া আবার সঙ্কোচ হইতে থাকে। প্রত্যেক জীবাত্মার পক্ষে এই সঙ্কোচের কারণ অসৎকর্ম। মানুষ অসৎকার্য করিলে তাহার আত্মার শক্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে—যতদিন না সে আবার সৎকর্ম করিতে আরম্ভ করে, তখন আবার উহার বিকাশ হইতে থাকে। ভারতীয় এই-সকল বিভিন্ন মতের ভিতর—এবং আমার মনে হয়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জগতের সকল মতের ভিতরই—একটি সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আমি উহাকে 'মানুষের দেবত্ব' বলিতে ইচ্ছা করি। জগতে এমন কোন মত নাই, এমন কোন যথার্থ ধর্ম নাই, যাহা কোন-না-কোনরূপে—পৌরাণিক বা রূপকভাবে হউক অথবা দর্শনের মার্জিত সুস্পষ্ট ভাষায় হউক, এই ভাব প্রকাশ না করে যে, জীবাত্মা যেই হউক অথবা ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ যাহাই হউক, উহা স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও পূর্ণ। জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ আনন্দ ও শক্তি—দুঃখ ও দুর্বলতা নয়। এই দুঃখ কোনরূপে তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অমার্জিত মতগুলি এই দুঃখকে মূর্তিমান্ অশুভ, শয়তান বা আহ্রিমান বলিয়া কল্পনা ও ব্যাখ্যা করিতে পারে। অন্যান্য মত একাধারে ঈশ্বর ও শয়তান দুইয়ের ভাব আরোপ করিতে পারে এবং কোনরূপ যুক্তি না দিয়াই বলিতে পারে, তিনি কাহাকেও সুখী, কাহাকেও বা দুঃখী করিতেছেন। আবার অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ 'মায়াবাদ' প্রভৃতি দ্বারা উহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু একটি বিষয় সকল মতেই অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত—উহা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়—আত্মার মুক্তস্বভাব। এই-সকল দার্শনিক মত ও প্রণালী কেবল মনের ব্যায়াম—বুদ্ধির চালনামাত্র। একটি মহৎ উজ্জ্বল ধারণা—যাহা আমার নিকট অতি স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা সকল দেশের ও সকল ধর্মের কুসংস্কাররাশির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এই যে, মানুষ দেবস্বভাব, দেবভাবই আমাদের স্বভাব—আমরা ব্রহ্মস্বরূপ।

বেদান্ত বলেন, অন্য যাহা কিছু তাহা উপাধি মাত্র। কিছু যেন তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেবভাবের কিছুতেই বিনাশ হয় না। অতি সাধু প্রকৃতিতে যেমন, অতিশয় পতিত ব্যক্তিতেও তেমনি উহা বর্তমান। ঐ দেবস্বভাবের উদ্বোধন করিতে হইবে, তবেই উহার কার্য হইতে থাকিবে। আমাদের ঐ দেবভাবকে আহ্বান করিতে হইবে, তবেই উহা নিজে নিজেই প্রকাশিত হইবে। প্রাচীনেরা ভাবিতেন, চকমকি-পাথরে আগুন ঘুমাইয়া থাকে, সেই আগুনকে বাহির করিতে হইলে কেবল ইস্পাতের ঘর্ষণ আবশ্যক। অগ্নি দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যে বাস করে, উহাকে প্রকাশ করিবার জন্য কেবল ঘর্ষণ আবশ্যক। অতএব এই অগ্নি—এই স্বাভাবিক মুক্তভাব ও পবিত্রতা প্রত্যেক আত্মার স্বভাব,'আত্মার গুণ নহে ; কারণ গুণ উপার্জন করা যাইতে পারে, সুতরাং উহা আবার নষ্টও হইতে পারে। মুক্তি বা মুক্তস্বভাব বলিতে যাহা বুঝায়, আত্মা বলিতেও তাহাই বুঝায়—এইরূপ সত্তা বা অস্তিত্ব এবং জ্ঞানও আত্মার স্বরূপ—আত্মার সহিত অভেদ। এই সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মার স্বভাব—আমাদের জন্মগত অধিকার ; আমরা যে-সকল অভিব্যক্তি দেখিতেছি, সেগুলি আত্মার স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—উহা কখন নিজেকে মৃদু, কখন বা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিতেছে। এমন কি, মৃত্যু বা বিনাশও সেই প্রকৃত সত্তার প্রকাশমাত্র। জন্ম মৃত্যু, ক্ষয় বৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি—সকলই সেই এক অখণ্ড সত্তার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। এইরূপ আমাদের সাধারণ জ্ঞানও—উহা বিদ্যা বা অবিদ্যা যেরূপেই প্রকাশিত হউক না, সেই চিৎ-এর—জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশমাত্র ; উহাদের বিভিন্নতা প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। ক্ষুদ্র কীট, যাহা তোমার পায়ের নিকট বেড়াইতেছে, তাহার জ্ঞান এবং স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দেবতার জ্ঞানে প্রভেদ প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। এই কারণে বৈদান্তিক মনীষিগণ নির্ভয়ে বলেন যে, আমাদের জীবনে আমরা যে-সকল সুখভোগ করি, এমন কি অতি ঘৃণিত সুখ পর্যন্ত আত্মার স্বরূপ সেই এক ব্রহ্মানন্দের প্রকাশমাত্র।

এই ভাবটিই বেদান্তের সর্বপ্রধান ভাব বলিয়া বোধ হয় ; আর আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বোধ হয়, সকল ধর্মেরই এই মত। আমি এমন কোন ধর্মের কথা জানি না, যাহার মূলে এই ভাব নাই। সকল ধর্মের ভিতরেই এই সার্বভৌম ভাব রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বাইবেলের কথা ধর—উহাতে

রূপকভাবে বর্ণিত আছে, প্রথম মানব আদম অতি পবিত্র ছিলেন, অবশেষে পাপকার্যের দ্বারা তাঁহার ঐ পবিত্রতা নষ্ট হইল। এই রূপক-বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয়, ঐ গ্রন্থলেখক বিশ্বাস করিতেন যে, আদিম মানবের—অথবা তাঁহারা উহা যেভাবেই বর্ণনা করুন না কেন—অথবা প্রকৃত মানবের স্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ণ ছিল। আমরা যে-সকল দুর্বলতা দেখিতেছি, আমরা যে-সকল অপবিত্রতা দেখিতেছি, সেগুলি উহার উপর আরোপিত আবরণ বা উপাধিমাত্র এবং খৃষ্টধর্মেরই পরবর্তী ইতিহাস ইহা দেখাইতেছে—খৃষ্টানরা সেই পূর্ব অবস্থা পুনরায় লাভ করিবার সম্ভাবনায়, শুধু তাহাই নহে, তাহার নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করেন। পুরাতন ও নূতন টেস্টামেণ্ট লইয়া সমগ্র বাইবেলেরও এই ইতিহাস। মুসলমানদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তাঁহারাও আদম ও আদমের জন্মের পবিত্রতায় বিশ্বাসী, আর তাঁহাদের ধারণা—মহম্মদের আগমনের পর হইতে সেই লুপ্ত পবিত্রতার পুনরুদ্ধারের উপায় হইয়াছে। বৌদ্ধদের সম্বন্ধেও তাহাই; তাঁহারাও নির্বাণনামক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসী; উহা এই দ্বৈতজগতের অতীত অবস্থা। বৈদান্তিকেরা যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, ঐ নির্বাণ-অবস্থাও ঠিক তাই; আর বৌদ্ধদের সমুদয় উপদেশের মর্ম এই—সেই বিনষ্ট নির্বাণ-অবস্থা পুনরায় লাভ করিতে হইবে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, সকল ধর্মেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে—যাহা তোমার নয়, তাহা তুমি কখন পাইতে পার না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহারও নিকট তুমি ঋণী নও। তুমি তোমার নিজের জন্মগত অধিকারই প্রার্থনা করিবে। একজন প্রধান বৈদান্তিক আচার্য এই ভাবটি তাঁহার নিজকৃত কোন গ্রন্থের নামপ্রদানচ্ছলে বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম-'স্বারাজ্যসিদ্ধি' অর্থাৎ আমার নিজের রাজ্য, যাহা হারাইয়াছিল, তাহার পুনঃপ্রাপ্তি। সেই রাজ্য আমাদের; আমরা উহা হারাইয়াছি, আমাদিগকে পুনরায় উহা লাভ করিতে হইবে। তবে মায়াবাদী বলেন, এই রাজ্যনাশ একটি ভ্রমমাত্র, তুমি কখনও রাজ্যভ্রষ্ট হও নাই—এই মাত্র প্রভেদ।

যদিও সকল ধর্মপ্রণালীই এই বিষয়ে একমত যে, আমাদের যে রাজ্য ছিল, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, তথাপি তাঁহারা উহা ফিরিয়া পাইবার উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বলেন, বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ করিয়া প্রতিমাদির পূজা-অর্চনা করিলে এবং নিজে কোন বিশেষ

নিয়মে জীবনযাপন করিলে সেই রাজ্যের উদ্ধার হইতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন, 'প্রকৃতির অতীত কোন পুরুষের সম্মুখে তুমি যদি পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে তুমি সেই রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।' আবার কেহ কেহ বলেন, 'তুমি যদি ঐরূপ পুরুষকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসিতে পারো, তবে তুমি ঐ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।' উপনিষদে এই বিভিন্ন রকমের উপদেশই পাওয়া যায়। ক্রমশঃ যত তোমাদিগকে উপনিষদ্ বুঝাইব, ততই ইহা বুঝিতে থাকিবে। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ শেষ উপদেশ এই : রোদনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তোমাদের এই-সকল ক্রিয়াকলাপের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কি করিয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, সে চিন্তারও তোমাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, কারণ তোমাদের রাজ্য কখন নষ্ট হয় নাই। যাহা তোমরা কখনই হারাও নাই, তাহা পাইবার জন্য আবার চেষ্টা করিবে কি? তোমরা স্বভাবতঃ মুক্ত, তোমরা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বভাব। যদি তোমরা নিজদিগকে মুক্ত বলিয়া ভাবিতে পারো, তোমরা এই মুহূর্তেই মুক্ত হইয়া যাইবে; আর যদি নিজেদের বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা কর, তবে বদ্ধই থাকিবে। শুধু তাহাই নহে; এইবার যাহা বলিব, তাহা আমাকে অতি সাহসের সহিত বলিতে হইবে—এই-সকল বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্বেই তোমাদিগকে সে-কথা বলিয়াছি। ইহা শুনিয়া তোমাদের ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা যতই চিন্তা করিবে এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবে, ততই দেখিবে আমার কথা সত্য কিনা। মনে কর, মুক্তভাব তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ নয়; তবে তোমরা কোনরূপেই মুক্ত হইতে পারিবে না। মনে কর, তোমরা মুক্ত ছিলে, এখন কোনরূপে সেই মুক্তভাব হারাইয়া বদ্ধ হইয়াছ, তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, তোমরা প্রথম হইতে মুক্ত ছিলে না। যদি মুক্ত ছিলে, তবে কিসে তোমায় বদ্ধ করিল? যে স্বতন্ত্র, সে কখন পরতন্ত্র হইতে পারে না; যদি হয়, তবে প্রমাণিত হইল, সে কখন স্বতন্ত্র ছিল না—এই স্বাতন্ত্র্য-প্রতীতিই ভ্রম ছিল।

তাহা হইলে এই দুই পক্ষের কোন্‌টি গ্রহণ করিবে? উভয় পক্ষের যুক্তিপরম্পরা বিবৃত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় : যদি বলো, আত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বরূপ ও মুক্ত, তবে অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা আত্মাকে বদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু যদি জগতে এমন কিছু থাকে,

যাহা আত্মাকে বদ্ধ করিতে পারে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে আত্মা মুক্তস্বভাব ছিলেন না, সুতরাং তুমি যে আত্মাকে মুক্তস্বভাব বলিয়াছিলে, তাহা তোমার ভ্রমমাত্র। অতএব অবশ্যই তোমাকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে যে, আত্মা স্বভাবতই মুক্ত। অন্যরূপ হইতে পারে না। মুক্তস্বভাবের অর্থ—বাহ্য সকল বস্তুর অধীনতা হইতে মুক্ত। অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্তুই উহার উপর কারণরূপে কোন কার্য করিতে পারে না। আত্মা কার্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, ইহা হইতেই আত্মা সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ উচ্চ ধারণা আসিয়া থাকে। আত্মার অমরত্বের কোন ধারণা স্থাপন করা যাইতে পারে না, যদি না স্বীকার করা যায় যে, আত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্তুই আত্মার উপর কার্য করিতে পারে না। কারণ মৃত্যু আমার বহিঃস্থ কোন কিছুর দ্বারা কৃত কার্য। ইহাতে বুঝাইতেছে যে, আমার শরীরের উপর বহিঃস্থ অপর কিছু কার্য করিতে পারে, আমি খানিকটা বিষ খাইলাম, তাহাতে আমার মৃত্যু হইল—ইহাতে বোধ হইতেছে, আমার শরীরের উপর বিষনামক বহিঃস্থ কোন বস্তু কার্য করিতে পারে। যদি আত্মা সম্বন্ধে ইহা সত্য হয়, তবে আত্মাও বদ্ধ। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয় যে, আত্মা মুক্ত-স্বভাব, তবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, বাহিরের কোন বস্তুই উহার উপর কার্য করিতে পারে না, কখনও পারিবে না। তাহা হইলে আত্মা কখনও মরিবেন না, আত্মা কার্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত। আত্মার মুক্তভাব, অমরত্ব এবং আনন্দ—সকলই এই ভাবের উপর নির্ভর করিতেছে যে, আত্মা কার্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত,—মায়ার অতীত। ভাল কথা; যদি বলো, আত্মার স্বভাব প্রথমে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এখন বদ্ধ হইয়াছে; তাহাতে ইহাই বোধ হয়, বাস্তবিক উহা মুক্তস্বভাব ছিল না। তুমি যে বলিতেছ, উহা মুক্তস্বভাব ছিল, তাহা অসত্য। কিন্তু অপর পক্ষে পাইতেছি, আমরা বাস্তবিক মুক্তস্বভাব; এই যে বদ্ধ হইয়াছি বোধ হইতেছে, ইহাই ভ্রান্তিমাত্র। এই দুই পক্ষের কোন্ পক্ষ লইব? হয় বলিতে হইবে—প্রথমটি ভ্রান্তি, নতুবা দ্বিতীয়টিকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমি অবশ্য দ্বিতীয়টিকে ভ্রান্তি বলিব। ইহাই আমার সমুদয় ভাব ও অনুভূতির সহিত অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। আমি সম্পূর্ণরূপে জানি, আমি স্বভাবতঃ মুক্ত; বদ্ধভাব সত্য ও মুক্তভাব ভ্রমাত্মক—ক্ষণকালের জন্যও আমি এ-কথা মানিয়া লইতে পারি না।

সকল দর্শনেই স্থূলভাবে এই বিচার চলিতেছে। এমন কি, খুব আধুনিক দর্শনেও এই আলোচনার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। দুই দল আছেন; এক দল বলিতেছেন, আত্মা বলিয়া কিছুই নাই, আত্মার ধারণা ভ্রান্তিমাত্র। এই ভ্রান্তির কারণ জড়কণাগুলির পুনঃ পুনঃ স্থানপরিবর্তন; এই সংহতি—যাহাকে তোমরা শরীর মস্তিষ্ক প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেছ, তাহারই স্পন্দন, তাহারই গতিবিশেষ এবং উহার মধ্যস্থ অংশগুলির ক্রমাগত স্থান-পরিবর্তনে এই মুক্তস্বভাবের ধারণা আসিতেছে। কয়েকটি বৌদ্ধসম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা বলিতেন—একটি মশাল লইয়া চতুর্দিকে দ্রুত ঘুরাইতে থাকিলে একটি আলোকের বৃত্ত দেখা যাইবে। বাস্তবিক এই আলোকবৃত্তের কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ ঐ মশাল প্রতি মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন করিতেছে। সেইরূপ আমরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টিমাত্র, উহাদের দ্রুত ঘূর্ণনে এই 'অহং'-ভ্রান্তি জন্মিতেছে।

অতএব একটি মত হইল এই যে, শরীরই সত্য, আত্মার অস্তিত্ব নাই। অপর মত এই যে, চিন্তাশক্তির দ্রুত স্পন্দনে জড়রূপ এক ভ্রান্তির উৎপত্তি হইতেছে, বাস্তবিক জড়ের অস্তিত্ব নাই। এই দুই পক্ষ আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিতেছে—একজন বলিতেছেন আত্মা ভ্রমমাত্র, অপরে আবার জড়কে ভ্রম বলিতেছেন। কোন্ মতটি লইব? অবশ্যই আত্মবাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া জড়বাদ অস্বীকার করিব। যুক্তি দুইদিকেই সমান, কেবল আত্মার নিরপেক্ষ অস্তিত্বের দিকে যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল; কারণ জড় কি, তাহা কেহ কখন দেখে নাই। আমরা কেবল নিজদিগকেই অনুভব করিতে পারি। আমি এমন লোক দেখি নাই, যিনি নিজের বাহিরে গিয়া জড়কে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। কেহ কখন লাফাইয়া নিজ আত্মার বাহিরে যাইতে পারে না। অতএব আত্মার দিকে যুক্তি একটু দৃঢ়তর হইল। দ্বিতীয়তঃ আত্মবাদ জগতের সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে পারে, জড়বাদ পারে না। অতএব জড়বাদের দিক হইতে জগতের ব্যাখ্যা অযৌক্তিক। পূর্বে যে আত্মার স্বাভাবিক মুক্ত ও বদ্ধভাব-সম্বন্ধীয় বিচারের প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল, জড়বাদ ও আত্মবাদের তর্ক তাহারই স্থূলভাবমাত্র। দর্শনসমূহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে, তাহাদের মধ্যেও এই দুইটি মতের সংঘর্ষ চলিয়াছে। খুব আধুনিক দর্শনসমূহেও আমরা অন্য আকারে সেই প্রাচীন বিচারই দেখিতে পাই। এক দল বলেন,

মানবের তথাকথিত পবিত্র ও মুক্ত স্বভাব ভ্রমমাত্র—অপরে আবার বদ্ধভাবকেই ভ্রমাত্মক' বলেন। এখানেও আমরা দ্বিতীয় দলের সহিত একমত, বদ্ধভাব যে ভ্রমাত্মক—আমরা এই মতই পোষণ করি।

অতএব বেদান্তের সিদ্ধান্তই এই—আমরা বদ্ধ নই, আমরা নিত্যমুক্ত। শুধু তাই নয়, আমরা বদ্ধ—এই কথা বলা বা ভাবাই অনিষ্টকর, উহা ভ্রম—উহা নিজেকে নিজে সম্মোহিত করে মাত্র। যখনই তুমি বলো আমি বদ্ধ, আমি দুর্বল, আমি অসহায়, তখনই তোমার দুর্ভাগ্য আরম্ভ, তুমি নিজের পায়ে আর একটি শিকল জড়াইতেছ মাত্র। এরূপ বলিও না, এরূপ ভাবিও না।

আমি এক ব্যক্তির কথা শুনিয়াছি—তিনি বনে বাস করিতেন এবং দিবা-রাত্র 'শিবোহহং, শিবোহহং' উচ্চারণ করিতেন। একদিন এক ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার জন্য টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। নদীর অপর পারের লোকে ইহা দেখিল আর শুনিল—সেই ব্যক্তির কণ্ঠনিঃসৃত 'শিবোহহং শিবোহহং' ধ্বনি। যতক্ষণ তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল, ব্যাঘ্রের কবলে পড়িয়াও তিনি 'শিবোহহং' উচ্চারণ করিতে বিরত হন নাই। এরূপ অনেক ব্যক্তির কথা শুনা যায়। এমন অনেক ব্যক্তির কথা শুনা যায়, যাঁহারা শত্রু কর্তৃক খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াও তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। 'সোহহং সোহহং'—আমি সেই, আমি সেই, তুমিও সেই। আমি নিশ্চয়ই মুক্ত পূর্ণস্বরূপ, আমার সকল শত্রুও তাই। 'তুমিই তিনি; আমিও তিনি'—ইহাই বীরের কথা।

তথাপি দ্বৈতবাদীদের ধর্মে অনেক অপূর্ব মহৎ ভাব আছে—প্রকৃতি হইতে পৃথক্ আমাদের উপাস্য ও প্রেমাস্পদ সগুণ ঈশ্বরবাদ অতি অপূর্ব—অনেক সময় এগুলি প্রাণ শীতল করিয়া দেয়; কিন্তু বেদান্ত বলেন, প্রাণের এই শীতলতা আফিং-এর নেশার মতো অস্বাভাবিক। ইহা আবার দুর্বলতা আনয়ন করে, আর পূর্বে যত না প্রয়োজন ছিল, এখন তদপেক্ষা বেশী প্রয়োজন এই বলসঞ্চার—শক্তিসঞ্চার। বেদান্ত বলেন, দুর্বলতাই সংসারের সমুদয় দুঃখের কারণ, দুর্বলতাই দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আমরা দুর্বল বলিয়াই এত দুঃখভোগ করি। আমরা দুর্বল বলিয়াই চুরি ডাকাতি মিথ্যা জুয়াচুরি বা অন্যান্য পাপ করিয়া থাকি। দুর্বল বলিয়াই আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। যেখানে আমাদিগকে দুর্বল করিবার কিছুই নাই, সেখানে মৃত্যু

বা কোনরূপ দুঃখ থাকিতে পারে না। আমরা ভ্রান্তিবশতই দুঃখভোগ করিতেছি। এই ভ্রান্তি ত্যাগ কর, সব দুঃখ চলিয়া যাইবে। ইহা তো খুব সহজ সাদা কথা। এই-সকল দার্শনিক বিচার ও কঠোর মানসিক ব্যায়ামের ভিতর দিয়া আমরা সমুদয় জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম।

অদ্বৈত বেদান্ত যেভাবে আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল। ভারতে এবং অন্যত্র এ-বিষয়ে একটি গুরুতর ভুল হইয়াছিল। বেদান্তের আচার্যগণ স্থির করিয়াছিলেন, এই শিক্ষা সর্বজনীন করা যাইতে পারে না, কারণ তাঁহারা যে-সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হইয়াছিলেন, সেইগুলির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যে-প্রণালীতে তাঁহারা ঐ-সকল সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রণালীর দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিলেন—অবশ্য ঐ প্রণালী অতিশয় জটিল। এই ভয়ানক দার্শনিক ও নৈয়ায়িক উক্তিগুলি দেখিয়া তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্বদা ভাবিতেন, এগুলি প্রাত্যহিক কর্মজীবনে শিক্ষা করা যাইতে পারে না, আর এরূপ দর্শনেব আবরণে অত্যন্ত নৈতিক শিথিলতা দেখা দিবে।

কিন্তু আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে, জগতে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারিত হইলে দুর্নীতি ও দুর্বলতার প্রাদুর্ভাব হইবে। বরং ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, ইহাই দুর্নীতি ও দুর্বলতা নিবারণ করিবার একমাত্র ঔষধ। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে যখন নিকটে অমৃতের স্রোত বহিতেছে, তখন লোকে পঙ্কিল জল পান করিতেছে কেন? যদি ইহাই সত্য হয় যে, সকলে শুদ্ধস্বরূপ, তবে এই মুহূর্তেই সমুদয় জগৎকে এই শিক্ষা দাও না কেন? সাধু-অসাধু, নর-নারী, বালক-বালিকা, বড়-ছোট—সকলকেই বজ্রনির্ঘোষে ইহা শিক্ষা দাও না কেন? যে-কোন ব্যক্তি জগতে দেহধারণ করিয়াছে, যে-কেহ করিবে—সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা, ঝাড়ুদার, ধনী, দরিদ্র—সকলকেই ইহা শিক্ষা দাও না কেন?—আমি রাজার রাজা, আমা অপেক্ষা বড় রাজা নাই। আমি দেবতার দেবতা, আমা অপেক্ষা বড় দেবতা নাই।

এখন ইহা বড় কঠিন কার্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, অনেকের পক্ষে ইহা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা কুসংস্কারের জন্য, অন্য কারণে নহে। সকল প্রকার কদর্য ও দুষ্পাচ্য খাদ্য খাইয়া এবং উপবাস করিয়া কগিযা

আমরা নিজদিগকে সুখাদ্য খাইবার অনুপযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা শিশুকাল হইতে দুর্বলতার কথা শুনিয়া আসিতেছি। এ ঠিক ভূত-মানার মতো। লোকে সর্বদা বলিয়া থাকে আমরা ভূত মানি না—কিন্তু খুব কম লোক দেখিবে, যাহাদের অন্ধকারে একটু গা ছমছম না করে। ইহা কুসংস্কার। ঠিক এইরূপেই লোকে বলিয়া থাকে, আমরা ইহা মানি না, উহা মানি না ইত্যাদি, কিন্তু কার্যকালে অবস্থাবিশেষে অনেকেই মনে মনে বলিয়া থাকেন—যদি কেহ দেবতা বা ঈশ্বর থাকো, আমায় রক্ষা কর। বেদান্ত হইতে এই অদ্বৈত ভাব পাওয়া যায়, এবং এই ভাবটিই চিরদিন থাকিবে। বেদান্তগ্রন্থগুলি কালই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই তত্ত্ব প্রথমে হিব্রুদের মস্তিষ্কে অথবা উত্তরমেরুনিবাসীদের মস্তিষ্কে উদিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ইহা সত্য, আর যাহা সত্য তাহা সনাতন, আর সত্য আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়। মানুষ পশু দেবতা—সকলেই এই এক সত্যের অধিকারী। তাহাদিগকে এই সত্য শিখাও, জীবনকে দুঃখময় করিবার প্রয়োজন কি? লোককে নানাপ্রকার কুসংস্কারে পড়িতে দাও কেন? কেবল এখানে (ইংলণ্ডে) নয়, এই তত্ত্বের জন্মভূমিতেই তুমি যদি লোককে বেদান্তের উপদেশ দাও, তাহারা ভয় পাইবে। তাহারা বলে: ইহা সন্ন্যাসীদের জন্য—সংসার ত্যাগ করিয়া যাহারা বনে বাস করে, তাহাদের পক্ষে ইহা ঠিক; কিন্তু আমরা সামান্য গৃহস্থ লোক; ধর্ম করিতে গেলে আমাদের কোন না কোন প্রকার ভয়ের দরকার, আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের দরকার ইত্যাদি।

দ্বৈতবাদ অনেক দিন জগৎকে শাসন করিয়াছে, আর ইহাই তাহার ফল। ভাল, একটি নূতন পরীক্ষা কর না কেন? হয়তো সকল ব্যক্তির ইহা ধারণা করিতে লক্ষ বৎসর লাগিবে, কিন্তু এখনই আরম্ভ কর না কেন? যদি আমরা আমাদের জীবনে কুড়িটি লোককে ইহা বলিতে পারি, আমরা খুব বড় কাজ করিলাম।

ভারতবর্ষে আবার একটি মহতী শিক্ষা প্রচলিত আছে, যাহা পূর্বোক্ত তত্ত্বপ্রচারের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। তাহা এই: 'আমি শুদ্ধ, আমি আনন্দস্বরূপ; এ কথা মুখে বলা বেশ, কিন্তু জীবনে তো আমি সর্বদা ইহা দেখাইতে পারি না।' এ কথা আমরা স্বীকার করি। আদর্শ সকল সময়েই

বড় কঠিন। প্রত্যেক শিশুই আকাশকে নিজের মস্তকের অনেক উপরে দেখে, কিন্তু তাই বলিয়া সে আকাশে পৌঁছিতে পারে না, এইজন্যই কি আমরা সে দিকে যাইতে চেষ্টা করিব না? কুসংস্কারের দিকে গেলেই কি সব ভাল হইবে? যদি অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারি, তবে কি বিষপান করিলেই মঙ্গল হইবে? আমরা সত্য কখনই অনুভব করিতে পারিতেছি না বলিয়া কি অন্ধকার, দুর্বলতা ও কুসংস্কারের দিকে গেলেই মঙ্গল হইবে?

নানাপ্রকারের দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যে-কোন উপদেশ দুর্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি। নর-নারী, বালক-বালিকা যখন দৈহিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ? কারণ আমি জানি, একমাত্র সত্যই বল বা শক্তি প্রদান করে। আমি জানি, সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে আমরা কিছুতেই বীর্যবান্ হইব না, আর বীর না হইলে সত্যেও যাওয়া যাইবে না। এইজন্যই যে-কোন মত, যে-কোন শিক্ষাপ্রণালী মনকে ও মস্তিষ্ককে দুর্বল করিয়া ফেলে, মানুষকে কুসংস্কারাবিষ্ট করিয়া তোলে, যাহাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, যাহাতে সর্বদাই মানুষকে সকলপ্রকার বিকৃতমস্তিষ্কপ্রসূত অসম্ভব আজগুবি ও কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অন্বেষণ করায়—আমি সেই প্রণালীগুলি পছন্দ করি না, কারণ মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, আর সেগুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সেগুলি নিতান্ত নিষ্ফল।

যাঁহারা ঐগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, তাঁহারা আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, ঐগুলি মনুষ্যকে বিকৃত ও দুর্বল করিয়া ফেলে—এত দুর্বল করে যে, ক্রমশঃ তাহার পক্ষে সত্যলাভ করা ও সেই সত্যের আলোকে জীবনযাপন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব আমাদের আবশ্যক একমাত্র বল বা শক্তি। শক্তি এই পার্থিব দুর্ভোগের একমাত্র মহৌষধ। দরিদ্রগণ যখন ধনিগণের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন শক্তিই দরিদ্রদের একমাত্র ঔষধ। মূর্খ যখন বিদ্বানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন এই শক্তিই মূর্খের একমাত্র ঔষধ। আর যখন পাপীরা অন্য পাপীদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখনও শক্তিই একমাত্র ঔষধ। আর অদ্বৈতবাদ যেরূপ বল, যেরূপ শক্তি প্রদান করে, আর কিছুই সেরূপ করিতে পারে না। অদ্বৈতবাদ

আমাদিগকে যেরূপ নীতিপরায়ণ করে, আর কিছুই সেরূপ করিতে পারে না। যখন সকল দায়িত্ব আমাদের উপর পড়ে, তখন আমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যত ভালভাবে কাজ করিতে পারি, আর কোন অবস্থাতেই তেমন পারি না। আমি তোমাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি, বলো দেখি, যদি একটি ছোট শিশুকে তোমাদের হাতে দিই, তোমরা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে? মুহূর্তে তোমাদের জীবন বদলাইয়া যাইবে। তোমাদের স্বভাব যেমন হউক না কেন, তোমরা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া যাইবে। তোমাদের উপর দায়িত্ব চাপাইলে তোমাদের পাপবৃত্তি সব পলায়ন করিবে, তোমাদের চরিত্র বদলাইয়া যাইবে। এইরূপ যখনই সমুদয় দায়িত্ব আমাদের উপর পড়ে, তখনই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাবের স্ফুরণ হইবে; যখন আমাদের সমুদয় দোষ অপর কাহারও উপর চাপাইতে হয় না, যখন শয়তান বা ঈশ্বর—কাহাকেও আমরা আমাদের দোষের জন্য দায়ী করি না, তখনই আমরা যথাশক্তি ভালভাবে কাজ করি। আমিই আমার অদৃষ্টের জন্য দায়ী। আমিই নিজের শুভাশুভের কর্তা, আমিই শুদ্ধ ও আনন্দস্বরূপ। বিরোধী ভাবগুলি বর্জন করিতে হইবে।

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥[1]

বেদান্ত বলেন, এই স্তবই সাধারণের একমাত্র অবলম্বনীয়। ইহাই সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার একমাত্র উপায়—নিজেকে এবং সকলকে বলা যে, আমিই সেই। পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে থাকিলে শক্তি আসে। যে প্রথমে খোঁড়াইয়া চলে, সে ক্রমশঃ পায়ে বল পাইয়া মাটির উপর পা সোজা রাখিয়া চলিতে থাকে। 'শিবোঽহং'-রূপ এই অভয়বাণী ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করে—পরিশেষে আমাদের প্রতি শিরায়—প্রতি ধমনীতে—শরীরের প্রত্যেক অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া জ্ঞান-সূর্যের কিরণ যতই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে, ততই মোহ চলিয়া

১ নির্বাণষট্‌কম্—শঙ্করাচার্য

যায়, অজ্ঞানরাশি দূর হয়—ক্রমশঃ এমন এক সময় আসে, যখন সমুদয় অজ্ঞান একেবারে চলিয়া যায় এবং একমাত্র জ্ঞান-সূর্যই অবশিষ্ট থাকে।

অবশ্যই এই বেদান্ততত্ত্ব অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ যে কুসংস্কার, তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। এই দেশেই (ইংলণ্ডেই) এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহাদিগকেই আমি যদি বলি শয়তান বলিয়া কেহ নাই, তাঁহারা ভাবিবেন, যাঃ—সব ধর্ম গেল। অনেক লোক আমাকে বলিয়াছেন, শয়তান না থাকিলে ধর্ম কিরূপে থাকিতে পারে? তাঁহারা বলেন, আমাদিগকে পরিচালিত করিবার কেহ না থাকিলে আর ধর্ম কি হইল? কেহ আমাদিগকে শাসন করিবার না থাকিলে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব কিরূপে? বাস্তবিক কথা এই, আমরা ঐভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে চাই। আমরা এইভাবে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, সুতরাং ইহা আমাদের ভাল লাগে। প্রতিদিন কেহ না কেহ আমাদের তিরস্কার না করিলে আমরা সুখী হইতে পারি না। সেই কুসংস্কার! কিন্তু এখন ইহা যত ভয়ানক বলিয়া বোধ হউক, এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা সকলেই অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া, শুদ্ধ অনন্ত আত্মাকে যে-সকল কুসংস্কার আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, সেগুলির প্রত্যেকটি স্মরণ করিয়া হাসিব, এবং আনন্দ ও দৃঢ়তার সহিত সত্যই বলিব—আমিই তিনি, চিরকাল তাহাই ছিলাম এবং সর্বদা তাহাই থাকিব।

কর্মজীবনে বেদান্ত

প্রথম প্রস্তাব

[লণ্ডনে প্রদত্ত, ১০ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

কর্মজীবনে বেদান্তদর্শনের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেকে আমাকে কিছু বলিতে বলিয়াছেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মতবাদ খুব ভাল বটে, কিন্তু কিভাবে উহা কার্যে পরিণত করা যাইবে, তাহাই প্রকৃত সমস্যা। যদি কার্যে পরিণত করা একেবারে অসম্ভব হয়, তবে বুদ্ধির একটু ব্যায়াম ব্যতীত কোন মতবাদের কোন মূল্যই নাই। অতএব বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর হইতে হইবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ দেন—বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্বত্র বিরাজিত। ধর্মের আদর্শসমূহ সমগ্র জীবনকে যেন আচ্ছাদন করে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তার ভিতরে যেন প্রবেশ করে এবং কার্যেও যেন ঐগুলির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমি ক্রমশঃ কর্মজীবনে বেদান্তের প্রভাবের কথা বলিব। কিন্তু এই বক্তৃতাগুলি ভবিষ্যৎ বক্তৃতাসমূহের উপক্রমণিকারূপে সঙ্কলিত, সুতরাং আমাদিগকে প্রথমে মতবাদগুলির বিষয়েই আলোচনা করিতে হইবে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, পর্বতগহ্বর ও নিবিড় অরণ্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কিরূপে মতবাদগুলি আবার কর্মমুখর নগরীর রাজপথে কার্যে পরিণত হইতেছে। আমরা এই মতগুলির আরও একটু বিশেষত্ব দেখিব যে, চিন্তাগুলির অধিকাংশ নির্জন অরণ্যবাসের ফলে নহে, পরন্তু যে-সকল ব্যক্তিকে আমরা সর্বাপেক্ষা বেশী কর্মে ব্যস্ত বলিয়া মনে করি, সিংহাসনে উপবিষ্ট সেই রাজারাই এগুলির প্রণেতা।

শ্বেতকেতু[১] আরুণি ঋষির পুত্র। এই ঋষি বোধ হয় বানপ্রস্থী ছিলেন। শ্বেতকেতু বনেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাঞ্চাল-জনপদের

১ ছান্দোগ্য উপ.—৫।৩

সভায় রাজা প্রবাহণ জৈবলির নিকট গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃত্যুকালে প্রাণিগণ কিরূপে এ লোক হইতে গমন করে, তাহা কি তুমি জানো?'—'না'। 'কিরূপে তাহারা এখানে পুনরায় আসিয়া থাকে, তাহা কি তুমি জানো?'—'না'। 'তুমি কি পিতৃযান ও দেবযানের বিষয় অবগত আছ?' রাজা এইরূপ আরও অনেক প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিলেন না, তাহাতে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি কিছুই জান না।' বালক পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়া ঐ কথা বলাতে পিতা বলিলেন, 'আমিও এ-সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে কি তোমায় শিখাইতাম না?' তখন পিতা-পুত্র রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া রাজাকে এই রহস্য-বিদ্যা শিখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন, 'এই বিদ্যা—এই ব্রহ্মবিদ্যা কেবল রাজারাই জানেন, যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণেরা কখনই ইহা জানিতেন না।' যাহা হউক, তিনি এ-সম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে আমরা অনেক উপনিষদে এই কথা পাইতেছি যে, বেদান্তদর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নয়, পরন্তু ইহার সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি সাংসারিক কার্যে বিশেষ ব্যস্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই চিন্তিত ও প্রকাশিত। লক্ষ লক্ষ প্রজার শাসক সার্বভৌম রাজা অপেক্ষা অধিকতর কর্ম-ব্যস্ত মানুষ আর কল্পনা করা যায় না; কিন্তু তথাপি এই রাজারা গভীর চিন্তাশীল ছিলেন।

এইরূপে নানাদিক হইতে দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই দর্শনের আলোকে জীবনগঠন ও জীবনযাপন করা অবশ্যই সম্ভব, আর যখন আমরা পরবর্তী কালের ভগবদ্গীতা আলোচনা করি—আপনারা অনেকেই বোধ হয় ইহা পড়িয়াছেন, ইহা বেদান্তদর্শনের একটি সর্বোত্তম ভাষ্যস্বরূপ—তখন দেখিতে পাই, আশ্চর্যের বিষয় যুদ্ধক্ষেত্র এই উপদেশের স্থান বলিয়া নির্বাচিত হইয়াছে, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন, আর গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে—তীব্র কর্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার চির শান্তভাব! এই তত্ত্বকে 'কর্মরহস্য' বলা হইয়াছে, এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য। আমরা অকর্ম বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা, তাহা অবশ্য আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, তবে তো আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী দেয়ালগুলিই

পরমজ্ঞানী হইত, তাহারা তো নিশ্চেষ্ট। মৃত্তিকাখণ্ড, গাছের গুঁড়ি—এই গুলিই তো তাহা হইলে জগতে মহাতপস্বী বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহারাও তো নিশ্চেষ্ট। আবার কামনাযুক্ত হইলেই যে নিশ্চেষ্টতা কর্মে পরিণত হয়, তাহাও নয়। বেদান্তের আদর্শ যে প্রকৃত কর্ম, তাহা অনন্ত স্থিরতার সহিত জড়িত—যাহাই কেন ঘটুক না, সে স্থিরতা কখন নষ্ট হইবার নয়—চিত্তের সে সমতা কখন নষ্ট হইবার নয়। আর আমরা বহুদর্শিতার দ্বারা জানিয়াছি, কার্য করিবার পক্ষে এইরূপ মনোভাবই সর্বাপেক্ষা ভাল।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা কার্যের জন্য যেমন একটা আগ্রহ বোধ করিয়া থাকি, তেমন আগ্রহ না থাকিলে কেমন করিয়া কাজ করিব? আমিও পূর্বে এইরূপ মনে করিতাম, কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি, ততই দেখিতেছি, উহা সত্য নহে। কার্যের ভিতরে যত কম আগ্রহ বা কামনা থাকে, আমরা ততই সুন্দরভাবে কাজ করিতে সমর্থ হই। আমরা যতই শান্ত হই, ততই আমাদের নিজেদের মঙ্গল, ততই আমরা আরও বেশী কাজ করিতে পারি। যখন আমরা ভাববশে পরিচালিত হই, তখনই আমাদের শক্তির বিশেষ অপব্যয় হয়, আমাদের স্নায়ুগুলী বিকৃত হয়, মন চঞ্চল হইয়া উঠে, কিন্তু কার্য খুব কমই হয়। যে-শক্তি কার্যরূপে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাহা শুধু হৃদয়াবেগেই পর্যবসিত হয়। মন যখন খুব শান্ত ও স্থির থাকে, কেবল তখনই আমাদের সমুদয় শক্তিটুকু সৎকার্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। যদি তোমরা জগতে বড় বড় কর্মকুশল ব্যক্তির জীবনী পাঠ কর, দেখিবে তাঁহারা অদ্ভুত শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কিছুই তাঁহাদের চিত্তের সমতা নষ্ট করিতে পারিত না। এই জন্য যে-ব্যক্তি সহজেই রাগিয়া যায়, সে বড় একটা কাজ করিতে আর যে কিছুতেই ,, সে সবাপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারে। যে-ব্যক্তি ক্রোধ ঘৃণা বা কোন রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে, সে এ-জগতে বড় একটা কিছু করিতে পারে না, সে নিজেকে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, সে বড় একটা কাজের লোক হয় না। কেবল শান্ত ক্ষমাশীল স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিয়া থাকেন।

বেদান্ত আমাদিগকে আদর্শ সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়া থাকেন, আর আদর্শ অবশ্য বাস্তব হইতে অর্থাৎ যাহাকে আমরা কার্যকর বলিতে পারি, তাহা হইতে অনেক উচ্চে। আমাদের জীবনে দুইটি প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়—একটি আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করা, আর অপরটি এই জীবনকে আদর্শের উপযোগী করা। এই দুইটির পার্থক্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, কারণ আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে—নিজেদের মতো করিয়া লইতে—আমরা অনেক সময় প্রলুব্ধ হই। আমার ধারণা, আমি কোন এক বিশেষ ধরনের কাজ করিতে পারি; হয়তো তাহার অধিকাংশই মন্দ। অধিকাংশের পশ্চাতেই হয়তো ক্রোধ, ঘৃণা অথবা স্বার্থপরতারূপ অভিসন্ধি আছে। এখন কোন ব্যক্তি আমাকে কোন বিশেষ আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন—অবশ্য তাঁহার প্রথম উপদেশ এই হইবে যে, স্বার্থপরতা—আত্মসুখ ত্যাগ কর। আমি ভাবিলাম, ইহা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব। কিন্তু যদি কেহ এমন এক আদর্শ বিষয়ে উপদেশ দেন, যাহা আমার সমুদয় স্বার্থপরতার—সমুদয় অসাধু ভাবের সমর্থন করে, আমি অমনি বলিয়া উঠি, ইহাই আমার আদর্শ। আমি সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। যেমন 'শাস্ত্রীয়' 'অশাস্ত্রীয়' কথা লইয়া লোকে গোলযোগ করিয়া থাকে; আমি যাহা বুঝি, তাহাই শাস্ত্রীয়, আর তোমার মত অশাস্ত্রীয়। কার্যকর (practical) কথাটি লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে। আমি যাহাকে কাজে লাগাইবার মতো বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই একমাত্র কার্যকর। যদি আমি দোকানদার হই, আমি মনে করি, দোকানদারিই একমাত্র কার্যকর ধর্ম। আমি যদি চোর হই, আমি মনে করি, চুরি করিবার উত্তম কৌশলই সর্বোত্তম কার্যকর ধর্ম। তোমরা দেখিতেছ, আমরা কেমন এই 'কার্যকর' শব্দটি—কেবল আমরাই বর্তমান অবস্থায় যাহা করিতে পারি, সেই বিষয়েই প্রয়োগ করিয়া থাকি। এই হেতু আমি তোমাদিগকে বুঝিতে বলি যে, যদিও বেদান্ত চূড়ান্তভাবে কার্যকর বটে, কিন্তু সাধারণ অর্থে নহে; উহা আদর্শ-হিসাবে কার্যকর। ইহার আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, ইহা কোন অসম্ভব আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করে না, অথচ এই আদর্শই 'আদর্শ' নামের উপযুক্ত। এক কথায় ইহার উপদেশ 'তত্ত্বমসি'—'তুমিই সেই ব্রহ্ম'—ইহাই সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি। নানাবিধ তর্ক বিচারের পর

এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে, মানবাত্মা শুদ্ধস্বভাব ও সর্বজ্ঞ। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলা বাতুলতা মাত্র। আত্মা কখন জন্মান নাই, কখন মরিবেন না; আর আমি মরিব বা মরিতে ভীত—এ-সব কুসংস্কার মাত্র। আমি ইহা করিতে পারি বা পারি না—ইহাও কুসংস্কার। আমি সব করিতে পারি। বেদান্ত মানুষকে প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন। যেমন জগতের কোন কোন ধর্ম বলে—যে-ব্যক্তি নিজ হইতে পৃথক্ সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সে নাস্তিক; সেইরূপ বেদান্ত বলেন—যে-ব্যক্তি নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলে। অনেকের পক্ষে এই ধারণা বড় ভয়ানক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আর আমরা অনেকেই মনে করি, আমরা কখনই এই আদর্শে পৌছিতে পারিব না, কিন্তু বেদান্ত দৃঢ়ভাবে বলেন যে, প্রত্যেকেই এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এ বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নাই, বালক-বালিকার ভেদ নাই, জাতিভেদ নাই—আবালবৃদ্ধবনিতা জাতিধর্মনির্বিশেষে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে—কোন কিছুই ইহাকে বাধা দিতে পারে না; কারণ বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহা পূর্ব হইতেই অনুভূত হইয়াছে—পূর্ব হইতেই রহিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের রহিয়াছে। আমরা নিজেরাই নিজেদের চোখে হাত দিয়া 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, দেখিবে সেখানে প্রথম হইতেই আলোক ছিল। অন্ধকার কখনই ছিল না, দুর্বলতা কখনই ছিল না, আমরা নির্বোধ বলিয়াই চীৎকার করি—'আমরা দুর্বল'; আমরা নির্বোধ বলিয়াই চীৎকার করি—'আমরা অপবিত্র'। এইরূপে বেদান্ত শুধু যে বলেন—আদর্শকে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা নহে, উপরন্তু বলেন—উহা পূর্ব হইতেই আমাদের উপলব্ধ; আর যাহাকে আমরা এখন আদর্শ বলিতেছি, তাহাই বাস্তব সত্তা—তাহাই আমাদের স্বরূপ। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই মিথ্যা। যখনই তুমি বলো, 'আমি মর্ত্য ক্ষুদ্র জীবমাত্র', তখনই তুমি মিথ্যা বলিতেছ; তুমি যেন যাদুবলে নিজেকে অসৎ, দুর্বল, দুর্ভাগা করিয়া ফেলিতেছ।

বেদান্ত পাপ স্বীকার করেন না, ভ্রম স্বীকার করেন। আর বেদান্ত বলেন, সর্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম এই : নিজেকে দুর্বল, পাপী ও হতভাগ্য জীব বলা; এরূপ

বলা যে, আমার কোন শক্তি নাই, আমি ইহা করিতে পারি না, আমি উহা করিতে পারি না। কারণ যখনই তুমি ঐরূপ চিন্তা কর, তখনই তুমি যেন বন্ধন-শৃঙ্খলকে আরও দৃঢ় করিতেছ, তোমার আত্মাকে পূর্ব হইতে অধিক মায়ার আবরণে আবৃত করিতেছ। অতএব যে-কেহ নিজেকে দুর্বল বলিয়া চিন্তা করে, সে ভ্রান্ত; যে-কেহ নিজেকে অপবিত্র বলিয়া মনে করে, সে ভ্রান্ত; সে জগতে একটি অসৎ চিন্তার স্রোত বিস্তার করে। আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে: বেদান্তে আমাদের এই বর্তমান জীবনকে—এই মায়াময় মিথ্যা জীবনকে আদর্শের সহিত মিলাইবার কোন চেষ্টা নাই। কিন্তু বেদান্ত বলেন, এই মিথ্যা জীবনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই ইহার অন্তরালে যে সত্যজীবন সদা বর্তমান, তাহা প্রকাশিত হইবে। মানুষ পূর্বে কিছুটা পবিত্র ছিল, আরও পবিত্র হইল—এমন নহে। কিন্তু বাস্তবিক সে পূর্ব হইতেই শুদ্ধ—তাহার সেই শুদ্ধ স্বভাব একটু একটু করিয়া প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। আবরণ চলিয়া যায় এবং আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। এই অনন্ত পবিত্রতা, মুক্তস্বভাব, প্রেম ও ঐশ্বর্য পূর্ব হইতেই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান।

বেদান্ত আরও বলেন, ইহা যে শুধু বনে অথবা পর্বতগুহায় উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তাহা নয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমে যাঁহারা এই-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বনে অথবা পর্বতগুহায় বাস করিতেন না, অথবা তাঁহারা সাধারণ মানুষও ছিলেন না, কিন্তু—আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে—তাঁহারা অত্যন্ত কর্মময় জীবন যাপন করিতেন, তাঁহাদিগকে সৈন্যপরিচালনা করিতে হইত, সিংহাসনে বসিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হইত। তখনকার কালে রাজারাই সর্বময় কর্তা ছিলেন, এখনকার মতো সাক্ষিগোপাল ছিলেন না; তথাপি তাঁহারা এই-সকল তত্ত্ব চিন্তা এবং সেগুলি জীবনে পরিণত করিবার এবং মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার সময় পাইতেন। অতএব তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের ঐ-সকল তত্ত্ব অনুভব করা তো অনেক সহজ, কারণ তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের জীবনে অনেক অবসর, সুতরাং আমাদের যখন কাজ এত কম, আমরা যখন তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীন, তখন আমরা যে ঐ-সকল সত্য অনুভব করিতে পারি না, ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। পূর্বকালীন সর্বময়

সম্রাটগণের প্রয়োজনের সহিত তুলনায় আমাদের অভাব তো কিছুই নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত অগণিত অক্ষৌহিণী-পরিচালক অর্জুনের তুলনায় আমার প্রয়োজন কিছুই নয়, তথাপি এই যুদ্ধকোলাহলের মধ্যে তিনি উচ্চতম দর্শনের কথা শুনিবার এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার সময় পাইলেন ; সুতরাং আমাদের এই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ও আরামের জীবনে ইহা পারা উচিত। আমরা যদি বাস্তবিক সদ্ভাবে সময় কাটাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে দেখিব, আমরা যতটা ভাবি তাহা অপেক্ষা আমাদের অনেকেরই যথেষ্ট সময় আছে। আমাদের যতটা অবকাশ আছে, তাহাতে যদি আমরা বাস্তবিক ইচ্ছা করি, তবে একটা আদর্শ কেন, পঞ্চাশটি আদর্শ অনুসরণ করিতে পারি, কিন্তু আদর্শকে কখনই নীচু করা উচিত নয়। এ আমাদের জীবনের একটি প্রলোভন। অনেকে আছে—তাহারা আমাদের মিথ্যা অভাব ও বাসনাগুলির জন্য নানাপ্রকার আপত্তি দেখায় আর আমরা মনে করি, উহা হইতে উচ্চতর আদর্শ বুঝি আর নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। বেদান্ত এরূপ শিক্ষা কখনই দেন না। প্রত্যক্ষ জীবনকে আদর্শের সহিত একীভূত করিতে হইবে, বর্তমান জীবনকে অনন্ত জীবনের সহিত মিলাইয়া দিতে হইবে।

তোমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বেদান্তের মূলকথা—এই একত্ব বা অখণ্ডভাব। দুই কোথাও নাই, দুইপ্রকার জীবন নাই, অথবা দুইটি জগৎও নাই। তোমরা দেখিবে, বেদ প্রথমতঃ স্বর্গাদির কথা বলিতেছেন, কিন্তু শেষে যখন দর্শনের উচ্চতম আদর্শের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন ও-সকল কথা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। একমাত্র জীবন আছে, একমাত্র জগৎ আছে, একমাত্র অস্তিত্ব আছে। সবই সেই একসত্তা ; প্রভেদ শুধু পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। ভিন্ন ভিন্ন জীবনের মধ্যে প্রভেদ প্রকারগত নহে। পশুগণ মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে আমাদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—বেদান্ত এরূপ কথা একেবারে অস্বীকার করেন।

কতকগুলি লোক দয়াপরবশ হইয়া 'জীবিত-ব্যবচ্ছেদ-নিবারণী সভা' (Anti-vivisection Society) স্থাপন করিয়াছেন। আমি এই সভার জনৈক সভ্যকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'বন্ধু, আপনারা খাদ্যের জন্য পশুহত্যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, অথচ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য দুই-

একটি পশুহত্যার এত বিরোধী কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'জীবিত-ব্যবচ্ছেদ বড় ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু পশুগুলি আমাদের খাদ্যের জন্য দেওয়া হইয়াছে।' কি ভয়ানক কথা! বাস্তবিক পশুগুলিও তো সেই অখণ্ড সত্তারই অংশ। যদি মানুষের জীবন অমর হয়, পশুর জীবনও অমর। প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত নয়। আমিও যেমন, একটি ক্ষুদ্র জীবাণুও তেমন— প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, আর সেই সর্বোচ্চ সত্তার দিক হইতে দেখিলে এ প্রভেদও দেখা যায় না। অবশ্য তৃণ ও একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু যদি অতি উচ্চে আরোহণ কর, তবে ঐ তৃণ ও বৃহত্তম বৃক্ষ সমান বোধ হইবে। এইরূপ সেই উচ্চতম সত্তার দৃষ্টিতে এ-সবই সমান; আর যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমাকে মানিতে হইবে, নিম্নতম পশু এবং উচ্চতম প্রাণী সমান, তাহা না হইলে প্রতিপন্ন হয়—ভগবান মহাপক্ষপাতী। যে-ভগবান মনুষ্যনামক তাঁহার সন্তানগণের প্রতি এত পক্ষপাতসম্পন্ন, আর পশুনামক তাঁহার সন্তানের প্রতি এত নির্দয়, তিনি মানুষ অপেক্ষাও অধম। এরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করা অপেক্ষা বরং আমি শত শত বার মরিতেও প্রস্তুত। আমার সমুদয় জীবন এরূপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ঈশ্বর তো এরূপ নহেন। যাহারা এরূপ বলে, তাহারা জানে না, তাহারা কত দায়িত্বহীন—হৃদয়হীন! তাহারা কি বলিতেছে, তাহা জানে না। এক্ষেত্রে আবার 'কার্যকর' শব্দটি ভুল অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বাস্তবিক কথা এই, আমরা খাইতে চাই, তাই খাইয়া থাকি। আমি নিজে একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে পারি, কিন্তু আমি নিরামিষ-ভোজনের আদর্শটি বুঝি। যখন আমি মাংস খাই, তখন আমি জানি, আমি অন্যায় করিতেছি। ঘটনাবিশেষে আমাকে উহা খাইতে বাধ্য হইতে হইলেও আমি জানি—উহা অন্যায়। আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্বলতার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব না। আদর্শ এই— মাংসভোজন না করা, কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করা; কারণ পশু মাত্রই আমার ভাই, বিড়াল কুকুরও। যদি তাহাদিগকে এরূপ ভাবিতে পারো, তবে তুমি সর্বপ্রাণীর প্রতি ভ্রাতৃভাবের দিকে এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছ— মনুষ্যজাতির প্রতি ভ্রাতৃভাবের তো কথাই নাই! উহা তো ছেলেখেলা মাত্র। তোমরা সচরাচর দেখিবে, এরূপ উপদেশ অনেকের রুচিসঙ্গত হয় না—কারণ

তাহাদিগকে বাস্তব ত্যাগ করিয়া আদর্শের দিকে যাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তুমি যদি এমন কোন মতের কথা বলো, যাহাতে তাহাদের বর্তমান কার্যের—বর্তমান আচরণের সহিত খাপ খায়, তবেই তাহারা বলে ইহা কার্যকর।

মনুষ্য-স্বভাবে ভয়ানক রক্ষণশীল প্রবৃত্তি রহিয়াছে; আমরা সম্মুখে এক পা-ও অগ্রসর হইতে চাহি না। তুষারমগ্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যেমন পড়া যায়, মনুষ্যজাতির সম্বন্ধেও আমার সেইরূপই বোধ হয়। শুনা যায়, ঐরূপ অবস্থায় লোক ঘুমাইতে চায়। যদি তাহাদিগকে জোর করিয়া জাগাইতে চাও, তাহারা নাকি বলে, 'আমাদের ঘুমাইতে দাও—বরফে ঘুমাইতে বড় আরাম!' তাহাদের সেই নিদ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হয়। আমাদের প্রকৃতিও তেমনি। আমরাও সারাজীবন তাহাই করিতেছি—পা হইতে উপরের দিক বরফে জমিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা ঘুমাইতে চাহিতেছি। অতএব সর্বদাই আদর্শে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে; যদি কোন ব্যক্তি আদর্শকে খাটো করিয়া তোমার স্তরে নামাইয়া আনিতে চায়, যদি কেহ শিক্ষা দেয়—ধর্ম উচ্চতম আদর্শ নহে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না। ঐরূপ ধর্মাচরণ আমার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু যদি কেহ আসিয়া আমায় বলে, 'ধর্মই জীবনের সর্বোচ্চ প্রয়াস', তবে আমি তাঁহার কথা শুনিতে প্রস্তুত আছি। এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যখন কোন ব্যক্তি কোনরূপ দুর্বলতা সমর্থন করিতে চেষ্টা করে, তখন বিশেষ সাবধান হইও। আমরা একে তো ইন্দ্রিয়সমূহে আবদ্ধ হইয়া নিজদিগকে একেবারে অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছি, তারপর আবার যদি কেহ আসিয়া পূর্বোক্ত ভাবে শিক্ষা দিতে চায় এবং তুমি ঐ উপদেশ অনুসরণ কর, তবে কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিবে না। আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি, জগৎ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আমার দেশে ধর্মসম্প্রদায়গুলি ব্যাঙের ছাতার মতো বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রতিবৎসর নূতন নূতন সম্প্রদায় উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, যে-সম্প্রদায়গুলি সংসার ও ধর্ম একসঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে না, তাহারাই উন্নতি করিয়া থাকে—আর যেখানে উচ্চতম আদর্শ সাংসারিক অনিত্য বাসনার সহিত মিলিত করার—ঈশ্বরকে মানুষের স্তরে টানিয়া আনিবার মিথ্যা চেষ্টা হইয়াছে,

সেখানেই রোগ প্রবেশ করে। মানুষ যেখানে পড়িয়া আছে, সেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না—তাহাকে দেবত্বে উন্নীত করিতে হইবে।

এ প্রশ্নের আবার আর একটি দিক আছে। আমরা যেন অপরকে ঘৃণার চক্ষে না দেখি। আমরা সকলেই সেই লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছি। দুর্বলতা ও শক্তির মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত। আলো ও অন্ধকারের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত, পাপ ও পুণ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত; যে-কোন বস্তুর সহিত অপর বস্তুর প্রভেদ কেবল মাত্রাগত—পরিমাণগত; প্রকারগত নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে সবই সেই এক অখণ্ড বস্তুমাত্র। সবই এক—চিন্তারূপেই হউক, জীবনরূপেই হউক, আত্মা-রূপেই হউক, সবই এক—প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, মাত্রার তারতম্যে। তাই অন্যে ঠিক আমাদের মতো উন্নতি করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদের ঘৃণা করা উচিত নয়। কাহারও নিন্দা করিও না, সাহায্য করিতে পারো তো কর; যদি না পারো হাত গুটাইয়া লও, সকলকে আশীর্বাদ কর, সকলকে নিজ নিজ পথে চলিতে দাও। গাল দিলে, নিন্দা করিলে কোন উন্নতি হয় না। এভাবে কখনও কাহারও উন্নতি হয় না। অন্যের নিন্দা করিলে কেবল বৃথা শক্তিক্ষয় হয়। সমালোচনা ও নিন্দা দ্বারা বৃথা শক্তিক্ষয় হয় মাত্র, আর শেষে আমরা দেখিতে পাই, অন্যে যে দিকে চলিতেছে আমরাও ঠিক সেই দিকেই চলিতেছি; আমাদের অধিকাংশ মতভেদ ভাষার বিভিন্নতামাত্র।

এমন কি, পাপের কথা ধর। বেদান্তের ধারণা এবং 'মানুষ পাপী ইত্যাদি' ধারণা—এই দুইটি ভাবই কার্যতঃ এক, তবে একটি ভুল দিকে চলিয়াছে। প্রচলিত মত নেতিভাবাপন্ন, বেদান্ত ইতিভাবাপন্ন। একমত মানুষকে তাহার দুর্বলতা দেখাইয়া দেয়, অপরে বলে—দুর্বলতা থাকিতে পারে, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিও না; আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে। মানুষ যখন প্রথম জন্মিয়াছে, তখনই তাহার রোগ কি জানা গিয়াছে। সকলেই জানে নিজের কি রোগ; অপর কাহাকেও তাহা বলিয়া দিতে হয় না। আমরা বহির্জগতের সমক্ষে কপট আচরণ করিতে পারি, কিন্তু অন্তরের অন্তরে আমরা আমাদের দুর্বলতা জানি। কিন্তু বেদান্ত বলেন, কেবল দুর্বলতা স্মরণ করাইয়া দিলেই বেশী উপকার হইবে না, তাহাকে ঔষধ দাও,

মানুষকে কেবল সর্বদা রোগগ্রস্ত ভাবিতে বলা রোগের ঔষধ নয়—রোগ প্রতিকারের উপায় নয়। মানুষকে সর্বদা তাহার দুর্বলতার বিষয় ভাবিতে বলা তাহার দুর্বলতার প্রতীকার নয়—তাহার শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতিকারের উপায়। তাহার মধ্যে যে-শক্তি পূর্ব হইতেই বিরাজিত, তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দাও। মানুষকে পাপী না বলিয়া বেদান্ত বরং ঠিক বিপরীত পথ দেখাইয়া বলেন: তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ, তুমি যাহাকে পাপ বলো, তাহা তোমাতে নাই। পাপগুলি তোমার খুব নিম্নতম প্রকাশ; যদি পারো, উচ্চতরভাবে নিজেকে প্রকাশিত কর। একটি জিনিস আমাদের মনে রাখা উচিত—তাহা এই যে, আমরা সবই পারি। কখনও 'না' বলিও না, কখনও 'পারি না' বলিও না। ওরূপ কখনও হইতেই পারে না, কারণ তুমি অনন্তস্বরূপ। তোমার স্বরূপের তুলনায় দেশকালও কিছুই নয়। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারো, তুমি সর্বশক্তিমান্।

অবশ্য যাহা বলা হইল, তাহা নীতির মূলসূত্র মাত্র। আমাদিগকে মতবাদ হইতে নামিয়া আসিয়া জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কিরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে—প্রত্যেক জাতির গার্হস্থ্য জীবনে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়। কারণ, মানুষ যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় ধর্ম যদি তাহাকে সাহায্য করিতে না পারে, তবে ধর্মের বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা কয়েকজন ব্যক্তির জন্য মতবাদ-রূপেই থাকিয়া যাইবে। ধর্ম দ্বারা যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করিতে হয়, তবে ধর্মকে এমন হইতে হইবে যে, মানুষ যেখানে যে-অবস্থায় আছে, সেইখানেই উহার সাহায্য পাইতে পারে,—দাসত্বে বা পূর্ণ স্বাধীনতায়, অধঃপাতের গহ্বরে বা পবিত্রতার উচ্চশিখরে—সর্বদা সমভাবে ধর্ম যেন মানবজাতিকে সাহায্য করিতে পারে। তবেই কেবল বেদান্তের তত্ত্বগুলি অথবা ধর্মের আদর্শ অথবা উহাদের যে-নামই দাও না কেন, কাজে আসিবে।

আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণসাধন করিতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্যে পরিণত করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগতে যত দুঃখ-কষ্ট রহিয়াছে, তাহা বেশীর ভাগ দূরীভূত হইত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে মহাপ্রাণ

নরনারীদের মধ্যে যদি কোন প্রেরণা বিশেষ শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা আত্মবিশ্বাস। তাঁহারা এই চেতনাসহ জন্মিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহৎ হইবেন, এবং তাঁহারা মহৎ হইয়াছিলেন। মানুষ যতদূর সম্ভব অবনত হউক না কেন, এমন এক সময় অবশ্য আসিবে, যখন ঐ অবস্থায় বিরক্ত হইয়াই তাহাকে উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে, তখন সে নিজের উপর বিশ্বাস করিতে শিখে। গোড়া হইতেই আমাদের ইহা জানিয়া রাখা ভাল। আমরা আত্মবিশ্বাস শিখিতে কেন এত ঘুরিয়া মরিব? আমরা বুঝিতে পারি, মানুষে মানুষে প্রভেদের কারণ—তাহাদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস অথবা ইহার অভাব। এই আত্মবিশ্বাসের বলে সকলই সম্ভব হইবে। আমি নিজের জীবনে ইহা দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি, আর যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলিতেছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। কিন্তু এই বিশ্বাস কেবল ক্ষুদ্র 'আমি'কে লইয়া নয়, কারণ বেদান্ত 'একত্ববাদ' শিক্ষা দিতেছেন। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ সকলের মধ্যেই 'তুমি' রহিয়াছ। আত্মপ্রীতির অর্থ সর্বভূতে প্রীতি—সকল জীবজন্তুর প্রতি প্রীতি, সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি। এই মহান্ বিশ্বাস-বলেই জগতের উন্নতি হইবে। ইহা আমার ধ্রুব ধারণা। তিনিই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন—আমি আমার নিজের সম্বন্ধে সব জানি; তোমরা কি জানো, তোমাদের এই দেহের ভিতর কত শক্তি, কত ক্ষমতা এখনই লুক্কায়িত রহিয়াছে? কোন্ বৈজ্ঞানিক একটি মানুষের ভিতরে যাহা আছে, তাহা সবই জানিয়াছেন? লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব হইতে মানুষ পৃথিবীতে বাস করিতেছে, কিন্তু তাহার শক্তির অতি সামান্য অংশই এ-যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তুমি নিজেকে দুর্বল বলো কি করিয়া? আপাতপ্রতীয়মান এই অবনতির পশ্চাতে কি রহিয়াছে, তাহা কি তুমি জানো? তোমার ভিতরে কি আছে, তাহা জানো কি? তোমার পশ্চাতে অনন্ত শক্তি ও আনন্দের সমুদ্র রহিয়াছে।

'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ'—এই আত্মার কথা প্রথমে শুনিতে হইবে। দিনরাত্রি শ্রবণ কর; তুমিই সেই আত্মা। দিনরাত্রি পুনঃ পুনঃ বলিতে

থাকো, যে পর্যন্ত না ঐ ভাব তোমার প্রতি রক্তবিন্দুতে, প্রতি শিরায় ও ধমনীতে স্পন্দিত হয়, যে পর্যন্ত না উহা তোমার মজ্জাগত হইয়া যায়। সমুদয় দেহটিই ঐ এক আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেলো; 'আমি জন্মহীন, অবিনাশী, আনন্দময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্য, জ্যোতির্ময় আত্মা'—দিবারাত্রি এই চিন্তা কর—যে পর্যন্ত না উহা তোমার প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া যায়। ঐ ভাব ধ্যান করিতে থাকো,—উহা হইতেই পরে কর্ম আসিবে। 'হৃদয় পূর্ণ হইলে মুখ কথা বলে—হৃদয় পূর্ণ হইলে হাতও কাজ করিয়া থাকে।' সুতরাং ঐরূপ অবস্থাতেই যথার্থ কার্য করিতে সক্ষম হইবে। নিজেকে ঐ আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেলো—যাহা কিছু কর, পূর্বে সে সম্বন্ধে ভালভাবে চিন্তা কর। তখন ঐ চিন্তাশক্তি-প্রভাবে তোমার সমুদয় কর্মই পরিবর্তিত হইয়া উন্নত দেবভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। জড় যদি শক্তিশালী হয়, চিন্তা তবে সর্বশক্তিমান্। সেই চিন্তা, সেই ধ্যান লইয়া আইস, নিজেকে নিজের সর্বশক্তিমত্তা ও মহত্ত্বের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেলো। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের মাথায় কুসংস্কারপূর্ণ ভাবগুলি যদি মোটেই প্রবেশ না করিত! ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা এই কুসংস্কারের প্রভাব, দুর্বলতা ও নীচত্বের দ্বারা পরিবেষ্টিত না হইতাম! ঈশ্বরেচ্ছায় যদি মানুষ অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে উচ্চতম মহত্তম সত্যসমূহে পৌঁছিতে পারিত! কিন্তু মানুষকে এই-সকলের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়; যাহারা তোমার পরে আসিতেছে, তাহাদের জন্য পথ দুর্গমতর করিও না।

অনেক সময় এই-সকল তত্ত্ব লোকের নিকট ভয়ানক বলিয়া মনে হয়। আমি জানি, অনেকে এই-সকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা যথার্থই এই ভাব কার্যে পরিণত করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রথম শিক্ষা। নিজেকে অথবা অপরকে দুর্বল বলিও না। যদি পারো লোকের ভাল কর, জগতের অনিষ্ট করিও না। অন্তরের অন্তরে জানো যে, তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব—নিজদিগকে কাল্পনিক ব্যক্তির সমক্ষে অবনত করিয়া রোদন করা—কুসংস্কার মাত্র। আমাকে এমন একটি উদাহরণ দেখাও, যেখানে বাহির হইতে এই প্রার্থনাগুলির উত্তর পাওয়া গিয়াছে। যাহা কিছু উত্তর আসিয়াছে, তাহা নিজের হৃদয় হইতে। তোমরা অনেকেই মনে কর, ভূত নাই, কিন্তু অন্ধকারে গা একটু ছমছম করিতে থাকে। ইহার

কারণ অতি শৈশবকাল হইতেই এই-সব ভয় মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে—এই ভয়ে, বন্ধু-বান্ধবের ঘৃণার ভয়ে, কুসংস্কার নষ্ট হইবার ভয়ে অপরকে এগুলি শিখাইবে না। এই-সকল প্রবৃত্তি জয় কর। ধর্মবিষয়ে শিখাইবার আর বেশী আছে কি?—কেবল বিশ্বের একত্ব ও নিজের উপর বিশ্বাস।

শিক্ষা দিবার আছে কেবল এইটুকু। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ এই একত্ব অনুভব করিবার চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছে, আর এখনও করিতেছে। আমরা জানি, তোমরাও এখন ইহা শিক্ষা দিতেছ। সকল দিক হইতেই এই শিক্ষা আমরা পাইতেছি। কেবল দর্শন ও মনোবিজ্ঞান নয়, জড়বিজ্ঞানও ইহাই ঘোষণা করিতেছে। এমন বৈজ্ঞানিক কি দেখাইতে পারো, যিনি আজ জগতের একত্ব অস্বীকার করিতে পারেন? জগতের নানাত্ব প্রচার করিতে কে এখন সাহস করে? এই সবই তো কুসংস্কারমাত্র। একমাত্র প্রাণ বিদ্যমান, একমাত্র জগৎ বিদ্যমান, আর তাহাই আমাদের চক্ষে 'নানা' রূপে প্রতিভাত হইতেছে, যেমন স্বপ্নদর্শনকালে একটি স্বপ্নের পরে আর একটি স্বপ্ন আসে। স্বপ্নে যাহা দেখ, তাহা তো সত্য নয়। একটি স্বপ্নের পর আর একটি স্বপ্ন আসে—বিভিন্ন দৃশ্য চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এই জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ। এখন ইহা পনর আনা দুঃখ ও এক আনা সুখরূপে প্রতিভাত হইতেছে। হয়তো কিছুদিন পরে ইহাই পনর আনা সুখে পরিপূর্ণ মনে হইবে—তখন আমরা ইহাকে স্বর্গ বলিব। কিন্তু সিদ্ধ হইলে এমন এক অবস্থা আসিবে, যখন এই সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে—উহা ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইবে এবং আমাদের আত্মাকেও আমরা ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিব। অতএব নানা জগৎ, নানা জীবন বলিয়া কিছু নাই। এই বহু সেই একেরই বিকাশমাত্র। সেই একই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিতেছেন—জড় বা চৈতন্য, মন বা চিন্তা-শক্তি অথবা অন্য কোনরূপে। সেই একই নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করিতেছেন। অতএব আমাদের প্রথম সাধন—নিজেকে ও অপরকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া।

পৃথিবীতে এই মহান্ আদর্শের ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হউক—কুসংস্কারগুলি দূর হউক। দুর্বল মানুষকে শুনাইতে থাকো, ক্রমাগত শুনাইতে থাকো:

তুমি শুদ্ধস্বরূপ; ওঠ, জাগো; হে মহান্, এই নিদ্রা তোমার সাজে না। ওঠ, এই মোহ তোমার সাজে না। তুমি নিজেকে দুর্বল ও দুঃখী মনে করিতেছ? হে সর্বশক্তিমান্, ওঠ, জাগো; নিজস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি নিজেকে পাপী বলিয়া মনে কর, তোমার পক্ষে ইহা শোভা পায় না। তুমি নিজেকে দুর্বল বলিয়া ভাবো, ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। জগৎকে বলিতে থাকো, নিজেকে বলিতে থাকো—দেখ ইহার কি শুভফল হয়, দেখ কেমন বিদ্যুৎ-ঝলকে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সবকিছু পরিবর্তিত হইয়া যায়। মনুষ্যজাতিকে বলিতে থাকো—তাহাদের শক্তি দেখাইয়া দাও। তাহা হইলেই দৈনিক জীবনে ইহা অনুশীলন করিতে শিখিব।

বিবেক সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। তখন শিখিব, জীবনের প্রতি মুহূর্তে, আমাদের প্রতি কার্যে কিভাবে সদসৎ বিচার করিতে হয়, কিভাবে সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে হয়। সত্যের পরীক্ষা কি আমাদের জানিতে হইবে—তাহা এই পবিত্রতা, একত্ব। যাহাতে একত্ব হয়, যাহাতে মিলন হয়, তাহাই সত্য। প্রেমই সত্য, কারণ উহা মিলনকারক; ঘৃণা অসত্য, কারণ উহা বহুত্বের ভাব আনে—পৃথক্ করে। ঘৃণাই তোমা হইতে আমাকে পৃথক্ করে—অতএব ইহা অন্যায় ও অসত্য, ইহা একটি বিভাজনী শক্তি, ইহাতে পৃথক্ করে—বিনষ্ট করে।

প্রেমে মিলায়, প্রেম একত্বসম্পাদক। সকলে এক হইয়া যায়—মা সন্তানের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন, পরিবারগুলি নগরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। এমন কি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সকল প্রাণীর সহিত এক হইয়া যায়। কারণ প্রেমই বাস্তবিক অস্তিত্ব, প্রেমই স্বয়ং ভগবান্, আর সবই প্রেমের বিভিন্ন বিকাশ—স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে, কিন্তু বাস্তবিক সকলই প্রেমের প্রকাশ। অতএব দেখিতে হইবে, আমাদের কর্মগুলি একত্বসম্পাদক, না বহুত্ববিধায়ক। যদি বহুত্ববিধায়ক হয়, তবে ঐগুলি ত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি একত্বসম্পাদক হয়, তবে ঐগুলি সৎকর্ম বলিয়া জানিবে। চিন্তাসম্বন্ধেও এইরূপ। দেখিতে হইবে, উহা বহুত্ববিধায়ক বা একত্বসম্পাদক; দেখিতে হইবে—উহা আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া দিয়া এক মহাশক্তি উৎপাদন করিতেছে কি-না। যদি তাহা করে, তবে ঐরূপ ভাব গ্রহণ করিতে হইবে—যদি না করে, তবে উহা পাপচিন্তা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বৈদান্তিক নীতিবিজ্ঞানের সার কথাই এই—উহা কোন অজ্ঞেয় বস্তুর উপর নির্ভর করে না, অথবা উহা অজ্ঞেয় কিছু শিখায়ও না, কিন্তু সেণ্ট পল যেমন রোমকগণকে বলিয়াছিলেন তেমনি বলে, 'যাঁহাকে তোমরা অজ্ঞেয় মনে করিয়া উপাসনা করিতেছ, আমি তাঁহার সম্বন্ধেই তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছি।' আমি এই চেয়ারখানির জ্ঞানলাভ করিতেছি, কিন্তু এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে প্রথমে আমার 'আমি'র জ্ঞান হয়, তারপর চেয়ারটির জ্ঞান হয়। আত্মার ভিতর দিয়াই চেয়ারটি জ্ঞাত হয়। এই আত্মার মধ্য দিয়াই আমি তোমার জ্ঞান লাভ করি—সমুদয় জগতের জ্ঞান লাভ করি। অতএব আত্মাকে অজ্ঞাত বলা প্রলাপ মাত্র। আত্মাকে সরাইয়া লও, সমুদয় জগৎই উড়িয়া যাইবে; আত্মার ভিতর দিয়াই সমুদয় জ্ঞান আসে,[১] অতএব ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। ইহাই 'তুমি'—যাহাকে তুমি 'আমি' বলো। তোমরা ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে পারো যে, আমার 'আমি' আবার তোমার 'আমি' কিরূপে হইবে? তোমরা আশ্চর্য বোধ করিতে পারো, এই সান্ত 'আমি' কিরূপে অনন্ত অসীম হইবে? কিন্তু বাস্তবিক তাই; সান্ত 'আমি' গল্পকথামাত্র। সেই অনন্তের উপর যেন একটা আবরণ পড়িয়াছে, আর উহার কতকাংশ এই 'আমি'-রূপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সেই অনন্তের অংশ। বাস্তবিকপক্ষে অসীম কখন সসীম হন না—'সসীম' কথার কথামাত্র। অতএব সেই আত্মা নর-নারী, বালক-বালিকা, এমন কি পশু-পক্ষী—সকলেরই জ্ঞাত। তাঁহাকে না জানিয়া আমরা ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারি না। সেই সর্বেশ্বর প্রভুকে না জানিয়া আমরা একটি নিশ্বাস ফেলিতে বা জীবনধারণ করিতে পারি না; আমাদের গতি শক্তি চিন্তা জীবন—সকলই তাঁহা দ্বারা পরিচালিত। বেদান্তের ঈশ্বর সর্বাধিক জ্ঞাত,—কখনও কল্পনাপ্রসূত নহেন।

যদি এই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হন, তবে আর প্রত্যক্ষ ঈশ্বর কি? ঈশ্বর, যিনি সকল প্রাণীতে বিরাজিত,—আমাদের ইন্দ্রিয়গণ হইতেও অধিক সত্য। আমি যাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহা হইতেও প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর কি দেখিতে চাও? কারণ তুমিই তিনি, সেই সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর;

১ কেন উপ., ২।৪

আর যদি বলি, তুমি তাহা নও, তবে আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি। সকল সময়ে আমি ইহা উপলব্ধি করি বা না করি, তথাপি আমি ইহা জানি। তিনিই এক অখণ্ড সত্তা, সর্ববস্তুর একত্বস্বরূপ, সমুদয় জীবন ও অস্তিত্বের যথার্থস্বরূপ।

বেদান্তের এই-সকল ভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। অতএব একটু ধৈর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে হইবে—বিশেষতঃ জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় কিভাবে উহা কার্যে পরিণত করা যায় দেখিতে হইবে, আর ইহাও দেখিতে হইবে, কিভাবে এই আদর্শ নিম্নতর আদর্শসমূহ হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে, কিভাবে এই একত্বের আদর্শ আমাদের পারিপার্শ্বিক সমুদয় ভাব হইতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া ক্রমশঃ সর্বজনীন প্রেমে পরিণত হইতেছে; সব দিক দিয়া এগুলি আলোচনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, তাহা হইলে আমরা আর বিপদে পড়িব না। কিন্তু সমগ্র জগৎ তো আর নিম্নতম আদর্শ হইতে ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিবার সময় নাও পাইতে পারে; কিন্তু উচ্চতর সোপান-আরোহণে কি সার্থকতা—যদি পরবর্তিগণকে আমরা ঐ সত্য সহজে শিক্ষা না দিতে প্যারি? অতএব বিষয়টি বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক, আর প্রথমতঃ উহার জ্ঞানভাগ—বিচারাংশ বিশেষরূপে বুঝা আবশ্যক, যদিও আমরা জানি, বিচারের বিশেষ কিছু মূল্য নাই, হৃদয়েরই প্রয়োজন বেশী। হৃদয়ের দ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, বুদ্ধি দ্বারা নয়। বুদ্ধি কেবল ঝাড়ুদারের মতো রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেয়—উহা গৌণভাবে আমাদের উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। বুদ্ধি প্রহরীর মতো, কিন্তু সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রহরীর বেশী প্রয়োজন নাই। তাহাকে কেবল গোলমাল থামাইতে হয়, অন্যায় নিবারণ করিতে হয়। বিচারশক্তির—বুদ্ধির কার্যও ততটুকু। এইরূপ বুদ্ধি-বিচারের পুস্তক যখন পড়া হয়, তখন একবার উহা আয়ত্ত হইলে সকলেরই তো মনে হয়, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা হইতে বাহির হইয়া বাঁচলাম। কারণ বিচার-শক্তি অন্ধ, ইহার নিজের গতিশক্তি নাই, হাত-পাও নাই। হৃদয়—অনুভবই বাস্তবিক কাজ করে, উহা বিদ্যুৎ অথবা আরও দ্রুতগামী বস্তু অপেক্ষা দ্রুত গমন করিয়া থাকে। প্রশ্ন এই—তোমাদের হৃদয় আছে কি? যদি থাকে, তবে তুমি

তাহা দ্বারাই ঈশ্বরকে দেখিবে। আজ যে তোমার হৃদয়ে এতটুকু অনুভব-শক্তি আছে, তাহাই প্রবল হইবে, ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে—দেবভাবাপন্ন হইতে থাকিবে, যতদিন না উহা সবকিছুতে, সর্ববস্তুতে একত্ব অনুভব করিতে পারে—নিজের মধ্যে ও অপরের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারে। বুদ্ধি তাহা পারে না। 'বিভিন্নরূপে শব্দযোজনার কৌশল, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।'[১]

তোমাদের মধ্যে যাহারা টমাস-আ-কেম্পিসের 'ঈশা-অনুসরণ' পুস্তক পাঠ করিয়াছ, তাহারাই জানো, প্রতি পৃষ্ঠায় কেমন তিনি অনুভবের উপর ঝোঁক দিতেছেন। জগতের প্রায় সকল মহাপুরুষই অনুভবের উপর জোর দিয়াছেন। বিচার আবশ্যক, বিচার না করিলে আমরা নানাপ্রকার ভ্রমে পড়ি। বিচারশক্তি ভ্রম নিবারণ করে, এতদ্ব্যতীত বিচারের ভিত্তিতে আর কিছু নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিও না। উহা একটি নিষ্ক্রিয় গৌণ সহায়মাত্র; প্রকৃত সাহায্য অনুভবে, প্রেমে। তুমি কি অপরের জন্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ? যদি কর, তবে তোমার হৃদয়ে একত্বের ভাব বর্ধিত হইতেছে। যদি না কর, তবে তুমি একজন বড় বুদ্ধিজীবী হইতে পারো, কিন্তু তোমার কিছুই হইবে না—কেবল শুষ্ক বুদ্ধিবাদী হইয়াই থাকিবে। আর যদি তোমার হৃদয় থাকে, তবে একখানি বই পড়িতে না পারিলেও, কোন ভাষা না জানিলেও তুমি ঠিক পথে চলিতেছ। ঈশ্বর তোমায় সহায় হইবেন।

জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষদের শক্তির কথা কি পাঠ কর নাই? এ শক্তি তাঁহারা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন?—বুদ্ধি হইতে? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি দর্শনসম্বন্ধীয় সুন্দর পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন? অথবা ন্যায়ের কূট বিচার লইয়া কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন? কেহই এরূপ করেন নাই। তাঁহারা কেবল গুটিকতক কথামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টের ন্যায় হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও খ্রীষ্ট হইবে; বুদ্ধের ন্যায় হৃদয়বান্ হও, তুমিও একজন বুদ্ধ হইবে। হৃদয়ই জীবন, হৃদয়ই বল, হৃদয়ই তেজ—হৃদয় ব্যতীত যতই বুদ্ধির চালনা কর না কেন, কিছুতেই ঈশ্বরলাভ হইবে না।

বুদ্ধি যেন চালনাশক্তিশূন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়। যখন হৃদয় তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া গতিযুক্ত করে, তখনই তাহা অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া

১ বিবেকচূড়ামণি, ৬০

থাকে। জগতে চিরকালই এরূপ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং এই বিষয়টি তোমাদের স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক। বৈদান্তিক নীতিতত্ত্বে ইহা একটি বিশেষ কার্যকরী শিক্ষা; কারণ বেদান্ত বলেন, তোমরা সকলে মহাপুরুষ—তোমাদের সকলকেই মহাপুরুষ হইতে হইবে। কোন শাস্ত্র তোমার কার্যের প্রমাণ নহে, কিন্তু তুমিই শাস্ত্রের প্রমাণ। কোন্ শাস্ত্র কি সত্য বলিতেছে—তাহা কি করিয়া জানিতে পারো? তুমিও সেইরূপ অনুভব কর বলিয়া। বেদান্ত ইহাই বলেন। জগতের খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের বাক্যের প্রমাণ কি? না, তুমি-আমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাকি, তাহাতেই তুমি-আমি বুঝিতে পারি—সেগুলি সত্য। আমাদের দিব্য-আত্মা তাঁহাদের দিব্য-আত্মার প্রমাণ। এমন কি, তোমার দেবত্বই ঈশ্বরের প্রমাণ। যদি তুমি বাস্তবিক মহাপুরুষ না হও, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেও কোন কথা সত্য নহে। তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তবে কোন ঈশ্বর নাই, কখন হইবেনও না। বেদান্ত বলেন, এই আদর্শ অনুসরণীয়। আমাদের প্রত্যেককেই মহাপুরুষ হইতে হইবে—আর তুমি স্বরূপতঃ মহাপুরুষই আছ; কেবল উহা অবগত হও। কখনও ভাবিও না, আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব। এরূপ বলা ভয়ানক নাস্তিকতা। যদি পাপ বলিয়া কিছু থাকে, তবে 'আমি দুর্বল' বা 'অন্যে দুর্বল' এরূপ বলাই একমাত্র পাপ।

কর্মজীবনে বেদান্ত

—দ্বিতীয় প্রস্তাব

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১২ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

আমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটি গল্প[১] বলিব—একটি বালকের কিরূপে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। গল্পটি প্রাচীন ধরনের বটে, কিন্তু উহার ভিতরে একটি সারতত্ত্ব নিহিত আছে। একটি অল্পবয়স্ক বালক তাহার মাতাকে বলিল, 'মা, আমি বেদশিক্ষা করিতে যাইব, আমার পিতার নাম কি ও আমার কি গোত্র, তাহা বলুন।'

তাহার মাতা বিবাহিতা ছিলেন না, আর ভারতবর্ষে অবিবাহিতা নারীর সন্তান সমাজে নগণ্যরূপে বিবেচিত—কোন কার্যেই তাহার অধিকার নাই, বেদপাঠ করা তো দূরের কথা। তাই তাহার মাতা বলিলেন, 'আমি যৌবনে অনেকের পরিচর্যা করিতাম, সেই অবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি, সুতরাং তোমার পিতার নাম এবং তোমার কি গোত্র, তাহা জানি না; এইটুকু মাত্র জানি যে, আমার নাম জবালা।'

বালক ঋষিগণের নিকট গমন করিলে ঋষিগণ তাহাকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেন। সে ব্রহ্মচারী শিষ্য হইতে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার গোত্র কি?' বালক মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই আবৃত্তি করিল। অনেকেই এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'বৎস, তুমি সত্য বলিয়াছ, তুমি ধর্মপথ হইতে বিচলিত হও নাই—এই সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ; অতএব তোমাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করিলাম—তোমাকে শিষ্য করিব।' এই বলিয়া তিনি তাহাকে আপনার নিকটে রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকের নাম রাখিলেন সত্যকাম, অর্থাৎ যে সত্য কামনা করে।

প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সত্যকামের শিক্ষা হইতে লাগিল। গুরু সত্যকামকে কয়েক শত গরুর সেবার ভার দিয়া বলিয়া দিলেন, 'এইগুলি লইয়া তুমি অরণ্যে যাও—যখন সর্বসুদ্ধ সহস্র গরু হইবে, তখন ফিরিয়া

[১] ছান্দোগ্য উপ, ৪।৪।৯

আসিবে।' সে তাহাই করিল। কয়েক বৎসর পরে সেই গরুগুলির মধ্যে একটি প্রধান বৃষ সত্যকামকে বলিল, 'আমরা এখন এক সহস্র হইয়াছি, আমাদিগকে লইয়া তোমার গুরুর নিকট ফিরিয়া যাও। আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব।' সত্যকাম বলিল, 'বলুন, প্রভু!' বৃষ বলিল, 'উত্তরদিক ব্রহ্মের এক অংশ; পূর্বদিক, দক্ষিণদিক, পশ্চিমদিকও তাঁহার এক এক অংশ। চারিদিক ব্রহ্মের চারি অংশ। অগ্নি তোমাকে আরও কিছু শিক্ষা দিবেন।' তখনকার কালে অগ্নি ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রতীকরূপে পূজিত হইতেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকেই অগ্নিচয়ন করিয়া তাহাতে আহুতি দিতে হইত। যাহা হউক, সত্যকাম স্নানাদি করিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট আছে, এমন সময় অগ্নি হইতে একটি বাণী শুনিতে পাইল—'সত্যকাম!' সত্যকাম বলিল, 'প্রভু, আজ্ঞা করুন।' তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, ওল্ড টেস্টামেণ্টে এইরূপ একটি গল্প আছে—স্যামুয়েল এইরূপ এক অদ্ভুত বাণী শুনিয়াছিলেন। যাহা হউক, অগ্নি বলিলেন, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। এই পৃথিবী ব্রহ্মের এক অংশ। অন্তরীক্ষ এক অংশ, স্বর্গ এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ। একটি হংস তোমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন।' একটি হংস একদিন আসিয়া সত্যকামকে বলিল, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব।' হে সত্যকাম! এই অগ্নি, তুমি যাহার উপাসনা করিতেছ, তাহা ব্রহ্মের এক অংশ, সূর্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিদ্যুৎও এক অংশ। মদ্‌গু নামক এক পক্ষী তোমাকে আরও কিছু শিখাইবেন।' একদিন সেই পক্ষী আসিয়া তাহাকে বলিল, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিখাইব। প্রাণ তাঁহার এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শ্রবণ এক অংশ এবং মন এক অংশ।' তাহার পর বালক তাহার গুরুর নিকট উপনীত হইল; গুরু দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'বৎস, তোমার মুখ যে ব্রহ্মবিদের মতো উদ্ভাসিত দেখিতেছি।' কে তোমাকে শিক্ষা দিল? সত্যকাম বলিল, 'কোন মানুষে নয়। কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু শিক্ষা দিন, কেননা আমি শুনিয়াছি আপনাদের ন্যায় গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিলে বিদ্যা কল্যাণের কারণ হয়।' দেবতাগণ পূর্বে তাহাকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ঋষি তাহাকে সেই শিক্ষাই দিলেন। বালক গুরুকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আরও উপদেশ দিবার জন্য বলিল। তিনি বলিলেন,' ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু তুমি পূর্বেই জানিয়াছ।'

এই-সকল রূপক ছাড়িয়া দিয়া বৃষ কি শিখাইল, অগ্নি কি শিখাইল, আর সকলে কি শিখাইল—এ-সব কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি, তবে বুঝিব, চিন্তার গতি কোন্ দিকে যাইতেছে। আমরা এখান হইতে এই তত্ত্বের আভাস পাইতেছি যে, এই-সকল বাণী আমাদেরই ভিতরে। আমরা আরও অধিক দূর পাঠ করিয়া গেলে বুঝিব, অবশেষে এই তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ বাণী বাস্তবিক আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে উত্থিত। শিষ্য বরাবরই সত্য সম্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিতেছেন অর্থাৎ উহা বাহির হইতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সত্য নহে। আর এক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে—কর্মজীবনেই ব্রহ্মোপলব্ধি বা ব্যাবহারিক জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োগ। ধর্ম হইতে কার্যতঃ কি সত্য পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই সকলে সর্বদা অন্বেষণ করিতেছে; আর এই-সব গল্প পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, একত্বের ধারণা কিভাবে দিন দিন ব্যাবহারিক জীবনের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদিগকে যে-সকল বস্তুর সংস্পর্শে সর্বদা আসিতে হইত, সেগুলির মধ্যেই তাঁহারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতেছেন। যে অগ্নি তাঁহারা উপাসনা করিতেন, তাহাই ব্রহ্ম—এই পৃথিবী সেই ব্রহ্মের একাংশ ইত্যাদি।

পরবর্তী উপাখ্যানটি[১] সত্যকামের এক শিষ্যসম্বন্ধীয়। ইনি সত্যকামের নিকট শিক্ষালাভের জন্য তাঁহার নিকট কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সত্যকাম কার্যবশতঃ কোন স্থানে গিয়াছিলেন। তাহাতে শিষ্যটি একেবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন। যখন গুরুপত্নী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তুমি কিছু খাইতেছ না কেন?' তখন বালক বলিলেন, 'আমার মন এত খারাপ যে, কিছু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।' এমন সময় তিনি যে অগ্নিতে হোম করিতেছিলেন, তাহা হইতে এই বাণী উত্থিত হইল, 'প্রাণ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মকে জানো।' তখন তিনি বলিলেন, 'প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু তিনি যে আকাশ—সুখ-স্বরূপ, তাহা আমি জানি না।' তখন অগ্নি আরও বলিতে লাগিলেন, 'এই পৃথিবী, এই অন্ন, এই সূর্য—তুমি যাঁহার উপাসনা করিতেছ, তিনি এই-সকলে বাস করিতেছেন, তিনি তোমাদের

১ ছান্দোগ্য উপ., ৪।১০-১৭

সকলের মধ্যেও আছেন। যিনি ইহা জানেন এবং এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন ও সুখী হন। যিনি দিক্‌সকলে বাস করেন, আমিই তিনি। যিনি এই প্রাণে, এই আকাশে, স্বর্গসমূহে ও বিদ্যুতে বাস করেন, আমিই তিনি।'

এখানেও আমরা কর্মজীবনে ধর্মানুভূতির কথা পাইতেছি। যাহাদিগকে তাঁহারা অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতিরূপে উপাসনা করিতেন, যে-সকল বস্তুর সহিত তাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাহাদেরই ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল, তাহাদেরই একটি উচ্চতর অর্থ দেওয়া হইতে লাগিল, আর ইহাই বাস্তবিক বেদান্তের সাধনকাণ্ড। বেদান্ত জগৎকে উড়াইয়া দেয় না, উহাকে ব্যাখ্যা করে। বেদান্ত ব্যক্তিকে উড়াইয়া দেয় না, ব্যাখ্যা করে—আমিত্বকে বিনাশ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আমিত্ব কি তাহা বুঝাইয়া দেয়। বেদান্ত বলে না যে, জগৎ বৃথা অথবা উহার অস্তিত্ব নাই, বরং বলে, জগৎ কি তাহা বুঝ, যাহাতে জগৎ তোমার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে।

সেই বাণী সত্যকাম বা তাঁহার শিষ্যকে এ-কথা বলে নাই যে, অগ্নি সূর্য চন্দ্র অথবা বিদ্যুৎ অথবা আর কিছু—যাহা তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন, তাহা একেবারে ভুল, কিন্তু বলিয়াছিল, যে-চৈতন্য সূর্য চন্দ্র বিদ্যুৎ অগ্নি এবং পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের ভিতরেও রহিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার চক্ষে সবই আর এক রূপ ধারণ করিল। যে-অগ্নি পূর্বে কেবল হোম করিবার জড় অগ্নি ছিল, তাহা এক নূতন রূপ ধারণ করিল এবং প্রকৃত-পক্ষে ঈশ্বরস্বরূপ হইল। পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করিল, প্রাণ আর এক রূপ ধারণ করিল; সূর্য চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ—সকলই আর এক রূপ ধারণ করিল, ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া গেল। তখন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ জানা গেল। কারণ আমাদের ইহা বিশেষরূপে জানা উচিত যে, বেদান্তের উদ্দেশ্যই এই-সকল বস্তুতে ভগবান দর্শন করা, বস্তুগুলি যেরূপ আপাততঃ প্রতীয়মান হইতেছে, সেগুলিকে সেভাবে না দেখিয়া তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে জানা।

তারপর আর একটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহা একটু অদ্ভুত রকমের। 'যিনি চক্ষের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি ব্রহ্ম, তিনি সুন্দর ও জ্যোতির্ময়; তিনি সমুদয় জগতেই দীপ্তি পাইতেছেন।' এখানে ভাষ্যকার বলেন, পবিত্রাত্মা পুরুষগণের চক্ষে যে এক বিশেষপ্রকার জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে

চাক্ষুষ জ্যোতির অর্থ। উহাকে সেই সর্বব্যাপী আত্মার জ্যোতিঃ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। সেই জ্যোতিই গ্রহগণে এবং সূর্য-চন্দ্র-তারায় প্রকাশ পাইতেছে।

তোমাদের নিকট এখন জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে এই প্রাচীন উপনিষদ্-সকলের কতকগুলি অদ্ভুত মতের[১] কথা বলিব। হয়তো ইহা তোমাদের ভাল লাগিতে পারে। শ্বেতকেতু পাঞ্চালরাজের নিকট গমন করিল। রাজা তাহাকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তুমি কি জানো, মৃত্যু হইলে লোকেরা কোথায় যায়? তুমি কি জানো, তাহারা কিরূপে আবার ফিরিয়া আসে? তুমি কি জানো, পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায় না কেন, শূন্যই বা হয় না কেন?' বালক বলিল, 'না, আমি এ-সকল কিছুই জানি না।' সে তখন তাহার পিতার নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিলেন, 'আমিও ঐ-সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অবগত নহি।' তখন তাঁহারা উভয়ে রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা বলিলেন, 'এই জ্ঞান পূর্বে ব্রাহ্মণদের জানা ছিল না, রাজারাই ঐ জ্ঞান অর্জন করেন এবং সেই জ্ঞানবলেই পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন।'

তখন তাঁহারা উভয়ে কিছুদিন রাজার সেবা করিলেন, অবশেষে রাজা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'হে গৌতম, তুমি যে এই অগ্নির উপাসনা করিতেছ, তাহা বাস্তবিক অতি নিম্নস্তরের। এই পৃথিবী সেই অগ্নিস্বরূপ, সম্বৎসর উহার কাষ্ঠ, রাত্রি উহার ধূম, দিক্‌সকল উহার শিখাস্বরূপ, কোণসকল উহার বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিরূপ আহুতি দিয়া থাকেন, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।' রাজা এইরূপে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই-সকল উপদেশের তাৎপর্য এই—তোমার এই ক্ষুদ্র অগ্নিতে হোম করিবার কোন প্রয়োজন নাই, সমুদয় জগৎ সেই অগ্নি এবং দিবারাত্র তাহাতে হোম হইতেছে। দেবতা মানব সকলেই দিবারাত্র উপাসনা করিতেছেন,—'হে গৌতম, মনুষ্যশরীরই সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্নি।'

আমরা এখানেও আবার দেখিতেছি ধর্মকে কার্যে পরিণত করা যাইতেছে, ব্রহ্মকে সংসারের ভিতর আনা হইতেছে। আর এই-সকল গল্পের রূপকে এই

১ ছান্দোগ্য উপ., ৫।৪-১০

একটি তত্ত্ব দেখিতেছি যে, মানুষের কৃত প্রতিমা লোকের হিতকর ও সহায়ক হইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর-উপাসনা করিবার নিমিত্ত প্রতিমার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে জীবন্ত মানব-প্রতিমা তো রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর-উপাসনার জন্য মন্দির নির্মাণ করিতে চাও বেশ, কিন্তু পূর্ব হইতেই ঐ মন্দির অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর মানবদেহরূপ মন্দির তো রহিয়াছে।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বেদের দুই ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদের অভ্যুদয়-সময়ে কর্মকাণ্ড এত জটিল ও বর্ধিতায়তন হইয়াছিল যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। উপনিষদে কর্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিলেই হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক কর্মকাণ্ডের ভিতর একটি উচ্চতর, গভীরতর অর্থ আছে। অতি প্রাচীনকালে এই-সকল যাগযজ্ঞ কর্মকাণ্ড প্রচলিত ছিল, কিন্তু উপনিষদের যুগে জ্ঞানিগণের অভ্যুদয় হইল। তাঁহারা কি করিলেন? আধুনিক সংস্কারকগণের মতো তাঁহারা যাগযজ্ঞাদির বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া ঐগুলিকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না, কিন্তু ঐগুলির উচ্চতর তাৎপর্য বুঝাইয়া দিয়া মানুষকে একটা ধরিবার জিনিস দিলেন।

তাঁহারা বলিলেন, 'অগ্নিতে হোম কর—অতি উত্তম কথা, কিন্তু এই পৃথিবীতে দিবারাত্র হোম হইতেছে। এই ক্ষুদ্র মন্দির রহিয়াছে; বেশ, কিন্তু সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই যে আমার মন্দির, যেখানেই আমি উপাসনা করি না কেন, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। তোমরা বেদী নির্মাণ করিয়া থাকো, কিন্তু আমার পক্ষে জীবন্ত চেতন মনুষ্যদেহরূপ বেদী রহিয়াছে এবং এই মনুষ্যদেহ-রূপ বেদীতে পূজা অন্যান্য অচেতন প্রতীকের পূজা অপেক্ষা অনেক বড়।'

এখানে আর একটি বিশেষ মত বর্ণিত হইতেছে। আমি ইহার অধিকাংশ বুঝি না। যদি তোমরা উহার ভিতর হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পারো, তাই তোমাদের নিকট উপনিষদের ঐ অংশ পাঠ করিতেছি। যে ব্যক্তি ধ্যানবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন সে প্রথমে অর্চিপথে, তারপর ক্রমান্বয়ে দিন শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ-ছয়মাসের নিকট গমন করে; মাস হইতে বৎসরে, বৎসর হইতে সূর্যলোকে,

সূর্যলোক হইতে চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে গমন করে। সেখানে কোন অমানব সত্তা তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহারই নাম 'দেবযান'। যখন ঋষি ও জ্ঞানীদের মৃত্যু হয়, তাঁহারা এই পথ দিয়া গমন করেন। এই মাস বৎসর প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি, কেহই ভাল করিয়া বুঝেন না। সকলেই স্বকপোল-কল্পিত অর্থ করিয়া থাকেন, আবার অনেকে বলেন—এই-সব বাজে কথামাত্র। এই চন্দ্রলোক, সূর্যলোক প্রভৃতিতে যাওয়ার অর্থ কি? আর এই যে অমানব ব্যক্তি আসিয়া বিদ্যুল্লোক হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, ইহারই বা অর্থ কি? হিন্দুদের মধ্যে একটি ধারণা ছিল যে, চন্দ্রলোকে প্রাণীর বাস আছে—ইহার পরে আমরা পাইব, কি করিয়া চন্দ্রলোক হইতে পতিত হইয়া মানুষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। যাহারা জ্ঞানলাভ করে নাই, কিন্তু এই জীবনে শুভকর্ম করিয়াছে, তাহাদের যখন মৃত্যু হয়, তাহারা প্রথমে ধূমপথে গমন করে, পরে রাত্রি, তারপরে কৃষ্ণপক্ষ, তারপরে দক্ষিণায়ন-ছয়মাস, তারপর বৎসর হইতে তাহারা পিতৃলোকে গমন করে। পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। চন্দ্রলোকে দেবতাদের খাদ্যরূপে পরিণত হইয়া দেবজন্ম গ্রহণ করে। যতদিন তাহাদের পুণ্যক্ষয় না হয়, ততদিন চন্দ্রলোকে বাস করিতে থাকে। আর কর্মফল শেষ হইলে পুনর্বার তাহাদিগকে পৃথিবীতে আসিতে হয়। তাহারা প্রথমে আকাশরূপে পরিণত হয়; তারপরে বায়ু, তারপরে ধূম, তারপরে মেঘ প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া শেষে বৃষ্টিকণাকে আশ্রয় করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। সেখানে শস্যক্ষেত্রে শস্যরূপে পরিণত হইয়া মনুষ্য-কর্তৃক খাদ্যরূপে গৃহীত হয়, অবশেষে তাহাদের সন্তানাদিরূপে পরিণত হয়। যাহারা সৎকর্ম করিয়াছিল, তাহারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে, আর যাহারা অসৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদের অতি নীচজন্ম হয়, এমন কি তাহাদিগকে কখন কখন শূকরজন্ম পর্যন্ত গ্রহণ করিতে হয়। আবার যে-সকল প্রাণী দেবযান ও পিতৃযান নামক এই দুই পথের কোন পথে গমন করিতে পারে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই জন্যই পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হয় না, একেবারে শূন্যও হয় না। আমরা ইহা হইতেও কতকগুলি ভাব পাইতে পারি, আর পরে হয়তো আমরা ইহার অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিব। শেষ কথাগুলি অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিয়া জীব আবার কিরূপে

ফিরিয়া আসে, তাহা প্রথম কথাগুলি অপেক্ষা যেন কিছু স্পষ্টতর বোধ হয়, কিন্তু এই-সকল উক্তির তাৎপর্য বোধহয় এই যে, ব্রহ্মানুভূতি ব্যতীত স্বর্গাদিলাভ বৃথা। মনে কর, অনেকে আছেন—তাঁহারা এখনও ব্রহ্ম অনুভব করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহলোকে কতকগুলি সৎকর্ম করিয়াছেন, আর সেই কর্ম আবার ফল-কামনায় করা হইয়াছে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা এখান ওখান নানা স্থান দিয়া গিয়া স্বর্গে উপস্থিত হন; আর আমরাও যেমন এখানে জন্মিয়া থাকি, তাঁহারাও ঠিক সেইরূপ দেবতাদের সন্তানরূপে জন্মিয়া থাকেন, আর যতদিন তাঁহাদের শুভ-কার্যের ফল শেষ না হয়, ততদিন তাঁহারা স্বর্গে বাস করেন। ইহা হইতেই বেদান্তের একটি মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় যে, যাহার নাম-রূপ আছে তাহাই নশ্বর। সুতরাং স্বর্গও অবশ্য নশ্বর হইবে, কারণ সেখানেও নাম-রূপ রহিয়াছে। 'অনন্ত স্বর্গ' স্ববিরুদ্ধ বাক্যমাত্র, যেমন এই পৃথিবী কখন অনন্ত হইতে পারে না; কারণ যে-কোন বস্তুর নাম-রূপ আছে, কালে তাহার উৎপত্তি, কালেই স্থিতি এবং কালেই বিনাশ। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত স্থির; সুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা পরিত্যক্ত হইল।

আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে অনন্ত স্বর্গের কথা আছে, যেমন মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের আছে। মুসলমানেরা আবার স্বর্গের অতিশয় স্থূল ধারণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, স্বর্গে বাগান আছে, তাহার নীচে নদী প্রবাহিত হইতেছে। আরবের মরুতে জল একটি অতি বাঞ্ছনীয় পদার্থ, এই জন্য মুসলমানেরা স্বর্গকে সর্বদাই জলপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন। আমার যেখানে জন্ম, সেখানে বৎসরের মধ্যে ছয়মাস জল। আমি হয়তো স্বর্গকে শুষ্ক বলিয়া কল্পনা করিব, ইংরেজরাও তাহাই করিবেন। সংহিতার এই স্বর্গ অনন্ত, মৃত ব্যক্তিরা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। তাহারা সেখানে সুন্দর দেহ লাভ করিয়া তাহাদের পিতৃগণের সহিত অতি সুখে চিরকাল বাস করিতে থাকে, সেখানে তাহাদের সহিত পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্রাদির সাক্ষাৎ হয়, আর তাহারা সর্বাংশে এখানকারই মতো, তবে অপেক্ষাকৃত অধিক সুখের জীবন যাপন করিয়া থাকে। তাহাদের স্বর্গের ধারণা এই যে, এই জীবনে সুখের যে-সকল বাধাবিঘ্ন আছে, সেগুলি সব চলিয়া যাইবে, কেবল সুখকর অংশগুলিই অবশিষ্ট থাকিবে। স্বর্গের এই ধারণা আমাদের খুব

সুখকর বটে, কিন্তু সুখকর ও সত্য—এ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্। বাস্তবিক চরম সীমায় না উঠিলে সত্য কখনও সুখকর হয় না। মানুষের স্বভাব বড় রক্ষণশীল —মানুষ একবার কোন বিশেষ কার্য করে, আর একবার আরম্ভ করিলে তাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। তাহার মন কোন নূতন চিন্তা গ্রহণ করিতে চায় না, কারণ উহা বড় কষ্টকর।

উপনিষদে আমরা পূর্বপ্রচলিত ধারণার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখিতেছি। উপনিষদে কথিত হইয়াছে—এই-সকল স্বর্গ, যেখানে গিয়া মানুষ পিতৃপুরুষের সহিত বাস করে, সেগুলি কখন নিত্য হইতে পারে না, কারণ যে-বস্তুর নাম-রূপ আছে, তাহা বিনাশশীল। যদি রূপময় স্বর্গ থাকে, তবে কালে অবশ্য সেই স্বর্গের ধ্বংস হইবে। হইতে পারে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, কিন্তু এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহার ধ্বংস হইবেই হইবে। আর এক ধারণা ইতিমধ্যে লোকের মনে উদিত হইয়াছে যে, এই-সকল আত্মা আবার এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে, এবং স্বর্গ কেবল তাহাদের শুভকর্মের ফলভোগের স্থানমাত্র। এই ফলভোগ হইয়া গেলে তাহারা আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। একটি কথা বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মানুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই কার্য-কারণের তত্ত্ব জানিত। পরে আমরা দেখিব, আমাদের দার্শনিকেরা দর্শন ও ন্যায়ের ভাষায় এই তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু এখানে একরূপ শিশুর অস্পষ্ট ভাষায় ইহা কথিত হইয়াছে। এই-সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, এইগুলি সবই অন্তরের অনুভূতি। যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর, ইহা কার্যে পরিণত হইতে পারে কি না, আমি বলিব, ইহা আগে কার্যে পরিণত হইয়াছে, তারপর দর্শনে রূপান্বিত হইয়াছে। তোমরা দেখিতেছ, এইগুলি প্রথমে অনুভূত, পরে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণের নিকট বিশ্বপ্রকৃতি কথা বলিত; পশুপক্ষী, চন্দ্রসূর্য তাঁহাদের সহিত কথা বলিত। তাঁহারা একটু একটু করিয়া সকল জিনিস অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রকৃতির অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চিন্তা দ্বারা বা বিচার দ্বারা উহা লাভ করেন নাই, কিংবা আধুনিক কালের প্রথা অনুযায়ী অপরের মস্তিষ্কপ্রসূত কতকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, অথবা আমি যেমন তাঁহাদেরই একখানি গ্রন্থ লইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া

থাকি, তাহাও করেন নাই; তাঁহাদিগকে সত্য আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। অভ্যাসই ইহার সাধন ছিল, আর চিরকালই এরূপ থাকিবে। ধর্ম চিরকালই ব্যাবহারিক বিজ্ঞানরূপে থাকিবে। শুধু দেবতা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম কখন ছিল না, কখন হইবেও না। প্রথমে অভ্যাস, তারপর জ্ঞান। জীবাত্মা যে এখানে ফিরিয়া আসে, এ ধারণা উপনিষদেই রহিয়াছে। যাহারা ফল কামনা করিয়া কোন সৎকর্ম করে, তাহারা সেই সৎকর্মের ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ ফল নিত্য নহে। কার্যকারণবাদ এখানে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে—কথিত হইয়াছে যে, কারণ অনুসারেই কার্য হইয়া থাকে; কারণ যাহা, কার্যও তাহাই হইবে; কারণ যখন অনিত্য, তখন কার্যও অনিত্য হইবে। কারণ নিত্য হইলে কার্যও নিত্য হইবে। কিন্তু 'সৎকর্ম করা'-রূপ কারণগুলি অনিত্য—সসীম, সুতরাং তাহার ফল কখনই নিত্য হইতে পারে না।

এই তত্ত্বের আর একদিক দেখিলে ইহা বেশ বোধগম্য হইবে, যে-কারণে অনন্ত স্বর্গ হইতে পারে না, সেই কারণেই অনন্ত নরক হওয়াও অসম্ভব। মনে কর, আমি একজন খুব খারাপ লোক। মনে কর, আমি জীবনের প্রতি মুহূর্তে অন্যায় কর্ম করিতেছি, তথাপি এই জীবনটা অনন্ত জীবনের তুলনায় কিছুই নয়। যদি অনন্ত শাস্তি থাকে, তাহার অর্থ এই হইবে যে, সসীম কারণের দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল। এই জীবনের কর্মরূপ সান্ত কারণ দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল। তাহা হইতে পারে না। সারা জীবন সৎকর্ম করিলেও অনন্ত স্বর্গ-লাভ হয় না; হয়—মনে করিলে ঐ একই ভুল হইয়া থাকে। পূর্বে যে-সকল পথের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি ছাড়া—যাঁহারা সত্যকে জানিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আর একটি পথ আছে। ইহাই মায়ার আবরণ হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়—'সত্যকে অনুভব করা'; আর উপনিষদ্‌সমূহ বুঝাইতেছেন এই সত্যানুভব কাহাকে বলে।

ভালমন্দ কিছুই দেখিও না, সকল বস্তু এবং সকল কার্যই আত্মা হইতে প্রসূত বলিয়া চিন্তা করিবে। আত্মা সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন। বলো—জগৎ বলিয়া কিছু নাই, বাহ্যদৃষ্টি রুদ্ধ কর, স্বর্গ-নরক সর্বত্র সেই প্রভুকে দেখ। কি মৃত্যু, কি জীবন—সর্বত্রই তাঁহাকে উপলব্ধি কর। আমি পূর্বে তোমাদিগকে

যাহা পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতেও এই ভাব—এই পৃথিবী সেই ভগবানের একপাদ, আকাশ ভগবানের একপাদ ইত্যাদি। সকলই ব্রহ্ম। ইহা দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কেবল ঐ বিষয় আলোচনা করিলে বা চিন্তা করিলে চলিবে না। মনে কর, জীবাত্মা জগতের প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মময় বোধ করিতে লাগিল, তখন উহা স্বর্গেই যাক, নরকে বা অন্যত্র যেখানেই যাক, কিছুই আসে যায় না। আমি পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করি অথবা স্বর্গেই যাই, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। আমার পক্ষে এগুলির আর কোন অর্থই নাই; কারণ আমার পক্ষে তখন সব জায়গা সমান, সকল স্থানই ভগবানের মন্দির, সকল স্থানই পবিত্র; কারণ স্বর্গে, নরকে বা অন্যত্র আমি ভগবানের সত্তাই অনুভব করিতেছি। ভাল-মন্দ বা জীবন-মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই—শুধু এক অনন্ত ব্রহ্মই আছেন।

বেদান্তমতে মানুষ যখন এই অনুভূতিসম্পন্ন হয়, তখন সে মুক্ত হইয়া যায়; আর বেদান্ত বলেন, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত, অন্যে নহে। যে-ব্যক্তি জগতে অন্যায় দেখে, সে কিরূপে জগতে বাস করিতে পারে? তাহার জীবন তো দুঃখময়। যে-ব্যক্তি এখানে নানা বাধা বিঘ্ন বিপদ দেখে, তাহার জীবন তো দুঃখময়; যে-ব্যক্তি জগতে মৃত্যু দেখে, তাহার জীবন তো দুঃখময়। যে-ব্যক্তি প্রতি বস্তুতে সেই সত্যস্বরূপ দর্শন করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত; সে-ই কেবল বলিতে পারে—আমি এই জীবন সম্ভোগ করিতেছি, আমি এই জীবন লইয়া বেশ সুখী। এখানে আমি বলিয়া রাখিতে পারি যে, বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আর একবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা। প্রথম হইতেই ব্যক্তিহীন ভাব আসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পুরস্কার ও শাস্তির ভাব খুবই জড়ভাবাত্মক, আর কেবল মানুষের মতো সগুণ ঈশ্বর-ভাবের সঙ্গেই ইহার সঙ্গতি আছে, যিনি আমাদেরই মতো একজনকে ভালবাসেন, অপরকে বাসেন না। এরূপ ঈশ্বরধারণার সহিতই পুরস্কার ও শাস্তির ভাব সঙ্গত হইতে পারে। সংহিতার ঈশ্বর এইরূপ ছিলেন। সেখানে ঐ ধারণার সঙ্গে ভয়ও মিশ্রিত ছিল, কিন্তু উপনিষদে এই ভয়ের ভাব একেবারে লোপ পাইয়াছে; ইহার সহিত

নির্গুণের ধারণা আসিতেছে—আর প্রত্যেক দেশেই এই ব্যক্তি-ভাবশূন্য নির্গুণের ধারণা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। মানুষ সর্বদাই সগুণ ব্যক্তি লইয়া থাকিতে চায়।

অনেক বড় বড় মনীষী—অন্ততঃ জগৎ যাঁহাদিগকে খুব চিন্তাশীল বলিয়া থাকে, তাঁহারা এই নির্গুণবাদের উপর বিরক্ত, কিন্তু মানবদেহধারী ঈশ্বরের চিন্তা করা আমার নিকট অবাস্তব, আমার নিকট এই সগুণবাদ অতিশয় হাস্যাস্পদ, নিম্নভাবাপন্ন, অতি স্থূল, এমন কি অধর্ম বলিয়া বোধ হয়। বালকের পক্ষে ভগবানকে একজন সাকার মনুষ্য বলিয়া ভাবা শোভা পায়, সে ওরূপ ভাবিলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে, চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষে ভগবানকে স্ত্রী-পুরুষ বলিয়া চিন্তা করা বড় লজ্জার কথা। উচ্চতর ভাব কোন্‌টি—জীবিত ঈশ্বর বা মৃত ঈশ্বর? যে-ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, যাঁহার সম্বন্ধে কেহ কিছু জানে না—সেই ঈশ্বর অথবা অনুভূত ঈশ্বর? সময়ে সময়ে তিনি জগতে তাঁহার এক এক জন দূতকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, যাঁহার এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে অভিশাপ, আর আমরা যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করি, তবে একেবারে ধ্বংস! তিনি নিজে আসিয়া, আমাদের কি করিতে হইবে বলিয়া দেন না কেন? কেন তিনি ক্রমাগত দূত পাঠাইয়া আমাদিগকে শাস্তি ও অভিশাপ দিতেছেন? কিন্তু এই বিশ্বাসেই অনেকে সন্তুষ্ট। আমাদের কল্পনার কি দীনতা!

অপর পক্ষে, নির্গুণ ঈশ্বরকে জীবন্তরূপে আমার সম্মুখে দেখিতেছি; তিনি একটি তত্ত্বমাত্র। সগুণ নির্গুণের মধ্যে প্রভেদ এই—সগুণ ঈশ্বর ব্যক্তিমাত্র, আর নির্গুণ ঈশ্বর দেবদূত, মানুষ, পশু এবং আরও কিছু, যাহা আমরা দেখিতে পাই না; কারণ নির্গুণের মধ্যে সব সগুণ ভাবই রহিয়াছে—উহা জগতের সমুদয় বস্তুর সমষ্টি এবং তদতিরিক্ত আরও অনেক কিছু। 'যেমন একই অগ্নি জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আবার তদতিরিক্ত অগ্নিরও অস্তিত্ব আছে',[১] নির্গুণও তদ্রূপ।

আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাই। আমি সারা জীবন ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দেখি নাই; তুমিও দেখ নাই; এই চেয়ারখানিকে দেখিতে

১ কঠ উপ., ২।২।৯

হইলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বরকে দেখিতে হয়, তারপর তাঁহারই ভিতর দিয়া চেয়ারখানিকে দেখিতে হয়। তিনি দিবারাত্র জগতে থাকিয়া ''আমি আছি, আমি আছি' বলিতেছেন। যে মুহূর্তে তুমি বলো—'আমি আছি', সেই মুহূর্তেই তুমি সেই সত্তাকে জানিতেছ। কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুঁজিতে যাইবে, যদি তুমি তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে, সকল প্রাণীর ভিতরে না দেখিতে পাও, যদি তাঁহাকে ঐ যে লোকটা রাস্তায় মোট বহিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইতেছে, তাহার ভিতর না দেখিতে পাও?

'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥'[১]

—তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা, তুমি বৃদ্ধ দণ্ডে ভর দিয়া বেড়াইতেছ, তুমিই জগতে জন্মগ্রহণ করিতেছ। তুমি এই সব। কি অদ্ভুত জীবন্ত ঈশ্বর! জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র বস্তু—ইহা অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়; বাস্তবিক ইহা প্রচলিত ঈশ্বর-ধারণার বিরোধী বটে; সেই ঈশ্বর কোন বিশেষ স্থানে কোন আবরণের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহই কখন দেখিতে পায় না। পুরোহিতরা আমাদিগকে কেবল এই আশ্বাস দেন যে, যদি আমরা তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলি, তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করি এবং তাঁহাদিগকে পূজা করি, তাহা হইলে আমরা এই জীবনে ঈশ্বরকে দেখিব না বটে, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁহারা আমাদিগকে একখানি ছাড়পত্র দিবেন—তখন আমরা ঈশ্বর দর্শন করিতে পারিব! এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়—এই স্বর্গবাদ প্রভৃতি পুরোহিতদের মূর্খতা ছাড়া আর কি?

অবশ্য নির্গুণবাদ অনেক কিছু ভাঙিয়া ফেলে, উহা পুরোহিতদের নিকট হইতে সব ব্যবসা কাড়িয়া লয়—উহাতে মন্দির গির্জা প্রভৃতি সব উড়িয়া যায়। ভারতে এখন দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, কিন্তু সেখানে এমন অনেক মন্দির আছে, যাহাতে অসংখ্য হীরাজহরত রহিয়াছে। যদি লোককে এই নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় শেখানো যায়, পুরোহিতদের ব্যবসা চলিয়া যাইবে।

১ শ্বেতাশ্বতর উপ., ৪।৩

তবু আমাদিগকে পৌরোহিত্য ছাড়িয়া নিঃস্বার্থভাবে শিখাইতে হইবে। তুমিও ঈশ্বর, আমিও ঈশ্বর—তবে কে কাহার আজ্ঞা পালন করিবে? কে কাহার উপাসনা করিবে? তুমিই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির; আমি কোন মন্দিরে কোনরূপ প্রতিমা বা কোনরূপ শাস্ত্র উপাসনা না করিয়া বরং তোমার উপাসনা করিব। লোকে এত পরস্পর-বিরোধী চিন্তা করে কেন? লোকে বলে, আমরা প্রত্যক্ষবাদী; বেশ কথা, কিন্তু এইখানে তোমার উপাসনা অপেক্ষা আর কি অধিকতর প্রত্যক্ষ হইতে পারে? আমি তোমাকে দেখিতেছি, তোমাকে বেশ অনুভব করিতেছি, আর জানিতেছি—তুমি ঈশ্বর। মুসলমানেরা বলেন, আল্লা ব্যতীত ঈশ্বর নাই; কিন্তু বেদান্ত বলেন, মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ইহা শুনিয়া তোমাদের অনেকের ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা ক্রমশঃ ইহা বুঝিবে। জীবন্ত ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তথাপি তোমরা মন্দির-গির্জা নির্মাণ করিতেছ, আর সর্বপ্রকার কাল্পনিক মিথ্যা বস্তুতে বিশ্বাস করিতেছ। মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্য জীবজন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহল। যদি মানুষের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না। যে-মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে-মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যের সম্মুখে শ্রদ্ধা সহকারে দাঁড়াইতে পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিব, যে-মুহূর্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহূর্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব—অন্য সব-কিছুই অন্তর্হিত হইবে, আমি মুক্ত হইব।

ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী উপাসনা। মতান্তর লইয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ-কথা বলিলে অনেক লোকে ভয় পায়। তাহারা বলে, ইহা ঠিক নয়। তাহারা তাহাদের পিতামহেরা কি বলিয়া গিয়াছেন, সেই কথা লইয়া মতবাদ রচনা করিবে। পিতামহেরা আবার বিশ হাজার বৎসর পূর্বেকার প্রপিতামহদের নিকট শুনিয়াছিলেন, স্বর্গের কোন স্থানে অবস্থিত একজন ঈশ্বর কাহাকেও বলিয়াছিলেন—আমি ঈশ্বর। সেই সময় হইতে কেবল মতমতান্তরের আলোচনাই চলিতেছে। তাহাদের মতে—ইহাই কাজের কথা, আর আমাদের ভাবগুলি কার্যে পরিণত করা যায় না।

বেদান্ত বলেন, সকলেই নিজ নিজ পথে চলুক ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহাই আদর্শ। স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি মন্দ নয়, কিন্তু ইহা সত্যে পৌঁছিবার সোপানমাত্র। ঐগুলিতে সুন্দর মহৎ ভাব আছে, কিন্তু বেদান্ত প্রতিপদে বলেন: বন্ধু, তুমি যাঁহাকে অজ্ঞাত বলিয়া উপাসনা করিতেছ এবং সারা জগতে যাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, তিনি সর্বদা এখানেই রহিয়াছেন। তুমি যে জীবিত আছ, তাহাও তিনি আছেন বলিয়া—তিনিই জগতের নিত্য সাক্ষী। সমুদয় বেদ যাঁহার উপাসনা করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, যিনি নিত্য 'আমি'তে সদা বর্তমান, তিনি আছেন বলিয়াই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আলোকস্বরূপ। তিনি যদি তোমাতে বর্তমান না থাকিতেন, তবে তুমি সূর্যকেও দেখিতে পাইতে না, সব কিছুই তোমার নিকট শূন্য অন্ধকার জড়রাশি বলিয়া প্রতীত হইত। তিনিই দীপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া তুমি জগৎকে দেখিতেছ।

এ বিষয়ে সাধারণতঃ একটি প্রশ্ন করা হইয়া থাকে—ইহাতে তো ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের সকলেই মনে করিবে, 'আমি ঈশ্বর'—অতএব যাহা কিছু আমি ভাবি বা করি, তাহাই ভাল ; ঈশ্বরের আবার পাপ কি?' প্রথমতঃ এই প্রকার অপব্যাখ্যার আশঙ্কা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা কি প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, অপর পক্ষে অনুরূপ আশঙ্কা নাই? লোকে পৃথক্ স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে, তাঁহাকে তাহারা খুব ভয় করিয়া থাকে। তাহারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জন্মিয়াছে এবং সারা জীবনই এইভাবে কাঁপিয়া কাটাইয়া দেয়। ইহাতে কি জগৎ পূর্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে? অপর পক্ষকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। যাঁহারা ব্যক্তিভাবাপন্ন সগুণ ঈশ্বরবাদ বুঝিয়া উপাসনা করিতেছেন, এবং যাঁহারা ব্যক্তি-ভাবশূন্য নির্গুণ ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিয়া উপাসনা করিতেছেন, উভয়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে জগতে বড় বড় লোকের আবির্ভাব হইয়াছে? বড় বড় কর্মী ও চরিত্রবান্ ব্যক্তির আবির্ভাব অবশ্যই নির্গুণ সাধকদের মধ্য হইতে হইয়াছে। ভয় হইতে উচ্চ নৈতিকশক্তি-সম্পন্ন মানুষ জন্মিবে, ইহা কিরূপে আশা করিতে পারো? ইহা কখনই হইতে পারে না। 'যেখানে একজন অপরকে' দেখে, যেখানে একজন অপরকে হিংসা করে, সেখানেই মায়া। যেখানে একজন অপরকে দেখে না, একজন অপরকে হিংসা করে না, যেখানে সবই আত্মাময়

হইয়া যায়, সেখানে আর মায়া থাকে না।'[1] তখন সবই তিনি, অথবা সবই আমি—তখন আত্মা মলিনতা-মুক্ত হইয়াছে। তখন—কেবল তখনই আমরা বুঝিতে পারি প্রেম কাহাকে বলে। ভয় হইতে কি এই প্রেমের উৎপত্তি সম্ভব? প্রেমের ভিত্তি মুক্তভাব। মুক্তস্বভাব হইলে তবেই প্রেম দেখা দেয়, তখনই আমরা বাস্তবিক জগৎকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অর্থ বুঝিতে পারি—তাহার পূর্বে নহে।

অতএব এই মত অনুসরণ করিলে সমুদয় জগতে ভয়ানক পাপের স্রোত প্রবাহিত হইবে, এমন কথা বলা উচিত নয়; যেন অপর মতটি কখন মানুষকে অন্যায়ের দিকে লইয়া যায় না, উহা যেন সমস্ত জগৎ রক্তে প্লাবিত করে না, উহা যেন মানুষকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে না! 'আমার ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ। এস, যুদ্ধ করিয়া সত্যতা প্রমাণ করি।' দ্বৈতবাদ হইতে জগতে এই ফল হইয়াছে। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথ হইতে প্রশস্ত উদার দিবালোকে এস। মহৎ অনন্ত আত্মা কি করিয়া সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন? আমাদের সম্মুখে এই আলোকময় বিশ্বজগৎ রহিয়াছে, ইহার প্রত্যেকটি বস্তু আমাদের। বাহু প্রসারিত করিয়া—সমুদয় জগৎকে প্রেমে আলিঙ্গন করিতে চেষ্টা কর। যদি কখন এরূপ করিবার ইচ্ছা অনুভব করিয়া থাকো, তবেই তুমি ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছ।

বুদ্ধদেবের জীবনচরিতের মধ্যে তোমাদের সেই অংশটি অবশ্যই মনে আছে, তিনি কিরূপে উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে, অধঃ ঊর্ধ্বে—সর্বত্র প্রেমের চিন্তাপ্রবাহ প্রেরণ করিতেন, যতক্ষণ না সমুদয় জগৎ সেই মহান্ অনন্ত প্রেমে পূর্ণ হইয়া যাইত। যখন সেই ভাব তোমাদের মধ্যে আসিবে, তখনই বুঝিবে যথার্থ ব্যক্তিত্ব কাহাকে বলে। সমুদয় জগৎ তখন এক ব্যক্তি হইয়া যায়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের প্রতি আর মন থাকে না। এই অনন্ত সুখের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ পরিত্যাগ কর। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ লইয়া তোমার লাভ কি? বাস্তবিক কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখও তোমায় ছাড়িতে হয় না, কারণ তোমাদের মনে থাকিতে পারে, পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি—সগুণ নির্গুণের অন্তর্গত। অতএব ঈশ্বর সগুণ এবং নির্গুণ দুইই। মানুষ—

১ বৃহদারণ্যক উপ., ৪।২৪ ও ৫।১৫, ছান্দোগ্য উপ., ৭।২৪

অনন্তস্বরূপ নিগুণ মানুষও—নিজেকে সগুণরূপে, ব্যক্তিরূপে দেখিতেছেন। অনন্তস্বরূপ আমরা যেন নিজদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। বেদান্ত বলেন, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও এইটুকু বলা যায় যে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপার—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা আমাদের কর্মদ্বারা নিজেদের সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহাই যেন আমাদের গলায় শিকল দিয়া আমাদিগকেও বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলো, মুক্ত হও। নিয়মকে পদদলিত কর। মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপে কোন বিধি নাই, কোন দৈব নাই, কোন অদৃষ্ট নাই। অনন্তে বিধান বা নিয়ম থাকিবে কিরূপে? স্বাধীনতাই ইহার মূলমন্ত্র, স্বাধীনতাই ইহার স্বরূপ—ইহার জন্মগত অধিকার। প্রথমে মুক্ত হও, তারপর যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রাখিতে হয়, রাখিও; তখন আমরা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের মতো অভিনয় করিব। যেমন একজন যথার্থ রাজা ভিখারীর বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এদিকে যে বাস্তবিক ভিক্ষুক, সে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছে। দৃশ্য উভয়ত্র সমান, কথাবার্তাও হয়তো এক, কিন্তু কি পার্থক্য! ভিক্ষুকের অভিনয় করিয়া একজন আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, অন্যজন দারিদ্র্যে কষ্ট পাইতেছে। কেন এই পার্থক্য হয়? কারণ একজন মুক্ত, অন্যজন বদ্ধ। রাজা জানেন, তাঁহার এই দারিদ্র্য সত্য নয়,—শুধু অভিনয়ের জন্য তিনি ইহা অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যথার্থ ভিক্ষুক জানে—এ তাহার চিরকালের অবস্থা—ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে এ দারিদ্র্য সহ্য করিতেই হইবে। তাহার পক্ষে ইহা বিধির বিধান, সুতরাং সে কষ্ট পায়। তুমি আমি—যতক্ষণ না আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হইতেছি, ততক্ষণ আমরা ভিক্ষুক-মাত্র, প্রকৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুই আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সমুদয় জগতে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি—শেষে পৌরাণিক কাল্পনিক প্রাণীদের নিকটও সাহায্য চাহিতেছি, কিন্তু এই সাহায্য কখনও পাইলাম না, তথাপি ভাবিতেছি, এইবার সাহায্য পাইব—ভাবিয়া কাঁদিতেছি, চীৎকার করিতেছি, আশা করিয়া বসিয়া আছি; এইভাবে একটা জীবন কাটিল, আবার সেই খেলা চলিতে থাকে।

মুক্ত হও; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা

স্মরণ কর, তবে দেখিবে—তোমরা সর্বদাই অন্যের নিকট সাহায্য পাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছ, কখনও সাহায্য পাও নাই ; যেটুকু সাহায্য পাইয়াছ, সব নিজের ভিতর হইতে। যে-কাজে তুমি নিজে চেষ্টা করিয়াছ, তাহারই ফল পাইয়াছ ; তথাপি কি আশ্চর্য, তুমি সর্বদাই অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ। ধনীদের বৈঠকখানায় খানিকক্ষণ বসিয়া যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে বেশ তামাসা দেখিতে পাইবে। দেখিবে, উহা সর্বদাই পূর্ণ, কিন্তু এখন উহাতে যে-দল রহিয়াছে, সে-দলকে আর দ্বিতীয়বার দেখিবে না,—সর্বদাই তাহারা আশা করিতেছে, ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু আদায় করিবে, কিন্তু কখনই কিছু করিতে পারিতেছে না। আমাদের জীবনও সেইরূপ ; কেবল আশা করিয়াই চলিয়াছি, ইহার শেষ নাই। বেদান্ত বলে, এই আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করিতে যাইবে ? সবই তোমার রহিয়াছে। তুমি আত্মা, তুমি সম্রাটস্বরূপ, তুমি আবার কিসের আশা করিতেছ ? যদি রাজা পাগল হইয়া নিজ দেশে 'রাজা কোথায়, রাজা কোথায় ?' বলিয়া খুঁজিয়া বেড়ান, তিনি কখনই রাজার সন্ধান পাইবেন না, কারণ তিনি নিজেই যে রাজা। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর—এমন কি প্রত্যেক গৃহ পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন, বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিতে পারেন, তথাপি রাজার উদ্দেশ পাইবেন না ; কারণ তিনি নিজেই যে রাজা। আমরা যদি জানিতে পারি, আমরা রাজা, এবং এই রাজার অন্বেষণরূপ অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারিলেই মঙ্গল। বেদান্ত বলেন, এইরূপে নিজদিগকে রাজা বলিয়া জানিতে পারিলেই আমরা সুখী ও সন্তুষ্ট হইতে পারি। নির্বোধের মতো এ-সব অন্বেষণ ছাড়িয়া দিয়া শিশুর মতো জগতে খেলা করিতে থাকো।

এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিলে আমাদের দৃষ্টি পরিবর্তিত হইয়া যায়। অনন্ত কারাস্বরূপ না হইয়া এ-জগৎ ক্রীড়াঙ্গনে পরিণত হয়, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না হইয়া ইহা ভ্রমরগুঞ্জনপূর্ণ বসন্তকালের রূপ ধারণ করে। পূর্বে যে জগৎ নরককুণ্ড বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহাই যেন স্বর্গে পরিণত হয়। বদ্ধের দৃষ্টিতে জগৎ এক মহা যন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহাই স্বর্গ—স্বর্গ অন্যত্র নাই। এক প্রাণই সর্বত্র বিরাজিত। পুনর্জন্মাদি যাহা কিছু—সব এখানেই হইয়া থাকে। দেবতা সবই এখানে

—তাঁহারা মানুষেরই প্রতিরূপ। দেবতারা মানুষকে তাঁহাদের আদর্শে নির্মাণ করেন নাই, কিন্তু মানুষই দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে! এখানে ইন্দ্র রহিয়াছেন, তাঁহার চতুর্দিকে বিশ্বের দেবতারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তোমরাই তোমাদের নিজেদেরই এক অংশকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ, তোমরাই কিন্তু মূল, আসল জিনিস—তোমরাই প্রকৃত উপাস্য দেবতা। ইহাই বেদান্তের মত এবং এই জন্যই ইহা যথার্থ কাজে লাগাইবার যোগ্য। অবশ্য আমরা যখন মুক্ত হইব, তখন উন্মত্ত হইয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বা গুহায় মরিতে যাইব না। তুমি যেখানে ছিলে সেইখানেই থাকিবে, তবে পার্থক্য হইবে এইটুকু যে, তুমি সমুদয় জগতের রহস্য অবগত হইবে। পূর্ব দৃশ্য—সবই আসিবে, কিন্তু উহাদের অর্থ তখন অন্যরূপ বুঝিবে। তোমরা এখনও জগতের স্বরূপ জান না; মুক্ত হইলেই কেবল উহার স্বরূপ বুঝা যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি—বিধি, দৈব বা অদৃষ্ট আমাদের প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই ব্যাপৃত। এটি কেবল আমাদের প্রকৃতির একদিক, অপর দিকে মুক্তি সর্বদা বিরাজিত, আর আমরা শিকারীর দ্বারা অনুসৃত শশকের ন্যায় মাটিতে নিজেদের মুখ লুকাইয়া নিজদিগকে অশুভ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

অতএব দেখা গেল, ভ্রমবশতঃ আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভুলিতে পারি নাই, সর্বদাই উহা কোন না কোনরূপে আমাদের সম্মুখে আসিতেছে। আমরা যে দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিয়া থাকি, আমরা যে বহির্জগতে স্বাধীনতা-লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকি, এ-সব আর কিছুই নয়—আমাদের মুক্ত প্রকৃতি যেন কোন না কোনরূপে নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা সর্বদাই আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভাবিতেছি—কোথা হইতে এই বাণী উঠিতেছে; তাহা বুঝিতে আমরা ভুল করিয়াছি মাত্র। আমরা প্রথমে ভাবি, এই বাণী অগ্নি সূর্য চন্দ্র তারা বা কোন দেবতা হইতে উত্থিত—অবশেষে আমরা দেখিতে পাই, এই বাণী আমাদেরই ভিতরে। এই সেই অনন্ত বাণী—অনন্ত মুক্তির সমাচার ঘোষণা করিতেছে। এই সঙ্গীত অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। আত্মার সঙ্গীতের কিয়দংশ এই পৃথিবী, এই নিয়ম, এই বিশ্বজগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এই সঙ্গীত—এই ধ্বনি সর্বদা আমাদের নিজেদেরই ছিল, এবং

চিরকাল তাহাই থাকিবে। এক কথায় বেদান্তের আদর্শ—জগতে মনুষ্যের উপাসনা, আর বেদান্তের ইহাই ঘোষণা যে, যদি তুমি ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপ তোমার ভ্রাতাকে উপাসনা করিতে না পারো, তবে অন্য কোথাও তোমার অন্য কিছু উপাসনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তোমাদের কি বাইবেলের সেই কথা স্মরণ নাই: যদি তুমি তোমার ভ্রাতাকে—যাহাকে তুমি দেখিয়াছ—ভাল না বাসিতে পারো, তবে যে-ঈশ্বরকে কখন দেখ নাই, তাঁহাকে কি করিয়া ভালবাসিবে? যদি তাঁহাকে দেবভাবাপন্ন মনুষ্যের মুখে না দেখিতে পারো, তবে তাঁহাকে মেঘে অথবা অন্য কোন জড় পদার্থে অথবা তোমার নিজ মস্তিষ্কের কল্পিত গল্পে কি করিয়া দেখিবে? যে-দিন হইতে তোমরা সকল নরনারীতে ঈশ্বর দেখিতে থাকিবে, সেই দিন হইতে আমি তোমাদিগকে ধার্মিক বলিব, তখনই তোমরা বুঝিবে, ডান গালে চড় কেহ মারিলে তাহার দিকে বাঁ গাল ফিরানোর অর্থ কি। যখন তুমি মানুষকে ঈশ্বররূপে দেখিবে, তখন সকল বস্তু—এমন কি ব্যাঘ্র পর্যন্ত তোমার নিকট আসিলে তাহাকে স্বাগত জানাইবে। যাহা কিছু তোমার নিকট আসে, সবই সেই অনন্ত আনন্দময় প্রভু নানারূপে আসিতেছেন—তিনি আমাদের পিতা মাতা বন্ধু। আমাদের আত্মাই আমাদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

ভগবানকে 'পিতা' বলা অপেক্ষা উচ্চতর ভাব আছে; তাঁহাকে সাধকেরা 'মাতা' বলিয়া থাকেন। তাহা অপেক্ষাও পবিত্রতর ভাব আছে—তাঁহাকে 'প্রিয়সখা' বলা। তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভাব—তাঁহাকে 'আমার প্রেমাস্পদ' বলা। ইহার কারণ এই—প্রেম ও প্রেমাস্পদে কিছু প্রভেদ না দেখাই সর্বোচ্চ ভাব। তোমাদের সেই প্রাচীন পারস্যদেশীয় গল্পের কথা স্মরণ থাকিতে পারে। একজন প্রেমিক আসিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদের ঘরের দরজায় আঘাত করিলেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল, 'কে?' তিনি বলিলেন, 'আমি।' দ্বার খুলিল না।' দ্বিতীয়বার তিনি আসিয়া বলিলেন, 'আমি আসিয়াছি', কিন্তু দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার তিনি আসিলেন, আবার জিজ্ঞাসিত হইল, 'কে?' তখন তিনি বলিলেন, 'প্রিয়, আমি তুমিই'; তখন দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ভগবান এবং আমাদের মধ্যেও তেমনি। 'তুমি সকলেতে, তুমিই সব কিছু।' প্রত্যেক নরনারীই সেই প্রত্যক্ষ জীবন্ত আনন্দময় ঈশ্বরের রূপ।

'কে বলে, তুমি অজ্ঞাত? কে বলে, তোমাকে অন্বেষণ করিতে হইবে? আমরা তোমাকে অনন্তকালের জন্য পাইয়াছি। আমরা তোমাতে অনন্তকালের জন্য বাস করিতেছি—সর্বত্র অনন্তকালের জন্য বিজ্ঞাত, অনন্তকাল ধরিয়া উপাসিত তোমাকে আমরা পাইয়াছি।'

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে যে, বেদান্ত বলেন—অন্যান্য প্রকারের উপাসনা ভুল নহে। এই বিষয়টি কোনমতে বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, যাহারা নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা ভগবানের উপাসনা করে—আমরা ঐগুলিকে যতই অপরিণত মনে করি না কেন—তাহারা বাস্তবিক ভ্রান্ত নহে। কারণ মানুষ সত্য হইতে সত্যে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে। অন্ধকার বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্প আলো; মন্দ বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্প ভাল; অপবিত্রতা বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্প পবিত্রতা। অতএব সত্য-ধারণার ইহাও একটি দিক যে, অন্যকে প্রেম ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে। আমরা যে-পথ দিয়া আসিয়াছি, তাহারাও সেই পথ দিয়া চলিতেছে। যদি তুমি বাস্তবিক মুক্ত হও, তবে তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে—তাহারাও শীঘ্র বা বিলম্বে মুক্ত হইবে। আর যখন তুমি মুক্তই হইলে, তখন তুমি অনিত্য দেখ কি করিয়া? যদি তুমি বাস্তবিক পবিত্র হও, তবে তুমি অপবিত্রতা দেখ কিভাবে? কারণ যাহা ভিতরে থাকে, তাহাই বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নিজেদের ভিতরে অপবিত্রতা না থাকিলে বাহিরে কখনই অপবিত্রতা দেখিতে পাইতাম না। বেদান্তে ইহা সাধনার একটি দিক। আশা করি, আমরা সকলে ইহা জীবনে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিব। ইহা অভ্যাস করিবার জন্য সারা জীবন পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু এই-সকল বিচার-আলোচনায় আমরা এই ফল লাভ করিলাম যে, অশান্তি ও অসন্তোষের পরিবর্তে আমরা শান্তি ও সন্তোষের সহিত কার্য করিব। কারণ আমরা জানিলাম, সবকিছুই আমাদের ভিতরে—আমাদেরই রহিয়াছে, আমাদের জন্মগত অধিকার। আমাদের কাজ শুধু এই সত্য প্রকাশ করা, প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা।

কর্মজীবনে বেদান্ত

—তৃতীয় প্রস্তাব

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৭ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

পূর্বোক্ত (ছান্দোগ্য) উপনিষদ্ হইতেই আমরা পাইতেছি যে, দেবর্ষি নারদ এক সময় সনৎকুমারের নিকট আগমন করিয়া অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে সোপানারোহণ-ন্যায়ে ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া অবশেষে আকাশতত্ত্বে উপনীত হইলেন। 'আকাশ তেজ হইতে মহত্তর, কারণ আকাশে চন্দ্র সূর্য বিদ্যুৎ তারা—সকলই রহিয়াছে। আকাশেই আমরা শ্রবণ করিতেছি, আকাশেই জীবনধারণ করিয়া আছি, আকাশেই আমরা মরিতেছি।'[১] এখন প্রশ্ন হইতেছে—আকাশ হইতে মহত্তর কিছু আছে কিনা? সনৎকুমার বলিলেন, প্রাণ আকাশ হইতেও বড়। বেদান্তমতে এই প্রাণই জীবনের মূলীভূত শক্তি। আকাশের ন্যায় ইহাও একটি সর্বব্যাপী তত্ত্ব, আর আমাদের শরীরে বা অন্যত্র যাহা কিছু গতি দেখা যায়, সবই প্রাণের কার্য। প্রাণ আকাশ হইতেও মহত্তর। প্রাণের দ্বারাই সকল বস্তু বাঁচিয়া রহিয়াছে, প্রাণই মাতা, প্রাণই পিতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য, প্রাণই জ্ঞাতা।

আমি তোমাদের নিকট ঐ উপনিষদ্ হইতেই আর এক অংশ পাঠ করিব। শ্বেতকেতু পিতা আরুণির নিকট সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পিতা তাঁহাকে নানা বিষয় শিখাইয়া অবশেষে বলিলেন, 'এই-সকল বস্তুর যে সূক্ষ্ম কারণ, তাহা হইতেই ইহারা নির্মিত, ইহাই সব, ইহাই সত্য; হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' তারপর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য নানা উদাহরণ দিতে লাগিলেন। 'হে শ্বেতকেতো, যেমন মধুমক্ষিকা বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া একত্র করে এবং এই বিভিন্ন মধু যেমন জানে না, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াও ভুলিয়া গিয়াছি। হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' 'যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু এই নদীসকল যেমন

---

১ ছান্দোগ্য উপ, ৭।১২।১

জানে না, ইহারা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা জানি না যে আমরা তাহাই। হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।'[১] পিতা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এখন কথা এই, সকল জ্ঞানলাভের দুইটি মূলসূত্র আছে। একটি সূত্র এই—বিশেষকে সাধারণে এবং সাধারণকে আবার সার্বভৌম তত্ত্বে সমাধান করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। দ্বিতীয় সূত্র এই: যে-কোন বস্তু ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব সেই বস্তুর স্বরূপ হইতেই তাহার ব্যাখ্যা অন্বেষণ করিতে হইবে। প্রথম সূত্রটি ধরিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের সমুদয় জ্ঞান বাস্তবিক উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীবিভাগ মাত্র। একটা কিছু যখন ঘটে, তখন আমরা যেন অতৃপ্ত হই। যখন ইহা দেখানো যায় যে, সেই একই ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে, তখন আমরা তৃপ্ত হই এবং উহাকে 'নিয়ম' আখ্যা দিয়া থাকি। যখন একটি প্রস্তর অথবা আপেল পড়িতে দেখি, তখন আমরা অতৃপ্ত হই; কিন্তু যখন দেখি, সকল প্রস্তর বা আপেলই পড়িতেছে, তখন আমরা উহাকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি এবং তৃপ্ত হই। ব্যাপার এই, আমরা বিশেষ হইতে সাধারণ তত্ত্বে গমন করিয়া থাকি। যদি ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে চাই, সেখানেও ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে এবং উহাকে বৈজ্ঞানিকভাবে করিতে গেলে আমাদিগকে এই মূলসূত্রের অনুসরণ করিতে হইবে। বাস্তবিক আমরা দেখিতে পাই, এই প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। এই উপনিষদ্, যাহা হইতে তোমাদিগকে শুনাইতেছি, তাহাতেও দেখিতে পাই, সর্বপ্রথমে এই ভাবের উদয় হইয়াছে—বিশেষ হইতে সাধারণে গমন। আমরা দেখিতে পাই—কিভাবে দেবতাগণ ক্রমশঃ পরস্পর অন্তর্ভুক্ত হইয়া এক তত্ত্বরূপে পরিণত হইতেছেন; জগতের ধারণায়ও তাঁহারা ক্রমশঃ কেমন অগ্রসর হইতেছেন, কেমন সূক্ষ্ম ভূত হইতে তাঁহারা সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর ভূতে যাইতেছেন, কেমন তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ভূত হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক সর্বব্যাপী আকাশতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, কিভাবে সেখান হইতেও

১ ছান্দোগ্য উপ., ৬।৯-১০

অগ্রসর হইয়া তাঁহারা প্রাণ-নামক সর্বব্যাপিনী শক্তিতে উপনীত হইতেছেন, আর এই-সকলের ভিতরে আমরা এই এক তত্ত্বই পাইতেছি যে, একটি বস্তু অন্য সকল বস্তু হইতে পৃথক্ নহে। আকাশই সূক্ষ্মতররূপে প্রাণ এবং প্রাণ আবার স্থূল হইয়া আকাশ হয়, আকাশ আবার স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে, ইত্যাদি।

সগুণ ঈশ্বর এই মূলসূত্রের আর একটি উদাহরণ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সগুণ ঈশ্বরের ধারণাও এইরূপ সামান্যীকরণের ফল। ইহা হইতে পাওয়া গিয়াছে এইটুকু যে, সগুণ ঈশ্বর সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টিস্বরূপ। কিন্তু ইহাতে একটি শঙ্কা উঠিতেছে, ইহা তো পর্যাপ্ত সামান্যীকরণ হইল না! আমরা প্রাকৃতিক ঘটনার একটা দিক অর্থাৎ জ্ঞানের দিক লইলাম, তাহা হইতে সামান্যীকরণ-প্রণালীতে সগুণ ঈশ্বরে উপনীত হইলাম, কিন্তু বাকি প্রকৃতির অন্যদিক বাদ গেল। সুতরাং প্রথমতঃ এই সামান্যীকরণ অসম্পূর্ণ। ইহাতে আর একটি ত্রুটি আছে, তাহা দ্বিতীয় সূত্রের অন্তর্গত। প্রত্যেক বস্তুকে তাহার নিজের ভাব হইতেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অনেক লোক হয়তো এক সময়ে ভাবিত, মাটিতে যাহা কিছু পড়ে, তাহা ভূতেই ফেলিতেছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণই বাস্তবিক ইহার ব্যাখ্যা; আর যদিও আমরা জানি, ইহা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে, তথাপি ইহা অপর ব্যাখ্যা হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয়; কারণ একটি ব্যাখ্যা বস্তুর বহিঃস্থ কারণ হইতে, অন্যটি বস্তুর স্বভাব হইতে লব্ধ। এইরূপ আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সম্বন্ধেই। যে-কোন ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি হইতে লব্ধ, তাহা বৈজ্ঞানিক; আর যে-কোন ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দেশ হইতে লব্ধ, তাহা অবৈজ্ঞানিক।

এখন 'সগুণ ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা'—এই তত্ত্বটিকেও এই সূত্রটি দ্বারা পরীক্ষা করা যাক। যদি এই ঈশ্বর প্রকৃতিব বহির্দেশে থাকেন, যদি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ না থাকে এবং যদি এই প্রকৃতি শূন্য হইতে—সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বভাবতই ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক মত হইয়া দাঁড়াইল। আর চিরকাল সগুণ ঈশ্বরবাদের ইহাই একটি দুর্বলতা। এই মতে ঈশ্বর মানবগুণসম্পন্ন, কেবল মানবীয় গুণগুলি অনেক পরিমাণে বর্ধিত। ঈশ্বর শূন্য হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—একেশ্বরবাদে এই দুইটি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমতঃ সগুণ ঈশ্বরবাদ পর্যাপ্ত সামান্যীকরণ নয়। দ্বিতীয়তঃ ইহা প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ব্যাখ্যা নয়। এই মতবাদে কারণ হইতে কার্য সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু মানুষ যতই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই তাহার এই ধারণা বাড়িতেছে যে, কার্য কারণের রূপান্তরমাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়া এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে, আর আধুনিক সর্ববাদিসম্মত ক্রমবিকাশবাদের তাৎপর্যই এই যে, কার্য কারণের রূপান্তরমাত্র। এই কারণও আবার এক পুরাতন কারণের কার্য। শূন্য হইতে সৃষ্টি—আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের নিকট উপহাসের বিষয়।

ধর্ম কি পূর্বোক্ত দুইটি পরীক্ষার পর টিকিয়া থাকিতে পারে? যদি এমন কোন ধর্মমত থাকে, যাহা এই দুইটি পরীক্ষায় টিকিয়া যায়, তাহাই আধুনিক চিন্তাশীল মনের গ্রাহ্য হইবে। যদি আজকালকার মানুষকে পুরোহিত, গির্জা অথবা কোন শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া কোন মত বিশ্বাস করিতে বলা যায়, তবে সে উহা বিশ্বাস করিতে পারিবে না; তাহার ফল দাঁড়াইবে—ঘোর অবিশ্বাস। যাহারা বাহিরে দেখিতে খুব বিশ্বাসী, তাহারা বাস্তবিক ভিতরে প্রচণ্ড অবিশ্বাসী। অবশিষ্ট লোকে ধর্ম একেবারে ছাড়িয়া দেয়, উহা হইতে দূরে পলাইয়া যায়, যেন ধর্মের সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে চায় না, ধর্মকে তাহারা পুরোহিতদের জুয়াচুরি মনে করে।

ধর্ম এখন একপ্রকার জাতীয় ভাবে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম আমাদের প্রাচীন সমাজের একটি মহান্ উত্তরাধিকার, অতএব ইহাকে থাকিতে দাও—ইহাই আমাদের ভাব। কিন্তু আধুনিক লোকের পূর্বপুরুষ ধর্মের জন্য যে প্রকৃত আগ্রহ বোধ করিতেন, এখন তাহা নাই; লোকে ধর্মকে এখন আর যুক্তিসঙ্গত মনে করে না। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর ও সৃষ্টির ধারণা, যাহাকে সচরাচর সকল ধর্মেই 'একেশ্বরবাদ' বলে, তাহাতে এখন লোকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না, আর ভারতে বৌদ্ধদের প্রভাবে একেশ্বরবাদ প্রবল হইতে পারে নাই; এব' এই বিষয়েই বৌদ্ধেরা প্রাচীনকালে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখাইয়া দিলেন যে, যদি প্রকৃতিকে অনন্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মানা যায়, যদি প্রকৃতি নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতে পারে, তবে প্রকৃতির অতীত কিছু আছে, ইহা স্বীকার করা অনাবশ্যক। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে প্রাচীনকাল হইতে একটি তর্ক-বিতর্ক চলিয়া

আসিতেছে। এখনও সেই প্রাচীন কুসংস্কার বর্তমান রহিয়াছে—দ্রব্য ও গুণের বিচার।

ইওরোপে মধ্যযুগে, এমন কি দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, তাহার অনেকদিন পরেও একটি বিশেষ বিচারের বিষয় ছিল: গুণগুলি কি দ্রব্যের ভিতরে আছে, না গুণ ব্যতীত দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ কি জড়পদার্থ-নামক দ্রব্যবিশেষে লাগিয়া আছে? আর এই গুণগুলি না থাকিলেও দ্রব্যটির অস্তিত্ব থাকে কি না? বৌদ্ধ দার্শনিক বলিতেছেন, এরূপ একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, এই গুণগুলিরই কেবল অস্তিত্ব আছে। ইহার অতিরিক্ত তুমি আর কিছুই দেখিতে পাও না। ইহাই অধিকাংশ আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীদের মত, এই দ্রব্যগুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে লইয়া গেলে দেখা যায়, ইহা ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার বিচারে পরিণত হইয়াছে। এই দৃশ্য জগৎ—নিত্যপরিণামশীল জগৎ রহিয়াছে, এবং ইহার পিছনে এমন কিছু রহিয়াছে, যাহার কখন পরিণাম হয় না; কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিবিধ পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আবার অধিকতর যুক্তির সহিত অপরে বলেন, এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন আবশ্যকতা নাই, আমরা যাহা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, তাহা 'দৃশ্য' মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার কোন অধিকার আমাদের নাই। এই কথার কোন সঙ্গত উত্তর প্রাচীনকালে কেহ দিতে পারেন নাই। কেবল বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে আমরা ইহার উত্তর পাইয়া থাকি—কেবল একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাই কখন দ্রষ্টারূপে কখন বা দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সত্য নহে যে, পরিণামশীল বস্তুর সত্তা আছে, আর তাহারই অভ্যন্তরে—অপরিণামী বস্তুও রহিয়াছে; সেই এক অপরিণামী বস্তুই পরিণামশীল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

বুঝিবার উপযুক্ত একটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আমরা দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতি নানা ভেদ করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি সত্তাই বিরাজিত। সেই এক বস্তুই নানারূপে প্রতিভাত হইতেছে। অদ্বৈতবাদীদের চিরপরিচিত উপমা অনুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, রজ্জুই সর্পাকারে প্রতিভাত হইতেছে। অন্ধকারবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে অনেকে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে সর্পভ্রম

ঘুচিয়া যায়, তখন রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই বোধ হয়। এই উদাহরণের দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতেছি—মনে যখন সর্পজ্ঞান থাকে, তখন রজ্জুজ্ঞান থাকে না, আবার যখন রজ্জুজ্ঞানের উদয় হয়, তখন সর্পজ্ঞান চলিয়া যায়। যখন আমরা ব্যাবহারিক সত্তা দেখি, তখন পারমার্থিক সত্তা থাকে না; আবার যখন আমরা সেই অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা দেখি, তখন অবশ্যই ব্যাবহারিক সত্তা আর প্রতিভাত হয় না।

এখন আমরা প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদী (Realist and Idealist) উভয়েরই মত বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছি। প্রত্যক্ষবাদী কেবল ব্যাবহারিক সত্তা দেখেন, আর বিজ্ঞানবাদী পারমার্থিক সত্তার দিক দেখিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃত বিজ্ঞানবাদী, যিনি অপরিণামী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পরিণামশীল জগৎ আর থাকে না; তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, জগৎ সমস্তই মিথ্যা, পরিণাম বলিয়া কিছুই নাই। প্রত্যক্ষবাদী কিন্তু পরিণামের দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে অপরিণামী সত্তা বলিয়া কিছু নাই, সুতরাং তাঁহার বলিবার অধিকার আছে—এ-সবই সত্য।

এই বিচারের ফল কি হইল? ফল হইল এই যে, ঈশ্বরের সগুণ ধারণা যথেষ্ট নহে। আমাদিগকে আরও উচ্চতর ধারণা অর্থাৎ নির্গুণের ধারণা করিতে হইবে। উহা দ্বারা যে সগুণ ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নহে। সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই—প্রমাণ করিতেছি না, কিন্তু দেখাইতেছি, যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। মানুষকেও আমরা এইরূপে সগুণ-নির্গুণ উভয়াত্মক বলিয়া থাকি। আমরা সগুণও বটে, আবার নির্গুণও বটে। অতএব আমাদের প্রাচীন ঈশ্বরধারণা, অর্থাৎ ঈশ্বরের সগুণ ধারণা, তাঁহাকে কেবল একটি ব্যক্তি বলিয়া ধারণা—অবশ্যই চলিয়া যাওয়া চাই, কারণ মানুষকে যেভাবে সগুণ নির্গুণ উভয়ই বলা যায়, আর একটু উচ্চতর ভাবে ঈশ্বরকেও সেইভাবে সগুণ নির্গুণ দুইই বলা যায়। অতএব সগুণের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অবশ্যই আমাদিগকে অবশেষে নির্গুণ ধারণায় যাইতে হইবে, কারণ নির্গুণ ধারণা সগুণ ধারণা হইতে আরও ব্যাপক। কেবল নির্গুণই অনন্ত হইতে পারে, সগুণ সান্ত মাত্র। অতএব এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা সগুণকে রক্ষাই করিলাম, উড়াইয়া দিলাম না। অনেক সময়ে এই সংশয় আসে—নির্গুণ

ঈশ্বরের ধারণায় সগুণ ধারণা নষ্ট হইয়া যাইবে, নির্গুণ জীবাত্মার ধারণায় সগুণ জীবাত্মার ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে; বাস্তবিক কিন্তু বেদান্তমতে 'আমিত্বের' নাশ হয় না, উহাকে প্রকৃতভাবে রক্ষা করা হইয়া থাকে। আমরা সেই অনন্ত সত্তার সমাধান না করিয়া ব্যক্তির অস্তিত্ব কোনরূপে প্রমাণ করিতে পারি না। যদি আমরা ব্যক্তিকে সমুদয় জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করি, তবে কখনই তাহাতে সমর্থ হইব না, ক্ষণকালের জন্যও ঐরূপ ভাবা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বোক্ত দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোকে আমরা আরও কঠিন ও দুর্বোধ্য তত্ত্বে উপনীত হই। সামান্যীকরণ-প্রক্রিয়ায় আমরা যে সর্বোচ্চ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি, যদি সকল বস্তুকে তদনুযায়ী তাহার স্বরূপ হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে, সেই নির্গুণ পুরুষ আমাদের ভিতরেই রহিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে আমরা তিনিই। 'হে শ্বেতকেতো, তত্ত্বমসি'[১]—তুমি তিনিই, তুমিই সেই নির্গুণ সত্তা; তুমিই সেই ব্রহ্ম, যাঁহাকে সমুদয় জগতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, সর্বদাই তুমি সেই! কিন্তু 'ব্যক্তি'-অর্থে 'তুমি' নহে, নির্গুণ-অর্থে। আমরা এই যে মানুষকে জানিতেছি, যাঁহাকে ব্যক্ত দেখিতেছি, তিনি সগুণ ব্যক্তি হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সত্তা নির্গুণ অব্যক্ত। এই সগুণকে জানিতে হইলে আমাদিগকে নির্গুণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে, বিশেষকে জানিতে হইলে সাধারণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। সেই নির্গুণ সত্তাই বাস্তবিক সত্য, তিনিই মানুষের আত্মা—এই সগুণ ব্যক্ত পুরুষকে সেই সত্য বলা হয় নাই।

এ-সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠিবে। আমি ক্রমশঃ সেইগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। অনেক কূট প্রশ্ন উঠিবে, কিন্তু ঐগুলির মীমাংসার পূর্বে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি—অদ্বৈতবাদ কি বলেন। এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি, ইহারই একমাত্র অস্তিত্ব আছে, সত্যের অন্বেষণ অন্যত্র করিতে হইবে না। স্থূলসূক্ষ্ম—সবই এখানে; কার্যকারণ—সবই এখানে, জগতের ব্যাখ্যা এখানেই রহিয়াছে। যাহা বিশেষ বলিয়া পরিচিত, তাহা সেই সর্বানুস্যূত সত্তারই সূক্ষ্মভাবে পুনরাবৃত্তিমাত্র। আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই

১ ছান্দোগ্য উপ., ৬।৮।৭

জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া থাকি। এই অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, বহির্জগৎ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। স্বর্গ নরক বলিয়া বাস্তবিক যদি কোন স্থান থাকে, সেগুলিও এই জগতের অন্তর্গত, সমুদয় মিলিয়া এই এক ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। অতএব প্রথম কথা এই, নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টিস্বরূপ এই 'এক' অখণ্ড বস্তু রহিয়াছে, আর আমাদের প্রত্যেকেই যেন সেই একের অংশস্বরূপ। ব্যক্ত-জীবভাবে আমরা যেন পৃথক্ হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু সেই একই সত্যস্বরূপ; আর যতই আমরা নিজদিগকে উহা হইতে কম পৃথক্ মনে করিব, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। যতই আমরা ঐ সমষ্টি হইতে নিজেদের পৃথক্ মনে করিব, ততই আমাদের দুঃখ বাড়িবে। এই অদ্বৈততত্ত্ব হইতেই আমরা নীতির ভিত্তি প্রাপ্ত হইলাম; আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি, আর কোন মত হইতে আমরা কোনরূপ নীতিতত্ত্ব পাই না। আমরা জানি, নীতির প্রাচীনতম ধারণা ছিল—কোন পুরুষবিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষের ইচ্ছা। এখন আর কেহ উহা মানিতে প্রস্তুত নয়; কারণ উহা আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। হিন্দুরা বলেন—এই কার্য করা উচিত নয়, কারণ বেদ উহা নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু খ্রীষ্টান বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। খ্রীষ্টান আবার বলেন—এ-কাজ করিও না, ও-কাজ করিও না, কারণ বাইবেলে ঐ-সকল কার্য নিষিদ্ধ। যাহারা বাইবেল মানে না, তাহারা অবশ্য এ-কথা শুনিবে না। আমাদিগকে এমন এক তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে, যাহা এই নানাবিধ ভাবের সমন্বয় করিতে পারে। যেমন লক্ষ লক্ষ লোক সগুণ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, সেইরূপ এই জগতে সহস্র সহস্র মনীষী আছেন, যাঁহাদের পক্ষে ঐ ধারণা পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু চাহিয়াছেন; আর যখনই ধর্মসম্প্রদায়গুলি এই মনীষীগণকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করিবার মতো উদারভাবাপন্ন হয় নাই, তখনই সমাজের উজ্জ্বলতম রত্নগুলি সংগঠিত ধর্মবিশ্বাস (organised faith) ত্যাগ করিয়াছেন, আর বর্তমান কালে বিশেষতঃ ইওরোপে ইহা যত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আর কখনও কোথাও এরূপ হয় নাই।

মনীষীদিগকে ধর্মের ভিতর রাখিতে হইলে ধর্মকে অবশ্য খুব উদার হইতে হইবে। ধর্ম যাহা কিছু বলে, সবই যুক্তির কষ্টিতে ফেলিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। কেহই বলিতে পারে না, সকল ধর্মই কেন এই এক দাবি করিয়া

থাকে যে, তাহারা যুক্তির দ্বারা পরীক্ষিত হইতে চায় না। বাস্তবিক ইহার কারণ, গোড়াতেই গলদ আছে। যুক্তির মানদণ্ড ব্যতীত ধর্মবিষয়েও কোনরূপ বিচার বা সিদ্ধান্ত সম্ভব নহে। কোন ধর্ম হয়তো কিছু বীভৎস ব্যাপার করিতে আজ্ঞা দিল।...মনে কর, মুসলমানধর্মের কোন আদেশের প্রতি একজন খ্রীষ্টান দোষারোপ করিল। তাহাতে মুসলমান স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিবে—কি করিয়া তুমি জানিলে আদেশটি ভাল কি মন্দ? তোমার ভালমন্দের ধারণা তো তোমার শাস্ত্র হইতে! আমার শাস্ত্র বলিতেছে, 'ইহা সৎকার্য।' যদি তুমি বলো, তোমার শাস্ত্র প্রাচীন, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা বলিবেন—আমাদের শাস্ত্র আরও প্রাচীন। আবার হিন্দু বলিবেন—আমার শাস্ত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অতএব শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না। তোমার আদর্শ কোথায়, যাহা লইয়া তুমি সমুদয় তুলনা করিতে পারো? খ্রীষ্টান বলিবেন, ঈশার 'শৈলোপদেশ' দেখ; মুসলমান বলিবেন, 'কোরানের নীতি' দেখ। মুসলমান বলিবেন—এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তাহা কে বিচার করিবে, মধ্যস্থ কে হইবে? বাইবেল ও কোরানে যখন বিবাদ, তখন উভয়ের মধ্যে কেহই মধ্যস্থ হইতে পারে না। কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি মীমাংসক হইলেই ভাল হয়। কোন গ্রন্থ মীমাংসক হইতে পারে না, সার্বভৌম কোন-কিছু দ্বারাই মীমাংসা হওয়া চাই। যুক্তি অপেক্ষা সার্বভৌম আর কি আছে? কেহ কেহ বলেন, যুক্তি সকল সময়ে সত্যানুসন্ধানে সমর্থ নহে। অনেক সময় যুক্তি ভুল করে বলিয়া এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কোন পুরোহিত-সম্প্রদায়ের শাসনে বিশ্বাস করিতে হইবে। আমি কিন্তু বলি, যুক্তি যদি দুর্বল হয়, তবে পুরোহিত-সম্প্রদায় আরও দুর্বল, আমি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া যুক্তিই শুনিব, কারণ যুক্তিতে যতই দোষ থাকুক, উহাতে কিছু সত্য পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অন্য উপায়ে সত্যলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।

অতএব আমাদিগকে যুক্তির অনুসরণ করিতে হইবে, আর যাহারা যুক্তির অনুসরণ না করিয়া কোন বিশ্বাসে উপনীত হয়, তাহাদের প্রতিও আমাদিগকে সহানুভূতি দেখাইতে হইবে। কারণ কাহারও মতে মত দিয়া বিশ লক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওয়াও ভাল! আমরা চাই উন্নতি, বিকাশ, প্রত্যক্ষানুভূতি। কোন মত অবলম্বন করিয়াই

মানুষ বড় হয় নাই। কোটি কোটি শাস্ত্রও আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহায্য করে না। ঐরূপ হইবার একমাত্র শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে। প্রত্যক্ষানুভূতিই আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহায্য করে, আর ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি মননের ফল। মানুষ চিন্তা করুক। মৃত্তিকাখণ্ড কখন চিন্তা করে না; ইহা মানিয়া লওয়া যাক যে, উহা সবই বিশ্বাস করে, তথাপি উহা মৃত্তিকাই থাকিয়া যায়। একটি গাভীকে যাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করানো যাইতে পারে। কুকুর সর্বাপেক্ষা চিন্তাহীন জন্তু। ইহারা কিন্তু যে কুকুর, যে গাভী, যে মৃত্তিকা তাহাই থাকে, কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব এই যে, সে মননশীল জীব; পশুদিগের সহিত আমাদের ইহাই প্রভেদ। মানুষের এই মনন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, অতএব আমাদিগকে অবশ্য মনের চালনা করিতে হইবে। এই জন্যই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস কবি এবং যুক্তির অনুসবণ করি, শুধু লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কি অনিষ্ট হয়, তাহা বিশেষরূপে দেখিয়াছি; কারণ আমি যে দেশে জন্মিয়াছি, সেখানে এই অপরের বাক্যে বিশ্বাস করার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বেদ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। একটা গো আছে, কিরূপে জানিলে? কারণ 'গো' শব্দ বেদে রহিয়াছে। মানুষ আছে কি করিয়া জানিলে? কারণ বেদে 'মনুষ্য' শব্দ রহিয়াছে। হিন্দুরা ইহাই বলেন। এ যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত!—আমি যেভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি, সেভাবে ইহার আলোচনা হয় না। কতকগুলি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি ইহা লইয়া কতকগুলি অপূর্ব দার্শনিক তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন, এবং সহস্র সহস্র বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র সহস্র বৎসর এই তত্ত্ব কার্যে রূপায়িত করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। লোকের কথায় বিশ্বাসের শক্তি অনেক, উহাতে বিপদও অনেক! এরূপ বিশ্বাস মনুষ্যজাতির উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ করে, আর আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, উন্নতিই আমাদের আবশ্যক। প্রকৃত সত্য অপেক্ষা আপেক্ষিক সত্যেব অনুসন্ধানেও আমাদের মনের চালনা আবশ্যক হইয়া থাকে। মননই আমাদের জীবন।

অদ্বৈতবাদের এইটুকু গুণ যে, ধর্মমতের ভিতর এই মতটিই অনেকটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়। নির্গুণ ঈশ্বর, প্রকৃতিতে তাঁহার অবস্থিতি আর প্রকৃতি যে নির্গুণ পুরুষের পরিণাম, এই সত্যগুলি অনেকটা প্রমাণের যোগ্য,

আর অন্য সমুদয় ভাব—যথা ঈশ্বরের আংশিক ক্ষুদ্র ব্যক্তিভাবাপন্ন সগুণ ধারণাগুলি—বিচারসহ নহে। যুক্তিসঙ্গত এই ঈশ্বরবাদের আর একটি গুণ এই যে, ইহা প্রমাণ করে ঐ আংশিক ধারণাগুলি এখনও অনেকের পক্ষে আবশ্যক। এই মতগুলির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ইহাই একমাত্র যুক্তি। দেখিবে, অনেক লোকে বলিয়া থাকে, এই সগুণবাদ অযৌক্তিক, তথাপি ইহা বড় শান্তিপ্রদ। তাহারা সখের ধর্ম চাহিয়া থাকে; আর আমরা বুঝিতে পারি, তাহাদের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। অতি অল্প লোকই সত্যের বিমল আলোক সহ্য করিতে পারে, তদনুসারে জীবনযাপন করা তো দূরের কথা। অতএব এই সখের ধর্মও থাকা দরকার; ইহা অনেককে উচ্চতর ধর্মলাভে সাহায্য করে। যে ক্ষুদ্র মনের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য বস্তুই যে মনের উপাদান, সে মন কখন উচ্চ চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে সাহস করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা, প্রতিমা ও আদর্শ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা উত্তম ও উপকারী, কিন্তু তোমাদিগকে নির্গুণবাদও বুঝিতে হইবে, আর এই নির্গুণবাদের আলোকেই এইগুলির উপকারিতা ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ জন স্টুয়ার্ট মিলের কথা ধর। তিনি ঈশ্বরের নির্গুণভাব বুঝেন ও বিশ্বাস করেন—তিনি বলেন, সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আমি এ-বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত; তবে আমি বলি, মনুষ্যবুদ্ধিতে নির্গুণের যতদূর ধারণা করা যাইতে পারে, তাহাই সগুণ ঈশ্বর। আর বাস্তবিকই জগৎটা কি? বিভিন্ন মন সেই নির্গুণেরই যতদূর ধারণা করিতে পারে, তাহাই; উহা যেন আমাদের সম্মুখে প্রসারিত এক একখানি পুস্তক-স্বরূপ, আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা উহা পাঠ করিতেছে, আর প্রত্যেককেই উহা নিজে নিজে পাঠ করিতে হয়। সকল মানুষেরই বুদ্ধি কতকটা একরূপ, সেইজন্য মনুষ্যবুদ্ধিতে কতকগুলি জিনিস একরূপ মনে হয়। তুমি আমি উভয়েই একখানা চেয়ার দেখিতেছি। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, আমাদের উভয়ের মনই কতকটা একভাবে গঠিত। মনে কর, অপর কোন ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব আসিল; সে আর আমাদের অনুভূত চেয়ার দেখিবে না, কিন্তু যাহারা এক প্রকৃতির, তাহারা সব একরূপ দেখিবে। অতএব এই জগৎ সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা; আর ব্যাবহারিক সত্তা তাহাকেই বিভিন্নভাবে দর্শনমাত্র। ইহার কারণ প্রথমতঃ ব্যাবহারিক সত্তা সর্বদাই

স-সীম। আমরা যে-কোন ব্যাবহারিক সত্তা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, দেখিতে পাই—উহা অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, অতএব সসীম হইয়া থাকে ; আর সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, তাহাতে তিনিও ব্যাবহারিক মাত্র। কার্যকারণ-ভাব কেবল ব্যাবহারিক জগতেই সম্ভব, আর তাঁহাকে যখন জগতের কারণ বলিয়া ভাবিতেছি, তখন অবশ্যই তাঁহাকে স-সীমরূপে ধারণা করিতে হইবে। তাহা হইলেও কিন্তু তিনি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এই জগৎই আমাদের বুদ্ধির মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্মমাত্র। প্রকৃতপক্ষে জগৎ সেই নির্গুণ সত্তা মাত্র, আর আমাদের বুদ্ধির দ্বারা উহার উপর নাম-রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই টেবিলের মধ্যে যতটুকু সত্য তাহা সেই সত্তা, আর এই টেবিলের আকৃতি ও অন্যান্য যাহা কিছু—সবই সদৃশমানব-বুদ্ধি দ্বারা তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ গতির বিষয় ধর। ব্যাবহারিক সত্তার উহা নিত্যসহচর। উহা কিন্তু সেই সার্বভৌম পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণু, জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণু সর্বদাই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে জগৎ অপরিণামী, কারণ গতি বা পরিণাম আপেক্ষিক ভাবমাত্র, আমরা কেবল গতিহীন পদার্থের সহিত তুলনায় গতিশীল পদার্থের কথা ভাবিতে পারি। গতি বুঝিতে গেলেই দুইটি পদার্থের আবশ্যক। সমুদয় সমষ্টিজগৎ এক অখণ্ডসত্তাস্বরূপ, উহার গতি অসম্ভব। কাহার সহিত তুলনায় উহার গতি হইবে? উহার পরিণাম হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কাহার সহিত তুলনায় উহার পরিণাম হইবে? অতএব সেই সমষ্টি সত্তা নিরপেক্ষ, কিন্তু উহার অন্তর্গত প্রত্যেক অণুই নিরন্তর গতিশীল ; একই সময়ে উহা পরিণামী ও অপরিণামী, সগুণ নির্গুণ দুই-ই। ইহাই আমাদের জগৎ, গতি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা, 'তত্ত্বমসি'র অর্থও ইহাই। আমাদিগকে আমাদের স্বরূপ জানিতে হইবে।

সগুণ মানুষ তাহার উৎপত্তিস্থল ভুলিয়া যায়, যেমন সমুদ্রের জল সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এইরূপ আমরা সগুণ হইয়া, ব্যষ্টি হইয়া আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি, আর অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে এই বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান জগৎকে ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয়

না, উহা কি তাহাই বুঝিতে বলে। আমরা সেই অনন্ত পুরুষ, সেই আত্মা। আমরা জলস্বরূপ, আর এই জল সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, উহার সত্তা সমুদ্রের উপর নির্ভর করিতেছে, আর বাস্তবিকই উহা সমুদ্র—সমুদ্রের অংশ নহে, সমুদয় সমুদ্রস্বরূপ ; কারণ যে অনন্তশক্তিরাশি ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমান, তাহার সমুদয়ই তোমার ও আমার। তুমি আমি, এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন কতকগুলির প্রণালীর মতো—যাহাদের ভিতর দিয়া সেই অনন্ত সত্তা আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে ; আর এই যে পরিবর্তনসমষ্টিকে আমরা 'ক্রমবিকাশ' নাম দিই, তাহারা বাস্তবিক পক্ষে আত্মার নানারূপ শক্তিবিকাশ মাত্র। কিন্তু অনন্তের এ-পারে—সান্ত জগতে আত্মার সমুদয় শক্তির প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। আমরা এখানে যতই শক্তি, জ্ঞান বা আনন্দলাভ করি না কেন, উহারা কখনই এ-জগতে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অনন্ত সত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ আমাদের রহিয়াছে। ঐগুলি যে আমরা উপার্জন করিব, তাহা নহে ; ঐগুলি আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, প্রকাশ করিতে হইবে মাত্র।

অদ্বৈতবাদ হইতে এই এক মহৎ সত্য পাওয়া যাইতেছে, এবং ইহা বুঝা বড় কঠিন। আমি বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, সকলেই দুর্বলতা শিক্ষা দিতেছে ; জন্মাবধি শুনিয়া আসিতেছি, আমি দুর্বল। এখন আমার পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু যুক্তিবিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে আমার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে মাত্র, তাহা হইলেই সব হইয়া গেল। এই জগতে আমরা যে-সকল জ্ঞান লাভ করি, তাহারা কোথা হইতে আসে? উহারা আমাদের ভিতরই রহিয়াছে। কোন জ্ঞান কি বাহিরে আছে?—আমাকে এক বিন্দু দেখাও তো। জ্ঞান কখনও জড়ে ছিল না, উহা বরাবর মানুষের ভিতরেই ছিল। জ্ঞান কেহ কখনও সৃষ্টি করে নাই ; মানুষ উহা আবিষ্কার করে, ভিতর হইতে উহাকে বাহির করে, উহা ভিতরেই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহা ঐ সর্ষপ-বীজের অষ্টমাংশের তুল্য ক্ষুদ্র বীজে ছিল—ঐ মহাশক্তিরাশি উহার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, একটি জীবাণুকোষের ভিতর সকল শক্তি, প্রখর বুদ্ধি কুণ্ডলীকৃত হইয়া অবস্থান করে ; তবে অনন্ত শক্তি কেন না

তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমরা জানি, তাহা আছে। প্রহেলিকাবৎ বোধ হইলেও ইহা সত্য। আমরা সকলেই একটি জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আর আমাদের যাহা কিছু শক্তি রহিয়াছে, তাহা ঐ জীবাণুকোষেই কুণ্ডলীভূত হইয়া ছিল। তোমরা বলিতে পার না, উহা খাদ্য হইতে প্রাপ্ত; রাশীকৃত খাদ্য লইয়া খাদ্যের এক পর্বত প্রস্তুত কর, দেখ তাহা হইতে কি শক্তি বাহির হয়! আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল, অব্যক্তভাবে কিন্তু উহা ছিল নিশ্চয়ই; অতএব সিদ্ধান্ত এই —মানুষের আত্মাতেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মানুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে, কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র। ধীরে ধীরে ঐ অনন্তশক্তিমান্ দৈত্য যেন জাগরিত হইয়া নিজ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইতেছে, আর যতই সে এই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই তাহার বন্ধনের পর বন্ধন খসিয়া যাইতেছে, শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইতেছে, আর এমন একদিন অবশ্য আসিবে, যখন এই অনন্তজ্ঞান অনুভূত হইবে, তখন জ্ঞানবান্ ও শক্তিমান্ হইয়া এই মানুষ দাঁড়াইয়া উঠিবে। এস, আমরা সকলে সেই অবস্থা আনয়ন করিবার জন্য সাহায্য করি।

কর্মজীবনে বেদান্ত

—চতুর্থ প্রস্তাব

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৮ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

আমরা এ পর্যন্ত সমষ্টির আলোচনাই করিয়া আসিয়াছি। অদ্য প্রাতে আমি তোমাদের সমক্ষে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধ বিষয়ে বেদান্তের মত বলিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রাচীনতর দ্বৈতবাদাত্মক বৈদিক মত দেখিতে পাই, প্রত্যেক জীবের একটি নির্দিষ্ট স-সীম আত্মা আছে, প্রত্যেক জীবে অবস্থিত এই বিশেষ আত্মা সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতবাদ প্রচলিত। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদান্তিকদিগের মধ্যে প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল এই যে, প্রাচীন বৈদান্তিকেরা স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মাতে বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধেরা

এরূপ জীবাত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতেন। আমি সেদিন তোমাদিগকে বলিয়াছি, ইওরোপে দ্রব্য-গুণ সম্বন্ধে যে বিচার চলিয়াছিল, এ ঠিক তাহারই মতো। একদলের মতে গুণগুলির পশ্চাতে দ্রব্যরূপী কিছু আছে, যাহাতে গুণগুলি লাগিয়া থাকে, আর এক মতে দ্রব্য স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, গুণগুলি নিজেরাই থাকিতে পারে। অবশ্য আত্মা সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন মত 'আমি আমিই' 'আত্মার ঐক্য'-রূপ যুক্তির উপর স্থাপিত; —কল্যকার যে-আমি, আজও সেই আমি, আর অদ্যকার আমি আবার আগামী কল্যের আমি হইব, শরীরে যে-সকল পরিণাম হইয়াছে, সেগুলি সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে, আমি সর্বদাই একরূপ। যাঁহারা সীমাবদ্ধ অথচ স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মায় বিশ্বাস করিতেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

অপরদিকে, প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাত্মা স্বীকার করিবার প্রয়োজন অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইতেন যে, আমরা কেবল এই পরিণামগুলিই জানি এবং এই পরিণামগুলি ব্যতীত আর কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি অপরিবর্তনীয় ও অপরিণামী দ্রব্য স্বীকার করা বাহুল্য-মাত্র, আর বাস্তবিক যদি এরূপ অপরিণামী বস্তু কিছু থাকে, আমরা কখনই উহাকে বুঝিতে পারিব না, আর কোনরূপে কখনও উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। বর্তমানকালেও ইওরোপে ধর্মবাদী ও বিজ্ঞানবাদী এবং আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের[১] ভিতর সেইরূপ বিচার চলিতেছে। একদলের বিশ্বাস, অপরিণামী পদার্থ কিছু আছে—ইহাদের সর্বশেষ প্রতিনিধি হার্বার্ট স্পেন্সার। তিনি বলেন, আমরা যেন অপরিণামী কোন পদার্থের আভাস পাইয়া থাকি। অপর মতের প্রতিনিধি কোম্তের বর্তমান শিষ্যগণ ও আধুনিক অজ্ঞেয়বাদিগণ। কয়েক বৎসর পূর্বে মিঃ ফ্রেডেরিক হ্যারিসন ও মিঃ হার্বার্ট স্পেন্সারের মধ্যে যে তর্ক হইয়াছিল তোমাদের মধ্যে যাহারা উহা আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছিলে, তাহারা দেখিয়া থাকিবে ইহাতেও সেই পুরাতন সমস্যা বিদ্যমান; একদল পরিণামী বস্তুসমূহের পশ্চাতে কোন অপরিণামী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, অপর দল এরূপ অনুমান

১ Religionist, idealist, realist, agnostic

করিবার আবশ্যকতাই অস্বীকার করিতেছেন। একদল বলিতেছেন, আমরা অপরিণামী সত্তার ধারণা ব্যতীত পরিণাম ভাবিতেই পারি না; অপর দল যুক্তি দেখান: এরূপ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, আমরা কেবল পরিণামী পদার্থেরই ধারণা করিতে পারি; অপরিণামী সত্তাকে আমরা জানিতে, অনুভব করিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

ভারতে এই মহান্ প্রশ্নের সমাধান অতি প্রাচীন কালে পাওয়া যায় নাই, কারণ আমরা দেখিয়াছি গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত অথচ গুণভিন্ন পদার্থের সত্তা কখনই প্রমাণ করা যাইতে পারে না; শুধু তাহাই নহে, 'আত্মার ঐক্য'রূপ প্রমাণ—স্মৃতি হইতে আত্মার অস্তিত্বের যুক্তি—কালও যে আমি ছিলাম, আজও সেই আমি আছি; কারণ আমার উহা স্মরণ আছে, অতএব আমি বরাবর আছি—এই যুক্তিও কোন কাজের নহে। আর একটি যুক্তি, যাহা সচরাচর উপস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল কথার মারপ্যাঁচ। 'আমি যাই,' 'আমি খাই,' 'আমি স্বপ্ন দেখি,' 'আমি ঘুমাই,' 'আমি চলি'—এইরূপ কতকগুলি বাক্য লইয়া তাঁহারা বলেন—করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা, এ-সব বিভিন্ন পরিণাম বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে 'আমি'টি নিত্যভাবে রহিয়াছে, এইরূপে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, এই 'আমি' নিত্য ও নিজেই একটি ব্যক্তি আর ঐ পরিণামগুলি শরীরের ধর্ম। এই যুক্তি আপাততঃ খুব উপাদেয় ও সুস্পষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক উহা কেবল কথার মারপ্যাঁচের উপর স্থাপিত। এই 'আমি' এবং করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি কাগজে-কলমে পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু মনে কেহই ইহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে না।

যখন আমি আহার করি, খাইতেছি বলিয়া চিন্তা করি, তখন আহার-কার্যের সহিত আমার একাত্মভাব হইয়া যায়। যখন আমি দৌড়াইতে থাকি, তখন 'আমি' ও 'দৌড়ানো' দুইটি পৃথক্ ভাব থাকে না। অতএব এই যুক্তি বড় দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। যদি স্মৃতিদ্বারা অস্তিত্বের অভিন্নতা প্রমাণ করিতে হয়, তবে আমার যে-সকল অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছি, সেই-সকল অবস্থায় আমি ছিলাম না বলিতে হয়। আর আমরা জানি, অনেকে বিশেষ অবস্থায় সমুদয় অতীতের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। দেখা যায় অনেক উন্মাদরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি নিজেদের কাচনির্মিত অথবা কোন পশু বলিয়া ভাবে। যদি স্মৃতির উপর সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে সে অবশ্য কাচ

অথবা পশুবিশেষ হইয়া গিয়াছে, বলিতে হইবে; কিন্তু বাস্তবিক যখন তাহা হয় নাই, তখন আমরা এই স্মৃতিবিষয়ক অকিঞ্চিৎকর যুক্তির উপর অহংভাবের অভিন্নতা স্থাপন করিতে পারি না। তবে কি দাঁড়াইল? দাঁড়াইল এই যে, সীমাবদ্ধ অথচ সম্পূর্ণ ও নিত্য অহং-এর অভিন্নতা আমরা গুণসমূহ হইতে পৃথক্‌ভাবে স্থাপন করিতে পারি না। আমরা এমন কোন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি না, যাহার সহিত গুণগুলি লাগিয়া রহিয়াছে।

অপর পক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধদের এই মত দৃঢ়তর বলিয়া বোধ হয় যে, গুণসমূহের অতিরিক্ত কোন বস্তুর সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না এবং জানিতেও পারি না। তাঁহাদের মতে অনুভূতি ও ভাবরূপ কতকগুলি গুণের সমষ্টিই আত্মা। এই গুণরাশিই আত্মা, আর উহারা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই উভয় মতের সমন্বয় সাধিত হয়।

অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত এই: আমরা বস্তুকে গুণ হইতে পৃথক্‌রূপে চিন্তা করিতে পারি না, এ-কথা সত্য, এবং পরিণাম ও অপরিণাম—এ-দুইটিও একসঙ্গে ভাবিতে পারি না। এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব। কিন্তু যাহাকেই বস্তু বলা হইতেছে, তাহাই গুণস্বরূপ। দ্রব্য ও গুণ পৃথক্ নহে। অপরিণামী বস্তুই পরিণামরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই অপরিণামী সত্তা পরিণামী জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। পারমার্থিক সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু নয়, সেই পারমার্থিক সত্তাই ব্যাবহারিক সত্তা হইয়াছে। অপরিণামী আত্মা আছেন, আর আমরা যেগুলিকে অনুভূতি, ভাব প্রভৃতি বলিয়া থাকি, এমন কি এই শরীর পর্যন্ত সেই আত্মস্বরূপ, কিন্তু বাস্তবিক আমরা এক সময়ে দুই বস্তু অনুভব করি না, একটিই করিয়া থাকি।

যখন আমি নিজেকে শরীর বলিয়া চিন্তা করি, তখন আমি শরীরমাত্র; 'আমি ইহার অতিরিক্ত কিছু' বলা বৃথা। আর যখন আমি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তখন দেহ কোথায় উড়িয়া যায়, দেহানুভূতি আর থাকে না। দেহজ্ঞান দূর না হইলে কখন আত্মানুভূতি হয় না। গুণের অনুভূতি চলিয়া না গেলে কেহই বস্তু অনুভব করিতে পারে না।

এইটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদীদের প্রাচীন রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। যখন লোকে দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল করে,

তখন তাহার পক্ষে দড়ি উড়িয়া যায়; আর যখন সে উহাকে যথার্থ দড়ি বলিয়া বোধ করে, তখন তাহার সর্পজ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়, তখন কেবল দড়িটিই অবশিষ্ট থাকে। বিশ্লেষণপ্রণালী অনুসরণ করাতেই আমাদের এই দ্বিত্ব বা বা ত্রিত্বের অনুভূতি হইয়া থাকে। বিশ্লেষণের পর এগুলি পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। আমরা ঐ-সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া অথবা উহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছি যে, সত্যই বুঝি আমাদের আত্মা ও দেহ দুয়েরই একত্র অনুভব হইয়া থাকে; বাস্তবিক কিন্তু তাহা কখনও হয় না। হয় দেহ, নয় আত্মার অনুভব হইয়া থাকে। উহা প্রমাণ করিতে কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজের মনে মনেই ইহা পরীক্ষা করিতে পারা যায়।

তুমি নিজেকে দেহশূন্য আত্মা বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর, দেখিবে—ইহা প্রায় অসম্ভব, আর যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্ভব, তাঁহারা যখন নিজদিগকে আত্মা-রূপে অনুভব করেন, তখন তাঁহাদের দেহবোধ থাকে না। তোমরা হয়তো দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, অনেক ব্যক্তি সম্মোহন (hypnotism)-প্রভাবে অথবা মৃগীরোগ বা অন্য কোন কারণে সময়ে সময়ে একপ্রকার বিশেষ অবস্থা লাভ করে। তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারা যায়, তখন তাহারা ভিতরে কিছু অনুভব করিতেছিল, এবং তাহাদের বাহ্যজ্ঞান একেবারেই ছিল না। ইহা হইতেই বোধ হইতেছে—অস্তিত্ব একটি, দুইটি নয়। সেই 'এক' নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, আর এ-সকলের মধ্যে কার্যকারণ-সম্বন্ধ আছে। কার্যকারণ-সম্বন্ধের অর্থ পরিণাম, একটি অপরটিতে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে যেন কারণের অন্তর্ধান হয়, সেই স্থানে কার্য অবশিষ্ট থাকে। যদি আত্মা দেহের কারণ হন, তবে যেন কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার অন্তর্ধান হয়, সেই স্থানে দেহ অবশিষ্ট থাকে, আর যখন শরীরের অন্তর্ধান হয় তখন আত্মা অবশিষ্ট থাকেন। এই মতে বৌদ্ধদের মত খণ্ডিত হইবে। আত্মা ও শরীর—এই দুইটি পৃথক্, এই অনুমানের বিরুদ্ধে বৌদ্ধেরা তর্ক করিতেছিলেন। অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই দ্বৈতভাব অস্বীকৃত হওয়ায় এবং দ্রব্য ও গুণ একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ প্রদর্শিত হওয়ায় তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইল।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, অপরিণামিত্ব কেবল সমষ্টি সম্বন্ধেই প্রমাণিত হইতে পারে, ব্যষ্টি-সম্বন্ধে নয়। পরিণাম—গতি, এই ভাবের সহিত ব্যষ্টির ধারণা জড়িত। যাহা কিছু সসীম, তাহাই পরিণামী; অপর কোন সসীম

পদার্থ বা অসীমের সহিত তুলনায় তাহার পরিণাম চিন্তা করা যাইতে পারে, কিন্তু সমষ্টি অপরিণামী ; সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই নাই, যাহার সহিত তুলনা করিয়া সমষ্টির পরিণাম বা গতি চিন্তা করা যাইবে ; পরিণাম কেবল অপর কোন অল্পপরিণামী বা একেবারে অপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় চিন্তা করা যাইতে পারে।

অতএব অদ্বৈতবাদ-মতে সর্বব্যাপী, অপরিণামী, অমর আত্মার অস্তিত্ব যথাসম্ভব প্রমাণ করা যাইতে পারে। ব্যষ্টি-সম্বন্ধেই গোলমাল। আমাদের প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক মতগুলির কি হইবে, যেগুলি আমাদের উপর এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? সসীম, ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত আত্মা সম্বন্ধে কি হইবে?—ইহাই প্রশ্ন।

আমরা দেখিয়াছি, সমষ্টিভাবে আমরা অমর, কিন্তু সমস্যা এই—আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি-হিসাবেও অমর হইতে ইচ্ছুক। তাহার কি হইবে? আমরা দেখিয়াছি, আমরা অনন্ত আর উহাই আমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আমরা এই-সকল ক্ষুদ্র আত্মাকেই ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া রাখিতে চাই। সেই-সকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের কি হইবে? প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের ব্যক্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব ক্রমবিকাশশীল ; এক বটে, অথচ ঠিক এক নহে, কল্যকার 'আমি' অদ্যকার 'আমি' বটে, আবার না-ও বটে। একটু পরিবর্তন হইয়াছে। পরিবর্তনের ভিতরে অপরিবর্তনীয় কিছু আছে—এই দ্বৈতবাদী মত পরিত্যক্ত হইল, আর খুব আধুনিক ভাব, যথা ক্রমবিকাশবাদ গ্রহণ করা হইল। সিদ্ধান্ত হইল, উহার পরিণাম হইতেছে বটে, কিন্তু উহারই ভিতরে একটি অভিন্ন-ভাব রহিয়াছে, যাহা সতত বিকাশশীল।

যদি ইহা সত্য হয় যে, মানুষ মাংসল জীববিশেষের (mollusc) পরিণাম-মাত্র, তবে সেই জীব ও মানুষ একই পদার্থ, কেবল মাংসল জীব বহুপরিমাণে বিকশিত হইয়াছে। সেই ক্ষুদ্র জীব ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে হইতে অনন্তের দিকে চলিয়াছে, এখন মানুষরূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব সীমাবদ্ধ জীবাত্মাকেও ব্যক্তি বলা যাইতে পারে ; তিনি ক্রমশঃ পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তখনই লাভ হইবে, যখন তিনি অনন্তে পৌঁছিবেন, কিন্তু সেই অবস্থালাভের পূর্বে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত পরিণাম, ক্রমাগত বিকাশ হইতেছে। . .

পূর্ববর্তী মতবাদগুলির সমন্বয়-সাধন করাই অদ্বৈতবেদান্তের অন্যতম বিশেষত্ব। অনেক সময় ইহাতে এই দর্শনের অনেক উপকার হইয়াছিল, আবার কোথাও কোথাও ক্ষতিও হইয়াছে। বর্তমান কালে ক্রমবিকাশ-বাদীদের যে মত, আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ তাহা জানিতেন, তাঁহারা বুঝিতেন, দর্শন-চিন্তাও ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে। এই কারণেই পূর্ব পূর্ব দর্শন-প্রণালীর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। কোন ভাবই পরিত্যক্ত হয় নাই। বৌদ্ধদের একটি বিশেষ দোষ এই যে, তাঁহারা ক্রমোন্নতি বুঝিতেন না, সুতরাং আদর্শে পৌছিবার পূর্ববর্তী সোপান-গুলির সহিত নিজেদের মতের সামঞ্জস্য করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। বরং পূর্বমতগুলিকে নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ধর্মজগতে এই প্রকার মনোভাব অত্যন্ত অনিষ্টকর। কোন ব্যক্তি একটি নূতন ও ভাল ভাব পাইল। তখন সে তাহার পুরাতন ভাবগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিদ্ধান্ত করে—ঐগুলি অনিষ্টকর ও অনাবশ্যক। সে কখন ভাবে না যে, তাহার বর্তমান দৃষ্টি হইতে সেগুলি যতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, তাহার পক্ষে এক সময়ে ঐগুলি অত্যাবশ্যক ছিল, তাহার বর্তমান অবস্থায় পৌছিতে ঐগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, আর আমাদের প্রত্যেককে ঐভাবেই আত্মবিকাশ করিতে হইবে, প্রথমে স্থূলভাব গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে উপকৃত হইয়া উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করিতে হইবে। এইজন্য প্রাচীনতম মতগুলির সহিত অদ্বৈতবাদের কোন বিরোধ নাই, এবং দ্বৈতবাদ ও যে-সব মত তাহার পূর্বে ছিল, সকলেরই উপর অদ্বৈতবাদীর প্রীতির ভাব—কোনরূপ অনুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতার ভাব নয়। অদ্বৈতবাদীর ধারণা সেগুলিও সত্য, একই সত্যের বিভিন্ন বিকাশ, আর অদ্বৈতবাদ যে-সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছে, অন্যান্য মতবাদও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে।

অতএব মানুষকে যে-সকল সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়, সেগুলিকে অভিশাপ না করিয়া আশীর্বাদসহ রক্ষা করিতে হইবে। এইজন্য বেদান্তে এই-সকল ভাব যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে, পরিত্যক্ত হয় নাই। এইজন্যই দ্বৈতবাদসম্মত সসীম অথচ পূর্ণজীবাত্মার ধারণাও বেদান্তে স্থান পাইয়াছে।

দ্বৈতবাদ অনুসারে মৃত্যু হইলে মানুষ অন্যান্য লোকে গমন করে, এই-সকল ভাবও বেদান্তে সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, কারণ অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া এই মতগুলিকেও তাহাদের যথাস্থানে রক্ষা করা যাইতে পারে, কেবল এইটুকু মানিতে হইবে যে, উহারা প্রকৃত সত্যের আংশিক বর্ণনামাত্র।

যদি তুমি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখ, তবে একটি দিক—একটি অংশই তোমার চোখে পড়ে, এবং জগৎ তোমার নিকট এইভাবেই প্রতীয়মান হইবে। দ্বৈতবাদীর দৃষ্টি হইতে এই জগৎ কেবল পদার্থ ও শক্তির সৃষ্টিরূপেই দৃষ্ট হইতে পারে; উহাকে কোন বিশেষ ইচ্ছাশক্তির ক্রীড়ারূপেই চিন্তা করা যাইতে পারে, আর সেই ইচ্ছাশক্তিকেও জগৎ হইতে পৃথক্‌রূপেই দেখা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মানুষ নিজেকে আত্মা ও দেহ এই দুয়ের সমষ্টিরূপেই চিন্তা করে; এই আত্মা সসীম হইলেও পূর্ণ। এরূপ ব্যক্তির অমরত্ব ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাও সেই আত্মাতেই প্রযুক্ত হইবে। এইজন্যই এই মতগুলি বেদান্তে সুরক্ষিত হইয়াছে এবং এইজন্যই দ্বৈতবাদীদের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ মতগুলিও তোমাদের নিকট বলা প্রয়োজন।

এই মতানুসারে অবশ্য আমাদের একটি স্থূল শরীর আছে; এই স্থূলশরীরের পশ্চাতে সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্মশরীরও ভৌতিক, তবে উহা খুব সূক্ষ্মভূতে নির্মিত। উহা আমাদের সমুদয় কর্মের আধারস্বরূপ। সমুদয় কর্মের সংস্কার এই সূক্ষ্মশরীরে বর্তমান—সংস্কারগুলি সর্বদাই ফল প্রদান করিতে উন্মুখ হইয়া আছে। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, আমরা যে-কোন কার্য করি, তাহাই কিছুকাল পরে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে,—যেন বীজভাব প্রাপ্ত হয়, এবং এই শরীরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কিছুকাল পরে আবার বাহিরে প্রকাশিত হইয়া ফল প্রদান করে। মানুষের সারা জীবনটাই এইরূপ। সে নিজের অদৃষ্ট নিজেই গঠন করে। মানুষ আর কোন নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নয়, সে আপনার নিয়মে—আপনার জালে বদ্ধ। আমরা যে-সকল কর্ম করি, আমরা যে-সকল চিন্তা করি, সেগুলি আমাদের বন্ধনজালের সূত্রমাত্র। একবার কোন শক্তিকে চালাইয়া দিলে তাহার শেষ পরিণতি পর্যন্ত আমাদিগকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ইহাই কর্মবিধান। এই সূক্ষ্ম শরীরের পশ্চাতে সসীম জীবাত্মা রহিয়াছেন। এই জীবাত্মার কোন আকৃতি আছে কি-না, ইহা অণু, বৃহৎ বা মধ্যম আকারের—এ-বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছে।

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ইহা অণু, অপরের মতে ইহা মধ্যম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতে ইহা বিভু। এই জীব সেই অনন্ত সত্তার এক অংশমাত্র, আর উহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে। উহা অনাদি, উহা সেই সর্বব্যাপী সত্তার এক অংশরূপে অবস্থান করিতেছে। উহা অনন্ত। আর উহা নিজের প্রকৃত স্বরূপ, শুদ্ধভাব প্রকাশ করিবার জন্য নানা দেহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। যে-কার্যের দ্বারা এই প্রকাশ ব্যাহত হয়, তাহাকে অসৎ কার্য বলে; চিন্তাসম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর যে-কার্য বা যে-চিন্তা দ্বারা তাহার স্বরূপ প্রকাশের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাকে সৎকার্য বা সচ্চিন্তা বলে। কিন্তু ভারতের অতি নিম্নতম দ্বৈতবাদী এবং অতি উন্নত অদ্বৈতবাদী—সকলেরই মত এই যে, আত্মার সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা তাহার ভিতরেই রহিয়াছে, অন্য কোথাও হইতে আসে না, আত্মাতে ঐ শক্তিপুঞ্জ অব্যক্তভাবে থাকে, আর আমাদের সমুদয় জীবনের কার্য কেবল ঐ অব্যক্ত শক্তিগুলিকে বিকশিত করা।

তাঁহারা পুনর্জন্মবাদও মানিয়া থাকেন—এই দেহের ধ্বংস হইলে জীব আর এক দেহ লাভ করিবে, আবার সেই দেহনাশের পর আর এক দেহ, এইরূপই চলিবে। জীব এই পৃথিবীতেও জন্মাইতে পারে, অন্য লোকেও জন্মাইতে পারে। তবে এই পৃথিবীকেই সকলের আগে পছন্দ করা হয়—আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ স্থান। অন্যান্য লোকে দুঃখকষ্ট খুব সামান্য আছে বটে, কিন্তু সাধকেরা বলেন যে, ঐজন্যই সেই-সকল লোকে উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার সুযোগও অল্প। এই জগতে বেশ সামঞ্জস্য আছে, অনেক দুঃখও আছে, আবার কিছু সুখও আছে, সুতরাং জীবের এখানে কখন না কখন মোহনিদ্রা ভাঙিবার সম্ভাবনা, কখন না কখন তাহার মুক্তিলাভের ইচ্ছার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যেমন এই পৃথিবীতে খুব ধনী ব্যক্তিদের উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার সুযোগ অতি অল্প, সেইরূপ এই জীব যদি স্বর্গে যায়, সেখানে তাহারও আত্মোন্নতির সম্ভাবনা নাই। শুধু এখানে যে-সুখ, সেখানে তাহাই তীব্রতর; সূক্ষ্মদেহে কোন ব্যাধি থাকিবে না, ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকিবে না, সকল বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে। জীব সেখানে সুখের পর সুখ সম্ভোগ করে এবং নিজের স্বরূপ ও উচ্চভাব—সব ভুলিয়া যায়। তথাপি এই-সকল উচ্চতর লোকে কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা

এই-সকল ভোগসত্ত্বেও সেখান হইতে আরও উচ্চতর ভাবে আরোহণ করেন। এক প্রকার স্থূলদর্শী দ্বৈতবাদীরা উচ্চতম স্বর্গকেই চরম লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন, জীবাত্মাগণ সেই স্বর্গে চিরকাল ভগবানের সহিত বাস করিবেন। সেখানে তাঁহারা দিব্যদেহ লাভ করিবেন—তাঁহাদের আর রোগ শোক মৃত্যু বা অন্য কোনরূপ অশুভ থাকিবে না। তাঁহাদের সকল বাসনা পরিপূর্ণ হইবে; এবং তাঁহারা চিরকাল সেখানে ভগবানের সহিত বাস করিবেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পৃথিবীতে আসিয়া দেহধারণ করিয়া লোকশিক্ষা দিবেন, আর জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণ সকলেই স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন,—এই তাঁহাদের মত। পূর্বেই মুক্ত হইয়া এই লোকগুরুগণ ভগবানের সহিত এক লোকে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু দুঃখার্ত মানবজাতির প্রতি অত্যন্ত কৃপাবশতঃ তাঁহারা এখানে আসিয়া পুনরায় দেহধারণ করিয়া মানুষকে স্বর্গের পথ-সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তাঁহারা অন্যান্য উচ্চতর—দেবতাদের লোকসমূহেও গমন করিয়া থাকেন।

অবশ্য অদ্বৈতবাদী বলেন, এই স্বর্গ কখন আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। দেহশূন্যভাবই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের লক্ষ্য বা আদর্শ কখন সসীম হইতে পারে না। অনন্ত ব্যতীত আর কিছুই আমাদের চরম আদর্শ হইতে পারে না, কিন্তু দেহ তো কখন অনন্ত হয় না। ইহা হওয়াই অসম্ভব, কারণ সীমাবদ্ধ ভাব হইতেই শরীরের উৎপত্তি। চিন্তাও অনন্ত হইতে পারে না, কারণ সসীম ভাব হইতেই চিন্তা আসিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদী বলেন, আমাদিগকে দেহ এবং চিন্তার বাহিরে যাইতে হইবে। আমরা আরও দেখিয়াছি অদ্বৈতবাদের মতে—মুক্তি লভ্য নয়, উহা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। আমরা কেবল ভুলিয়া যাই ও উহা অস্বীকার করি। পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে না, উহা আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এই অমরত্ব ও আনন্দ লাভ করিতে হইবে না, ঐগুলি পূর্ব হইতেই বর্তমান—ঐগুলি আমাদের বরাবরই রহিয়াছে।

যদি তুমি সাহস করিয়া বলিতে পারো—'আমি মুক্ত,' এই মুহূর্তে তুমি মুক্তই হইবে। যদি তুমি বলো—'আমি বদ্ধ,' তবে তুমি বদ্ধই থাকিবে। যাহা হউক, দ্বৈতবাদী ও অন্যান্যবাদীদের মত ইহার বিপরীত। তোমরা ইহার মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারো।

বেদান্তের এই আদর্শটি বুঝা বড় কঠিন, আর সাধারণ লোকে সর্বদা ইহা লইয়া বিবাদ করিয়া থাকে। প্রধান মুশকিল এই যে, ইহার মধ্যে যে একটি মত অবলম্বন করে, সে অপর মত একেবারে অস্বীকার করিয়া সেই মতাবলম্বীর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তোমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত, তাহা গ্রহণ কর; অপরের উপযোগী মত তাহাকে গ্রহণ করিতে দাও। যদি তুমি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব—এই সসীম মানবত্ব রাখিতে এতই ইচ্ছুক হও, তবে তুমি তাহা অনায়াসে রাখিতে পারো, তোমার সকল বাসনাই রাখিতে পারো এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারো। যদি মানুষভাবে থাকিবার সুখ তোমার নিকট এতই সুন্দর ও মধুর লাগে, তবে তুমি যতদিন ইচ্ছা উহা রাখিয়া দাও, কারণ তুমি জানো তুমিই তোমার অদৃষ্টের নির্মাতা, কেহই তোমাকে বাধ্য করিয়া কিছু করাইতে পারে না; তোমার যতদিন ইচ্ছা ততদিন মানুষরূপে থাকিতে পারো, কেহই তোমাকে অন্য কিছু করিতে বাধ্য করিতে পারে না। যদি দেবতা হইতে ইচ্ছা কর, দেবতাই হইবে—সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য। কিন্তু এমন অনেক মানুষ থাকিতে পারেন, যাঁহারা দেবতা হইতেও অনিচ্ছুক। তাঁহাদিগকে কি তোমার বলিবার অধিকার আছে যে, এ ভয়ানক কথা? তোমার এক শত টাকা নষ্ট হইবার ভয় হইতে পারে, কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহাদের পৃথিবীতে যত অর্থ আছে, সব নষ্ট হইলেও কিছু কষ্ট হইবে না। এই ধরনের মানুষ পূর্বকালে অনেক ছিলেন, এবং এখনও আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার আদর্শ অনুসারে বিচার করিতে যাও কেন? তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জাগতিক ভাবে বদ্ধ হইয়া আছ। ইহাই তোমার সর্বোচ্চ আদর্শ হইতে পারে। তুমি এই আদর্শ লইয়া থাকো না কেন? তুমি যেমনটি চাও তেমনটি পাইবে; কিন্তু তুমি ছাড়া এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সত্যকে দর্শন করিয়াছেন—তাঁহারা ঐ স্বর্গাদিভোগে তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আর উহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চান না, তাঁহারা সকল সীমার বাহিরে যাইতে চান, জগতের কিছুই তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। জগৎ ও উহার সমুদয় ভোগ তাঁহাদের পক্ষে ডোবার মতো। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাও কেন? এই ভাবটি একেবারে ছাড়িতে হইবে, প্রত্যেককে নিজের ভাবে চলিতে দাও।

কয়েক বৎসর পূর্বে 'সচিত্র লণ্ডন সমাচারে' (Illustrated London News) একটি সংবাদ পাঠ করি। কতকগুলি জাহাজ[১] প্রশান্ত মহাসাগরে 'সাউথ সী' দ্বীপপুঞ্জের নিকট ঝটিকাক্রান্ত হয়। ঐ পত্রিকায় জাহাজগুলির একটি চিত্রও ছিল। একখানি ব্রিটিশ জাহাজ ছাড়া সবগুলিই ভগ্ন হইয়া ডুবিয়া যায়। সেই জাহাজখানি ঝড় কাটাইয়া চলিয়া আসে। ছবিতে দেখাইতেছে—যে জাহাজগুলি ডুবিয়া যাইতেছে, সেগুলির মজ্জমান আরোহিদল ডেকের উপর দাঁড়াইয়া ঐ জাহাজের লোকগুলিকে উৎসাহ দিতেছে। অপর লোককে টানিয়া নিজের স্তরে নামাইয়া আনিও না।

আর একপ্রকার নির্বুদ্ধিতা আছে: যদি আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র আমিত্ব হারাইয়া ফেলি, তবে জগতে কোনরূপ নীতিপরায়ণতা থাকিবে না, মনুষ্যজাতির কোন আশাভরসা থাকিবে না। যাঁহারা উহা বলেন, তাঁহাদের যেন মনুষ্যজাতির জন্য সর্বদা প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। যদি প্রত্যেক দেশে মানুষের যথার্থ কল্যাণকামী অন্ততঃ দুই শত নরনারী থাকে, তবে পাঁচদিনে সত্যযুগ উপস্থিত হইবে। আমরা জানি, মনুষ্যজাতির জন্য আমাদের প্রাণ কিরূপ ছটফট করিতেছে। এ-সব অভিসন্ধি-প্রণোদিত লম্বা লম্বা কথামাত্র। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, এই ক্ষুদ্র 'আমি'কে যাঁহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠ হিতকারী, আর নরনারী যত বেশী নিজেদের কথা ভাবিবে, তত কম পরের উপকার করিতে পারিবে। দুটির মধ্যে একটি নিঃস্বার্থপরতা, অপরটি স্বার্থপরতা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগসুখে আসক্ত থাকা এবং চিরকাল এইভাবে চলা এবং একই অবস্থার পুনরাবর্তন ঘোর স্বার্থপরতা। উহা সত্যানুরাগ হইতে উৎপন্ন নয়, অপরের প্রতি দয়াও এই ভাবের উৎপত্তির কারণ নয়—উহার কারণ ঘোর স্বার্থপরতা; অপর কাহারও দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিজেই সমস্ত ভোগ করিব—এই ভাব হইতে উহার উৎপত্তি। আমার তো এইরূপই বোধ হয়। আমি জগতে প্রাচীন মহাপুরুষ ও সাধুগণের তুল্য চরিত্রবান্ পুরুষ আরও দেখিতে চাই—তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র পশুর উপকারের জন্য শত শত জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত

১ প্রশান্ত মহাসাগরে সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের নিকট ব্রিটিশ জাহাজ ক্যালিয়োপি (Calliope) ও আমেরিকার কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ।

ছিলেন। নীতি ও পরোপকারের কথা কি বলিতেছ? ইহা তো আধুনিক কালের বাজে কথামাত্র।

আমি সেই গৌতম বুদ্ধের ন্যায় চরিত্রবান্ লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি ঐ বিষয়ে কখন কোন প্রশ্নই করেন নাই, যিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন কিসে অপরের কল্যাণ হয়, ইহাই তাঁহার চিন্তা ছিল। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক বেশ বলিয়াছেন, তিনি 'বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বনে গিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, তাহাও নিজের মুক্তির জন্য নয়। জগৎ জলিয়া গেল—বাঁচিবার পথ বাহির করিতেই হইবে। জগতে এত দুঃখ কেন?—তাঁহার সারাজীবন এই এক চিন্তা ছিল। তোমরা কি মনে কর, আমরা তাঁহার মতো নীতিপরায়ণ?

* * *

যীশুখ্রীষ্ট যে-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই খাঁটি খ্রীষ্টধর্মে ও বেদান্ত-ধর্মে অতি অল্পই প্রভেদ। খ্রীষ্টধর্মে বিকৃতভাব অতি অল্পই ছিল। যীশু অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, আবার সাধারণের উপযোগী এবং উচ্চতম আদর্শ ধারণা করিবার সোপানরূপে দ্বৈতবাদের কথাও বলিয়াছেন। 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' বলিয়া যিনি প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই আবার প্রচার করিয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক'; আর তিনি ইহাও জানিতেন, এই স্বর্গস্থ পিতারূপে দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতে করিতেই এই বোধ আসিয়া থাকে যে 'আমি ও আমার পিতা এক'। তখন ঐ ধর্মে ছিল কেবল প্রেম ও আশীর্বাদ, কিন্তু অবশেষে নানাবিধ মত উহাতে প্রবিষ্ট হওয়ায় উহা বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া অবনত হইল।

এই যে ক্ষুদ্র 'আমি'র জন্য মারামারি, 'আমি'র প্রতি অতিশয় ভালবাসা, শুধু এই জীবনে নয়, মৃত্যুর পরও এই ক্ষুদ্র 'আমি'—এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব লইয়া থাকিবার ইচ্ছা, ইহা ধর্মের বিকৃতভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে বলেন, ইহাই নিঃস্বার্থপরতা—ইহাই নীতির ভিত্তিস্বরূপ। ইহা যদি নীতির ভিত্তি হয়, তবে আর দুর্নীতির ভিত্তি কি? স্বার্থপরতা নীতির ভিত্তি! আর যে-সকল নরনারীর নিকট আমরা অধিকতর জ্ঞানের আশা করি, তাঁহারা

ঐ কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যান এবং মনে করেন এই ক্ষুদ্র 'আমি'র নাশ হইলে সব নীতি একেবারে ধ্বংস হইবে। এই সর্বপ্রকার শুভভাবের, সর্বপ্রকার নৈতিক মঙ্গলের মূলমন্ত্র—'আমি নয়, তুমি'।

কে ভাবিতে যায়—স্বর্গ নরক আছে কি-না? কে ভাবিতে যায়—আমার আত্মা আছে কি-না? কে ভাবিতে যায়—কোন অপরিণামী অপরিবর্তনীয় সত্তা আছে কি-না? এই সংসার পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা মহাদুঃখে পরিপূর্ণ। বুদ্ধের মতো এই সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দাও। দুঃখ লাঘব করিবার জন্য—হয় সংগ্রাম কর, নয় ঐ চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন দাও। আস্তিক হও বা নাস্তিক হও, অজ্ঞেয়বাদী হও বা বৈদান্তিক হও, খ্রীষ্টান হও বা মুসলমান হও নিজেকে ভুলিয়া যাও—ইহাই প্রথম শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা এই উপদেশ সকলেই বুঝিতে পারে, 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'—অহংনাশ ও প্রকৃত 'আমি'র বিকাশ।

দুইটি শক্তি সর্বদা সমান্তরালভাবে কার্য করিতেছে। একটি 'অহং', অপরটি 'নাহং'। শুধু মানুষের ভিতর নয়, জীবজন্তুর ভিতরও এই দুইটি শক্তির বিকাশ দেখা যায়—এমন কি, ক্ষুদ্রতম কীটাণুর মধ্যেও এই দুই শক্তির প্রকাশ। নরশোণিতপানে লোলজিহ্ব ব্যাঘ্রী তাহার শাবককে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। অতি অধঃপতিত ব্যক্তি, যে অনায়াসে তাহার ভ্রাতৃসমান অন্যান্য মানুষকে হত্যা করিতে পারে, সেও অনাহারে মুমূর্ষু স্ত্রী অথবা পুত্র-কন্যার জন্য সব করিতে প্রস্তুত। অথবা দেখা যায়; সৃষ্টির ভিতরে এই দুই শক্তি পাশাপাশি কার্য করিতেছে—যেখানে একটি শক্তি দেখিবে, সেখানে অপরটিও দেখিবে। একটি স্বার্থপরতা, অপরটি নিঃস্বার্থপরতা। একটি গ্রহণ, অপরটি ত্যাগ। ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই এই দুই শক্তির লীলাক্ষেত্র। ইহার কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ইহা স্বতঃপ্রমাণ।

সমাজের এক সম্প্রদায়ের লোকের বলিবার কি অধিকার আছে যে, জগতের সমুদয় কার্য ও বিকাশ ঐ দুই শক্তির অন্যতম—শুধু স্বার্থ-শক্তির উপর, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রামের উপর স্থাপিত? জগতের সমুদয় কার্য রাগ-দ্বেষ, বিবাদ ও প্রতিযোগিতার উপর স্থাপিত, এ-কথা বলিবার তাঁহাদের কি অধিকার আছে? এই-সকল প্রবৃত্তি যে আছে, তাহা অস্বীকার করি না।

কিন্তু অপর শক্তিটির অস্তিত্ব ও ক্রিয়া অস্বীকার করিবার কি অধিকার তাঁহাদের আছে? আর তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, এই প্রেম—এই অহংশূন্যতা, এই ত্যাগই জগতের একমাত্র পরা শক্তি? অপর শক্তিটি এই প্রেমশক্তিরই বিপরীতভাবে প্রয়োগের ফল, এবং এই ভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎপত্তি। অশুভের উৎপত্তিও নিঃস্বার্থপরতা হইতে—অশুভের পরিণামও শুভ বই আর কিছুই নয়। উহা কেবল কল্যাণশক্তির অপব্যবহার মাত্র। এক ব্যক্তি যে অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহাও হয়তো নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহের প্রেরণায়—তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিবে বলিয়া। তাহার প্রেম অন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া ঐ একটি শিশু-সন্তানের উপর পড়িয়া সসীম ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সীমাবদ্ধই হউক, অসীমই হউক, ভালবাসা সেই ভগবান, অন্য কিছুই নহে।

অতএব সমগ্র জগতের প্রেরণাশক্তি, জগতের মধ্যে একমাত্র প্রকৃত ও জীবন্ত শক্তি সেই অদ্ভুত ভাব—উহা যে-কোন আকারে ব্যক্ত হউক না কেন, উহা সেই প্রেম, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ বই আর কিছুই নয়। বেদান্ত এইজন্যই অদ্বৈতভাবের উপর ঝোঁক দেন, দ্বৈতভাবের উপর নয়। আমরা এই ব্যাখ্যার উপর বিশেষ জোর দিই কারণ, আমরা জানি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহমিকা সত্ত্বেও আমাদের মানিতে হইবে, যেখানে একটি কারণ দ্বারা কতকগুলি কার্য ব্যাখ্যা করা যায়, আবার অনেকগুলি কারণ দ্বারাও যদি সেই কার্যগুলি ব্যাখ্যা করা যায়, তবে অনেকগুলি কারণ স্বীকার না করিয়া সেই একটি কারণই সত্য বলিয়া স্বীকার্য। এখানে যদি আমরা স্বীকার করি যে, সেই এক অপূর্ব সুন্দর প্রেমই সীমাবদ্ধ হইয়া অশুভ বা অসৎরূপে প্রতীয়মান হয়, তবে আমরা এক প্রেম-শক্তি দ্বারাই সমুদয় জগতের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলাম। নচেৎ আমাদিগকে জগতের দুইটি কারণ মানিতে হয়—একটি শুভশক্তি, অপরটি অশুভশক্তি—একটি প্রেমশক্তি, অপরটি দ্বেষশক্তি। এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্‌টি অধিক যুক্তিসঙ্গত? অবশ্য একটি কারণ মানিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

আমি এমন সব বিষয়ে গিয়া পড়িতেছি, যাহা সম্ভবতঃ দ্বৈতবাদীদের অধিকার-বহির্ভূত। ভয় হইতেছে, দ্বৈতবাদের আলোচনা লইয়া আমি বোধ হয় বেশীক্ষণ কাটাইতে পারি না। আমার ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য যে, উচ্চ-তম দার্শনিক ধারণার সহিত নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার উচ্চতম আদর্শ

পাশাপাশি যাইতে পারে। আমার ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য, নীতিপরায়ণ হইতে গেলে তোমার দার্শনিক ধারণাকে খাটো করিতে হয় না ; বরং নীতির ভিত্তি-ভূমি লাভ করিতে হইলে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণা-সম্পন্ন হইতে হইবে। মানুষের জ্ঞান মানুষের কল্যাণের বিরোধী নয়। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে ; জ্ঞানই উপাসনা। আমরা যতই জ্ঞানলাভ করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। বেদান্তী বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান অশুভের কারণ—অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব। যে-প্রেম সীমাবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইয়া যায় এবং অশুভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই আবার অপর প্রান্তে অসীম হইয়া ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায়। আর বেদান্ত ইহাও বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান সমুদয় অশুভের কারণ আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। অতিপ্রাকৃত কোন সত্তার উপর দোষারোপ করিও না, নিরাশ বা বিষণ্ণ হইয়া পড়িও না, অথবা মনে করিও না আমরা গর্তের মধ্যে পড়িয়া আছি—অপর কেহ আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য না করিলে আমরা আর উঠিতে পারিব না। বেদান্ত বলেন, এ-ধারণা ঠিক নহে ; আমরা গুটিপোকার মতো! নিজের শরীর হইতে জাল প্রস্তুত করিয়া কালক্রমে তাহাতে আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ বদ্ধভাব চিরকালের জন্য নয়। উহার মধ্যে প্রজাপতিতে পরিণত হইয়া আমরা বাহিরে আসিব, মুক্ত হইব। আমরা আমাদের চতুর্দিকে এই কর্মজাল জড়াইয়াছি, আমরা অজ্ঞানবশতঃ মনে করিতেছি আমরা যেন বদ্ধ, আর কখন কখন সাহায্যের জন্য চীৎকার ও ক্রন্দন করিতেছি। কিন্তু বাহির হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, সাহায্য পাওয়া যায় ভিতর হইতে। জগতের সকল দেবতার নিকট উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে পারো। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছি ; অবশেষে দেখিলাম, সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু এই সাহায্য ভিতর হইতে আসিল, আর ভুলবশতঃ এতদিন যাহা করিতেছিলাম, তাহা নষ্ট করিতে হইল। ইহাই একমাত্র উপায়। নিজের চারিদিকে যে-জাল বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহা আমাকেই ছিন্ন করিতে হইবে, আর তাহা করিবার শক্তিও আমার ভিতরে রহিয়াছে। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমার জীবনের ভালমন্দ কোন ভাবই বৃথা যায় নাই—আমি সেই অতীত শুভাশুভ উভয়বিধ

কর্মেরই সমষ্টি-স্বরূপ। আমি জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি, কিন্তু ঐগুলির একটিও যদি বাদ পড়িত, তাহা হইলে আমি আজ যাহা হইয়াছি, তাহা হইতাম না। আমার জীবনে আমি বেশ সন্তুষ্ট। আমার এ-কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, তোমরা বাড়ি গিয়া নানাপ্রকার অন্যায় কাজ করিতে থাকো, আমার কথা এইরূপে ভুল বুঝিও না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, কতকগুলি ভুলচুক হইয়া গিয়াছে বলিয়া একেবারে বসিয়া পড়িও না, কিন্তু জানিও পরিণামে তাহাদের ফল শুভই হইবে। অন্যরূপ হইতে পারে না, কারণ মঙ্গল ও পবিত্রতা আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম, আর কোন উপায়েই সেই প্রকৃতির অন্যথা হয় না। আমাদের যথার্থ স্বরূপ সর্বদা একই-প্রকার।

আমাদের ইহা বুঝা আবশ্যক যে, আমরা দুর্বল বলিয়াই নানাবিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা দুর্বল। আমি পাপ-শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'ভ্রম'-শব্দ ব্যবহার করাই পছন্দ করি। আমাদিগকে ভ্রমে বা অজ্ঞানে ফেলিয়াছে কে? আমরা নিজেরাই। আমরা নিজ নিজ চোখে হাত দিয়া 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, দেখিবে আলোক আমাদের জন্য সর্বদাই রহিয়াছে, সেই জীবাত্মার স্বপ্রকাশ আলোক। দেখিতে পাইতেছ না আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি বলিতেছেন? এই-সকল ক্রমবিকাশের হেতু কি? বাসনা। কোন জীবজন্তু যেভাবে আছে, তাহার অতিরিক্ত কিছু করিতে চায়—সে দেখে, তাহার পরিবেশ উপযোগী নহে, সুতরাং সে একটি নূতন শরীর গঠন করিয়া লয়। নিম্নতম জীবাণু হইতে নিজ ইচ্ছাশক্তিবলে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ—আবার সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর, আরও উন্নত হইতে পারিবে। ইচ্ছা সর্বশক্তিমান্। বলিতে পারো, ইচ্ছাই যদি সর্বশক্তিমান্, তবে অনেক কিছুই আমি করিতে পারি না কেন? যখন তুমি এ-কথা বলো, তখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র 'আমি'র দিকে লক্ষ্য করিতেছ মাত্র। ভাবিয়া দেখ, ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে তুমি এই মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ করিল? তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি অস্বীকার করিতে পারো, ইচ্ছা সর্বশক্তিমান্? যাহা তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও উন্নত করিবে। আমাদের প্রয়োজন—চরিত্র ও ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, এ-গুলির দুর্বলতা নয়।

অতএব যদি তোমাকে উপদেশ দিই যে, তোমার প্রকৃতিই অসৎ, আর তুমি কতকগুলি ভুল করিয়াছ বলিয়া তোমাকে অনুতাপ ও ক্রন্দন করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে, তাহাতে তোমার বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না, বরং উহা তোমাকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলিবে, আর তাহাতে তোমাকে ভাল হইবার পথ না দেখাইয়া বরং আরও মন্দ হইবার পথ দেখানো হইবে। যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গৃহ অন্ধকার থাকে, আর তুমি সেই গৃহে আসিয়া 'হায়, বড় অন্ধকার! বড় অন্ধকার!' বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ কর, তবে কি অন্ধকার চলিয়া যাইবে? একটি দিয়াশলাই জ্বালিলে এক মুহূর্তেই ঘর আলোকিত হইবে। অতএব সারা জীবন 'আমি অনেক দোষ করিয়াছি, আমি অনেক অন্যায় কাজ করিয়াছি' বলিয়া অনুশোচনা করিলে কি তোমার উপকার হইবে? আমরা নানা দোষে দোষী, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। জ্ঞানের আলো জ্বালো, এক মুহূর্তে সব অশুভ চলিয়া যাইবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ কর, প্রকৃত 'আমি'কে—সেই জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বল, নিত্যশুদ্ধ 'আমি'কে প্রকাশ কর; প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই আত্মাকে প্রকাশ কর। আমি ইচ্ছা করি, সকলেই এমন অবস্থা লাভ করুক যে, অতি জঘন্য পুরুষকে দেখিলেও তাহার বাহিরের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া অন্তর্যামী ভগবানকে দেখিতে পারে, আর তাহার নিন্দা না করিয়া বলিতে পারে, 'হে স্বপ্রকাশ, জ্যোতির্ময়, ওঠ! হে সদাশুদ্ধস্বরূপ, ওঠ! হে অজ, অবিনাশী, সর্বশক্তিমান্, ওঠ! আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি যে-সকল ক্ষুদ্র ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা তোমাতে সাজে না।' অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহার একমাত্র প্রার্থনা—নিজস্বরূপ-স্মরণ, সদা সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরের স্মরণ, তাঁহাকে সর্বদা অনন্ত সর্বশক্তিমান্ সদামঙ্গলময় বলিয়া স্মরণ। এই ক্ষুদ্র অহং তাঁহাতে নাই, ক্ষুদ্র বন্ধনসমূহ তাঁহাতে নাই। আর এই প্রার্থনা নিঃস্বার্থ বলিয়াই ভয়শূন্য ও শক্তিসম্পন্ন; কারণ স্বার্থ হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যাহার নিজের অন্য কোন কামনা নাই, সে কাহাকে ভয় করিবে? কোন্ বস্তুই বা তাহাকে ভীত করিতে পারে? মৃত্যু তাহাকে কী ভয় দেখাইতে পারে? অশুভ, বিপদ তাহাকে কী ভয় দেখাইতে পারে? অতএব যদি আমরা অদ্বৈতবাদী হই, আমাদিগকে অবশ্য চিন্তা করিতে হইবে যে, আমরা এই মুহূর্ত হইতেই

মৃত। তখন আমাদের পুরাতন ব্যক্তিপরিচয় চলিয়া যায়, ও-গুলি কেবল কুসংস্কারমাত্র; অবশিষ্ট থাকেন সেই নিত্যশুদ্ধ সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ-স্বরূপ এবং তখন সব ভয় চলিয়া যায়। সর্বব্যাপী 'আমার' অনিষ্ট কে করিতে পারে? এইরূপে আমার সমুদয় দুর্বলতা চলিয়া যায়, তখন অপর সকলের ভিতর এই ভাব জাগাইয়া তোলাই আমার কার্য হয়। আমি দেখিতেছি, সকলেই সেই আত্মস্বরূপ, কিন্তু সকলে তাহা জানে না। সুতরাং প্রত্যেককে ইহা শিখাইতে হইবে, সেই অনন্তশক্তির জাগরণে তাহাকে সহায়তা করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি, জগতে এই ভাব প্রচার করাই বিশেষ প্রয়োজন। এই-সকল মত অতি পুরাতন—সম্ভবতঃ অনেক পর্বত অপেক্ষা পুরাতন। সকল সত্যই সনাতন। সত্য কাহারও একার সম্পত্তি নয়। কোন জাতি, কোন ব্যক্তিই সত্যকে নিজস্ব বলিয়া দাবি করিতে পারে না। সত্যই সকল আত্মার যথার্থ স্বরূপ। উহার উপর কে বিশেষ দাবি করিতে পারে? কিন্তু উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে, সরলভাবে উহা প্রচার করিতে হইবে, কারণ তোমরা দেখিবে—উচ্চতম সত্য অতি সহজ ও সরল। খুব সহজ ও সরলভাবে উহার প্রচার করিতে হইবে, যাহাতে ঐ ভাব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়, যাহাতে উহা উচ্চতম মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ মনেরও অধিকারের বিষয় হইতে পারে, যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা একই কালে উহা বুঝিতে পারে। এই-সকল ন্যায়ের কূটবিচার, দার্শনিক মতবাদ, এই-সকল দেবতাতত্ত্ব ও ক্রিয়াকাণ্ড এক সময়ে উপকার করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু এস আমরা একমনে ধর্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি, আর সেই সত্যযুগ আনিবার সহায়তা করি, যখন প্রত্যেকটি মানুষ উপাসক হইবে, আর প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যবস্তু উপাস্য হইবেন।

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে



সহস্রদ্বীপোদ্যানে ভ্রমণরত স্বামীজী, ১৮৯৫

আত্মা

[আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

আপনারা অনেকেই ম্যাক্স মূলারের সুবিখ্যাত পুস্তক 'Three Lectures on the Vedanta Philosophy' (বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা) পাঠ করিয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ আপনারা কেহ কেহ অধ্যাপক ডয়সনের জার্মান ভাষায় লিখিত এই একই দার্শনিক মতবাদ-বিষয়ক গ্রন্থটিও পাঠ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে প্রতীচ্যে বর্তমানে যাহা লিখিত হয়, অথবা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা প্রধানতঃ একটি মাত্র মতবাদ—অদ্বৈতবাদ, অথবা ভারতীয় ধর্মের 'এক-তত্ত্ব'বাদ সম্বন্ধেই এবং কেহ কেহ মনে করেন, বেদের সমগ্র তত্ত্ব এই একটি দার্শনিক মতবাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক আছে; এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অদ্বৈত-মতাবলম্বীরাই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা কম। প্রাচীনতম যুগ হইতেই ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়; এবং সুস্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ অথবা সর্বজনসম্মত কোন ধর্মকেন্দ্র অথবা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় তত্ত্ব-নির্দেশকারী কোন মণ্ডলী এই দেশে কোনদিনও না থাকায় জনসাধারণ নিজ নিজ পন্থাবলম্বন, নিজ নিজ দর্শন-বিস্তার, এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়-স্থাপনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। এই কারণে আমরা দেখি, প্রাচীনতম যুগ হইতেই ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ। আমি জানি না, বর্তমানে ভারতবর্ষে কত শত সম্প্রদায় আছে; প্রত্যেক বৎসরই কয়েকটি নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতেছে। মনে হয় যেন, এই জাতির আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা সত্যই অফুরন্ত।

এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে প্রথমতঃ দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; একটি আস্তিক বা বৈদিক, অপরটি নাস্তিক বা অবৈদিক। যাঁহারা হিন্দু-শাস্ত্র বেদকে নিত্য-তত্ত্ব-প্রকাশকরূপে প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বলা হয় 'আস্তিক' এবং যাঁহারা বেদ বর্জন করিয়া অন্যান্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন, তাঁহারাই হইলেন ভারতীয় 'নাস্তিক'। ভারতের দুইটি প্রধান আধুনিক 'নাস্তিক' সম্প্রদায় হইল জৈন এবং বৌদ্ধ। আস্তিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, যুক্তি-অপেক্ষা শ্রুতি অধিকতর প্রামাণ্য; আবার

কেহ কেহ বলেন, শ্রুতির যুক্তিসম্মত অংশই কেবল গ্রহণীয়, অবশিষ্ট অংশ বর্জনীয়।

সাংখ্য, ন্যায় এবং মীমাংসা—এই তিনটি আস্তিক মতবাদের মধ্যে প্রথম দুইটি দার্শনিক মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও সম্প্রদায়-গঠনে সমর্থ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ভারতবর্ষে যে একটি মাত্র সম্প্রদায় আছে, তাহা হইল উত্তর-মীমাংসার উপর প্রতিষ্ঠিত বৈদান্তিক সম্প্রদায়। তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদের নামই 'বেদান্ত'।

হিন্দু দর্শনের সকল মতবাদেরই উদ্ভব হইল বেদান্ত অথবা উপনিষদ্ হইতে; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ বিশেষভাবে এই নামটি নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র ধর্ম ও দর্শনকে কেবলমাত্র বেদান্তের ভিত্তিতেই স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। কালক্রমে কেবল বেদান্তই স্থায়ী হয়, এবং ভারতবর্ষের বর্তমান বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি এই বেদান্তেরই কোন না কোন শাখার অন্তর্গত। তথাপি এই-সকল সম্প্রদায় একমতাবলম্বী নহে।

আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদান্তিকগণের মধ্যে তিনটি প্রধান শ্রেণী-বিভাগ আছে। অবশ্য একটি বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত, অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এই-সকল বৈদান্তিক ইহাও বিশ্বাস করেন যে, বেদ অতিপ্রাকৃত উপায়ে ব্যক্ত ঈশ্বরের বাণী। তাঁহাদের এই বিশ্বাস ঠিক ইসলাম ও খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণের বিশ্বাসের মতো নহে—ইহা একটি বিশেষ ধরনের বিশ্বাস। তাঁহাদের ধারণা এই: বেদসমূহ ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রকাশ; ঈশ্বর নিত্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞানও তাঁহার মধ্যে নিত্য বিরাজমান এবং সেইজন্য বেদও নিত্য। অপর একটি সাধারণ বিশ্বাসও তাঁহাদের আছে—সৃষ্টি-প্রবাহে বিশ্বাস। অর্থাৎ তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, সমুদয় সৃষ্টি ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে, জগৎ আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ স্থূলতর হয়, এবং কল্পকালের শেষে ক্রমাগত সূক্ষ্মতর হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়; ইহার পরে আসে বিশ্রামের সময়। তাহার পর পুনরায় জগতের সৃষ্টি বা আবির্ভাব হয়, এবং সেই একই প্রক্রিয়ার পুনরাবর্তন ঘটে। তাঁহারা 'আকাশ' নামক একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, ইহা বৈজ্ঞানিকগণের 'ইথারের' মতো। অপর একটি শক্তির অস্তিত্বও তাঁহারা স্বীকার করেন—যাহাকে তাঁহারা বলেন 'প্রাণ'। তাঁহারা বলেন, এই বিশ্বজগৎ প্রাণের স্পন্দন হইতেই উদ্ভূত। একটি কল্পের শেষ হইলে

প্রকৃতির সকল প্রকাশই ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতর হইয়া আকাশে বিলীন হইয়া যায়। এই আকাশকে প্রত্যক্ষ অথবা স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু আকাশ হইতেই প্রত্যেক বস্তু সৃষ্ট হয়। প্রকৃতিতে যত কিছু শক্তি দেখি—মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং চিন্তা, অনুভব ও স্নায়বিক ক্রিয়া-গতি—এ-সকল বিভিন্ন প্রকারের শক্তিই এই প্রাণে বিলীন হইয়া যায়, এবং প্রাণের স্পন্দন শুব্ধ হয়। জগৎ এই অবস্থাতেই বিরাজ করে, যতদিন পর্যন্ত না নূতন কল্পের আরম্ভ হয়। সেই সময়ে পুনরায় প্রাণের স্পন্দন আরম্ভ হয়, এবং এই স্পন্দন আকাশে সঞ্চারিত হয়, যাহার ফলে এই-সকল বস্তু ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হয়।

যে-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমি আপনাদের প্রথম বলিব, তাহার নাম 'দ্বৈত-সম্প্রদায়'। দ্বৈতবাদিগণের মতে—জগতের স্রষ্টা ও শাসক ঈশ্বর সর্বদাই জীব-জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বর নিত্য, জগৎ নিত্য, জীবগণও নিত্য। জীব-জগৎ কখনও বিকশিত এবং পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বর সর্বদাই সেই একই রহিয়াছেন। পুনরায় দ্বৈতবাদিগণের মতে—গুণের জন্যই ঈশ্বর ব্যক্তি-ভাবাপন্ন, দেহের জন্য নয়। তাঁহার মানবীয় গুণ আছে। তিনি করুণাময়, ন্যায়বান্, শক্তিমান্। তিনি সর্বশক্তিমান্, তাঁহার নিকটে যাওয়া যায়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা যায়, তাঁহাকে ভালবাসা যায়। তিনিও প্রতিদানে ভালবাসেন, ইত্যাদি। এক কথায় তিনি মানবীয়গুণসম্পন্ন দেবতা, যদিও মানব অপেক্ষা অনন্তগুণ মহৎ। মানবের দোষগুলির কিছুই তাঁহার মধ্যে নাই। 'তিনি অনন্তকল্যাণ-গুণাধার'—ইহাই হইল দ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বরের সংজ্ঞা। কিন্তু তিনি তো উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারেন না, এবং প্রকৃতিই তাঁহার উপাদান—যাহা হইতে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।

এরূপ কয়েকজন দ্বৈতবাদীও আছেন যাঁহারা বেদান্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। তাঁহাদের বলা হয় 'পরমাণুকারণবাদী'। তাঁহাদের মতে জগৎ অসংখ্য পরমাণুর সমাহার মাত্র, এবং ঈশ্বরেচ্ছায় এই-সকল পরমাণু হইতে সৃষ্টি হয়। বৈদান্তিকগণ এই মতবাদ স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায়, পরমাণুরও অংশ অথবা আয়তন নাই; কিন্তু যাহার অংশ অথবা আয়তন নাই, তাহাকে অনন্তবার গুণ করিলেও তাহা পূর্ববৎই থাকিয়া যায়। যাহার অংশ নাই, তাহা কোনদিন অংশযুক্ত কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে না; এবং বহুসংখ্যক

শূন্যকে যোগ দিলে একটি পূর্ণ সংখ্যা হয় না। সেজন্য পরমাণুসমূহের যদি অংশ অথবা আয়তন না থাকে, তাহা হইলে এরূপ পরমাণু হইতে জগতের সৃষ্টি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সেইজন্য বৈদান্তিক দ্বৈতবাদিগণের মতে—অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। ভারতীয় জনসাধারণ অধিকাংশই দ্বৈতবাদী। সাধারণতঃ মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু ধারণা করা সম্ভব নয়। আমরা দেখি, পৃথিবীর ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই দ্বৈতবাদী। ইওরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার সকল ধর্মই দ্বৈতমূলক—ইহা ব্যতীত তাহাদের অপর কোন উপায়ই নাই। সাধারণ মানুষের পক্ষে নামরূপ-বিহীন কোন কিছুর ধারণা করাই অসম্ভব। যাহা তাহার বুদ্ধিগম্য, তাহাই সে আঁকড়াইয়া থাকিতে ভালবাসে। অর্থাৎ উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয়কে সে নিজের স্তরে নামাইয়া আনিয়া সেই ভাবেই কেবল ধারণা করিতে পারে। নামরূপ-বিহীনকে কেবল নামরূপ-বিমণ্ডিতরূপেই সে চিন্তা করিতে পারে। পৃথিবীর সর্বত্র ইহাই হইল জনসাধারণের ধর্ম। দ্বৈতবাদীরা এরূপ একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি মানুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; তিনি যেন একজন মহান্ সম্রাট, একজন সর্বশক্তিমান্ রাজা। কিন্তু দ্বৈতবাদীদের মতে—তিনি পার্থিব সম্রাট অপেক্ষা পবিত্রতর; তাঁহারা তাঁহাকে নিখিল-কল্যাণ-গুণবিমণ্ডিত এবং অখিল-দোষ-বিবর্জিতরূপে দর্শন করিতে চান। কিন্তু মন্দ ব্যতীত ভালোর অস্তিত্ব, অন্ধকারের ধারণা ব্যতীত আলোর ধারণা কি কোনদিন সম্ভব?

অনন্ত-কল্যাণ-গুণাধার, ন্যায়বান্, করুণাময় পরমেশ্বরের শাসনাধীন এই জগতে কিরূপে এরূপ অসংখ্য পাপের উদ্ভব হইতে পারে—ইহাই হইল সকল দ্বৈতবাদীর প্রথম সমস্যা। সকল দ্বৈতবাদী ধর্মেই এই প্রশ্নের উদয় হয়; কিন্তু ইহার উত্তরে হিন্দুগণ কোনদিনই একজন 'শয়তান' সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহারা সমস্বরে মানুষকেই ইহার জন্য দায়ী করেন এবং তাঁহাদের পক্ষে ইহা করাও সহজ। কারণ আমি আপনাদের এইমাত্র বলিয়াছি, 'শূন্য হইতে জীবের সৃষ্টি হইতে পারে'—একথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এই জীবনে দেখিতেছি, আমরা সর্বদাই আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে পারি; আমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যহ আগামী কল্যকে গড়িতে চেষ্টা করি। অদ্য আমরা আগামীকল্যের ভাগ্য নির্ধারণ করি, কল্য আমরা তাহার পরের

দিগের ভাগ্য স্থির করি—এইভাবেই আমাদের জীবন চলে। এই যুক্তি-প্রণালী আরও অতীতে প্রয়োগ করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। যদি আমাদের নিজেদের কর্মের দ্বারা আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যকে গঠিত করিতে পারি, তাহা হইলে সেই একই নিয়ম কেন অতীতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে না? যদি একটি অনন্ত শৃঙ্খলের কয়েকটি অংশ কিছু পরে পরে আবর্তিত হইতে থাকে এবং উহার একটি অংশকে আমরা ব্যাখ্যা করিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র পর্যায়টিরও ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে। এই ভাবেই যদি অনন্ত কাল-প্রবাহের একটি অংশকে আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার সম্যক্ ব্যাখ্যা করিতে পারি এবং উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই, আর পৃথিবীতে যদি সর্বদাই একই কারণ একই কার্য সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সেই সমগ্র কাল-প্রবাহেরও ব্যাখ্যা আমরা অবশ্যই করিতে পারিব। যদি ইহা সত্য হয় যে, এই পৃথিবীতে অল্পকাল থাকিবার সময় আমরা আমাদের নিজ নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, এবং যদি ইহাও সত্য হয় যে, প্রত্যেক বস্তুরই একটি কারণ থাকা অতি আবশ্যক; তাহা হইলে আমরা বর্তমানে যাহা আছি, তাহা যে আমাদের সমগ্র অতীতেরই ফল, ইহাও সত্য হইবে। এই কারণে মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা। পৃথিবীতে যে-সকল পাপ বিরাজ করিতেছে, তাহার কারণ একমাত্র আমরা নিজেরাই। আমরাই এই-সকল পাপ সৃষ্টি করিয়াছি; এবং আমরা যেমন সর্বদাই দেখি যে, পাপ হইতেই তাপের সৃষ্টি হয়, তেমনি আমরা দেখি যে, বর্তমান দুঃখ-ক্লেশের অধিকাংশই মানুষের অতীত পাপেরই ফলস্বরূপ। এই মতানুসারে একমাত্র মানুষই এক্ষেত্রে দায়ী। ঈশ্বরকে সেজন্য দোষ দেওয়া চলে না। সেই নিত্য-করুণাময় পিতাকে কোনক্রমেই দোষ দেওয়া চলে না; 'আমরা যেরূপ বীজ বপন করি, সেরূপই ফল পাই।'

দ্বৈতবাদীদের অপর একটি অভিনব মতবাদ এই : প্রত্যেক জীবই পরিশেষে মুক্তিলাভ করিবে। একজনও বাকি থাকিবে না। নানা অবস্থা-বিপর্যয় ও নানা সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া প্রত্যেকেই অবশেষে বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু কোথা হইতে বাহির হইবে? সকল হিন্দু সম্প্রদায়েরই অভিমত—সকল জীবই এই সংসারচক্র হইতে বাহির হইয়া আসিবে। যে-বিশ্বকে আমরা দেখিতেছি

এবং অনুভব করিতেছি, অথবা যে-বিশ্বের বিষয়ে আমরা কল্পনা করিতেছি— তাহাদের কোনটিই প্রকৃত সত্য হইতে পারে না, কারণ উভয়ের মধ্যেই ভালো-মন্দ সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। দ্বৈতবাদীদের মতে এই পৃথিবীর ঊর্ধ্বে এরূপ একটি স্থান আছে, যেখানে কেবলই সুখ, কেবলই পুণ্য চিরবিরাজমান। সেই স্থান লাভ করিলে জীবের আর জন্ম-মৃত্যু থাকে না, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না; এবং এই ধারণা তাঁহাদের অতি প্রিয়। সেই স্থানে রোগ নাই, মৃত্যু নাই, নিত্য সুখ বিরাজমান; এবং সেই স্থানে তাঁহারা নিত্যই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিবেন, নিত্যই তাঁহাকে উপভোগ করিবেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, নিম্নতম কীটপতঙ্গ হইতে উচ্চতম দেবদূত এবং দেবতা পর্যন্ত সকলেই, শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বে হউক, সেই স্থান লাভ করিবে, যে-স্থানে আর কোন দুঃখের অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু আমাদের এই সংসারের শেষ হইবে না, ইহা অনন্তকাল চলিতেছে; তরঙ্গভঙ্গে চলিলেও, চক্রাকারে চলিলেও ইহার শেষ নাই। অসংখ্য জীবাত্মাকে মুক্তি এবং পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। কিছু জীবাত্মা আছে বৃক্ষের মধ্যে, কিছু আছে পশুর মধ্যে, কিছু আছে মানুষের মধ্যে, কিছু দেবতার মধ্যে, কিন্তু প্রত্যেকেই এমন কি উচ্চতম দেবতারাও অপূর্ণ, বদ্ধ। এই বদ্ধাবস্থা অথবা 'বন্ধন' কিরূপ? বদ্ধাবস্থা জন্মমরণশীল অবস্থা। উচ্চতম দেবতাগণও মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই-সকল দেবতার অর্থ বিশেষ অবস্থা, বিশেষ পদ। যেমন ইন্দ্রত্ব একটি বিশেষপদ মাত্র। একজন অতি উচ্চ জীব বর্তমান কল্পের আরম্ভে এই পৃথিবী হইতেই এই পদ অলঙ্কৃত করিতে গিয়াছেন এবং বর্তমান কল্প শেষ হইলে তিনি পুনরায় এই পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, এই পৃথিবীর অপর এক অতিশয় হিতকারী ব্যক্তি পরবর্তী কল্পে ঐ পদ অধিকার করিবেন। অন্যান্য সকল দেবতার ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। তাঁহারাও বিশেষ বিশেষ পদধারী, যে-পদসমূহ লক্ষ লক্ষ জীব পর্যায়ক্রমে অধিকার করিয়াছে এবং পরে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যাঁহারা এই পৃথিবীতে পুণ্যকর্মাদি করেন এবং অন্যদের সাহায্য করেন, কিন্তু কিছুটা সকামভাবে, পুরস্কারের আশায় অথবা অন্যদের প্রশংসার লোভে, তাঁহারা নিশ্চয়ই মৃত্যুর পরে সেই-সকল পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করিবেন—তাঁহারাই এই সকল দেবতা হইবেন। কিন্তু ইহা তো মুক্তি নহে, পুরস্কারের আশায়

কৃত সকাম কর্ম দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হয় না। মানুষ যাহা কিছু কামনা করে, ঈশ্বর সে-সবই তাহাকে দান করেন। মানুষ শক্তি কামনা করে, সম্মান কামনা করে, দেবতারূপে ভোগসুখ কামনা করে; তাহাদের এই-সকল কামনা পূর্ণ হয়; কিন্তু কোন কর্মের ফলই নিত্য নহে। কিছুকাল পরে উহা নিঃশেষিত হইয়া যায়; বহুদিন স্থায়ী হইলেও ইহা নিঃশেষিত হইয়া যাইবেই; এবং সেই-সকল দেবতা পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন; এইভাবে তাঁহারা মুক্তিলাভের আর একটি সুযোগ লাভ করিবেন। পশুগণ উচ্চতর স্তরে উঠিয়া হয়তো মনুষ্যরূপে দেহধারণ করিবে, দেবতারূপও ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পর সম্ভবতঃ পুনরায় মনুষ্যরূপ ধারণ করিবে, অথবা পূর্বের মতো পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে—এইরূপে যতদিন পর্যন্ত না তাহাদের সকল ভোগ-বাসনা, পার্থিব জীবনের জন্য সকল তৃষ্ণা, এবং অহং-মমত্ববুদ্ধি লোপ পাইবে, ততদিন পর্যন্ত এইরূপই চলিতে থাকিবে। এই 'অহং-মম'-ভাবই পার্থিব সকল বন্ধনের কারণ। আপনি যদি একজন দ্বৈতবাদীকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার সন্তান কি সত্যই আপনার?'—তিনি উত্তর দিবেন, 'সে ঈশ্বরের। আমার সম্পত্তি আমার নহে, ঈশ্বরের।' সকল বস্তুকে ঈশ্বরেরই বস্তুরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য।

ভারতবর্ষের এই-সকল দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় নিরামিষভোজী, খুব অহিংসা প্রচার করে। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের মতবাদ বৌদ্ধ মতবাদ হইতে ভিন্ন। আপনি যদি একজন বৌদ্ধ-মতাবলম্বীকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কেন পশুহত্যার বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছেন?' তাহা হইলে তিনি উত্তর দিবেন, 'প্রাণী হত্যা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই।' কিন্তু আপনি যদি একজন দ্বৈতবাদীকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কেন পশুহত্যা করেন না?'—তাহা হইলে তিনি উত্তর দিবেন, 'কারণ, পশু ঈশ্বরের।' সেইজন্য দ্বৈতবাদিগণের মত—এই 'অহং-মমত্ব'-ভাব কেবলমাত্র ঈশ্বর-বিষয়েই প্রযুক্ত হওয়া কর্তব্য। একমাত্র তিনিই 'অহং' এবং সকল বস্তুই তাঁহার। যখন মানুষ 'অহং-মম'-ভাব বিসর্জন দেয়, যখন সে সব কিছুই ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করে, যখন সে সকলকেই ভালবাসে, এবং পুরস্কারের কোনরূপ আশা না করিয়া একটি পশুর প্রাণরক্ষার জন্যও প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হয়, তখন তাহার হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, এবং এরূপ বিশুদ্ধ চিত্তেই ঈশ্বর-প্রীতির উদয় হয়। ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবের

আকর্ষণ-কেন্দ্র; এবং দ্বৈতবাদী বলেন: মৃত্তিকায় আবৃত সূচ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না; কিন্তু মৃত্তিকা ধৌত হইয়া গেলেই তাহা আকৃষ্ট হইবে। ঈশ্বর চুম্বক, জীব সূচ, তাহার পাপকর্মই ধূলি এবং ময়লা, যাহা তাহাকে আবৃত করে। জীব বিশুদ্ধ হইলেই স্বভাবজ আকর্ষণ-বলে ঈশ্বরের নিকট আসিবে, ঈশ্বরের সহিত অনন্তকাল বিরাজ করিবে, কিন্তু চিরকাল সে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিবে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব ইচ্ছানুসারে যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারে; ইচ্ছা করিলে সে একই সঙ্গে একশত দেহ ধারণ করিতে পারে, অথবা একটিও দেহ ধারণ না করিতে পারে। এরূপ জীব প্রায় সর্বশক্তিমান্ হয়, সে শুধু সৃষ্টি করিতে পারে না—সৃষ্টি করিবার শক্তি কেবল ঈশ্বরেরই আছে। যতই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হউক না কেন, কেহই জগৎ-ব্যাপার পরিচালনা করিতে পারে না। এই কার্য কেবল ঈশ্বরের। কিন্তু পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে সকল জীবই অনন্তকাল আনন্দপূর্ণ হয়, এবং অনন্তকাল ঈশ্বরের সহিত বাস করে। ইহাই হইল দ্বৈতবাদীদের মত।

দ্বৈতবাদিগণ আর একটি মতও প্রচার করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট এ-ধরনের প্রার্থনা করার সম্পূর্ণ বিরোধী: প্রভু! আমাকে ইহা দাও, উহা দাও। তাঁহাদের মতে এরূপ করা কখনই উচিত নহে। যদি কেহ কোন পার্থিব দ্রব্যের জন্য প্রার্থনা করিতে চায়, তাহা হইলে নিম্নতর কাহারও নিকটেই সেই প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত—কোন দেবতা, দেবদূত অথবা পূর্ণতাপ্রাপ্ত মুক্ত জীবের নিকটই কেবল পার্থিব বস্তু চাহিতে হয়। ঈশ্বরকে কেবল ভালবাসা কর্তব্য। 'প্রভু! আমাকে ইহা দাও, উহা দাও' এইভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা ধর্মের দিক হইতে ঘোরতর অন্যায়। অতএব দ্বৈতবাদীদের মতে—দেবতাদের একজনকে আরাধনা করিয়া মানুষ যাহা কামনা করে, তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে লাভ করে, কিন্তু যদি সে মুক্তি চায়, তাহা হইলে তাহাকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। ইহাই ভারতবর্ষের জনসাধারণের ধর্ম।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতবাদে প্রকৃত বেদান্ত-দর্শনের আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের মতে—কার্য কখনও কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কার্য কারণেরই রূপভেদ মাত্র। যদি জগৎ কার্য হয় এবং ঈশ্বর কারণ হন, তাহা হইলে জগৎ ঈশ্বর স্বয়ং; জগৎ—ঈশ্বর ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন,

ঈশ্বর জগতের উপাদান-ও নিমিত্ত-কারণ; তিনিই স্রষ্টা, এবং তিনিই সেই উপাদান—যাহা হইতে সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। আপনাদের ভাষায় যাহাকে 'সৃষ্টি' বলা হয়, তাহার কোন প্রতিশব্দ সংস্কৃতে নাই, যেহেতু ভারত-বর্ষের কোন সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্য মতানুযায়ী শূন্য হইতে জগৎসৃষ্টি স্বীকার করেন না। মনে হয়, এক সময়ে এই মতবাদের সমর্থক কয়েকজন ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মতবাদ অতি শীঘ্রই নিরাকৃত হইয়া যায়। বর্তমানে আমি এমন কোন সম্প্রদায় জানি না, যাঁহারা এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'সৃষ্টি' বলিতে আমরা বুঝি—যাহা পূর্ব হইতেই আছে, তাহারই বহিঃপ্রকাশ। এই সম্প্রদায়ের মতানুসারে সমগ্র জগৎই স্বয়ং ঈশ্বর। তিনিই জগতের উপাদান। আমরা বেদে পাঠ করি: উর্ণনাভ যেমন নিজের দেহ হইতে তন্তু বয়ন করে, তেমনি সমগ্র জগৎ সেই পরম সত্তা হইতে বাহির হইয়াছে।

কার্য যদি কারণের রূপান্তর মাত্র হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে: অ-জড় কিন্তু নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর হইতে কিরূপে জড় অচেতন জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে? যদি কারণ শুদ্ধ ও পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কার্য অশুদ্ধ ও অপূর্ণ হয় কি করিয়া? এ-বিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কি বলেন? তাঁহাদের মতবাদ একটু অদ্ভুত। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর জীব ও জগৎ—এই তিনটি ভাব বা সত্তা অভিন্ন। ঈশ্বর যেন আত্মা, জীব-জগৎ তাঁহার দেহ। যেমন আমাদের দেহ আছে, আত্মাও আছে, তেমনি সমগ্র জগৎ এবং সকল জীবই ঈশ্বরের দেহ, এবং ঈশ্বর সকল আত্মার আত্মা। এইরূপে ঈশ্বরই জগতের উপাদান-কারণ। দেহ পরিবর্তিত হইতে পারে, তরুণ বা বৃদ্ধ হইতে পারে, সবল বা দুর্বল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। আত্মা সর্বদাই সেই চিরন্তন সত্তা, যাহা দেহের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। দেহ আসে, যায়; কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন নাই। তেমনি সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের দেহ, এবং সেই অর্থে জগৎ স্বয়ং ঈশ্বর। কিন্তু জাগতিক পরিবর্তনে ঈশ্বর পরিবর্তিত হন না। এরূপ উপাদান হইতে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং একটি কল্পের শেষে তাঁহার দেহ সূক্ষ্মতর হইয়া যায়, সঙ্কুচিত হয়। আর একটি কল্পের প্রারম্ভে তাহা আবার প্রসারিত হয় এবং তাহা হইতেই এই-সকল বিভিন্ন বিশ্ব প্রকাশিত হয়।

দ্বৈতবাদী এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—উভয়েই স্বীকার করেন, আত্মা স্বভাবতই শুদ্ধ, কিন্তু স্বকর্মদোষে অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ দ্বৈতবাদিগণ অপেক্ষা আরও সুন্দর ভাবে এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন, জীবের শুদ্ধতা এবং পূর্ণতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং পুনরায় বিকশিত হয়। আমরা বর্তমানে আত্মার এই স্বভাবগত জ্ঞান, শুদ্ধতা ও শক্তি পুনঃপ্রকাশিত করিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছি। আত্মার বহু গুণ আছে, কিন্তু এই জীবাত্মা সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ নয়। প্রত্যেক অসৎ কর্ম আত্মার স্বরূপকে সঙ্কুচিত করে, এবং প্রত্যেক সৎ কর্ম তাহাকে প্রসারিত করে, সকল জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশ। 'জ্বলন্ত অগ্নি হইতে যেমন লক্ষ লক্ষ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, অনন্তরূপ ঈশ্বর হইতেও তেমনি এই-সকল আত্মা নির্গত হইয়াছে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের ঈশ্বরও ব্যক্তিভাবাপন্ন, অনন্ত-কল্যাণ-গুণাধার; কেবল তিনি জগতের সর্বত্রই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি সর্ব বস্তুতে, সকল স্থানে অন্তর্লীন হইয়া আছেন; যখন শাস্ত্র বলেন—ঈশ্বরই সব, ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর সর্ববস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন; তিনি যে দেওয়াল হইয়াছেন, তাহা নহে; তিনি দেওয়ালের মধ্যে নিহিত হইয়া আছেন। পৃথিবীতে এমন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ, এমন একটি অণু-পরমাণু নাই, যাহাতে তিনি নাই। সকল জীবাত্মাই সসীম; তাহারা সর্বব্যাপী নয়। যখন তাহাদের শক্তি বিকশিত হয় এবং তাহারা পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহাদের আর জন্ম-মৃত্যু থাকে না; তাহারা ঈশ্বরের সহিত অনন্তকাল বাস করিতে থাকে।

এইবার আমরা অদ্বৈতবাদ-প্রসঙ্গে আসিলাম। আমাদের মতে ইহাই হইল সকল দেশের, সকল যুগের প্রকৃত দর্শন এবং ধর্মের শেষ ও সুন্দরতম পুষ্প—ইহাতেই মানবীয় চিন্তার উচ্চতম বিকাশ দৃষ্ট হয়; যে-রহস্য অভেদ্য বলিয়াই বোধ হয়, তাহাও অদ্বৈতবাদ ভেদ করিয়াছে। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদী বেদান্ত। অদ্বৈতবাদ এরূপ নিগূঢ়—এরূপ উচ্চ যে, ইহা জনসাধারণের ধর্ম হইতে পারে না। যে-ভারতবর্ষে ইহার জন্ম এবং যেখানে ইহা বিগত তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করিতেছে, সেখানেও ইহা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। আমরাও ক্রমশঃ দেখিব যে, যে-কোন দেশের অতি চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষেও অদ্বৈতবাদ হৃদয়ঙ্গম করা

কঠিন। আমরা নিজেদের এরূপ দুর্বল, এরূপ হীন করিয়া ফেলিয়াছি যে, আমরা বড় বড় দাবি করিতে পারি, কিন্তু স্বভাবতঃ আমরা অন্যের উপর নির্ভর করিতে চাই। আমরা যেন ক্ষুদ্র দুর্বল চারাগাছের মতো—সর্বদাই একটা অবলম্বন চাই। কতবার একটি সহজ আরামের ধর্ম সম্বন্ধে বলিবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। অতি অল্প লোকই সত্যের কথা শুনিতে চান, অল্পতর লোক সত্য জানিতে সাহসী হন, অল্পতম লোক সেই সত্যকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহসী হন। ইহা তাঁহাদের দোষ নয়, ইহা তাঁহাদের মস্তিষ্কের দুর্বলতা। যে-কোন নূতন তত্ত্ব—বিশেষ করিয়া উচ্চ তত্ত্ব—বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, মস্তিষ্কের ভিতর যেন একটি নূতন চিন্তা-প্রণালী উদ্ভাবনের চেষ্টা করে; এবং ইহাতে মানুষের সমগ্র জীবন বিপর্যস্ত হইয়া যায়, এবং মানুষ সমতা হারাইয়া ফেলে। তাহারা পূর্ব হইতেই বিশেষ ধরনের পরিবেশে অভ্যস্ত; এবং সেইজন্য তাহাদের প্রাচীন পরিবারিক, নাগরিক শ্রেণীগত, দেশগত বহু এবং বিবিধ কুসংস্কার, সর্বোপরি প্রত্যেক মানুষের স্বীয় অন্তর্নিহিত বহু কুসংস্কার জয় করিতে হয়। তাহা সত্ত্বেও পৃথিবীতে এরূপ কয়েকজন সাহসী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিতে সাহসী হন, সত্য গ্রহণে সাহসী হন, শেষ পর্যন্ত সত্য অনুসরণ করিতে সাহসী হন।

অদ্বৈতবাদী কি বলেন? তিনি বলেন: যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জগতের নিমিত্ত- এবং উপাদান-কারণ। তিনি যে কেবল স্রষ্টা—কারণ, তাহাই নহে, সৃষ্ট কার্যও। তিনি স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ইহা কিরূপে সম্ভব? শুদ্ধ আত্মা ঈশ্বরই কি জীবজগতে পরিণত হইয়াছেন? হাঁ, আপাতদৃষ্টিতে ইহাই তো সত্য। অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাকে বিশ্ব-সংসাররূপে গ্রহণ করে, তাহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। তাহা হইলে তুমি, আমি এবং অন্যান্য দৃষ্ট বস্তুসমূহ কি? তাহা কেবল আত্মসম্মোহন—প্রকৃতপক্ষে অনন্ত অসীম নিত্যমঙ্গলময় সত্তাই একমাত্র সত্তা। এই সত্তাতেই আমরা এই-সকল স্বপ্ন দেখি। তিনিই আত্মা—সকল বস্তুর ঊর্ধ্বে, অনন্ত অসীম, সকল জ্ঞাত-জ্ঞেয়ের ঊর্ধ্বে। তাঁহারই মধ্যে, তাঁহারই মাধ্যমে আমরা বিশ্বকে দেখি। তিনিই একমাত্র সত্তা। তিনিই এই 'টেবিল'; তিনিই এই সম্মুখস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী, তিনিই এই কক্ষপ্রাচীর, তিনিই সকল

বস্তু, কেবল তাহাদের বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন নাম ও রূপ তাঁহার নাই। এই 'টেবিলের' নাম বর্জন কর, বিশেষ রূপ অথবা আকারাদি বর্জন কর; যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই তিনি। বৈদান্তিক তাঁহাকে পুরুষও বলেন না, নারীও বলেন না—এই-সকল বর্ণনাই কল্পনা, মনুষ্য-মস্তিষ্কজাত মোহ-ভ্রান্তি মাত্র; প্রকৃতপক্ষে আত্মার মধ্যে নরনারী-ভেদ নাই। যাহারা মোহগ্রস্ত ভ্রান্ত, যাহারা পশুবৎ, তাহারাই কেবল নারীকে নারী, পুরুষকে পুরুষরূপে দর্শন করে। যাঁহারা সবকিছুর ঊর্ধ্বে, তাঁহারা নরনারীর ভিতর ভেদ করিবেন কিরূপে? সকল বস্তু, সকল জীবই আত্মা—লিঙ্গবিহীন, শুদ্ধ, চিরমঙ্গলময় আত্মা। নাম, রূপ—দেহই কেবল জড়; এবং ইহারাই সকল ভেদের স্রষ্টা। নাম ও রূপ, এই উভয় প্রকারের ভেদ যদি বর্জন করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই এক হইয়া যাইবে। কোন স্থানেই 'দুই' নাই, সর্বত্রই আছে মাত্র সেই 'এক'। তুমি ও আমি এক। প্রকৃতি নাই, ঈশ্বরও নাই, বিশ্বও নাই; আছে কেবল এই এক অনন্ত অসীম সত্তা, যাহা হইতে নাম-রূপের মাধ্যমে সকল বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইবে? ইহা জানা যায় না। তোমার আত্মাকে তুমি দেখিবে কিরূপে? তুমি কেবল নিজেকে প্রতিবিম্বিত করিতে পারো। এই ভাবেই সেই এক নিত্য সত্তা আত্মার প্রতিবিম্বই সমগ্র বিশ্ব; এবং ভাল-মন্দ দর্পণের উপর পড়িলে ভাল-মন্দ প্রতিবিম্বের উদ্ভব হয়। হত্যাকারীর ক্ষেত্রে প্রতিফলক-দর্পণটি মলিন বা মন্দ, আত্মা নহেন। একজন সাধুর ক্ষেত্রে দর্পণটি শুদ্ধ। আত্মা স্বভাবতই শুদ্ধ। জগতে ইনিই সেই এক, সেই একক সত্তা, যিনি নিম্নতম কীট-পতঙ্গ হইতে উচ্চতম প্রাণীতে পর্যন্ত সর্বত্র নিজেকে প্রতিবিম্বিত করিতেছেন। দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সব দিক দিয়া সমগ্র বিশ্ব সেই এক অখণ্ড সত্তারূপে বিরাজমান। আমরা এই এক সত্তাকে বিভিন্ন রূপে দর্শন করি, সেই এক সত্তার উপরেই বিভিন্ন আকৃতি সৃষ্টি করি। যিনি নিজেকে মানব-স্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই সত্তা মানুষের জগৎরূপেই প্রতিভাত হয়। যিনি উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই সত্তা স্বর্গরূপে প্রতিভাত হয়। বিশ্বজগতে কেবল একটি সত্তাই রহিয়াছে, দুইটি নাই। তাঁহার আসাও নাই, যাওয়াও নাই। তাঁহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, পুনরায় দেহধারণও নাই। তাঁহার

মৃত্যু হইবে কিরূপে? তিনি কি কোন স্থানে গমন করিতে পারেন? এই-সকল স্বর্গ, এই-সকল ভুবন, এই-সকল স্থান মনের মিথ্যা কল্পনা মাত্র। তাহাদের কোন অস্তিত্বই নাই, অতীতেও ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকিবে না।

আমি সর্বব্যাপী, নিত্য। আমি কোথায় গমন করিতে পারি? আমি কোথায় না আছি? আমি প্রকৃতির এই পুস্তকটি পাঠ করিতেছি। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়িয়া শেষ করিতেছি, এবং পাতা উল্টাইয়া যাইতেছি, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের এক একটি স্বপ্ন বিলীন হইয়া যাইতেছে। জীবনের আর একটি পৃষ্ঠা উল্টানো হইল, আর একটি স্বপ্নেরও উদয় হইল, ইহাও বিলীন হইয়া যাইতেছে, ক্রমান্বয়ে চলিয়া যাইতেছে, আমি আমার পাঠ শেষ করিতেছি। আমি এগুলিকে চলিয়া যাইতে দিই, একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াই। পুস্তকটি ফেলিয়া দিই, এবং সমস্ত ব্যাপারটি পরিসমাপ্ত হইয়া যায়।

অদ্বৈতবাদী কি প্রচার করেন? অতীতে যে-সকল দেবতা ছিলেন, এবং ভবিষ্যতেও যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন মানবাত্মাকে, যে আত্মা সূর্য-চন্দ্র অপেক্ষা মহত্তর, স্বর্গ অপেক্ষাও উচ্চতর, এই বিশাল জগৎ অপেক্ষাও বিশালতর।

যে আত্মা জীবাত্মা-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার মহিমা কোন গ্রন্থ, কোন শাস্ত্র, কোন বিজ্ঞান কল্পনাও করিতে পারে না। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমময় দেবতা, যিনি চিরদিন বিরাজমান; তিনিই একমাত্র দেবতা, যিনি অতীতেও ছিলেন, বর্তমানেও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন। সুতরাং আমাকে একমাত্র আমার আত্মাকেই উপাসনা করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদী বলেন: আমি আমার আত্মাকেই উপাসনা করি। কাহার সম্মুখে আমি প্রণত হইব? আমি আমার আত্মাকেই প্রণাম করি। কাহার নিকট আমি সাহায্যের জন্য যাইব? বিশ্বব্যাপী অসীম সত্তা 'আমাকে' কে সাহায্য করিতে পারে? এগুলি কেবল মূর্খের স্বপ্ন, ভ্রান্তি মাত্র। কে কবে কাহাকে সাহায্য করিয়াছে? কেহই নহে। যখনই দেখিবে যে, একজন দুর্বল ব্যক্তি—একজন দ্বৈতবাদী স্বর্গ হইতে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া রোদন ও আর্তনাদ করিতেছে, তখনই জানিও সে এরূপ করিতেছে, কারণ সে জানে না—সেই স্বর্গ তাহার নিজেরই মধ্যে বিরাজমান। সে স্বর্গ হইতে সাহায্য চায়, এবং সেই সাহায্য সে পায়। আমরা দেখি সেই সাহায্য আসে;

কিন্তু তাহা আসে তাহার নিজের ভিতর হইতে, যদিও সে ইহাকে বাহিরের সাহায্য বলিয়া ভ্রম করে। কোন কোন সময়ে এরূপ ঘটে যে, শয্যাশায়ী অসুস্থ ব্যক্তি দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিতে পায়। সে উঠিয়া দ্বার খোলে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পায় না। তখন সে শয্যায় ফিরিয়া আসে; কিন্তু পুনরায় সে দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিতে পায়। সে আবার উঠিয়া দ্বার খোলে। সেখানে কেহ নাই। অবশেষে সে আবিষ্কার করে, তাহার নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দকেই সে দ্বারে করাঘাতের শব্দ বলিয়া মনে করিতেছিল। একইভাবে দেবতাকে বাহিরে বৃথা অন্বেষণ করিবার পর মানুষের পরিক্রমা সমাপ্ত হয়, যে-স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই স্থানেই সে ফিরিয়া আসে—সেই মানবাত্মায়; তখন সে বুঝিতে পারে, যে-ঈশ্বরকে সে এতকাল ধরিয়া সর্বত্র অন্বেষণ করিতেছে—বনে পর্বতে, প্রত্যেক নদী-নালায়, প্রত্যেক মন্দিরে গির্জায় এবং স্বর্গে, সেই ঈশ্বর—যাঁহাকে সে এতকাল ধরিয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্য-শাসনকারী বলিয়া কল্পনা করিয়া আসিতেছে, সেই ঈশ্বর সে নিজেই। আমিই তিনি, এবং তিনিই আমি। আমি ব্যতীত অপর কোন ঈশ্বর ছিলই না এবং এই ক্ষুদ্র আমির অস্তিত্বও কোনদিন ছিল না।

তাহা সত্ত্বেও সেই পূর্ণ নির্দোষ ঈশ্বর কিরূপে মোহগ্রস্ত হইলেন? তিনি কদাপি মোহগ্রস্ত হন নাই। পূর্ণ নির্দোষ ঈশ্বর কিরূপে স্বপ্ন দেখিতে পারেন? তিনি কখনও স্বপ্ন দেখেন নাই। সত্য কখনও স্বপ্ন দেখে না। 'কোথা হইতে এই মিথ্যা মোহের উৎপত্তি হইল?'—এই প্রশ্নটিই অযৌক্তিক। মোহ হইতেই মোহের উৎপত্তি। সত্য-দর্শন হইলেই মিথ্যা মোহের বিলয় ঘটে। মোহের ভিত্তিতেই মোহের স্থিতি—ঈশ্বরের, সত্যের অথবা আত্মার ভিত্তিতে নহে। তুমি কখনও মোহে বিরাজ কর না, মোহই তোমার মধ্যে থাকে। একটি মেঘ ভাসিতেছে, অপর একটি মেঘ আসিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া নিজে তাহার স্থান অধিকার করে। তারপর অপর একটি মেঘ আসিয়া তাহাকেও সরাইয়া দিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। যেরূপ শাশ্বত নীল আকাশে নানা বর্ণের মেঘ আসে, অল্পক্ষণের জন্য থাকে, তার পর চলিয়া যায়, আকাশ পূর্বের মতো নীলই থাকে, সেইরূপ তোমরাও চিরকাল শুদ্ধ, চিরকাল পূর্ণ। তোমরাই পৃথিবীর প্রকৃত দেবতা; না, দ্বিতীয় কোনকালেই নাই—কেবল 'একই' সর্বদা আছেন। 'তুমি এবং

আমি'—এরূপ বলাই তো ভুল। বরং 'আমি'। 'আমিই' লক্ষ লক্ষ মুখে খাইতেছি; আমি কিরূপে ক্ষুধার্ত হইতে পারি? এই 'আমিই' অসংখ্য হস্তে কার্য করিতেছি; আমি কিরূপে নিষ্ক্রিয় হইতে পারি? 'আমিই' সমগ্র বিশ্বে জীবন যাপন করিতেছি; আমার মৃত্যু কোথায়? আমি সমস্ত জীবন-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে। আমি কোথায় মুক্তি অন্বেষণ করিব? কারণ আমি স্বরূপতই চিরমুক্ত। কে আমাকে বন্ধন করিতে পারে—বিশ্বের ঈশ্বর কি? পৃথিবীর শাস্ত্রসমূহ কেবল ক্ষুদ্র মানচিত্র—যে-আমি বিশ্বের একমাত্র সত্তা, তাহারই মহিমা ইহারা বর্ণনা করিতে প্রয়াসী। সুতরাং এই-সকল গ্রন্থের মূল্য আমার নিকট আর কতটুকু?—অদ্বৈতবাদী এইরূপই বলেন।

'সত্যকে জানো এবং এক নিমেষেই মুক্ত হইয়া যাও।' তখন সব অন্ধকার বিদূরিত হইয়া যাইবে। যখন মানুষ নিজেকে বিশ্বের অনন্ত অসীম সত্তার সহিত এক বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন সমস্ত ভেদ দূরীভূত হয়। যখন সকল নর-নারী, সকল দেবতা-দেবদূত, সকল পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই একত্বে দ্রবীভূত হইয়া যায়—তখন সমস্ত ভয়ও দূর হইয়া যায়। আমি কি নিজেকে আঘাত করিতে পারি? আমি কি নিজেকে হত্যা করিতে পারি? আমি কি নিজেকে আহত করিতে পারি? কাহাকে ভয় করিব? তুমি কি কোনদিন নিজেকেই ভয় করিতে পারো? তখন সকল দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। কী আমার দুঃখের কারণ হইতে পারে? আমিই তো পৃথিবীর একমাত্র সত্তা। তখন সকল ঈর্ষা দূর হইয়া যাইবে। কাহাকে আমি ঈর্ষা করিব? নিজেকে? তখন সকল মন্দ ভাব দূর হইয়া যাইবে। কাহার বিরুদ্ধে আমার মন্দ ভাব থাকিবে? নিজের বিরুদ্ধে? পৃথিবীতে 'আমি' ছাড়া আর কেহই নাই। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, ইহাই হইল জ্ঞানের একটিমাত্র পন্থা। জগতে যে বহু আছে—সেই ভেদ, সেই কুসংস্কার ধ্বংস করিয়া ফেলো। 'এই বহুবস্তুপূর্ণ জগতে সেই এককেই যিনি দর্শন করেন—এই জড় জগতের মধ্যে সেই চেতন সত্তাকেই যিনি দর্শন করেন, এই ছায়াময় পৃথিবীতে সেই সত্যকেই যিনি ধারণ করেন, তিনিই শাশ্বত শান্তি লাভ করেন, অন্য কেহ নহে, অন্য কেহই নহে।'

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার যে তিনটি স্তর আছে, এগুলি তাহারই মূলসূত্র। আমরা দেখিয়াছি, ইহার আরম্ভ হইয়াছে

'জগদ্‌বহির্ভূত ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরের' মতবাদ লইয়া। তারপর বাহির হইতে ভিতরে গিয়া ইহা 'জগতের অন্তর্যামী ঈশ্বরের' মতবাদে স্থিতি লাভ করে। পরিশেষে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে এক ও অভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়া এবং সেই এক আত্মাকে পৃথিবীর বহুরূপ প্রকাশের ভিত্তি নির্দেশ করিয়া এই আধ্যাত্মিক চিন্তা শেষ হইয়াছে। ইহাই বেদের চরম ও পরম কথা। ইহা দ্বৈতবাদ লইয়া আরম্ভ হয়, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, এবং অদ্বৈতবাদে সমাপ্ত হয়। আমরা জানি, পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায় পৌঁছিতে পারেন, এমন কি ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারেন এবং তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যক্তি এই ভাব অনুসারে কার্য করিতে পারেন। তাহা সত্ত্বেও আমরা ইহাও জানি যে, ইহারই মধ্যে আছে বিশ্বের সকল নীতি-তত্ত্ব, সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পূর্ণ ব্যাখ্যা। 'অপরের মঙ্গলসাধন কর'—ইহা সকলেই বলেন ; কিন্তু কেন ? ইহার ব্যাখ্যা কি ? কেন সকল মহৎ ব্যক্তিই সমগ্র মানবজাতির, এবং মহত্তর ব্যক্তিগণও সকল প্রাণিজগতের ভ্রাতৃত্বের বিষয় বলিয়াছেন ? কারণ তাঁহারা না জানিলেও এই-সকলের পশ্চাতে, তাঁহাদের সকল অযৌক্তিক এবং ব্যক্তিগত কুসংস্কারের মধ্যেও সকল বহুত্ববিরোধী সেই আত্মার শাশ্বত আলোকই অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল এবং দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করিতেছিল—সমগ্র বিশ্বই এক।

জ্ঞানের চরম কথা : এক অখণ্ড বিশ্ব—যাহা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া জড়রূপে, বুদ্ধির মধ্য দিয়া জীবরূপে, আত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়। পৃথিবীতে যাহাকে পাপ বা অন্যায় বলা হয়, তাহারই আবরণে যে নিজেকে আবৃত করিয়া রাখে, তাহার নিকট এই জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং কুৎসিত আকার ধারণ করে। একজন ভোগসুখকামীর নিকট এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া স্বর্গের আকার ধারণ করে, এবং পূর্ণ মানবের নিকট সবই তিরোহিত হইয়া যায় এবং সব কিছু তাঁহার নিজেরই আত্মা হইয়া দাঁড়ায়।

বস্তুতঃ সমাজের বর্তমান অবস্থায় পূর্বোক্ত সকল স্তরেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। একটি স্তর অপর স্তরকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করে না ; একটি স্তর অপর স্তরের পূর্ণতর রূপ মাত্র। অদ্বৈতবাদী অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এই কথা বলেন না যে, দ্বৈতবাদ ভ্রমাত্মক। ইহাও সত্য, কিন্তু নিম্নস্তরের সত্য,

ইহাও পূর্ণ সত্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেককেই তাহার নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে জগৎ সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করিতে দাও; কাহাকেও আঘাত করিও না, কাহাকেও স্থান দিতে অসম্মত হইও না, যে যেখানে দণ্ডায়মান আছে, সেখানেই তাহাকে গ্রহণ কর এবং যদি পারো, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া দাও, তাহাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত কর, কিন্তু তাহাকে আঘাত করিও না, ধ্বংস করিও না। পরিশেষে সকলেই সত্যে উপনীত হইবে। 'যখন হৃদয়ের সকল কামনা পরাভূত হইবে, তখনই মর্ত্য জীব অমৃতত্বের অধিকারী হইবে'—তখন জীবই স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া যাইবে।

আত্মা : তাহার বন্ধন ও মুক্তি

[আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

অদ্বৈতবাদীর মতে জগতে সত্য বস্তু একটিই আছে, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়। অন্যান্য সকল বস্তুই মিথ্যা—ব্রহ্ম হইতে মায়া-শক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত। আমাদের উদ্দেশ্য হইল পুনরায় সেই ব্রহ্মভাবে ফিরিয়া যাওয়া। আমরা প্রত্যেকেই সেই ব্রহ্ম, সেই সত্য, কিন্তু মায়া-সমন্বিত। যদি এই মায়া বা অজ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা প্রকৃতপক্ষে যাহা, তাহাই হইব। এই দর্শন অনুসারে প্রত্যেক মানুষেরই তিনটি অংশ আছে—দেহ, অন্তঃকরণ বা মন, এবং মনের পশ্চাতে আত্মা। দেহ আত্মার বাহিরের এবং মন আত্মার ভিতরের আবরণ। এই আত্মাই প্রকৃত জ্ঞাতা, প্রকৃত ভোক্তা; এই আত্মাই অন্তঃকরণের সাহায্যে দেহকে পরিচালিত করিতেছে।

জড় দেহের মধ্যে একমাত্র আত্মাই জড় নয়। যেহেতু আত্মা জড় নয়, অতএব আত্মা যৌগিক বস্তু হইতে পারে না; এবং যৌগিক পদার্থ নয় বলিয়া আত্মা প্রাকৃতিক কার্য-কারণ-নিয়মের অধীনও নয়, সেজন্য আত্মা অমর। যাহা অমর তাহা অনাদি, কেন না যাহার আদি আছে, তাহারই অন্ত আছে।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা নিরাকার; জড় ছাড়া আকার থাকিতে পারে না। সকল সাকার বস্তুরই আদি অন্ত আছে। আমরা কেহই এমন সাকার বস্তু দেখি নাই, যাহার আদি ও অন্ত নাই। শক্তি ও জড়ের সমন্বয়ে আকারের উদ্ভব হয়। এই 'চেয়ারটির' একটি বিশেষ আকার আছে; ইহার অর্থ এই যে, কিছু পরিমাণ জড়ের উপর কিছু পরিমাণ শক্তি কার্য করিয়া ঐ জড়কে একটি বিশেষ আকার ধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। এই আকারটি জড় ও শক্তির সংযোগ। এ সংযোগ শাশ্বত হইতে পারে না, এরূপ সংযোগ কালক্রমে ভাঙিয়া যায়। এই কারণে সকল আকারই আদি- এবং অন্ত-বিশিষ্ট। আমরা জানি, আমাদের দেহ বিনষ্ট হইবে; ইহার আরম্ভ বা আদি ছিল, একদিন শেষ হইবে। কিন্তু আকার নাই বলিয়া আত্মা এই আদি-অন্তের নিয়মাধীন নয়। আত্মা অনাদিকাল হইতেই আছে; কাল যেমন শাশ্বত, মানবের আত্মাও তেমনি শাশ্বত। দ্বিতীয়তঃ আত্মা নিশ্চয়ই সর্বব্যাপী। কেবল সাকার বস্তুই দেশকাল দ্বারা সৃষ্ট এবং সীমাবদ্ধ; যাহা নিরাকার, তাহা দেশকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈত-বেদান্তমতে—আমার, তোমার, সকলের মধ্যে আত্মা সর্বব্যাপী। তুমি যেমন পৃথিবীতে আছ, তেমনি সূর্যেও আছ; যেমন আমেরিকায় আছ, তেমনি ইংলণ্ডেও আছ। কিন্তু আত্মা দেহমনের মাধ্যমেই কার্য করে, এবং যেখানে দেহমন আছে, সেখানে তাহার কার্যও দৃষ্ট হয়।

আমাদের প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তা মনে একটি ছাপ রাখিয়া যায়, এগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় 'সংস্কার'; এবং এই-সকল সংস্কার মিলিত হইয়া একটি প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি করে, যাহাকে বলা হয় 'চরিত্র'। মানুষের চরিত্র মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে; চরিত্র তাহার নিজের মানসিক এবং দৈহিক কার্যাবলীর ফল মাত্র। সংস্কারসমূহের সমন্বয়ই হইল সেই শক্তি, যাহা মৃত্যুর পরে মানুষের নূতন জীবন নির্দিষ্ট করে। একজন মানুষের মৃত্যু হয়, তাহার দেহপাত হয় এবং সেই দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু সংস্কারসমূহ মনের ভিতর থাকিয়া যায়। এই মন সূক্ষ্মতর জড় বস্তু বলিয়া বিলীন হয় না, কারণ বস্তু যত সূক্ষ্ম হয়, তত স্থায়ী হয়। কিন্তু পরিশেষে মনও লয় পায়, এবং ইহারই জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। এই প্রসঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট একটি উদাহরণের কথা আমার মনে পড়িতেছে, তাহা হইল ঘূর্ণিবায়ু। বিভিন্ন দিক

হইতে বিভিন্ন বায়ু-প্রবাহ আসিয়া একস্থানে সমবেত হয়, এবং ঘুরিতে আরম্ভ করে। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা নিকটের কাগজ, খড়কুটা প্রভৃতি টানিয়া লইয়া একস্থানে ধূলিময় আকার ধারণ করে; আবার তাহা ফেলিয়া দিয়া, অন্য স্থানে যাইয়া অন্য আকারে ঘুরিতে থাকে, এইরূপে সম্মুখে যাহা আছে, তাহা আকর্ষণ করিয়া পুনরায় বিভিন্ন আকার ধারণ করে। সংস্কৃতে যাহাকে 'প্রাণ-শক্তি' বলে, তাহাও এইভাবে একত্র হইয়া জড় পদার্থ হইতে দেহ ও মন সৃষ্টি করে; যতক্ষণ না ঐ দেহের পতন হয়, ততক্ষণ সে সক্রিয়ভাবে কায করিতে থাকে; ঐ দেহনাশের পর নূতন উপাদান হইতে প্রাণশক্তি অপর একটি দেহ সৃষ্টি করে, সেই দেহের বিনাশের পর আবার অপর একটি দেহ সৃষ্টি করে—এইভাবেই এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। শক্তি জড়-পদার্থ ব্যতীত চলিতে পারে না। সেজন্য দেহপাতের পরেও মনের উপাদান থাকে, প্রাণ সংস্কাররূপে মনের উপর কার্য করে; এবং মন তখন অন্য স্থানে গিয়া নূতন উপাদান হইতে অপর একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি করে এবং নূতন যাত্রা আরম্ভ করে; এইভাবে মন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিভ্রমণ করে, যতক্ষণ না গতিবেগ শেষ হয়, ততক্ষণ চলিতে থাকে; পরে পড়িয়া যায়, ইহার গতিবেগ সমাপ্ত হয়। এইভাবে যখন মনের নাশ হইবে, কোন সংস্কার না রাখিয়াই মন একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইব, কিন্তু তাহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা বদ্ধই থাকিব। মনের ঘূর্ণিতে সমাচ্ছন্ন আত্মা কল্পনা করিতেই থাকিবে, আমি স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতেছি। যখন এই ঘূর্ণি বা আবর্ত চলিয়া যাইবে, তখন আত্মা জানিতে পারিবে, সে সর্বব্যাপী, সে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, এবং সে যত ইচ্ছা তত দেহ-মন সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত আত্মা কেবল ঘূর্ণির সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে পারে। এই মুক্তিই হইল লক্ষ্য—যেখানে পৌঁছিবার জন্য আমরা সকলেই অগ্রসর হইতেছি।

মনে করুন, এই কক্ষে একটি 'বল' আছে এবং আমাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি করিয়া লাঠি আছে। আমরা সেই লাঠি দিয়া বলটিকে শতবার আঘাত করিতেছি, এক স্থান হইতে অপর স্থানে ঠেলিয়া দিতেছি, যতক্ষণ না বলটি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যায়। কিরূপ বেগে এবং কোন্ দিকে বলটি যাইবে? কক্ষের ভিতর যে-সকল শক্তি এ যাবৎ বলটির উপর কার্য

করিতেছিল, সেগুলির দ্বারাই ইহা নিরূপিত হইবে। বলটির উপর যে-সকল বিভিন্ন আঘাত করা হইয়াছিল, সেগুলি স্ব স্ব ফল প্রসব করিবে। আমাদের প্রত্যেক মানসিক ও দৈহিক কর্মই এরূপ এক একটি আঘাত। মানব-মনও একটি 'বল'—মনকেও আঘাত করা হইতেছে। পৃথিবীর এই কক্ষে আমরা সর্বদাই এইভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইতেছি, এবং এখান হইতে আমাদের নিষ্ক্রমণ এই-সকল আঘাতের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'বলটির' গতিবেগ ও গতির দিক আঘাতগুলির দ্বারাই নিরূপিত হয়; তেমনি আমাদের এই জন্মের কর্মসমূহ আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন স্থির করিবে। আমাদের বর্তমান জন্ম আমাদের অতীত কর্মের ফল। একটি দৃষ্টান্ত: মনে কর, আমি তোমাকে একটি অনন্ত সীমাহীন শৃঙ্খল দিলাম—তাহার কড়াগুলি পর পর একটি শ্বেত, একটি কৃষ্ণ; ইহার আরম্ভ নাই, শেষও নাই। মনে কর, আমি তোমাকে সেই শৃঙ্খলটির স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। শৃঙ্খলটি উভয় দিক হইতে অনন্ত অসীম বলিয়া প্রথমে ইহার আরম্ভ এবং শেষ স্থির করা তোমার পক্ষে কষ্টকর হইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে জানিতে পারিবে—ইহা একটি শৃঙ্খল। শীঘ্রই তুমি আবিষ্কার করিবে, এই অনন্ত শৃঙ্খলটি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দুইপ্রকার অংশের পুনরাবৃত্তি মাত্র, এবং এই দুইটি অংশকেই অনন্ত বার গুণ করিলে সমগ্র শৃঙ্খলটি পাওয়া যায়। যদি তুমি এই-সকল অংশের স্বরূপ জানো, তাহা হইলে তুমি সমগ্র শৃঙ্খলটিরও স্বরূপ জানিবে, যেহেতু ইহা সেই অংশসমূহের শুধু পুনরাবৃত্তি মাত্র। একই ভাবে আমাদের সমগ্র জীবন—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—যেন একটি অনন্ত শৃঙ্খল, ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই; ইহার প্রত্যেকটি অংশ এক একটি জীবন, এবং এই জীবনের দুইটি দিক—জন্ম ও মৃত্যু। আমরা যাহা হই এবং যাহা করি, সে-সবই বারংবার সামান্য পরিবর্তিত আকারে পুনরাবর্তিত হইতেছে। সুতরাং আমরা যদি এই দুইটি অংশকে জানি, তাহা হইলে জগতে যে-সকল পথ আমাদের অতিক্রম করিতে হইবে, সে-সবই আমরা জানিতে পারিব। এক্ষণে দেখিতেছি যে, বর্তমান জীবনে আমরা যে যে-পথে যাইতেছি, তাহা অতীত জীবনে আমরা যে যে-পথে গিয়াছি, তাহা দ্বারাই স্থিরীকৃত হইতেছে। আমাদের নিজেদের কর্মানুসারেই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। আমরা যেমন নিজেদের বর্তমান কর্মফলগুলি লইয়া পৃথিবী হইতে

চলিয়া যাই, তেমনি নিজেদের প্রাক্তন কর্মফলগুলি লইয়া এই পৃথিবীতে আসি ; যাহা আমাদিগকে পৃথিবী হইতে লইয়া যায়, তাহাই আমাদিগকে পৃথিবীতে লইয়া আসে। কোন্ শক্তি আমাদের পৃথিবীতে লইয়া আসে ?—আমাদের প্রাক্তন কর্ম। কে লইয়া যায় ?—আমাদের নিজেদের ইহলোকের কর্মসকল। যেমন 'গুটিপোকা' নিজের মুখ হইতে তন্তু বাহির করিয়া 'রেশম-গুটি' নির্মাণ করে এবং পরিশেষে সেই 'রেশম-গুটির' ভিতর নিজেই আবদ্ধ হইয়া যায়, সেরূপ আমরাও নিজেদের কর্ম দ্বারা নিজদিগকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি, আমরাও আমাদের চারিদিকে নিজেদের কর্মজাল বুনিয়াছি। আমরাই কার্য-কারণ-নিয়মকে চালু করিয়াছি, এবং এখন তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন বলিয়া বোধ করিতেছি। আমরাই সংসার-চক্রকে গতিশীল করিয়াছি, এবং এখন সেই চক্রতলে পিষ্ট হইতেছি। সুতরাং এই দার্শনিক মতবাদ আমাদের ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা সকলে একই প্রকারে আমাদের নিজেদের কর্ম—পাপ-পুণ্য দ্বারা আবদ্ধ হইতেছি।

আত্মা কখন চলিয়াও যায় না, আসেও না, জন্মগ্রহণও করে না, মৃত্যু-মুখেও পতিত হয় না। ইহা আত্মার সম্মুখস্থ প্রকৃতিরই গতি ; এই গতির প্রতিবিম্ব আত্মায় পড়ে ; তাহাতে আত্মা অজ্ঞানবশতঃ মনে করে, সে-ই গমনাগমন করিতেছে, প্রকৃতি নহে। যখন আত্মা এইরূপ মনে করে, তখন সে বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যখন সে জানিতে পারে—তাহার গতি নাই, সে সর্বব্যাপী, তখন সে মুক্তিলাভ করে। বদ্ধ আত্মাকে 'জীব' বলা হয়। এরূপে তোমরা দেখিতেছ, যখন বলা হয়—আত্মা আসিতেছে ও যাইতেছে, তখন তাহা কেবল বুঝিবার সুবিধার জন্যই বলা হয়, যেমন জ্যোতির্বিদ্যা-পাঠের সুবিধার জন্য তোমাদের মনে করিতে বলা হয়, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, যদিও তাহা সত্য নহে। এইভাবে জীব উচ্চতর অথবা নিম্নতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই হইল সেই সুপরিচিত জন্মান্তরবাদ, এবং সমগ্র সৃষ্টি এই নিয়মের অধীন।

মানুষ যে পশু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এই দেশের জনসাধারণের নিকট অতি বীভৎস বলিয়া বোধ হয়। কেন ? এই-সকল লক্ষ লক্ষ পশুর শেষ গতি কি ? তাহারা কি কিছুই নহে ? আমাদের যদি আত্মা থাকে, তাহা হইলে তাহাদেরও তো আত্মা আছে ; তাহাদের যদি আত্মা না থাকে,

আমাদেরও আত্মা নাই। কেবল মানুষেরই আত্মা আছে, পশুর নাই—ইহা বলা অতি অযৌক্তিক। পশুর অধম মানুষও আমি দেখিয়াছি।

মানুষের আত্মা সংস্কার অনুসারে নিম্ন হইতে উচ্চতর শরীরে পরিভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু কেবল উচ্চতম মনুষ্যশরীরেই তাহার মুক্তিলাভ হয়। এই মনুষ্য-আকার, এমন কি দেবদূতের আকার অপেক্ষাও উচ্চতর, সকল প্রকার জীব হইতে উচ্চ মানুষই পৃথিবীর মহত্তম জীব, কারণ মানুষই মোক্ষলাভ করে।

এই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থিত ছিল, এবং যেন তাঁহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এরূপে যে-উৎস হইতে জগৎ বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেইখানে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছে, যেরূপ ডায়নামো (dynamo) হইতে উৎপন্ন হইয়া বিদ্যুৎ একটি বৃত্ত (circuit) সম্পূর্ণ করিয়া ডায়নামোতেই প্রত্যাবর্তন করে। আত্মার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে। ব্রহ্ম হইতে বাহির হইয়া আত্মা বিবিধ উদ্ভিদ্ ও পশুর মধ্য দিয়া অবশেষে মনুষ্যশরীরে উপস্থিত হয়; এবং মানবই ব্রহ্মের নিকটতম। যে ব্রহ্ম হইতে আমরা বাহির হইয়া আসিয়াছি, তাঁহাতে ফিরিয়া যাওয়াই মহান্ জীবন-সংগ্রাম। মানুষ ইহা জানুক বা নাই জানুক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। পৃথিবীতে আমরা যাহা কিছু গতিময় দেখি, খনিজ পদার্থে, বৃক্ষ-লতায় অথবা পশুপক্ষীতে যাহা কিছু সংগ্রাম দেখি, সবই সেই এক কেন্দ্রস্থলে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিশ্রামলাভের প্রচেষ্টা মাত্র। পূর্বে সাম্যাবস্থা ছিল, পরে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং সকল অংশ—অণু-পরমাণু সেই বিনষ্ট সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই সংগ্রামে তাহারা মিলিত হইয়া নূতন নূতন ভাবে সৃষ্ট হইতেছে, এইভাবেই প্রকৃতির সকল অত্যাশ্চর্য বস্তুর উদ্ভব হইতেছে। প্রাণিজগতে, উদ্ভিদ্‌জগতে এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই সকল সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা, সকল সামাজিক সংঘর্ষ ও যুদ্ধ, সেই সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য শাশ্বত সংগ্রাম ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

জন্ম হইতে মৃত্যুর দিকে এই গতি—এরূপ বিচরণকেই সংস্কৃতে বলা হয় 'সংসার'; আক্ষরিক অর্থে বলা হয়—জন্ম-মরণ-চক্র। সকল সৃষ্ট বস্তুই এই চক্র পরিক্রমণ করিয়া শীঘ্র বা বিলম্বে মোক্ষলাভ করিবে। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি আমরা সকলেই ভবিষ্যতে মুক্তিলাভে অধিকারী হই, তাহা হইলে

তাহার জন্য আবার সংগ্রামের প্রয়োজন কি? যদি প্রত্যেকেই মুক্ত হইবে, তাহা হইলে আমরা বসিয়া থাকিব এবং অপেক্ষা করিব। ইহা সত্য যে, শীঘ্র হউক বা বিলম্বেই হউক, প্রত্যেক জীবই মুক্তিলাভ করিবে। কেহই পিছনে পড়িয়া থাকিবে না; কাহারও ধ্বংস হইবে না; প্রত্যেক বস্তু নিশ্চয়ই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের সংগ্রামের প্রয়োজন কি? প্রথমতঃ সংগ্রামই হইল একমাত্র উপায়, যাহা আমাদিগকে কেন্দ্রস্থলে আনিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ আমরা জানি না, কেন সংগ্রাম করিতেছি। সংগ্রাম আমাদের করিতেই হইবে। 'সহস্র লোকের মধ্যে, কয়েকজনই মাত্র জানেন যে, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিবেন।' অধিকাংশ মানুষ জড় দ্রব্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন; কিন্তু কয়েকজন আছেন, যাঁহারা জাগ্রত হন—ব্রহ্মে প্রত্যাবর্তন করিতে চান, যাঁহারা মনে করেন—পৃথিবীর লীলাখেলা যথেষ্ট হইয়াছে। ইঁহারাই সজ্ঞানে সংগ্রাম করেন; অন্যান্য সকলে সংগ্রাম করে অজ্ঞানে।

বেদান্তদর্শনের আরম্ভ ও শেষ হইল—অসত্যকে ত্যাগ এবং সত্যকে গ্রহণ করিয়া 'সংসার ত্যাগ করা'। যাঁহারা পার্থিব মোহে মুগ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহারা হয়তো বলিতে পারেন: কেন আমরা পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব, এবং কেন্দ্রস্থলে প্রত্যাবর্তন করিতে চেষ্টা করিব? মনে করুন, আমরা সকলেই ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি; কিন্তু দেখিতেছি, এই জগৎ সুন্দর ও সুখদায়ক; অতএব কেন আমরা জগৎকেই আরও বেশী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিব না? কেন আমরা সংসারের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিব? তাঁহারা বলেন—পৃথিবীতে প্রত্যহই যে উন্নতি সাধিত হইতেছে, সেইদিকে দৃষ্টিপাত কর; জগতে কতই না বিলাসদ্রব্য সৃষ্ট হইতেছে! জগৎ অতিশয় সুখজনক। কেন আমরা তাহা ছাড়িয়া যাইব, এবং যাহা উপভোগ্য নয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিব? ইহার উত্তর এই যে, পৃথিবীর ধ্বংস সুনিশ্চিত; পৃথিবী নিশ্চয়ই খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইবে। পূর্বে বহুবার আমরা একই প্রকার সুখ উপভোগ করিয়াছি। আমরা বর্তমানে যে-সকল আকার দেখিতেছি, সে-সকলই পূর্বে বহুবার প্রকটিত হইয়াছে; এবং বর্তমানে আমরা যে-পৃথিবীতে বাস করিতেছি, সে-পৃথিবীও পূর্বে বহুবার এইভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। আমিও পূর্বে বহুবার এখানে আসিয়াছি, তোমাদের সহিত বহুবার কথা বলিয়াছি। তোমরাও জানিতে

পারিবে—ইহা সত্য; এবং যে-সকল কথা তোমরা বর্তমানে শুনিতেছ, সেগুলি তোমরা পূর্বেও বহুবার শুনিয়াছ, এবং ভবিষ্যতেও বহুবার এরূপ ঘটিবে। আত্মা সর্বদাই এক ও অভিন্ন; দেহই কেবল অবিরত বিনষ্ট ও পুনরাবির্ভূত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এই-সকল ঘটনা পর্যায়ক্রমে ঘটে। মনে কর, তিন-চারিটি পাশা আছে; তুমি সেইগুলি ফেলিলে—একটিতে পাঁচ, একটিতে চার, একটিতে তিন, একটিতে দুই দেখা গেল। তুমি যদি এইভাবে ক্রমাগত পাশা ফেলিয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আবার এরূপ হইবে এই সংখ্যাগুলি পুনঃ পুনঃ দেখা যাইবে। ক্রমাগত পাশা ফেলিয়া যাও, এবং বিলম্ব যতই হউক না কেন, এই সংখ্যাগুলি নিশ্চয়ই আবার দেখা যাইবে। অবশ্য কতবার পরে তাহাদের পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহা সঠিক বলা যায় না—ইহা দৈবাধীন। জীবাত্মাদের একত্র হওয়ার ব্যাপারেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। যতই বিলম্ব হউক না কেন, সেই একই সংযোগ এবং বিয়োগ বারংবার ঘটিবে। সেই একই জন্ম, সেই পানাহার, তারপর মৃত্যু বারংবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। কেহ কেহ সাংসারিক ভোগসুখ অপেক্ষা উচ্চতর আর কিছুই কোনদিন পায় না; কিন্তু যাঁহারা উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে চান, তাঁহারা দেখেন—এই-সকল ভোগসুখ চরম লক্ষ্য নয়, আনুষঙ্গিক মাত্র।

ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেক জীবশরীরই চিকাগোর 'ফেরিস্ হুইল্'-এর এক একটি গাড়ির মতো—চক্রটি সর্বদাই চলিতেছে, কিন্তু প্রতি গাড়ির আরোহী পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। মানুষ একইভাবে একটি গাড়িতে উঠিতেছে, চক্রের ঘূর্ণনের সহিত ঘুরিতেছে, তার পর নামিয়া যাইতেছে। চক্রটি ক্রমাগত ঘুরিয়া চলিয়াছে। এক একটি জীবাত্মা ঐভাবে এক একটি শরীর ধারণ করিতেছে, তাহার মধ্যে কিছুকাল বাস করিতেছে, তারপর উহা ত্যাগ করিয়া অন্য একটি শরীর ধারণ করিতেছে, তাহাও ত্যাগ করিয়া তৃতীয় একটি ধারণ করিতেছে। এইভাবে জন্মমৃত্যুর চক্র ঘুরিয়া চলিতেছে, যতদিন না জীব সেই চক্র হইতে বাহির হইয়া মুক্তিলাভ করে।

প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে মানুষের জীবনের অতীত এবং ভবিষ্যৎ জানিবার অতি আশ্চর্য শক্তির কথা সকলে শুনিয়াছ। ইহার ব্যাখ্যা

যতদিন পর্যন্ত আত্মা কার্য-কারণ-নিয়মের অধীন থাকে—অবশ্য তাহার স্বভাবগত স্বাধীনতা কখনও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায় না—তাহার অস্তিত্ব তখনও থাকে ; এমন কি সেজন্য আত্মা নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া কার্য-কারণ-শৃঙ্খল অতিক্রম করিতে পারে, যেরূপ মুক্তাত্মার ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে ; ততদিন তাহার কর্ম কার্য-কারণ-নিয়মের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয় এবং এরূপে কর্মফল-পরম্পরা সম্বন্ধে যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁহাদের পক্ষে অতীত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোকপাত করা সম্ভব।

যতদিন কোন বাসনা কামনা অথবা অভাবের অস্তিত্ব থাকে, ততদিন অপূর্ণতাও থাকে। পূর্ণ মুক্তাত্মার কোন বাসনা-কামনা থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের কোন অভাব থাকিতে পারে না। তাঁহার যদি কোন বাসনা-কামনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলা চলে না, কারণ সেক্ষেত্রে তিনি অপূর্ণ হইয়া পড়েন। এই কারণে—'ঈশ্বর ইহা কামনা করেন, উহা কামনা করেন ; তিনি কখন রুষ্ট, কখন তুষ্ট'—এরূপ বলা শিশুর মুখের আধ-আধ বুলি, অর্থহীন কথা। সেইজন্য সকল আচার্য ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন : কোন কিছু কামনা করিও না ; সকল বাসনা ত্যাগ কর, পূর্ণভাবে তৃপ্ত হও।

দন্তহীন শিশু 'হামাগুড়ি' দিতে দিতে পৃথিবীতে আসে ; এবং বৃদ্ধও 'হামাগুড়ি' দিতে দিতে দন্তবিহীন অবস্থায় পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়। এরূপে জীবনের আরম্ভ ও শেষ—চরম দুটি প্রান্ত একই প্রকার ; কেবল একজনের এই জীবন সম্বন্ধে কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই, অপরের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। যখন আলোক-তরঙ্গের স্পন্দন অতি মৃদু হয়, তখন আমরা আলোক দেখিতে পাই না ; যখন তাহা অতি দ্রুত হয়, তখনও তাহার ফল হয় অন্ধকার। এইভাবে চরম সীমা-দুটি একই প্রকার হয়, যদিও তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। দেয়ালের বাসনা-কামনা নাই, পূর্ণ মুক্ত মানবেরও নাই। কিন্তু দেয়ালটির কোন চেতনা নাই যে, উহা কামনা করিবে ; আর পূর্ণ মুক্ত মানবের কামনা করিবার কিছুই থাকে না। জড়বুদ্ধি লোকদের এই জগতে কোন কামনা থাকে না, যেহেতু তাহাদের মস্তিষ্ক অপূর্ণ। একই সঙ্গে, উচ্চতম অবস্থাতেও আমাদের কোন কামনা থাকে না। কিন্তু এই দুই অবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একজন পশুর নিকটবর্তী, অন্যজন ঈশ্বরের।

পুনর্জন্ম

[নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত দার্শনিক পত্রিকা 'Metaphysical magazine' এর জন্য লিখিত, মার্চ, ১৮৯৫]

'অতীতে তোমার ও আমার বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে, হে শত্রুনাশকারী (অর্জুন), আমি সে-সবই অবগত আছি, কিন্তু তুমি অবগত নও।'—গীতা[১]

সকল দেশে ও সকল কালে যে-সকল কূট সমস্যা মানুষের বুদ্ধিকে বিমূঢ় করিয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল মানুষ নিজে। যে অগণিত রহস্য ইতিহাসের আদি যুগ হইতে মানুষের শক্তিকে সমাধানের জন্য আহ্বান জানাইয়া ঐ কার্যে ব্রতী করিয়াছে, তন্মধ্যে গভীরতম রহস্য হইল মানুষের নিজ স্বরূপ। ইহা সমাধানের অসাধ্য একটি প্রহেলিকামাত্র নয়, ইহা সকল সমস্যার অন্তর্নিহিত মূল সমস্যাও বটে। মানুষের এই স্বরূপটিই আমাদের সর্বপ্রকার জ্ঞান, সর্বপ্রকার অনুভূতি ও সর্বপ্রকার কার্যকলাপের মূল উৎস ও শেষ আধার। এমন কোন সময় ছিল না, এমন কোন সময় আসিবেও না—যখন মানুষের নিজের স্বরূপ তাহার সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিবে না।

মানুষের সকল প্রকার ক্ষুধার মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসারূপ যে-ক্ষুধা মানুষের নিজ সত্তার সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত আছে, বহির্বিশ্বের মূল্যায়নকল্পে অন্তঃরাজ্য হইতে কোন মানদণ্ড আবিষ্কারের জন্য যে সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, এবং এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে একটি অপরিবর্তনীয় স্থির বিন্দু আবিষ্কার করিবার জন্য যে অনিবার্য ও স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেগুলির দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ যদিও মধ্যে মধ্যে স্বর্ণকণিকা-ভ্রমে ধূলি-মুষ্টিকে ধরিতে সচেষ্ট হইয়াছে, এমন কি যুক্তি ও বুদ্ধি অপেক্ষাও উচ্চতর রাজ্যের কোন বাণীর প্রেরণা পাইয়াও সে অনেক সময়ই অন্তর্নিহিত দেবত্বের মর্ম অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাপি যতদিন হইতে এই

১ বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ৪।৫

অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন কোন সময় দেখিতে পাওয়া যায় না, যখন কোন না কোন জাতি বা কতিপয় ব্যক্তি সত্যের বর্তিকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরেন নাই।

অতীতে অথবা আধুনিক কালে—বিশেষতঃ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এমন লোকের কখনও অভাব ঘটে নাই, যাঁহারা পারিপার্শ্বিক ও অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে একদেশদর্শী, বিবেচনাহীন এবং কুসংস্কারপূর্ণ অভিমত স্বীকার করিবার ফলে, কখন বা বিবিধ দর্শনমত ও সম্প্রদায়ের বক্তব্যের অস্পষ্টতায় দরুন বিরক্তির ফলে, এবং দুঃখের সহিত বলিতে হয়, অনেক সময় সঙ্ঘবদ্ধ পৌরোহিত্যের ভয়াবহ কুসংস্কারাদির প্রভাবে চরম বিপরীত মতে উপস্থিত হইয়াছেন; এবং এই-সকল কারণে হতাশ হইয়া শুধু যে এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন এই কার্য নিষ্ফল এবং অনাবশ্যক। দার্শনিকেরা ক্ষোভ বা বিদ্রূপ প্রকাশ করিতে পারেন এবং পুরোহিতগণ তরবারির সাহায্য পর্যন্ত স্বীকার করিয়া স্বীয় ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারেন, কিন্তু সত্য একমাত্র তাঁহাদেরই নিকট আবির্ভূত হয়, যাঁহারা সত্যের জন্যই লাভালাভের চিন্তা ছাড়িয়া নির্ভীক হৃদয়ে সত্যেরই পীঠস্থানে উপাসনা করিয়া থাকেন।

মানুষের বুদ্ধি যখন জ্ঞানপূর্বক কোন বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তখনই তাঁহাদের নিকট আলোক উদ্ভাসিত হয়; এবং ধীরে ধীরে হইলেও ক্রমশঃ তাহা অজ্ঞাতভাবে অনুস্রুত হইয়া সমগ্র জাতির মধ্যে প্রসারিত হয়। দার্শনিকগণ দেখাইয়া দেন, কিরূপে মহাপুরুষেরা জ্ঞানের সঙ্গে সাধনা করিয়া থাকেন; এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কিরূপে নীরবে ধীরে ধীরে সাধারণ জনসমাজে তাঁহাদের সাধনালব্ধ সত্য অনুপ্রবেশ করে।

মানুষ তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে যতগুলি মত আজ পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছে, তন্মধ্যে এই মতটিই সর্বাধিক প্রসার লাভ করিয়াছে যে, আত্মা নামক একটি সত্যবস্তু আছে এবং উহা দেহ হইতে ভিন্ন ও অমর। যাঁহারা এইরূপ আত্মার অস্তিত্বে আস্থাবান্, তাঁহাদের মধ্যে আবার চিন্তাশীল অধিকাংশ ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন যে, আত্মা বর্তমান জন্মের পূর্ব হইতেই আছে।

আধুনিক মানবসমাজে যাঁহাদের ধর্ম সুসংবদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের অধিকাংশই ইহা বিশ্বাস করেন, এবং যে-সব দেশ ভগবানের আশীর্বাদে

সর্বাধিক উন্নত, সে-সব দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীরা যদিও আত্মার অনাদিত্বে বিশ্বাস করার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই প্রতিপালিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা আত্মার পূর্বাস্তিত্বের সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ইহা ভিত্তিস্বরূপ। প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যে শিক্ষিতশ্রেণী ইহাতে বিশ্বাস করিতেন, প্রাচীন পারসীকগণ এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন; গ্রীক দার্শনিকগণ এই ধারণাকে তাহাদের দর্শন-চিন্তার ভিত্তি-প্রস্তররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; হিব্রুগণের মধ্যে ফ্যারিসিগণ (আচারনিষ্ঠ প্রাচীন ইহুদী ধর্মসম্প্রদায়) ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সুফীরা প্রায় সকলেই এই সত্য স্বীকার করেন।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিশ্বাসের উদ্ভব ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত মনে হয়, বিশেষ ধরনের পরিবেশের প্রয়োজন আছে। মৃত্যুর পরে শরীরের এতটুকু মাত্র অংশও জীবিত থাকে—এই ধারণায় উপস্থিত হইতেই প্রাচীন জাতিসমূহের কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে। আবার দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া মৃত্যুর পরও জীবিত থাকে, এইরূপ কোন বস্তু সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ ধারণায় উপনীত হইতে আরও কত যুগ-যুগান্তের প্রয়োজন হইয়াছে। এমন একটি সত্তা আছে, যাহার দেহের সহিত সম্পর্ক সাময়িক, এইরূপ ধারণায় উপনীত হওয়া যখন সম্ভব হইল, কেবল তখনই এবং যে-সকল জাতির মধ্যে এইরূপ সিদ্ধান্তের উদয় হইতে পারিল, একমাত্র তাহাদের মধ্যে এই অনিবার্য প্রশ্নটি উত্থিত হইয়াছিল: কোথায়? কখন?

প্রাচীন হিব্রুগণ আত্মা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া মনের স্থৈর্য নষ্ট করেন নাই। তাঁহাদের মতে মৃত্যুতেই সবকিছুর অবসান হয়। কার্ল হেকেল যথার্থই বলিয়াছেন: 'ইহা যদিও সত্য যে, (ইহুদীদের) নির্বাসনের পূর্ববর্তী বাইবেলের প্রাচীন অংশে হিব্রুগণ প্রাণ-তত্ত্বটির পৃথক্ পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তাহাকে তাঁহারা কখনও 'নেফেস' অথবা 'রুয়াথ' অথবা 'নেশামা' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি এই-সকল শব্দ চৈতন্য বা আত্মার ধারণার দ্যোতক না হইয়া বরং প্রাণবায়ুরই দ্যোতক। আবার প্যালেস্টাইনের অধিবাসী ইহুদীগণের নির্বাসনের পরবর্তী কালের রচনায় কোথাও কোন পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট অমর আত্মার উল্লেখ পাওয়া যায় না; কিন্তু সর্বত্র ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত শুধু এমন একটি প্রাণবায়ুর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহা শরীর ধ্বংস হইলে দিব্য সত্তা 'রুয়াখে' অন্তর্হিত হয়।'

প্রাচীন মিশর ও ক্যাল্ডিয়ায় অধিবাসিগণের আত্মা সম্বন্ধে নিজস্ব বহু অদ্ভুত ধারণা ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরেও মানবের কোন একটি অংশ জীবিত থাকে বলিয়া তাহারা যে ধারণা পোষণ করিত, তাহার সহিত প্রাচীন হিন্দু, পারসীক, গ্রীক বা অন্য কোন আর্যজাতির এ-সম্বন্ধীয় ধারণাগুলিকে যেন মিশাইয়া ফেলা না হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আত্মার ধারণা সম্পর্কে আর্য ও অ-সংস্কৃত ভাষাভাষী ম্লেচ্ছদিগের সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাহ্যতঃ মৃতদেহের শেষকৃত্য-অনুষ্ঠানের রীতি যেন ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্লেচ্ছগণ শবকে সযত্নে প্রোথিত করিয়া অথবা তদপেক্ষা জটিলতর বিরাট প্রক্রিয়া অবলম্বনে শবকে মমি-তে পরিণত করিয়া মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইত, আর আর্যগণ সাধারণতঃ মৃতদেহকে অগ্নিতে ভস্মীভূত করিতেন।

ইহারই মধ্যে আমরা এই একটি প্রকাণ্ড গোপন রহস্যের সন্ধান পাই যে, আর্যজাতির—বিশেষতঃ হিন্দুদের সহায়তা ব্যতীত মিশরীয় হউক, এসীরীয় হউক বা ব্যাবিলনবাসীই হউক, কোন ম্লেচ্ছজাতিই এই ধারণায় উপনীত হইতে পারে নাই যে, আত্মা-নামক এমন এক পৃথক্ বস্তু আছে, যাহা শরীর-নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতে পারে।

যদিও হেরোডোটাস বলেন, মিশরীয়গণই সর্বাগ্রে আত্মার অমরত্বের ধারণা করিতে পারিয়াছিল, এবং তিনি মিশরীয়গণের মতবাদ-প্রসঙ্গে এইরূপ বলেন, 'আত্মা দেহ-নাশের পরেও বারংবার এক একটি জীবদেহে প্রবেশ করে এবং তাহার ফলে ঐ জীব বাঁচিয়া উঠে; অতঃপর জলচর স্থলচর ও খেচর—যত প্রাণী আছে, তাহাদের সকলের মধ্যে সে গতায়াত করে, এবং তিনসহস্র বৎসরকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে পুনর্বার মানবদেহে ফিরিয়া আসে', তথাপি মিশরতত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমান কালে যে গবেষণা হইয়াছে, তাহার ফলে অদ্যাবধি আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ-বিষয়ে মিশরীয় জনসাধারণের ধর্মের মধ্যে কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বরং ম্যাসপেরো[১], আর্মান[২] এবং অপরাপর খ্যাতনামা মিশরতত্ত্ববিদের আধুনিকতম এই অনুমানই অনুমোদিত হয় যে, পুনর্জন্মবাদের সহিত মিশরীয়গণ সুপরিচিত ছিল না।

---

১ Maspero　　২ A. Erman

প্রাচীন মিশরীয়গণের মতে আত্মা একটি অন্যসাপেক্ষ বিকল্প সত্তা মাত্র, ইহার নিজস্ব কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই এবং কোনদিনই দেহের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। যতদিন দেহ থাকে, কেবল ততদিনই ইহা জীবিত থাকে, যদি কোন আকস্মিক কারণবশতঃ মৃত দেহটি বিনষ্ট হয়, তবে বিদেহ আত্মাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যু ও ধ্বংস বরণ করিতে হয়। মৃত্যুর পর আত্মা সমগ্র পৃথিবীময় যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রতি রাত্রে মৃতদেহটি যেখানে আছে সেখানে তাহাকে ফিরিতে হয়; সে সর্বদা দুঃখমগ্ন, সর্বদা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর এবং আর একবার জীবনকে উপভোগ করিবার জন্য তীব্র বাসনাযুক্ত, অথচ কোনমতেই তাহা পূরণ করিতে পারে না। উহার পুরাতন শরীরের কোন অংশ কোনরকমে আহত হইলে আত্মার অনুরূপ অংশও অনিবার্যভাবে আহত হয়। এই ধারণার দিক হইতেই প্রাচীন মিশরীয়গণের মৃতদেহ সংরক্ষণ করিবার জন্য অতিরিক্ত ব্যাকুলতার কারণ বুঝিতে পারা যায়। প্রথমে মরুভূমিকে শবক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন করা হইয়াছিল, কারণ তথায় বায়ুর শুষ্কতা হেতু মৃতদেহ সহজে বিনষ্ট হইত না, এবং এইরূপে বিদেহ প্রেতাত্মা দীর্ঘজীবন লাভের সুযোগ পাইত।

কালক্রমে জনৈক দেবতা শবদেহ সংরক্ষণের এমন এক উপায় আবিষ্কার করিলেন, যাহার সাহায্যে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা তাহাদের স্বজনগণের মৃতদেহ প্রায় অনন্তকালের জন্য সংরক্ষণ করিবার আশা পোষণ করিত; এবং নিদারুণ দুঃখের হইলেও আত্মার জন্য এইরূপ অমরত্বের ব্যবস্থা তাহারা করিত।

পৃথিবীর সহিত আর কোন নিবিড় সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব হইলেও এক শাশ্বত খেদ সেই মৃত আত্মাকে সর্বদাই পীড়া দিত; বিদেহী আত্মা সখেদে বলিত: "হে ভ্রাতঃ, তুমি কখনও পানাহার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিও না, মাদকতা, ভালবাসা, সর্বপ্রকার সম্ভোগ এবং দিবারাত্র বাসনার অনুসরণ হইতে বিরত হইও না। দুঃখকে হৃদয়ে স্থান দিও না, কারণ পৃথিবীতে মানুষের জীবনকাল কতটুকু? পশ্চিমে যে (প্রেত-) লোক আছে, উহা সুপ্তিময় ও ঘন ছায়ায় আবৃত; ইহা এমন একটি স্থান যেখানে একবার অধিষ্ঠিত হইলে সেখানকার অধিবাসীরা তাহাদের 'মমি'রূপে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়, পুনর্বার আর কোনদিনই স্বজনবর্গকে দেখিবার জন্য জাগ্রত হয় না, আর তাহারা তাহাদের পিতা-

মাতাকে চিনিতে পারে না, এবং তাহাদের হৃদয়ে স্ত্রী ও সন্তানবর্গের কোন স্মৃতি থাকে না। পৃথিবী তাহার অধিবাসীদিগকে যে প্রাণবন্ত জলধারা দান করে, তাহা আমার নিকট পঙ্কিল ও প্রাণহীন; পৃথিবীতে যাহারা বাস করে, তাহারা সকলেই জলধারার অধিকারী; অথচ আমার নিকট ঐ জলধারাই এখন এক পূতিগন্ধময় গলিত ধারায় পরিণত হইয়াছে। মৃত্যুর এই উপত্যকায় আসিয়া অবধি আমি বুঝিতেই পারিতেছি না, আমি কে এবং কোথায় আছি। আমাকে স্রোতস্বিনীর জল পান করিতে দাও···উত্তরাভিমুখে মুখ করিয়া আমাকে জলাশয়ের ধারে রাখো, যাহাতে মৃদুবায়ু আমাকে স্নেহস্পর্শ দান করিতে পারে এবং আমার হৃদয় দুঃখের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া সজীব হইতে পারে।"[১]

ক্যাল্ডিয়াবাসীরা মৃত্যুর পরে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে মিশরীয়দের মতো অত গবেষণা না করিলেও তাহাদের মতে আত্মাকে দেহের উপর নির্ভরশীল দ্বিতীয় বস্তু হিসাবেই গ্রহণ করা হয়, এবং ঐ আত্মা কবরস্থানেরই সহিত জড়িত। তাহারাও এই দেহ-নিরপেক্ষ কোন অবস্থার কথা চিন্তা করিতে পারে নাই এবং আশা পোষণ করিত যে, মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত হইবে। যদিও দেবী ইস্থার নানা বিপদ আপদ ও রোমাঞ্চকর অভিযানের অন্তে ইয়া ও দমকিনার পুত্র—তাঁহার মেষপালক স্বামী দমুজিকে পুনর্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি 'অতি ধর্মপ্রাণ এবং ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরাও তাহাদের প্রিয়জনদের পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত দেবালয় হইতে দেবালয়ে বৃথাই কাতর আবেদন জানাইয়াছিল।'

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন মিশরীয় বা ক্যাল্ডিয়াবাসীরা মৃত ব্যক্তির শবদেহ হইতে কিংবা কবরস্থান হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মা সম্পর্কে কখনও ধারণা করিতে সক্ষম হয় নাই। সব দিক বিবেচনা করিলে এই পার্থিব জীবনই সর্বোত্তম, এবং মৃত ব্যক্তি সকল সময়ই আর একবার ইহা পাইবার সুযোগের জন্য লালায়িত এবং যাহারা জীবিত তাহারাও দুঃখ-পীড়িত, দেহের উপর নির্ভরশীল এই দ্বিতীয় আত্মার অবস্থিতিকাল বৃদ্ধি করিবার গভীর আশা পোষণ করিত এবং তাহাদিগকে সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিত।

১ প্রাচীন লেখা হইতে ম্যাসপেরো কর্তৃক ফরাসীতে, ক্রগশ্ কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত।

এইরূপ পরিবেশে আত্মা সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। প্রথমতঃ ইহা অত্যন্ত স্থূল জড়বাদ, তদুপরি ভয় ও যন্ত্রণাপূর্ণ। অসংখ্য অশুভ-শক্তির দ্বারা ত্রস্ত হইয়া, ঐগুলিকে এড়াইবার নৈরাশ্যজনক ও উদ্বিগ্ন চেষ্টায় জীবিতদের আত্মাও তাহাদের ধারণানুযায়ী মৃতের আত্মার মতো সারা পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও কিছুতেই গলিত শব ও শবাধারের গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারিতেছে না।

এখন আমাদিগকে আত্মা সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণার মূল আবিষ্কারের জন্য অপর একটি জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, যাহাদের নিকট ঈশ্বর সর্বকরুণানিলয় সর্বব্যাপী পুরুষ, যাহাদের নিকট তিনি জ্যোতির্ময় দয়ালু ও সহায়ক বিভিন্ন দেবতার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন; মানবজাতির মধ্যে যাহারা সর্বাগ্রে ঈশ্বরকে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, 'পিতা যেমন তাহার প্রিয় পুত্রের হস্ত ধারণ করেন, আপনিও তেমনি আমার হস্ত ধারণ করুন'; যাহাদের নিকট জীবন ছিল আশার বস্তু, নৈরাশ্যের নয়; ধর্ম যাহাদের নিকট জীবনের প্রমত্ত উত্তেজনার অবসরে বেদনার্ত ব্যক্তির মুখ হইতে অকস্মাৎ নিঃসৃত কতগুলি সবিরাম আর্তনাদ মাত্র নয়, পরন্তু যাহাদের ধারণাসমূহ আমাদের নিকট শস্যক্ষেত্রের সুগন্ধ ও বনানীর সৌরভে আমোদিত হইয়া আসে; যাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত বাধাহীন আনন্দপূর্ণ বন্দনাগীতি দিনমণির প্রথম কিরণে উদ্ভাসিত এই শোভাময়ী ধরণীকে অভিনন্দন করিবার কালে পক্ষিকণ্ঠ হইতে যেরূপ কাকলী নিঃসৃত হয়, তাহারই সদৃশ—আজও তাহা অষ্ট সহস্র বৎসরের সরণী ধরিয়া আমাদের নিকট দিব্যধামের নবীন আহ্বানের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়; আমরা এবার প্রাচীন আর্যজাতির কথাই বলিতেছি।

আর্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে তাহাদের প্রার্থনা-মন্ত্র এইরূপে লিপিবদ্ধ আছে: 'আমাকে সেই মৃত্যুহীন অক্ষয় ধামে স্থান দাও, যেখানে দিব্যলোকের জ্যোতি বিদ্যমান এবং যেখানে চিরন্তন দীপ্তি জাজ্বল্যমান'। 'আমাকে সেই ধামে অমর করিয়া রাখো, যেখানে রাজা বিবস্বানের পুত্র বাস করেন, যেখানে দিব্যধামের রহস্যাবৃত অর্চনালয় বর্তমান'। 'আমাকে সেই লোকে অমর করিয়া রাখো যেখানে তাঁহারা সানন্দে যদৃচ্ছ বিহার করেন'। 'পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের ঊর্ধ্বে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম যে তৃতীয়

দ্যুলোকে নিখিল বিশ্ব জ্যোতির্ময়রূপে অবস্থিত, সেই আনন্দ-লোকে আমাকে অমর করিয়া রাখো।'

এইবারে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আর্যজাতি ও ম্লেচ্ছগণের ধারণার মধ্যে কিরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান। একের দৃষ্টিতে এই দেহ এবং এই পার্থিব জগৎই একমাত্র সত্য ও কাম্য বস্তু। তাহারা এই বৃথা আশা পোষণ করে যে, মৃত্যুকালে যে জীবনী-শক্তি দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়সুখে বঞ্চিত হইয়া নির্যাতন ও দুঃখ অনুভব করে, মৃত দেহকে সযত্নে রক্ষা করিলে ঐ জীবনী-শক্তিকে পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়। এইরূপে তাহাদের নিকট জীবন্ত ব্যক্তি অপেক্ষা মৃতদেহই অধিকতর যত্নের অধিকারী হইয়া পড়িল। অপরেরা দেখিল যে, শরীর ত্যাগ করিয়া যাহা প্রস্থান করে, তাহাই মানবের প্রকৃত সত্তা এবং শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া তাহা এমন উচ্চতর সুখানুভবের স্তরে উপস্থিত হয়, শরীরে অবস্থানকালে সে-সুখ কখনও পায় নাই। তাই তাহারা ধ্বংসোন্মুখ শবদেহকে শীঘ্র দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিল।

এখানেই আমরা এমন একটি ভাবের অঙ্কুর দেখিতে পাইতেছি, যাহা হইতে আত্মা সম্পর্কে সঠিক ধারণার উদ্ভব হইতে পারে। যেখানে প্রকৃত মানবকে কেবল শরীর না ভাবিয়া আত্মা-রূপে ভাবা হইয়াছে, যেখানে প্রকৃত মানব ও তাহার শরীরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য কোন সম্বন্ধ একেবারে নাই—সেখানেই আত্মার মুক্তি-সম্বন্ধীয় মহান্ ভাবের উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই স্তরে উঠিয়া আর্যগণের দৃষ্টি যখন মৃত ব্যক্তির আবরণভূত বস্ত্রসদৃশ জ্যোতির্ময় দেহকে ভেদ করিয়া তদতীত স্তরে উপনীত হইল এবং আত্মার নিরাকার, পৃথক্, স্বতন্ত্র সত্তার প্রকৃত তত্ত্ব তাহারা বুঝিল, তখনই প্রশ্ন উঠিল—'কোথা হইতে?'

এই ভারতবর্ষে এবং আর্যদিগের মধ্যেই আত্মার পূর্বাস্তিত্বের, অমরত্বের এবং স্বাতন্ত্র্যের ধারণা প্রথম উদ্ভূত হয়। প্রাচীন মিশর সম্পর্কে সম্প্রতি যত গবেষণা হইয়াছে, তাহা হইতে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, সেখানে কখনও স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পার্থিব জীবন লাভের পূর্বে বিদ্যমান আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা ছিল। কোন কোন রহস্য-বিদ্যাবিদ্ অবশ্য এই তত্ত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐ ভাব ভারতবর্ষ হইতেই আসিয়াছিল।

কার্ল হেকেল বলেন, 'আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যে, যতই গভীরভাবে মিশরীয় ধর্ম অনুধাবন করা যাইবে, ততই ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, মিশরীয় জনসাধারণ যে-ধর্মের অনুসরণ করিত, উহার সহিত পুনর্জন্মবাদের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। এমন কি রহস্যবিদ্যাবিদ্ কেহ কেহ এই বিদ্যার অধিকারী হইয়া থাকিলেও ইহা ওসিরিস-শিক্ষার নিজস্ব বস্তু নহে, প্রত্যুত উহা হিন্দুগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত।'

পরবর্তী কালে দেখা যায়, আলেকজান্দ্রিয়াবাসী ইহুদীগণ এই মতবাদে বিশ্বাসী হইয়াছেন যে, প্রত্যেক আত্মার পৃথক্ সত্তা আছে; এবং পূর্বেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি, যীশুর সমসাময়িক ফ্যারিসীরা (প্রাচীন আচারনিষ্ঠ ইহুদী ধর্মসম্প্রদায়) শুধু যে আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন তাহাই নয়, তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মা বিভিন্ন শরীরে গতায়াত করে। এইরূপে অতি সহজেই ইহা বুঝিতে পারা যায়, তাহারা কেমন করিয়া যীশুকে প্রাচীন এক মহাপুরুষের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল এবং যীশু স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছিলেন, ব্যাপ্টিস্ট জন-এর মধ্যে মহাত্মা ইলিয়াস পুনরাবির্ভূত হইয়াছেন—'যদি আপনাদের বুঝিবার মতো ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে জানিবেন, যে ইলিয়সের পুনরাগমনের কথা ছিল, ইনিই তিনি।'[১]

হিব্রুগণের মধ্যে আত্মা ও তাহার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে যে-ধারণাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি নিশ্চয়ই উচ্চতর রহস্যবিদ্যাবিদ্ মিশরীয়গণের নিকট হইতে আসিয়াছিল; মিশরীয়গণ আবার সেগুলি হিন্দুদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এগুলি যে আলেকজান্দ্রিয়ার মাধ্যমে আসিয়াছে, তাহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বৌদ্ধদের লিপি ও পুস্তকাদি হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ও এসিয়া-মাইনরে তাহাদের প্রচারকার্যের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইরূপ কথিত আছে যে, গ্রীকদের মধ্যে পিথাগোরাসই সর্বপ্রথম হেলেনীয়দের নিকট আত্মার পুনর্জন্মবাদ প্রচার করেন। গ্রীকরা আর্য জাতিরই অন্তর্গত বলিয়া ইতিপূর্বেই মৃতদেহের অগ্নিসংকার করিত এবং প্রত্যেক আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। অতএব পিথাগোরাসের শিক্ষার ফলে পুনর্জন্মবাদ মানিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল। এপুলিয়াসের মতে পিথাগোরাস ভারতে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

১ ম্যাথু. ৯।১৪।

এ পর্যন্ত আমরা এইটুকু জানিয়াছি যে, যেখানেই আত্মাকে কেবল শরীরের চৈতন্যপ্রদ অংশবিশেষ না বলিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইতেছে এবং উহাকেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ বলা হইতেছে, সেখানেই ইহার পূর্বাস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস অপরিহার্যরূপেই আসিয়া পড়িয়াছে; এবং আমরা ইহাও জানিয়াছি যে, যে-সকল জাতি আত্মার স্বাধীন পৃথক্ সত্তায় বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই তাঁহাদের মৃতদেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ঐ বিশ্বাসের বাহ্য প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। যদিও আর্য জাতিদের মধ্যে প্রাচীন পারসীকগণ সেমিটিক প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়াও মৃতদেহ-সৎকারের একটি অদ্ভুত প্রথা আবিষ্কার করিয়াছিল, তথাপি যে-নামে তাহারা তাহাদের 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'[1]-কে অভিহিত করে, তাহা হইতেই জানা যায় যে, উহা দহনার্থ দহ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যে-সকল জাতি মানুষের স্বরূপ-নির্ধারণে অধিক মনোযোগ দেয় নাই, তাহারা এই জড়দেহকে সর্বস্ব বলিয়া মনে করার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই; এবং যদি বা কখনও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের আলোকে তাহারা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছে, তবু তাহারা শুধু এই সিদ্ধান্তেই সন্তুষ্ট হইয়াছে যে, সুদূর ভবিষ্যতে কোন প্রকারে এই দেহই অবিনশ্বর হইবে।

অপরদিকে আর একটি জাতি ছিল, যাহারা মানবকে মননশীল জীবরূপে গণ্য করিয়া তাহার স্বরূপ-অনুসন্ধানে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল; সেই আর্য হিন্দু জাতি শীঘ্রই দেখিতে পাইল যে, এই দেহকে অতিক্রম করিয়া, এমন কি পিতৃপুরুষদের আকাঙ্ক্ষিত তেজোময় দেহকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃত মানব-সত্তা বিরাজ করিতেছে; সেই মূলতত্ত্ব, সেই অবিভাজ্য স্বতন্ত্র সত্তাই নিজেকে এই দেহদ্বারা আবৃত করে, এবং জীর্ণ হইলে উহা ত্যাগ করে। এই মূলতত্ত্বটি কি কোন সৃষ্ট পদার্থ? যদি সৃষ্ট বলিতে 'অভাব' হইতে 'ভাবে'র সৃষ্টি বুঝায়, তাহা হইলে তাহাদের নিশ্চিত উত্তর 'না'; এই আত্মা জন্ম ও মৃত্যুহীন, ইহা যৌগিক বা মিশ্রিত পদার্থ নয়, কিন্তু স্বাধীন পৃথক্ সত্তাবান্;

---

১ পার্সীদের মৃতদেহ যে বেদীতে স্থাপন করিয়া পক্ষীদের আহারের জন্য ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়, তাহাকে Tower of Silence (দখ্‌ম) বলে।

সেই হেতু তাহাকে উৎপন্নও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না, ইহা কেবল বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পরিভ্রমণ করে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে: ইতিপূর্বে (দেহগ্রহণের পূর্বে) আত্মা কোথায় অবস্থান করিতেছিল? হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহা নানা দেহ অবলম্বন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছিল; অথবা প্রকৃত বা দার্শনিক অর্থে ইহা বিভিন্ন মানসিক স্তর অতিক্রম করিতেছিল।

বেদ ভিন্ন এমন অপর কোন যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি আছে কি, যাহার উপর হিন্দু দার্শনিকগণ তাঁহাদের পুনর্জন্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? আছে। আশা করি, আমরা পরে দেখাইতে পারিব যে, সর্বজনগৃহীত যে-কোন মতবাদেরই মতো ইহারও স্বপক্ষে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ আছে; কিন্তু সর্বাগ্রে আমরা দেখিতে চাই, আধুনিক কালের কতিপয় শ্রেষ্ঠ ইওরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন।

ফিকটে[১] আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন:

'ইহা সত্য যে, আত্মার স্থায়িত্বের ধারণা খণ্ডনের নিমিত্ত প্রকৃতি হইতে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা সেই সর্বজনবিদিত যুক্তি—কালে যাহার আরম্ভ হইয়াছে, কোন না কোন কালে তাহার অবসানও হইবে; অতএব অতীতে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে আত্মার-পূর্বাস্তিত্বও স্বীকার করা হইয়া যায়। ইহা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইহা আত্মার স্থায়িত্বের বিপক্ষে প্রযোজ্য যুক্তি না হইয়া বরং তাহার নিত্যত্বের স্বপক্ষেই একটি অতিরিক্ত যুক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বস্তুতঃ কেহ যদি এই অধ্যাত্ম-ও শারীর-বিদ্যার অন্তর্গত স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি বুঝিতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোন-কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা হইলে এই সত্যও ধরিতে পারিবেন যে, এই স্থূল শরীর অবলম্বনে দৃশ্যমান হইবার পূর্ব হইতেই আত্মা বিদ্যমান ছিল।'

শোপেনহাওয়ার[২] তাঁহার 'Die Welt als Wille Und Vorstellung' নামক গ্রন্থে পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কে বলিতেছেন: "ব্যক্তির পক্ষে নিদ্রা বলিতে যাহা বুঝায়, 'ইচ্ছাশক্তি'র পক্ষে মৃত্যু বলিতেও তাহাই বুঝায়। কারণ

১ I. H. Fichte. ২ Schopenhauer.

স্মৃতিশক্তি ও নিজ স্বাতন্ত্র্য যদি সর্বদা ইহার সহিত লাগিয়া থাকিত, তবে প্রকৃত লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে ইচ্ছাশক্তি কিছুতেই অনন্তকাল ধরিয়া একই কর্মানুষ্ঠান ও যন্ত্রণাভোগ করার জন্য টিকিয়া থাকিত না। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি উহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেয়, এবং ইহাই লিথি-নামক বিস্মরণের নদী; এই মৃত্যুরূপ নিদ্রার ভিতর দিয়া ইচ্ছাশক্তি পুনর্বার অপর একটি নূতন বুদ্ধির দ্বারা সজ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ এক নূতন জীবরূপে আবির্ভূত হয়; এক নূতন দিন তখন তাহাকে এক নূতন তটভূমির দিকে প্রলুব্ধ করে।

"এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, এই নিরন্তর জন্মপ্রবাহই পর পর সেই অবিনাশী ইচ্ছাশক্তির জীবন-স্বপ্নগুলি রচনা করিতে থাকে; এবং যতক্ষণ না নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট প্রকারের বিচিত্র ও নিত্যনূতন উপদেশ ও অভিজ্ঞতা লাভের ফলে ইচ্ছাশক্তি নিজেই নিজের বিলোপ ও বিনাশ সাধন করিতেছে, ততদিন এইরূপই চলিতে থাকে।...ইহাও উপেক্ষা করা যায় না যে, ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা-প্রসূত যুক্তিও এইরূপ পুনর্জন্ম সমর্থন করে। বস্তুতঃ যাঁহারা জীর্ণ হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুর সহিত যাহারা নবাবির্ভূত, তাহাদের জন্মের একটি সম্পর্ক আছে। ব্যাপক মহামারীর পরে মানবজাতির মধ্যে শিশুজন্মের যে আধিক্য দেখা যায়, তাহা হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। চতুর্দশ শতকে প্লেগ মহামারীর (Black Death) ফলে যখন পূর্ব গোলার্ধের অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন মানবজাতির মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং প্রায়ই যমজ-শিশুর জন্ম হইত। ইহাও লক্ষণীয় যে, এই সময়ে যে-সকল শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের কেহই পূর্ণসংখ্যক দন্ত লাভ করে নাই; এইরূপে প্রকৃতি আপন শক্তি যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়াও খুঁটিনাটি ব্যাপারে কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছিল। ১৮২৫ খৃঃ লিখিত Chronik der Seuchen নামক গ্রন্থে স্নুরার[১] ইহার বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যাসপারও[২] তাঁহার ১৮৩৫ খৃঃ লিখিত 'Ueber die Wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen' গ্রন্থে এই প্রাকৃতিক নিয়ম সমর্থন করিয়াছেন যে, যে-কোন একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে দেখা যায়, তাহাদের জন্মসংখ্যার হার

১ F. Schnurrer   ২ Casper.

তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা ও আয়ুষ্কালের হারের উপর অতি সুনিশ্চিত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কারণ জন্মের সংখ্যা সর্বদা মৃত্যুর হারের সহিত সমতা রক্ষা করে; ইহার ফলে সর্বদা সর্বত্র মৃত্যু ও জন্ম সমান হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। বিভিন্ন দেশ এবং উহাদের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি সন্দেহাতীতরূপে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। তথাপি ইহা অসম্ভব যে, আমার অকাল-মৃত্যুর সহিত এইরূপ একটি বিবাহের ফলপ্রসূতার কোন প্রত্যক্ষ বা কার্যকারণাত্মক সম্পর্ক থাকিবে, যে-বিবাহের সহিত আমার কোন সম্পর্কই নাই; ইহাও অসম্ভব যে, ঐ বিবাহের সহিত আমার মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে। এইরূপে এক্ষেত্রে অধ্যাত্ম-তত্ত্বই অনস্বীকার্যরূপে এবং অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে জাগতিক বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রত্যক্ষ ভিত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক নবজাত ব্যক্তি সজীবতা ও প্রফুল্লতা লইয়া নবজীবনে আবির্ভূত হয় এবং ঐগুলি উপঢৌকনের মতো উপভোগ করে; কিন্তু জগতে বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না, পাওয়া যাইতে পারে না। এই নবীন জীবনের জন্য অপর একটি নিঃশেষিত জীবনকে বার্ধক্য ও জরারূপ মূল্য দিতে হয়। কিন্তু তাহার মধ্যেই এমন এক অবিনশ্বর বীজ নিহিত থাকে, যাহা হইতে নূতন জীবনের উৎপত্তি হয়—উভয়ে একই সত্তা।"

শূন্যবাদে বিশ্বাসী হইলেও সুবিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হিউম[১] অমৃতত্ব বিষয়ে সংশয়াত্মক এক প্রবন্ধে বলেন: 'অতএব এই জাতীয় মতবাদ-সমূহের মধ্যে একমাত্র পুনর্জন্মবাদই দার্শনিকদের প্রণিধানযোগ্য।' দার্শনিক লেসীং[২] কবিজনোচিত গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে প্রশ্ন করিতেছেন: 'একমাত্র প্রাচীনতমত্বের দাবিতে স্বীকৃত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের কুতর্কের প্রভাবে মানুষের বোধশক্তি যে অতীতকালে ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া যায় নাই, সেই অতীতকালে এই মতবাদটি মানুষের অনুভূতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া কি ইহা এতই পরিহাসের বিষয়?...আমি যতক্ষণ নূতন জ্ঞান, নূতন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা রাখি, ততক্ষণ কেন আমি বারংবার ফিরিয়া আসিব না? একবার জন্মগ্রহণ করিয়াই কি আমি এত বেশী পাইয়াছি যে, দ্বিতীয়বার আগমনজনিত ক্লেশের পরিবর্তে আমার আর কিছুই পাইবার থাকিবে না?'

১ Hume ২ Lessing

পূর্ব হইতে বিদ্যমান একই আত্মা বহু জীবনে বহুবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করে—এইরূপ মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি রহিয়াছে, এবং সর্বকালেই চিন্তানায়কদের মধ্যে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহার সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছেন; আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয়, আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু থাকিলে ইহাও অনিবার্য যে, উহা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করিয়া উহাকে স্কন্ধ (ধারণা) সমূহের সমষ্টি বলিয়া মানিলেও বৌদ্ধদের মধ্যে মাধ্যমিকদিগকে নিজেদের মতবাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য বাধ্য হইয়া আত্মার পূর্বাস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

যে যুক্তিবলে প্রমাণ করা হয়, কোন অসীম বস্তুর আদি থাকা অসম্ভব, তাহা অকাট্য। যদিও ইহার খণ্ডনকল্পে এই যুক্তিবিরুদ্ধ মতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় যে, অনন্তশক্তি ভগবানের পক্ষে অসম্ভবও সম্ভব হয়। দুঃখের বিষয় এই ভ্রমাত্মক যুক্তি বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ যেহেতু ঈশ্বর প্রাকৃতিক সকল ব্যাপারের সর্বজনীন এবং সাধারণ কারণ, অতএব মানবাত্মার নিজের মধ্যে যে-সব বিশেষ রকমের ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, সেগুলির প্রাকৃতিক (অসাধারণ) কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্ন উঠিতেছে; কাজেই এক্ষেত্রে ভগবান এই জগদ্রূপ যন্ত্রের নির্মাতা[১] এইরূপ মতবাদ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ইহা অজ্ঞতার স্বীকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ মানবীয় জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার প্রত্যেক প্রশ্ন সম্পর্কেই আমরা ঐ এক উত্তর দিতে পারি এবং এইরূপে সকল প্রকার অনুসন্ধিৎসা বন্ধ করিয়া ফলতঃ জ্ঞানের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ এইরূপ সর্বদা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার দোহাই দেওয়ার অর্থ কতগুলি শব্দের প্রহেলিকা সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণকে কারণরূপে ঠিক তখনই জানা হয় এবং জানিতে পারা যায়, যখন ঐ কারণটি তাহার কার্য-উৎপাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত, এতদতিরিক্ত আর কিছুই নয়। ইহার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতেছি যে, আমরা একদিকে যেমন অনন্ত ফলের চিন্তা করিতে পারি না, অপরদিকে তেমনি সর্বশক্তিমান্

১ Deus ex machina

কারণেরও ধারণা করিতে পারি না। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ভগবান সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণাই সসীম; তাঁহাকে কারণ বলিয়া মানিলেও এই কারণত্বের দ্বারা ভগবানের ধারণা সীমিত হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ ঐরূপ মতবাদ তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলেও যতক্ষণ আমরা ইহা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দিতে না পারিব, ততক্ষণ এমন কোন অসম্ভব কথা মানিতে বাধ্য নই যে, 'অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়' অথবা 'অসীম বস্তু কোন কালের মধ্যে আরম্ভ হয়'।

পূর্বাস্তিত্বের বিরুদ্ধে এই একটি তথাকথিত দৃঢ় যুক্তি খাড়া করা হয় যে, অধিকাংশ মানুষ এ সম্পর্কে সচেতন নয়। এই যুক্তির উপস্থাপয়িতাকে ইহার সারবত্তা প্রদর্শনের জন্য প্রমাণ করিতে হইবে যে, সমগ্র মানবাত্মাটি শুধু স্মরণকার্যেই ব্যাপৃত থাকে। কোন জিনিসের স্মৃতি যদি তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ হয়, তাহা হইলে জীবনের যে যে অংশ এখন স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই লোপ পাইয়াছে, এবং যে-কোন ব্যক্তি গভীর মূর্ছাকালে বা বিকারের অন্য কোন অবস্থায় স্মৃতিশক্তি হারাইয়া ফেলে, সে তখন নিশ্চয়ই নিজের অস্তিত্বও হারাইয়া ফেলে।

আত্মার পূর্বাস্তিত্ব অনুমানের জন্য, বিশেষতঃ সচেতন কার্যকলাপের স্তরে তাহার প্রমাণার্থে হিন্দু দার্শনিকগণ যে-সকল মৌলিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন, তাহা প্রধানতঃ এইরূপ:

প্রথমতঃ ইহা ব্যতীত এই বৈষম্যময় জগতের ব্যাখ্যা কিরূপে সম্ভব হইবে? একজন দয়ালু ও ন্যায়বান্ ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত রাজ্যে সদ্‌ভাবে ও মানব-সমাজের সম্পদ্‌রূপে গড়িয়া উঠিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগের মধ্যে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিল, এবং হয়তো সেই একই মুহূর্তে একই মহানগরে অপর একটি শিশু এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল, যাহা তাহার ভাল হইয়া উঠিবার পক্ষে প্রতিকূল। দেখিতে পাই—এমন শিশুও জন্মায় যে শুধু কষ্ট ভোগ করে, হয়তো সারা জীবনই কষ্ট পায়, অথচ এজন্য তাহার কোন দোষ নাই। এইরূপ কেন হইবে? ইহার কারণ কি? ইহা কাহার অজ্ঞতা-প্রসূত? যদি শিশুটির দোষ নাই থাকে, তাহা হইলে সে কেন তাহার পিতামাতার কর্মের ফলে এই কষ্ট ভোগ করিবে? বর্তমান দুঃখের অনুপাতে ভবিষ্যতে সুখ লাভ হইবে—এই প্রলোভন দেখাইয়া বা রহস্যের অবতারণা

করিয়া প্রশ্নটিকে এড়াইয়া যাওয়া অপেক্ষা অজ্ঞতা স্বীকার করা অনেক ভাল। কাহারও পক্ষে আমাদের উপর অসঙ্গত ক্লেশভার বলপূর্বক চাপাইয়া দেওয়া নীতিবিগর্হিত তো বটেই, উহাকে অবিচারও বলা চলে; শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ হইবে—এইরূপ মতবাদটিও সম্পূর্ণ যুক্তিহীন।

যাহারা দুঃখের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের কয়জন উচ্চতর জীবনের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য সংগ্রাম করে? কতজনই বা যে-অবস্থার মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহারই মধ্যে আত্মসমর্পণ করে? যাহারা বাধ্য হইয়া মন্দ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার জন্য অধিকতর মন্দস্বভাব এবং নীতিহীন হইয়া উঠে, তাহারা কি তাহাদের আজীবন নীতিহীনতার দরুন ভবিষ্যতে পুরস্কৃত হইবে? সে-ক্ষেত্রে যে এখানে যত দুর্বৃত্ত হইবে, ভবিষ্যতে তাহার পুরস্কার ততই অধিক হইবে।

সুখদুঃখভোগের সকল দায়িত্ব উহার ন্যায়সঙ্গত কারণের উপর, অর্থাৎ আমাদের স্বাধীন কর্ম বা কর্মফলের উপর আরোপ না করিলে মানবাত্মার মহিমা ও মুক্তভাব প্রমাণ করার এবং সংসারের এই অসাম্য ও ভয়াবহতার সামঞ্জস্য স্থাপন করার আর কোন উপায় নাই। শুধু তাই নয়, শূন্য হইতে আত্মার সৃষ্টি-বিষয়ে যত মতবাদই প্রচার করা হউক না কেন, উহাদের প্রত্যেকটি আমাদিগকে অনিবার্যরূপে অদৃষ্টবাদে বা সমস্তই পূর্ব হইতে সুনির্দিষ্ট—এইরূপ মতবাদে লইয়া যাইবে, এবং এক করুণাময় পিতার পরিবর্তে এক বিকটদর্শন, নিষ্ঠুর এবং সদাক্রুদ্ধ ঈশ্বরকে আমাদের উপাস্যরূপে উপস্থিত করিবে। অধিকন্তু শুভাশুভ-সাধনে ধর্মের যতটুকু শক্তি আছে, তাহার অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই যে, 'আত্মা সৃষ্ট বস্তু'—এই মতবাদের সহিত তাহারই অনুসিদ্ধান্ত—অদৃষ্টবাদ ও ঈশ্বর কর্তৃক ভাগ্যনির্ধারণ—খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এই এক ভয়াবহ ধারণার জন্য দায়ী যে, অধার্মিক ও পৌত্তলিকগণকে বিধিসঙ্গতরূপে তাহাদের তরবারি দ্বারা হত্যা করা চলে, আরও এই মতবাদের ফলে যতপ্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে সেগুলির জন্যও এই মতবাদই দায়ী।

কিন্তু ন্যায়দর্শন-প্রণেতারা পুনর্জন্মতত্ত্বের সমর্থনে যে-যুক্তিটি বহু বার উপস্থিত করিয়াছেন এবং যাহা আমাদের দৃষ্টিতে এই প্রসঙ্গের সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইল এই যে, আমাদের অভিজ্ঞতা কখনও সম্পূর্ণ বিলীন হইতে

না। আমাদের কার্যকলাপ (কর্ম) যদিও বাহ্যতঃ বিলুপ্ত হয়, তথাপি অদৃষ্টরূপে বর্তমান থাকে, এবং পুনর্বার কার্যের মধ্যে প্রবৃত্তির আকারে আবির্ভূত হয়, এমন কি ছোট শিশুরাও কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যথা মৃত্যুভয়।

এখন যদি প্রবৃত্তিকে বারংবার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের ফল বলা হয়, তাহা হইলে যে-সকল প্রবৃত্তি লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি, তাহার অর্থ সেই দিক হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়। স্পষ্টতঃ আমরা ঐগুলি এইজন্মে পাই নাই, সুতরাং অতীতেই সেগুলির মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। এখন ইহাও স্পষ্ট যে, আমাদের কতকগুলি প্রবৃত্তি মনুষ্যোচিত সচেতন প্রয়াসের ফল। ইহা যদি সত্য হয় যে, আমরা এই-সকল প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তবে ইহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয় অতীতের সচেতন সকল প্রযত্নই ইহার কারণ, অর্থাৎ আমরা যাহাকে মানবীয় স্তর বলি, বর্তমান জন্মের পূর্বেও আমরা সেই মানবোচিত মানস স্তরেই ছিলাম।

অন্ততঃ বর্তমান জীবনের প্রবৃত্তিসমূহকে অতীতের সচেতন প্রয়াসের দ্বারা ব্যাখ্যার ব্যাপারে ভারতের পুনর্জন্মবাদিগণ এবং অধুনাতম ক্রম-বিকাশবাদিগণ একমত; একমাত্র পার্থক্য এই যে, যেখানে অধ্যাত্ম-বাদী হিন্দুরা এগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র আত্মার সচেতন প্রয়াসের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেখানে জড়বাদী ক্রমবিবর্তনবাদীরা ঐগুলি বংশপরম্পরায় একদেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারণ বলিয়া অভিহিত করেন। যে মতবাদিগণ 'অভাব' বা শূন্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের স্থান কোথাও নাই।

তাহা হইলে এই বিষয়ে দুইটি মাত্র পক্ষ দাঁড়াইতেছে—পুনর্জন্মবাদ এবং জড়বাদ; ইহারই কোন একটি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবে। পুনর্জন্মবাদী বলেন: অতীত সমস্ত অভিজ্ঞতা অনুভব-কর্তার মধ্যে, অর্থাৎ প্রত্যেক পৃথক্ আত্মার মধ্যে প্রবৃত্তিরূপে সঞ্চিত হইয়া আছে, এবং প্রত্যেক আত্মা যখন তাহার অবিচ্ছেদ্য পৃথক্ সত্তা লইয়া নূতন জন্ম গ্রহণ করে, তখন ঐ প্রবৃত্তিগুলিও তাহাতে সঞ্চারিত হয়। আর জড়বাদী বলেন: মানুষের মস্তিষ্কই সকল কর্মের কর্তা এবং জীবকোষ অবলম্বনে এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে (পুরুষানুক্রমে) ঐ প্রবৃত্তিগুলি সঞ্চারিত হয়।

এইরূপে পুনর্জন্মবাদ আমাদের নিকট অসীম গুরুত্ব লইয়া উপস্থিত হয়, কারণ আত্মার পুনর্জন্ম ও দেহ-কোষ অবলম্বনে প্রবৃত্তির সঞ্চারণ-বিষয়ে যে বিবাদ চলিতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের সংগ্রাম। যদি কোষের মাধ্যমে সঞ্চারণই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে জড়বাদ অনিবার্য, এবং তখন আত্মতত্ত্বের কোন প্রয়োজন থাকে না। ইহা যদি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক আত্মার একটি নিজস্ব সত্তা আছে এবং আত্মা তাহার বর্তমান জীবনে অতীতের অভিজ্ঞতা বহন করিয়া আনে—এই মতটি সম্পূর্ণ সত্য। এই দুই বিকল্প—পুনর্জন্মবাদ ও জড়বাদ ; এই উভয়ের মধ্যে আর কোন কিছুর স্থান নাই। ইহার কোন্‌টি আমরা গ্রহণ করিব ?

আত্মা কি অমর ?

The New York Morning Advertiser পত্রিকায় এ-বিষয়ে যে আলোচনা হয়, তাহাতে যোগ দিয়া স্বামীজী এই প্রবন্ধ লিখেন।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ।—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।১৭

সংস্কৃত ভাষার সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য মহাভারতে বর্ণিত আছে—কিরূপে (বকরূপী) ধর্ম কর্তৃক জগতের আশ্চর্যতম বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঐ মহাকাব্যের নায়ক যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন : জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জীবনের প্রায় প্রতি মুহূর্তে চারিদিকে মৃত্যু ঘটিতেছে দেখিয়াও মানুষের অটল বিশ্বাস যে, সে নিজে মৃত্যুহীন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই মানব-জীবনের প্রচণ্ড বিস্ময়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দর্শনে ইহার বিপক্ষে অশেষ প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও এবং ইন্দ্রিয়গত ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের মধ্যে চিরবিদ্যমান রহস্য-যবনিকা যুক্তিসহায়ে ভেদ করিতে অক্ষম হইলেও মানুষ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছে যে, সে কখনও মরিতে পারে না।

আমরা সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া অনুশীলন করিতে পারি, তথাপি শেষ পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর সমস্যাটিকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন যুক্তিমূলক

প্রমাণের স্তরেই দাঁড় করাইতে পারি না। মানব-সত্তার স্থায়িত্ব বা অনিত্যতার পক্ষে বা বিপক্ষে আমরা যত খুশি লিখিতে, বলিতে, প্রচার করিতে বা শিক্ষা দিতে পারি; ইহার যে কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমরা প্রচণ্ড বিরোধে মত্ত হইতে পারি; ইহার পূর্ব পূর্ব নাম অপেক্ষা ক্রমেই শত শত জটিলতর নূতন নূতন নাম আবিষ্কার করিয়া আমরা ক্ষণকালের জন্য আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে এই শান্তি লাভ করিতে পারি যে, আমরা চিরকালের জন্য সমস্যাটির সমাধান করিয়া ফেলিয়াছি; আমরা পূর্ণ উদ্যমে ধর্মরাজ্যের কোন একটি অদ্ভুত কুসংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি, অথবা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর আপত্তিজনক কোন বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারকে মানিয়া লইতে পারি, কিন্তু অবশেষে দেখিতে পাই—আমরা যুক্তিরূপ এক সঙ্কীর্ণ ক্রীড়াক্ষেত্রে এমন একটি অনন্ত কন্দুক-ক্রীড়ায় লিপ্ত রহিয়াছি, যাহাতে বুদ্ধিরূপ খুঁটিগুলিকে বারংবার দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতেছি, আর পরক্ষণেই উহারা কন্দুকাঘাতে ধরাশায়ী হইতেছে।

কিন্তু এই যে মানসিক শ্রম ও কষ্টভোগ, যাহা বহু ক্ষেত্রে ক্রীড়া অপেক্ষাও অধিকতর সঙ্কট উৎপন্ন করে, উহার পশ্চাতে এমন একটি সত্য আছে, যাহার সম্বন্ধে বাদবিসংবাদ করা চলে না, যাহা সমস্ত বিসংবাদের অতীত। আর ইহাই হইল মহাভারতে উল্লিখিত সেই সত্য—সেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার: মানুষের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব যে, সে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। এমন কি আমার নিজের বিনাশের কথা ভাবিতে গেলেও আমাকে সাক্ষিরূপে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই বিনাশক্রিয়াটিকে দেখিতে হইবে।

এখন এই অদ্ভুত ব্যাপারের অর্থ বুঝিবার পূর্বে এই একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক যে, সমগ্রজগৎ এই তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহির্জগতের সত্তা অপরিহার্যরূপে অন্তর্জগতের সত্তার সহিত বিজড়িত। এই উভয় সত্তার কোন একটিকে বাদ দিয়া এবং অপরটিকে স্বীকার করিয়া জগৎ সম্বন্ধে যে কোন মতবাদ গড়িয়া তুলিলে উহা আপাততঃ যতই বিশ্বাসযোগ্য মনে হউক, ঐ মতবাদের স্রষ্টা নিজেই দেখিতে পাইবেন, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ—এই উভয় জগতের স্থায়িত্বকে যদি প্রেরণাশক্তির অন্যতম কারণরূপে স্বীকার না করা হয়, তবে তাঁহার কল্পিত প্রক্রিয়া অবলম্বনে একটিও সচেতন ক্রিয়া সম্ভব নয়। যদিও ইহা সম্পূর্ণ সত্য

যে, যখন মানব-মন আপন সীমাবদ্ধ ভাব অতিক্রম করে, তখন সে দেখে—দ্বৈত জগৎ এক অখণ্ড একত্বে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ঐ নিরপেক্ষ সত্তাকে তখনও ইহজগতের দৃষ্টিতে দেখা হয়, এবং সমগ্র দৃশ্য জগৎ—অর্থাৎ আমাদের পরিচিত এই জগৎ, জ্ঞাতার জ্ঞেয় বিষয়মাত্ররূপেই জ্ঞাত হয় ও জ্ঞাত হইতে পারে। সুতরাং এই জ্ঞাতার ধ্বংসের কল্পনা করিতে পারার পূর্বে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া জ্ঞেয় বিষয়ের ধ্বংস কল্পনা করিতে হইবে।

এ পর্যন্ত তো খুবই সহজ। ইহার পর ব্যাপারটি কঠিন হইয়া পড়িতেছে। সাধারণতঃ আমরা নিজদিগকে শরীর ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিতে পারি না। আমি যখনই নিজেকে অমর বলিয়া ভাবি, তখন 'আমি' বলিতে দেহরূপ আমাকেই গ্রহণ করি। কিন্তু শরীর যে সমগ্র প্রকৃতির মতোই অস্থায়ী এবং ইহা সর্বদা বিনাশের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, ইহা তো প্রত্যক্ষ সত্য।

তাহা হইলে এই স্থায়িত্ব কোথায় নিহিত?

আমাদের জীবনের সঙ্গে এমন আর একটি আশ্চর্য বিষয়ের সংযোগ রহিয়াছে, যেটিকে বাদ দিলে 'কে বাঁচিতে পারে, কে এক মুহূর্তের জন্যও জীবনে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে?'[১]—সেটি হইল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

এই আকাঙ্ক্ষাই আমাদের প্রতি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করে, আমাদের গতিবিধি সম্ভব করে, পরস্পরের সহিত আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। শুধু তাই নয়, ইহা যেন মানবজীবনরূপ বস্ত্রের টানা ও পোড়েন। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ইহাকে তিল তিল করিয়া নিজ ক্ষেত্র হইতে হটাইয়া দিতে চায়, ইহার রাজ্য হইতে একটির পর একটি দুর্গ অধিকার করিতে চায়, এবং (মানুষের) প্রতিটি পদক্ষেপ কার্য-কারণের রেলপথের লৌহবন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু আমাদের এ-সব প্রচেষ্টায় মুক্তি হাসিয়া উঠে, আর কি আশ্চর্য! মুক্তিকে যদিও আমরা অশেষ বিপুলতার বিধি ও কার্য-কারণের নিয়মের চাপে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম, তথাপি সে এখনও নিজেকে ঐগুলির ঊর্ধ্বে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহার অন্যথা কিরূপে হইতে পারে? সসীমকে যদি নিজের অর্থ পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সর্বদাই তাহাকে অসীমের উচ্চতর ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে

১ কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। তৈত্তি. উপ.—২।৭

তাহা করিতে হইবে। বদ্ধ কেবল মুক্তের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। যাহা কার্যরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাত হইতে পারে কার্যাতীত বস্তুর দ্বারা। এখানে আবার সেই একই অসুবিধা আসিয়া পড়িল। মুক্ত কে?—শরীর? অথবা মনও কি মুক্ত? ইহা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট যে বিশ্বের অন্যান্য যে-কোন বস্তুর ন্যায় এই দুইটিও নিয়মের অধীন।

এখন সমস্যাটি একটি উভয়-সঙ্কটের আকার ধারণ করিতেছে। হয় বলো, সমগ্র বিশ্ব একটি সদা-পরিবর্তনশীল জড়সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়, ইহা কার্য-কারণের অনিবার্য নিগড়ে চির আবদ্ধ, ইহার একটি কণিকারও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; অথচ অচিন্তনীয়রূপে ইহা নিত্যত্ব ও মুক্তির এক অবিচ্ছেদ্য প্রহেলিকা সৃজন করিয়া চলিয়াছে। অথবা বলো, এই বিশ্ব ও আমাদের মধ্যে এমন কিছু রহিয়াছে, যাহা নিত্য এবং মুক্ত। ফলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, মানুষের মনে নিত্যত্ব ও মুক্তি সম্বন্ধে যে স্বভাবসিদ্ধ মৌলিক বিশ্বাস রহিয়াছে, তাহা প্রহেলিকা নয়। বিজ্ঞানের কর্তব্য হইল উচ্চতর সামান্যীকরণের সাহায্যে জাগতিক ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করা। সুতরাং কোন ব্যাখ্যা-কালে যদি অপরাপর তথ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যার জন্য উপস্থাপিত নূতন তথ্যের কিয়দংশকে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, তবে ঐ ব্যাখ্যা আর যাহা কিছু হউক, বিজ্ঞান-নামধেয় হইতে পারে না।

অতএব যে-কোন ব্যাখ্যাতে এই সদা-বিদ্যমান এবং সর্বদা-আবশ্যক মুক্তির ধারণাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহা উপরি-উক্ত প্রকারে ভ্রান্ত, অর্থাৎ অপর তথ্যগুলির ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে উহা নূতন তথ্যের একাংশকে অস্বীকার করে; সুতরাং উহা ভ্রান্ত। অতএব আমাদের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একমাত্র অপর বিকল্পটি স্বীকার করা চলে, তাহা এই যে—আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা মুক্ত এবং নিত্য।

কিন্তু তাহা শরীর নহে, মনও নহে। শরীর প্রতি মুহূর্তে মরিতেছে, মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। শরীর একটি যৌগিক পদার্থ, মনও তাই; অতএব তাহারা কখনও পরিবর্তনশীলতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। কিন্তু এই স্থূল জড়বস্তুর ক্ষণিক আবরণের ঊর্ধ্বে, এমন কি মনের সূক্ষ্মতর আবরণেরও ঊর্ধ্বে, সেই আত্মা বিরাজমান, যাহা মানুষের প্রকৃত সত্তা, যাহা

চিরস্থায়ী ও চিরমুক্ত। তাহারই মুক্ত স্বভাব মানুষের চিন্তা এবং বস্তুর স্তরের মধ্য দিয়া অনুস্যুত হইতেছে এবং নামরূপের বর্ণপ্রলেপ সত্ত্বেও স্বীয় শৃঙ্খলহীন অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। অজ্ঞানের ঘনীভূত স্তরের আবরণ সত্ত্বেও তাঁহারই অমরত্ব, তাঁহারই পরমানন্দ, তাঁহারই শান্তি, তাঁহারই ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত হইয়া স্বীয় অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ভয়শূন্য, মৃত্যুহীন, মুক্ত আত্মাই প্রকৃত মানুষ।

যখন কোন বহিঃশক্তি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, কোনও পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না, তখনই স্বাধীনতা বা মুক্তি সম্ভব। মুক্তি শুধু তাহারই পক্ষে সম্ভব, যে সর্বপ্রকার বন্ধনের—সমস্ত নিয়মের এবং কার্য-কারণের নিয়ন্ত্রণের অতীত। অর্থাৎ অন্য প্রকারে বলিতে গেলে বলা যায়, যে অবিকারী সেই শুধু মুক্ত এবং সেইজন্যই অমর হইতে পারে। মুক্ত অবিকারী ও বন্ধনহীন এই যে জীবাত্মা, এই যে মানবাত্মা, ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ; ইহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই।

'এই মানবাত্মা অজ, অমর, শাশ্বত ও সনাতন।'

আত্মা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর

বেদান্ত দর্শনের মতে মানুষ যেন তিনটি পদার্থ দিয়া গড়া। একেবারে বাহিরে আছে দেহ, মানুষের স্থূল রূপ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি সংবেদনের যন্ত্রসমূহ ইহাতেই রহিয়াছে। এই চক্ষু দৃষ্টির উৎস নয়, ইহা যন্ত্রমাত্র। ইহার অন্তরালে আছে প্রকৃত ইন্দ্রিয়। সেইরূপ বাহিরের কর্ণও শ্রবণের ইন্দ্রিয় নয়, যন্ত্রমাত্র; তাহার অন্তরালে আছে প্রকৃত ইন্দ্রিয়; আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানে তাহাকেই বলে স্নায়ু-কেন্দ্র। সংস্কৃতে এগুলিকে বলে ইন্দ্রিয়। যে-কেন্দ্র চক্ষুকে পরিচালিত করে, তাহা যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে চক্ষু আর দেখিতে পায় না; সকল ইন্দ্রিয়-সম্পর্কেই ইহা সত্য। ইন্দ্রিয়গুলি আবার যতক্ষণ না আর একটি জিনিসের সহিত যুক্ত হয়, ততক্ষণ তাহারা নিজে নিজে কোন বিষয়-সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে না। সেই আর একটি জিনিস

হইল মন। অনেক সময়েই তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ একটি বিশেষ চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন থাকা-কালে ঘড়ি বাজিলেও তাহা শুনিতে পাও না। কেন? কান তো ঠিকই ছিল, বায়ুর কম্পন তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল এবং মস্তিষ্কের ভিতরে নীতও হইয়াছিল, তথাপি শুনিতে পাও নাই, কারণ মন সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। বাহিরের বস্তুসমূহের ধারণা প্রথমে ইন্দ্রিয়ে নীত হয়; তারপর মন তাহার সহিত যুক্ত হইলে সেগুলিকে গ্রহণ করিয়া যেন একটি প্রলেপ লাগাইয়া দেয়, তাহাকেই বলে অহংকার—'আমি'। মনে কর, আমি যখন একটা কাজে ব্যস্ত আছি, তখন একটি মশা আমার আঙুলে কামড় দিল। আমি সেটা বুঝিতে পারি না, কারণ আমার মন তখন অন্য কিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে ইন্দ্রিয়-প্রাপ্ত ধারণার সঙ্গে যখন আমার মন যুক্ত হয়, তখন একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সেই প্রতিক্রিয়ার ফলেই মশা-সম্পর্কে আমি সচেতন হই। কাজেই অঙ্গসমূহের সঙ্গে মনের যোগ হওয়াই যথেষ্ট নয়; ইচ্ছার আকারে প্রতিক্রিয়ারও উপস্থিতি প্রয়োজন। মনের যে-বৃত্তি হইতে এই প্রতিক্রিয়া আসে—এই যে জ্ঞান-বৃত্তি, ইহাকেই বলে 'বুদ্ধি'। প্রথমতঃ একটি বাহিরের যন্ত্র থাকা চাই, তারপর ইন্দ্রিয়, তারপর ইন্দ্রিয়ের সহিত মন যুক্ত হওয়া চাই, তারপর চাই বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া, এবং যখন এই সবগুলি সম্পূর্ণ হইবে, তৎক্ষণাৎ দেখা দিবে 'আমি এবং বহির্জাগতিক বস্তু'র ধারণা, দেখা দিবে—অনুভব বা প্রত্যয়-জ্ঞান। যে বহিরিন্দ্রিয়টি যন্ত্রমাত্র, তাহার অবস্থান দেহে; তারপর আছে সূক্ষ্মতর অন্তরিন্দ্রিয়, তারপর মন, তারপর বুদ্ধিবৃত্তি, তারপর অহংকার। অহংকার বলে: 'আমি'—আমি দেখি, আমি শুনি ইত্যাদি। সমগ্র কর্মধারাটি কয়েকটি শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়; তাহাদের প্রাণশক্তি বলিতে পারো; সংস্কৃতে তাহাদের বলে 'প্রাণ'। মানুষের এই স্থূল অংশ, যাহাতে বহিরিন্দ্রিয়সমূহ অবস্থিত, তাহাকে বলে স্থূল দেহ বা 'স্থূল শরীর'। তারপর আসে প্রথমে ইন্দ্রিয়, তারপর মন, বুদ্ধি, অহংকার। এই-সব এবং প্রাণশক্তিসমূহ মিলিয়া যে যৌগিক সত্তা গড়িয়া ওঠে, তাহাকে বলে সূক্ষ্ম দেহ বা সূক্ষ্ম শরীর। এই শক্তিসমূহ কতকগুলি সূক্ষ্ম পদার্থ দিয়া গঠিত; সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, স্থূল দেহের কোন ক্ষতিই সেগুলিকে ধ্বংস করিতে পারে না; দেহের সর্বপ্রকার আঘাতকে অতিক্রম করিয়া সেগুলি বাঁচিয়া থাকে। যে স্থূল শরীর আমরা

দেখিতে পাই, তাহা স্থূল পদার্থ দিয়া গঠিত, কাজেই তাহা নিত্য নূতন হইতেছে, নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ—মন বুদ্ধি ও অহংকার সূক্ষ্মতম পদার্থ দ্বারা গঠিত, কাজেই যুগ যুগ ধরিয়া তাহারা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোন কিছু দ্বারা তাহাদের বাধা দেওয়া যায় না; যে-কোন বাধাকে তাহারা অতিক্রম করিতে পারে। স্থূল দেহ যেমন অচেতন, সূক্ষ্মদেহও তাই, কারণ তাহাও সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত। যদিও তাহার এক অংশকে বলে মন, অপর অংশকে বুদ্ধি এবং তৃতীয় অংশকে অহংকার, তথাপি একদৃষ্টিতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, উহাদের কেহই 'জ্ঞাতা' হইতে পারে না। উহাদের কেহই অনুভবের কর্তা হইতে পারে না; সর্বকর্মের সাক্ষী বা সর্বকর্মের লক্ষ্যও হইতে পারে না। মন, বুদ্ধি বা অহংকারের সকল কর্মই এতদ্ব্যতিরিক্ত কাহারও জন্ম হইতে বাধ্য। এই সব-কিছুই সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত বলিয়া কখনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। এগুলির দীপ্তি নিজেদের ভিতরে থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই টেবিলটির প্রকাশ কোন বাহ্যবস্তুর দরুন হইতে পারে না। সুতরাং উহাদের সকলের পশ্চাতে নিশ্চয় এমন একজন আছেন, যিনি প্রকৃত প্রকাশক, প্রকৃত দ্রষ্টা, প্রকৃত ভোক্তা; সংস্কৃতে তাঁহাকেই বলা হয় 'আত্মা'—মানুষের আত্মা, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। তিনিই সব কিছু দেখেন। বাহিরের যন্ত্র ও ইন্দ্রিয়সমূহ ধারণাগুলি সংগ্রহ করিয়া মনের কাছে প্রেরণ করে, মন প্রেরণ করে বুদ্ধির কাছে, বুদ্ধিতে সেগুলি আয়নার মতো প্রতিফলিত হয়; এবং তাহার পশ্চাতে আছেন আত্মা, যিনি সেগুলির উপর দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁহার আদেশ ও নির্দেশ দান করেন। এই-সব যন্ত্রের চালক তিনি, গৃহের কর্তা তিনি, দেহ-সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা তিনি। অহংকারবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাবৃত্তি, ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রসমূহ, স্থূল দেহ—সকলেই তাঁহার আদেশ পালন করে। তিনিই এইসব-কিছুকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই মানুষের আত্মা। বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশে যাহা আছে, সমগ্র বিশ্বেও তাহাই আছে। সামঞ্জস্য যদি এই বিশ্বের বিধান হয়, তাহা হইলে বিশ্বের প্রতিটি অংশ সামগ্রিকভাবে একই পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হইবে। সুতরাং আমরা স্বভাবতই মনে করিতে পারি যে, যাহাকে আমরা এই বিশ্ব বলি, তাহার স্থূল জড়রূপের অন্তরালে সূক্ষ্মতর উপাদানের একটি বিশ্ব নিশ্চয়ই আছে; তাহাকেই

আমরা বলি মনন বা চিন্তা। আবার তাহারও অন্তরালে আছেন আত্মা—যিনি এই-সব চিন্তাকে সম্ভব করেন, যিনি আদেশ দেন, যিনি এই বিশ্ব-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজা। প্রতিটি মন এবং প্রতিটি দেহের অন্তরালে যে-আত্মা, তাহাকেই বলে প্রত্যগাত্মা—জীবাত্মা; আর বিশ্বের অন্তরালে অবস্থিত ইহার চালক শাসক ও নিয়ামকরূপী যে-আত্মা, তিনিই ঈশ্বর।

পরবর্তী বিবেচ্য বিষয়: এই-সব জিনিস কোথা হইতে আসিল? উত্তর—'আসিল' বলিতে কি বোঝায়? যদি ইহার এই অর্থ হয় যে, শূন্য হইতে কোন কিছু সৃষ্টি করা যায়, তবে তাহা অসম্ভব। এই সৃষ্টি—এই প্রকাশ কখনও শূন্য হইতে হয় না। কারণ না থাকিলে কোন কার্য হয় না; আর কার্য তো কারণেরই পুনঃপ্রকাশ। এই যে একটি গ্লাস। মনে কর—ইহাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিলাম, চূর্ণ করিলাম এবং রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলিলাম। তাহা হইলে কি ইহা শূন্যে ফিরিয়া যাইবে? নিশ্চয়ই না। ইহার আকৃতিটিই ভাঙিবে, কিন্তু যে অণু-গুলি দ্বারা ইহা গঠিত, সেগুলি ঠিকই থাকিবে; সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ানু-ভূতির বাহিরে চলিয়া যাইবে বটে, কিন্তু থাকিবে; এবং ইহাও খুবই সম্ভব যে, সেগুলি দ্বারা আর একটি গ্লাস নির্মিত হইবে। একটি ক্ষেত্রে যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে সব ক্ষেত্রেই ইহা সত্য হইবে। শূন্য হইতে কিছুই নির্মাণ করা যায় না। আবার কোন কিছুকে শূন্যে মিলাইয়াও দেওয়া যায় না। ইহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে পারে, আবার স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে পারে। বৃষ্টিবিন্দু সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে আসিয়া বাতাসের দ্বারা তাড়িত হইয়া পর্বতে যায়; সেখান হইতে আবার জল হইয়া শত শত মাইল প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র-জননীর কাছেই ফিরিয়া আসে। বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মলাভ করে। বৃক্ষটি মরিয়া যায়, রাখিয়া যায় শুধু বীজ। সেই বীজ আর একটি বৃক্ষ হইয়া দেখা দেয়, আবার বীজেই শেষ হইয়া যায়। এমনি করিয়াই চলে। একটি পাখিকে দেখ। ডিম হইতে জন্মিয়া কেমন সুন্দর একটি পাখি হয়; তারপর শুধু কতকগুলি ডিম রাখিয়া মরিয়া যায়; সেই ডিমে থাকে ভবিষ্যৎ পাখির জীবকোষ; ঠিক তেমনি জন্তুর বেলায়, মানুষের বেলায়। সব কিছুই যেন শুরু হয় কয়েকটি বীজ, কয়েকটি মূল, কয়েকটি সূক্ষ্ম আকার হইতে; যতই বাড়িতে থাকে, ততই স্থূল হইতে স্থূলতর হয়; তারপর আবার সেই সূক্ষ্মরূপে

ফিরিয়া যায়, মিলিয়া যায়। সারা বিশ্বই এইভাবে চলিতেছে। এমন এক সময় আসে, যখন সমগ্র বিশ্ব সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়, অবশেষে যেন সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হইয়া যায়; তবু অতি সূক্ষ্ম বস্তুরূপে থাকিয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে আমরা জানিয়াছি, এই পৃথিবী ক্রমশঃ শীতল হইতেছে এবং এক সময়ে অত্যন্ত শীতল হইয়া যাইবে। তারপর খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত পুনরায় ইথারে পরিণত হইবে। তথাপি মূল উপাদান সবই থাকিবে এবং সেই মালমশলা হইতে আর একটি পৃথিবী বাহির হইয়া আসিবে। সেটিও আবার অদৃশ্য হইয়া যাইবে, এবং নতুন একটি দেখা দিবে। অতএব এই বিশ্বও ইহার মূল কারণে ফিরিয়া যাইবে; আবার তাহার উপাদানগুলি একত্র হইয়া একটি আকার ধারণ করিবে, ঠিক তরঙ্গ যেমন নীচে নামে, আবার উপরে ওঠে, এবং একটি আকার ধারণ করে। কারণে ফিরিয়া যাওয়া, আবার বাহির হইয়া আসা এবং রূপ পরিগ্রহ করাকেই সংস্কৃতে বলে 'সংকোচ' ও 'বিকাশ' অর্থাৎ সঙ্কুচিত হওয়া এবং প্রসারিত হওয়া। সমগ্র বিশ্ব যেন সঙ্কুচিত হয়, তারপর আবার প্রসারিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচলিত ভাষায় বলিতে গেলে সব কিছুই ক্রমসঙ্কুচিত ও ক্রমবিকশিত হয়। তোমরা বিবর্তনবাদ বা ক্রমবিকাশবাদের কথা শুনিয়াছ; শুনিয়াছ, কেমন করিয়া ক্রমাগত বাড়িতে বাড়িতে সব-কিছুই নিম্নতর রূপ হইতে গড়িয়া ওঠে। সে কথা খুবই ঠিক, কিন্তু প্রত্যেক বিবর্তনেরই একটি ক্রমসঙ্কুচিত পূর্বাবস্থা বা অনভিব্যক্ত অবস্থা আছে। আমরা জানি, এই বিশ্বে যে-শক্তির লীলা চলিতেছে, তাহার মোট পরিমাণ সব সময়েই এক, একটি জড়পরমাণুরও ধ্বংস নাই। কোন-মতেই তুমি এক বিন্দু পদার্থ কমাইতে পার না। এক বিন্দু শক্তিও তুমি হ্রাস করিতে পার না বা বৃদ্ধি করিতে পার না। মোট পরিমাণ সর্বদা একই থাকিবে। প্রকাশেই যাহা কিছু পার্থক্য—কখনও ক্রম-সঙ্কোচন, কখনও বিবর্তন। পূর্ব কল্পে যাহা অব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা হইতেই এই কল্পের বিবর্তন; এই বর্তমান কল্প আবার অনভিব্যক্ত হইবে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে, এবং তাহা হইতেই পরবর্তী কল্পের আবির্ভাব হইবে। সমগ্র বিশ্ব এই ভাবেই চলিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, একেবারে শূন্য হইতে কোন কিছু গড়িয়া উঠিতেছে—এই অর্থে 'সৃষ্টি' বলিয়া কিছু নাই। বরং বলা চলে, সব

কিছুরই বিকাশ বা অভিব্যক্তি হইতেছে, আর ঈশ্বর হইতেছেন বিশ্বের বিকাশ-কর্তা। এই বিশ্ব যেন তাঁহার ভিতর হইতে নিঃশ্বাসের মতো আসিতেছে, আবার তাঁহাতেই সঙ্কুচিত হইয়া মিশিয়া যাইতেছে; আবার তিনি ইহাকে বাহিরে নিক্ষেপ করিতেছেন। বেদে একটি চমৎকার উপমা আছে—'সেই শাশ্বত পুরুষ নিঃশ্বাসে এই বিশ্বকে প্রকট করিতেছেন এবং প্রশ্বাসে ইহাকে গ্রহণ করিতেছেন।' ঠিক যেমন একটি ধূলিকণা আমরা নিঃশ্বাসের সহিত বাহির ও প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে পারি। খুব ভাল কথা, কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে: প্রথম কল্পের বেলায় কি হইয়াছিল? ইহার উত্তর: 'প্রথম' বলিতে আমরা কি বুঝি? প্রথম কল্প বলিয়া কিছু ছিল না। সময়ের যদি আদি বলিয়া কিছু থাকে, তাহা হইলে সময়ের ধারণাই নষ্ট হইয়া যায়। সময় যেখানে শুরু হইয়াছিল, সেইরূপ একটি সীমানার কথা ভাবিতে চেষ্টা কর, দেখিবে সেই সীমানার ওপারে আরও সময়ের কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে। স্থানের আরম্ভের কথা ভাবিতে চেষ্টা কর, দেখিবে তাহার আগেও স্থানের কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে। স্থান এবং কাল—দুই-ই অসীম, তাহাদের আদিও নাই, অন্তও নাই। ঈশ্বর পাঁচ মিনিটে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ঘুমাইতে গেলেন এবং সেই সময় হইতে ঘুমাইয়াই আছেন—ইহার চেয়ে পূর্বোক্ত ধারণা অনেক ভাল। অপর পক্ষে, এই ধারণাদ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই শাশ্বত সৃষ্টি-কর্তারূপে। এখানে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠিতেছে, পড়িতেছে; আর ঈশ্বর সেই শাশ্বত প্রবাহকে পরিচালিত করিতেছেন। এই বিশ্ব যেমন অনাদি এবং অনন্ত, ঈশ্বরও তাই। তাহাই হওয়া উচিত, কারণ আমরা যদি বলি যে, এমন এক সময় ছিল, যখন স্থূল কি সূক্ষ্ম কোন আকারেই কোন সৃষ্টি ছিল না। তাহা হইলে বলিতে হয় তখন কোন ঈশ্বরও ছিল না, কারণ ঈশ্বর আমাদের নিকট এই বিশ্বের সাক্ষিরূপেই বিদিত। কাজেই বিশ্ব যখন ছিল না, তখন তিনিও ছিলেন না। একটি ধারণা হইতেই অপরটি আসে। কার্যের ধারণা হইতেই আমরা কারণের ধারণা লাভ করি। কার্য যদি না থাকে, তাহা হইলে কারণও থাকিতে পারে না। কাজেই ইহা স্বভাবতই ধারণা করা যায়—বিশ্ব যেহেতু শাশ্বত, ঈশ্বরও শাশ্বত।

আত্মাও শাশ্বত। কেন? প্রথমত আমরা জানি—আত্মা জড় নয়। ইহা স্থূল শরীর নয়, অথবা আমরা যাহাকে মন বা চিন্তা বলি—সেরূপ কোন

সূক্ষ্ম শরীরও নয়। ইহা ভৌতিক শরীর নয়, কিংবা খ্রীষ্টধর্মে যাহাকে 'আত্মিক দেহ' বলে, তাহাও নয়। স্থূল ও 'আত্মিক' শরীর দুইই পরিবর্তনশীল। স্থূল শরীর প্রায় প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল এবং মরণশীল, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর মানুষের মুক্তিলাভ পর্যন্ত দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে, তারপর উহার শেষ হইয়া যায়। মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখন তাহার আত্মিক শরীরও বিলীন হয়। যখনই একটি মানুষের মৃত্যু হয়, তখনই তাহার স্থূল শরীর পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। আত্মা কোন অণুপরমাণুর দ্বারা গঠিত নয় বলিয়া অবিনশ্বর। ধ্বংস বলিতে আমরা কি বুঝি? যে-সব মূল উপাদান লইয়া একটি বস্তু গঠিত, তাহাদের বিভাজনই ধ্বংস। এই গ্লাসটি যদি নানা খণ্ডে ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে ইহার অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং তাহাতেই গ্লাসটি ধ্বংস হইবে। ধ্বংসের অর্থই অংশসমূহের বিভাজন। অতএব সহজেই বুঝা যাইতেছে—বিভিন্ন অংশদ্বারা গঠিত নয়, এমন কোন কিছুরই ধ্বংস হইতে পারে না, বিভাজন হয় না। আত্মা কোনরূপ উপাদানের সমবায়ে গঠিত নয়। ইহা অখণ্ড, এক; কাজেই ইহা অবিনশ্বর। সেই একই কারণে ইহা অনাদিও বটে। অতএব আত্মা অনাদি ও অনন্ত।

মোট তিনটি সত্তা আছে। প্রথমতঃ আছে অসীম অথচ পরিবর্তনশীল প্রকৃতি। সমগ্র প্রকৃতি অনাদি এবং অনন্ত, কিন্তু ইহার ভিতরে আছে বিবিধ পরিবর্তন। ইহা যেন সহস্র বৎসর যাবৎ সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত একটি নদীর মতো। একই নদী, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাহার পরিবর্তন ঘটিতেছে; জলকণাগুলি প্রতিনিয়তই তাহাদের স্থান পরিবর্তন করিতেছে। তারপর আছেন ঈশ্বর, অপরিবর্তনীয় শাস্তা। আর আছে আমাদের আত্মা, ঈশ্বরের মতোই অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত; কিন্তু সেই শাস্তার অধীন। একজন প্রভু, অপরজন ভৃত্য; আর তৃতীয় পক্ষ হইল প্রকৃতি।

ঈশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ; কার্যসংঘটনের জন্য কারণকে অবশ্যই উপস্থিত থাকিতে হইবে। শুধু তাই নয়, কারণই কার্যরূপে দেখা দেয়। নির্মাণকারী কর্তৃক ব্যবহৃত কিছু উপাদান ও কিছু শক্তির সাহায্যেই গ্লাস নির্মিত হয়। গ্লাসে আছে ঐ উপাদান এবং ঐ শক্তি। ব্যবহৃত শক্তিই সংলগ্ন থাকিবার সংহতি-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সেই শক্তির অভাব ঘটিলেই গ্লাসটি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া যাইবে। উপাদানসমূহও

নিঃসন্দেহে গ্লাসের মধ্যেই আছে। কেবলমাত্র তাহাদের আকারের পরিবর্তন হইয়াছে। কারণই কার্যরূপে পরিণত হইয়াছে। যেখানেই কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেই বিশ্লেষণ করিলে কারণ পাওয়া যায়; কারণই নিজেকে কার্যরূপে প্রকাশ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর যদি এই বিশ্বের কারণ হন, এবং এই বিশ্ব যদি কার্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরই এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। আত্মাসমূহ যদি কার্য হয় এবং ঈশ্বর যদি কারণ হন, তাহা হইলে ঈশ্বরই আত্মা-রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রতিটি আত্মাই ঈশ্বরের অংশ। 'একই অগ্নি হইতে যেমন অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, ঠিক তেমনই সেই শাশ্বত-এক হইতেই বিশ্বের সকল আত্মা বাহির হইয়াছে।'[1]

আমরা দেখিলাম, শাশ্বত ঈশ্বর আছেন এবং শাশ্বত প্রকৃতিও আছে, আর আছে অসংখ্য শাশ্বত আত্মা। এই হইল ধর্মের প্রথম সোপান। ইহাকে বলে দ্বৈতবাদ। এই স্তরে মানুষ নিজেকে এবং ঈশ্বরকে অনন্তকাল ধরিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখে। এই স্তরে ঈশ্বর একটি স্বতন্ত্র সত্তা, মানুষ একটি স্বতন্ত্র সত্তা, এবং প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তা। ইহাই হইল দ্বৈতবাদ। এই মতে জ্ঞাতা কর্তা এবং জ্ঞেয় কর্ম পরস্পর-বিরোধী। মানুষ প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া মনে করে, সে কর্তা আর প্রকৃতি কর্ম। কর্তা ও কর্মের দ্বৈতভাব সে নিরীক্ষণ করে। মানুষ যখন ঈশ্বরের দিকে তাকায়, তখন ঈশ্বরকে দেখে কর্মরূপে, আর নিজেকে দেখে কর্তারূপে। এই হইল মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে দ্বৈতভাব। সাধারণভাবে ইহাই হইল ধর্মের প্রথম রূপ।

তারপর আসে আর একটি রূপ, যাহা এইমাত্র তোমাদের দেখাইলাম। মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করে যে, ঈশ্বর যদি এই বিশ্বের কারণ হন, এবং এই বিশ্ব যদি কার্য হয়, তাহা হইলে স্বয়ং ঈশ্বরই তো এই বিশ্ব এবং আত্মাসমূহরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং মানুষ নিজেও পূর্ণ সত্তা ঈশ্বরের একটি অংশ মাত্র। আমরা ছোট ছোট জীব সেই অগ্নিকুণ্ডের স্ফুলিঙ্গ মাত্র; সমগ্র বিশ্ব স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রকাশ। ইহাই পরবর্তী সোপান। সংস্কৃতে ইহাকে বলে 'বিশিষ্টাদ্বৈত'। যেমন আমার এই শরীর আছে, এই শরীর আত্মাকে

১ মুণ্ডক. উপ, ২।১।১

আচ্ছাদন করিয়া আছে, এই শরীরের ভিতরে আত্মা ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, সেইরূপ অসংখ্য আত্মা ও প্রকৃতি-সমন্বিত এই সমগ্র বিশ্ব যেন ঈশ্বরের দেহস্বরূপ। ক্রমসঙ্কোচন বা অনভিব্যক্তির সময় যখন আসে, তখন এই বিশ্ব সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয় বটে, তবু ঈশ্বরের দেহরূপেই থাকে। স্থূল প্রকাশ যখন শুরু হয়, তখনও বিশ্ব ঈশ্বরের দেহরূপেই থাকে। মানুষের আত্মা যেমন মানুষের দেহ ও মনের আত্মা, সেইরূপ ঈশ্বর আমাদের 'আত্মারও আত্মা'। আমাদের 'আত্মার আত্মা'—এই কথাটি তোমরা প্রত্যেক ধর্মেই শুনিয়াছ। ইহার অর্থ এই—তিনি যেন তাহাদের সকলের মধ্যে বাস করেন, তাহাদের পরিচালিত করেন, তাহাদের সকলকে শাসন করেন। দ্বৈতবাদীর প্রথম মতে—আমরা প্রত্যেকেই এক একটি ব্যক্তি, অনাদি কাল ধরিয়া ঈশ্বর ও প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় মতে—আমরা ব্যক্তি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে পৃথক্ নই। আমরা যেন একই বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চরমান অংশ, আর ঈশ্বর হইলেন সমষ্টিবস্তু। ব্যক্তিহিসাবে আমরা স্বতন্ত্র। কিন্তু ঈশ্বরে আমরা এক। আমরা সকলে তাঁহাতেই আছি। আমরা সকলে তাঁহারই অংশ, সুতরাং আমরা এক। তথাপি মানুষে মানুষে, মানুষে ও ঈশ্বরে একটি কঠোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে—স্বতন্ত্র, তবু স্বতন্ত্র নয়।

তারপর আসে একটি আরও সূক্ষ্মতর প্রশ্ন। প্রশ্নটি হইল: অসীমের কি অংশ থাকিতে পারে? অসীমের অংশ বলিতে কি বোঝায়? যদি বিচার করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে—ইহা অসম্ভব। অসীমকে কখনও ভাগ করা যায় না, উহা সর্বদাই অসীম। অসীমকে যদি ভাগ করা যাইত, তাহা হইলে প্রতিটি অংশই অসীম হইত; অথচ অসীম কখনও দুইটি থাকিতে পারে না। ধর যদি দুইটি থাকিত, তাহা হইলে একটি অপরটিকে সীমাবদ্ধ করিত, এবং উভয়েই সসীম হইয়া যাইত। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হইল—অসীম এক, বহু নয়; একই অসীম আত্মা হাজার হাজার দর্পণে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আত্মা-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই বিশ্বের পটভূমি সেই অসীম আত্মাকেই আমরা বলি 'ঈশ্বর'। মানব মনের পটভূমি সেই একই অসীম আত্মাকেই আমরা বলি 'মানবাত্মা'।

প্রকৃতি ও মানুষ

বিশ্বজগতের যেটুকু অংশ ভৌতিক স্তরে অভিব্যক্ত, শুধু সেইটুকুই প্রকৃতি-সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার অন্তর্গত। মন বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, তাহা প্রকৃতিরূপে বিবেচিত হয় না।

ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া দার্শনিকগণ মনকে প্রকৃতি হইতে বাদ দিয়া থাকিবেন, কারণ প্রকৃতি নিয়মের—কঠোর অনমনীয় নিয়মের শাসনে আবদ্ধ, প্রকৃতির অন্তর্গত বিবেচিত হইলে মনও নিয়মের অধীন হইয়া পড়িবে। ফলে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মতবাদ দাঁড়াইতে পারিবে না; কেন না যাহা কোন নিয়মের অধীন, তাহা কিরূপে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হইতে পারে?

যুক্তি ও তথ্যের উপর দণ্ডায়মান ভারতীয় দার্শনিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী এ-বিষয়ে বিপরীত। তাঁহাদের মতে—ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত সমগ্র বাস্তব জীবনই নিয়মের অধীন। তাঁহাদের মতে: মন ও বাহ্য প্রকৃতি, দুই-ই নিয়মের—একই নিয়মের অধীন। মন যদি নিয়মের অধীন না হয়, আমরা এখন যাহা চিন্তা করিতেছি, তাহা যদি পূর্ব চিন্তার অনিবার্য ফলস্বরূপ না হয়, যদি একটি মানসিক অবস্থা আর একটি মানসিক অবস্থার অনুসরণ না করে, তবে মনকে অযৌক্তিক বলিতে হইবে। এমন কে আছে, যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি স্বীকার করিয়া যুক্তির ক্রিয়া অস্বীকার করিতে পারে? অপর পক্ষে মন কার্য-কারণ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইহা স্বীকার করিয়া কে বলিতে পারে যে, ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন?

নিয়মই কার্য-কারণের ক্রিয়া। পূর্ববর্তী কতকগুলি ঘটনার অনুযায়ী হইয়া পরবর্তী কতকগুলি ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। প্রতিটি পূর্বগামী ঘটনার বা কারণের অনুবর্তী কার্য আছে। প্রকৃতি এইরূপেই চলিয়াছে। এই নিয়মের শাসন যদি মনের স্তরেও চালু থাকে, তাহা হইলে মন বদ্ধ—স্বাধীন নয়। না, ইচ্ছাশক্তিও স্বাধীন নয়। ইহা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু আমরা সকলেই জানি, অনুভব করি যে, আমরা স্বাধীন। স্বাধীন না হইলে আমাদের জীবনের কোন অর্থ থাকে না, জীবনযাপন বৃথা হইয়া যায়।

প্রাচ্যদেশীয় দার্শনিকগণ এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, বা বলা যায়—উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, মন এবং ইচ্ছাশক্তি দেশকালনিমিত্তের দ্বারা তথা-

কথিত জড়বস্তুর মতোই বদ্ধ ; সুতরাং উহারা কার্যকারণের নিয়মে শাসিত। আমরা কালের মধ্যে চিন্তা করি, আমাদের চিন্তাগুলি কালের দ্বারা সীমিত ; যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, সে সব কিছুই দেশে ও কালে বর্তমান। সব কিছুই কার্য-কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলি, এবং মন—এ দুইই একই উপাদানে গঠিত। প্রভেদ কেবল কম্পনের তারতম্যে। মনের অতি নিম্নগ্রামের স্পন্দনকেই আমরা জড়বস্তু বলিয়া জানি। আবার জড়পদার্থের দ্রুত স্পন্দনকে আমরা মন বলিয়া জানি। উভয়ের উপাদান একই। অতএব জড়পদার্থ এবং দেশকালনিমিত্তের দ্বারা সীমিত বলিয়া জড়ের দ্রুত স্পন্দন মনও একই নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ।

প্রকৃতির উপাদান সর্বত্র সমজাতীয়। প্রভেদ কেবল বিকাশের তারতম্যে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইল 'প্রকৃতি' এবং ইহার আক্ষরিক অর্থ 'প্রভেদ'। সবই এক উপাদান, কিন্তু ইহা বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত।

মন জড়ে রূপান্তরিত হয়, আবার জড়ও মনে রূপান্তরিত হয়, ইহা শুধু কম্পনের তারতম্য।

একটি ইস্পাতের দণ্ড লও, উহাকে কম্পিত করিতে পারে—এইরূপ একটি শক্তি ইহাতে প্রয়োগ কর ; তারপর কি ঘটিবে ? যদি একটি অন্ধকার ঘরে এই পরীক্ষাটি করা হয়, তবে প্রথম তুমি শুনিতে পাইবে একটি শব্দ—একটি গুনগুন শব্দ। শক্তিপ্রবাহ বর্ধিত কর, দেখিবে ইস্পাতের দণ্ডটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। শক্তি আরও বর্ধিত কর, ইস্পাত-দণ্ডটি একেবারে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। উহা মনে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

আর একটি উদাহরণ লও : দশদিন আহার না করিলে আমি কোনপ্রকার চিন্তা করিতে পারি না। শুধু কয়েকটি এলোমেলো চিন্তা আমার মনে থাকিবে। আমি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িব এবং সম্ভবতঃ আমার নামও ভুলিয়া যাইব। তারপর কিছু খাদ্য গ্রহণ করিলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিব ; আমার মনের শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। খাদ্যই মনে রূপান্তরিত হইয়াছে। তেমনি স্পন্দনের গতিবেগ কমাইয়া মন দেহে অভিব্যক্ত হয়, জড়ে পরিণত হয়।

জড় ও মন—এ দুইটির কোন্‌টি প্রথম ? একটি উদাহরণসহ বুঝাইতেছি—একটি মুরগী ডিম পাড়িল, ডিমটি হইতে আর একটি মুরগীর জন্ম হইল ;

মুরগীটি আর একটি ডিম পাড়িল; ডিমটি হইতে আবার আর একটি মুরগী জন্মিল; অনন্ত কার্যকারণ-পরম্পরা এইরূপ চলিতে থাকিবে। এখন কোন্‌টি প্রথম—ডিম, না মুরগী? এমন কোন ডিমের কথা কল্পনা করিতে পার না, যাহা কোন মুরগী হইতে জন্মে নাই; অথবা এমন কোন মুরগীর বিষয় চিন্তা করিতে পার না, যাহা ডিম হইতে ফুটে নাই। যেটিই প্রথম হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের প্রায় সব চিন্তাধারাই এই ডিম ও মুরগীর ব্যাপারের মতো[১]।

মহত্তম সত্যগুলি অত্যন্ত সরল বলিয়াই বিস্মৃতির গর্ভে চলিয়া যায়। মহৎ সত্যগুলি সহজ, কেন না এগুলির প্রয়োগ সার্বকালিক। সত্য নিজেই সর্বদা সহজ ও সরল। যাহা কিছু জটিল, তাহা কেবল মানুষের অজ্ঞতার জন্য।

মানুষের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব মনেতে নাই, কেন না মন বদ্ধ। সেখানে কোন স্বাধীনতা নাই। মানুষ মন নয়, আত্মা। এই আত্মা সর্বদা মুক্ত, সীমাহীন ও চিরন্তন। এইখানেই—এই আত্মাতেই মানুষের মুক্তভাব। আত্মা সর্বদাই মুক্ত; কিন্তু মন উহার ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গগুলির সঙ্গে নিজেকে এক মনে করিয়া আত্মাকে দেখিতে পায় না এবং দেশকালনিমিত্ত-রূপ গোলকধাঁধায়—মায়ায় নিজেকে হারাইয়া ফেলে।

ইহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। আমরা সর্বদা মন এবং মনের অদ্ভুত পরিবর্তনগুলির সঙ্গে নিজেদের এক ভাবিতেছি।

মানুষের স্বতন্ত্রভাব আত্মাতেই অবস্থিত এবং আত্মা নিজেকে মুক্ত উপলব্ধি করিয়া—মনের বন্ধন সত্ত্বেও সর্বদা ঘোষণা করিতেছে: আমি মুক্ত! আমি যা, আমি তাই; আমি সেই। ইহাই আমাদের মুক্তি। সদামুক্ত সীমাহীন চিরন্তন আত্মা যুগে যুগে তাঁহার মন-রূপ যন্ত্রের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে অধিকতর ব্যক্ত হইতেছেন।

তাহা হইলে মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক কি? জীবের নিম্নতম বিকাশ হইতে মানব পর্যন্ত—সর্বত্রই প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মা বিকশিত হইতেছেন। নিম্নতম অভিব্যক্ত জীবনের মধ্যেও আত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশ নিহিত আছে, ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মা নিজের বিকাশ সাধন করিতেছেন।

১ তুলনীয়: বীজাঙ্কুর-ন্যায়

বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়াই আত্মার নিজেকে ব্যক্ত করিবার সংগ্রাম। ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম। প্রকৃতির অনুযায়ী কাজ করিয়া নয়, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই মানুষ আজ বর্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনধারণ করা, প্রকৃতির সঙ্গে একতানতা রক্ষা করা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু কথাই আমরা শুনিয়া থাকি। এরূপ ধারণা ভ্রম। এই টেবিলটি, এই জলের কুঁজাটি, এই খনিজ পদার্থগুলি, ঐ বৃক্ষ—ইহারা সকলেই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতেছে। সেখানে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান—কোন বিরোধ নাই। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের অর্থ নিশ্চেষ্টতা, মৃত্যু। মানুষ এই গৃহ কিরূপে নির্মাণ করিয়াছে—প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া? না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ইহা নির্মিত হইয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের পথেই মানুষের উন্নতি, প্রকৃতির অনুগত হইয়া নয়।

আত্মা—ইহার স্বরূপ ও লক্ষ্য[1]

প্রাচীনতম ধারণা এই যে, মানুষের মৃত্যু হইলে সে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুর পরও একটা সত্তা অবশিষ্ট থাকে এবং তাহাই বাঁচিয়া থাকে। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং প্রাচীন হিন্দু—সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রাচীনতম তিনটি জাতির মধ্যে তুলনা করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে এই ধারণাটি গ্রহণ করা সমীচীন হইবে। মিশরীয় এবং ব্যাবিলনীয়দিগের মধ্যে একটি আত্মা-বিষয়ক ধারণা—একটি যুগ্ম-সত্তার ধারণা দেখিতে পাই। তাহাদের মতে এই দেহের অভ্যন্তরে অপর একটি দেহ বর্তমান, যাহা এখানে বিচরণ করিয়া কর্মাদি সম্পাদন করিতেছে। যখন বাহ্যদেহটির মৃত্যু হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় দেহটি বাহিরে আসে এবং কিছুকাল বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু এই দ্বিতীয় দেহটির জীবনকাল বাহ্যদেহটির সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে। প্রথম দেহটির কোন অঙ্গ আহত হইলে দ্বিতীয়টিরও সেই অঙ্গ সমভাবে আহত হইবে। এই কারণেই প্রাচীন মিশরীয়দিগের মধ্যে মৃতব্যক্তির দেহকে সুগন্ধ আরক

প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত করিয়া, পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া সংরক্ষণ করিবার আগ্রহ দেখিতে পাই। আমরা দেখিতেছি যে, ব্যাবিলনীয় এবং প্রাচীন মিশরীয়দিগের মতে—এই দ্বিতীয় দেহটি অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না ; বড় জোর ইহা কিছুকাল থাকিতে পারে, অর্থাৎ পরিত্যক্ত বাহ্যদেহটি যতদিন সংরক্ষিত হয় ততদিন।

পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটি এই যে, এই দ্বিতীয়দেহ-সম্বন্ধীয় ধারণার সঙ্গে একটি ভয়ের ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে। ইহা সর্বদাই অসুখী এবং দুর্দশাগ্রস্ত। তীব্রতম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ইহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। যাহারা জীবিত, তাহাদের নিকট সে পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসে এবং খাদ্য, পানীয় ও ভোগ্য বস্তুসমূহ, যেগুলি সে এখন পাইতেছে না, সেগুলি পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করে। নীলনদের স্বচ্ছ জল, যাহা সে এখন পান করিতে পারে না, তাহা পান করিতে চায়। জীবিত থাকিতে যে-সব দ্রব্য সে ভোগ করিত, সেগুলি পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে। যখন দেখে, সে এইগুলি পাইবে না, তখন অত্যন্ত হিংস্র হইয়া উঠে এবং সময়ে সময়ে ঐ-সকল খাদ্য না পাইলে জীবিত ব্যক্তিদের জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে।

আর্যগণের চিন্তাধারা আলোচনা করিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটি বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। এখানেও একটি দ্বিতীয় দেহের ধারণা রহিয়াছে ; কিন্তু ঐটি একপ্রকার অধ্যাত্ম দেহ। অপর একটি বড় প্রভেদ এই যে, এই অধ্যাত্ম দেহ বা আত্মা বা যাহাই আমরা বলি না কেন, এইটির জীবনকাল পরিত্যক্ত দেহ দ্বারা বদ্ধ নয়। বরং আত্মা পূর্বদেহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে বলিয়াই মৃতদেহ দাহ করিবার অপূর্ব পদ্ধতিটি আর্যদের মধ্যে বর্তমান। মৃতের পরিত্যক্ত দেহ হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইতে চায়, আর মিশরীয়গণ এই দেহকে সুগন্ধ আরক দ্বারা সুবাসিত করিয়া, কবরে প্রোথিত করিয়া পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া উহাকে সংরক্ষিত করিতে চায়। মৃতের দেহকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়ার এই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রথা ছাড়াও কতকটা উন্নত জাতিগুলির মধ্যে মৃতদেহ বিনষ্ট করিবার যে রীতি দেখা যায়, তাহা দ্বারা বেশ প্রমাণিত হয় যে, উহাদের মধ্যে আত্মার ধারণাটি বর্তমান। যেখানেই দেহবিযুক্ত আত্মার ধারণাটি দেহের ধারণার সহিত যুক্ত, সেখানেই আমরা মৃতদেহ সংরক্ষিত করিবার এবং যে-কোন ভাবে ইহাকে

প্রোথিত করিবার আগ্রহ লক্ষ্য করি। অপর পক্ষে যাহাদের মধ্যে এই ধারণা পরিস্ফুট হইয়াছে যে, আত্মা দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং মৃতদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও আত্মা আহত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তাহাদের মধ্যেই মৃতদেহকে দাহ করিবার রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। তাই আমরা প্রাচীন আর্যজাতির মধ্যে এই মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা দেখিতে পাই, যদিও পারসীকরা অবশ্য এই প্রথাকে পরিবর্তন করিয়া একটি উচ্চস্থানে অনাবৃতভাবে মৃতদেহ রাখিবার প্রথা অনুসরণ করে। কিন্তু এই উচ্চস্থান বা দখ্‌ম্ (dakhma)-নামের অর্থ দাহ করিবার স্থান; ইহা দ্বারা প্রতীত হয় যে, প্রাচীনকালে তাহারাও মৃতদেহ পোড়াইত। আর্যজাতির অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের এই দ্বিতীয়-দেহগুলির ধারণার সঙ্গে কোন ভীতির ভাব জড়িত ছিল না। দ্বিতীয়-দেহগুলি খাদ্য বা সাহায্যের জন্য এই পৃথিবীতে নামিয়া আসে না, বা ঐ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলে হিংস্রও হয় না, অথবা জীবিত ব্যক্তিগণের জীবন বিপন্ন করিতেও প্রয়াসী হয় না; উহারা বরং আনন্দিত—দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আহ্লাদিত। চিতাগ্নি বিশ্লিষ্ট হইয়া যাওয়ার প্রতীক। দেহমুক্ত আত্মাকে ধীরে পিতৃপুরুষগণের নিকট—যেখানে দুঃখ নাই, যেখানে চির আনন্দ বিরাজিত—সেইখানে ধীরে বহন করিয়া লইবার জন্য এই চিতাগ্নির উদ্দেশে বলা হইয়া থাকে।

এই দুইটি ভাবধারা লক্ষ্য করিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি, দুটি ভাব স্বরূপতঃ এক—প্রাথমিকভাবে একটি আশাবাদী, অপরটি নৈরাশ্যবাদী; একটি অপরটির বিবর্তন মাত্র। ইহা খুবই সম্ভব যে, অতি প্রাচীন কালে মিশরীয়দের ন্যায় আর্যগণও এই ভাবধারা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিলে আমরা এই কথার সম্ভাব্যতা বুঝিতে পারি। কিন্তু ভাবটি যথার্থই সুন্দর এবং অপূর্ব। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন এই আত্মা পিতৃপুরুষগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের সহিত সুখৈশ্বর্য সম্ভোগ করে। পিতৃপুরুষগণ আত্মাকে অত্যন্ত করুণাপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। আত্মা সম্বন্ধে ভারতের প্রাচীন ধারণা হইল এই। পরবর্তীকালে এই ভাবটি উন্নত হইতে উন্নততর পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে। তখন দেখা গেল, তাঁহারা যাহাকে 'আত্মা' বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা বস্তুতঃ আত্মা নয়। এই জ্যোতির্ময় দেহ, সূক্ষ্ম দেহ—যত সূক্ষ্মই হউক না কেন,

বস্তুতঃ দেহমাত্র, এবং সূক্ষ্ম বা স্থূল সকল দেহই কোন না কোন উপাদানের দ্বারা গঠিত। যাহা কিছু কোনপ্রকার অবয়ববিশিষ্ট, তাহা অবশ্যই সীমিত, তাহা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যাহা অবয়ববিশিষ্ট, তাহাই পরিবর্তনশীল, আর যাহা পরিবর্তনশীল তাহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে? সুতরাং এই জ্যোতির্ময় দেহের পশ্চাতে তাঁহারা যেন একটি সত্তাকে অনুভব করিয়াছেন, যাহাকে মানুষের আত্মা-নামে অভিহিত করা যায়। ইহাকেই 'আত্মা' বা 'জীবাত্মা' বলা হইয়া থাকে। আত্মা-সম্বন্ধীয় ধারণা এইখানেই আরম্ভ হইল, এইটিকেও অবশ্য বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে। কেহ চিন্তা করিলেন, এই জীবাত্মা নিত্য; কেহ ভাবিয়াছেন, ইহা অতিসূক্ষ্ম, প্রায় এক-একটি অণুর মতো সূক্ষ্ম; ইহা শরীরের একটি বিশেষ অংশে বাস করে এবং যখন একজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার জীবাত্মা জ্যোতির্ময় দেহকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্হিত হয়। আবার অন্য একদল লোক আছেন—যাঁহারা স্বীকার করেন না, জীবাত্মা আণবিক প্রকৃতিবিশিষ্ট; জ্যোতির্ময় দেহ জীবাত্মা নয়, এ-কথা বলিতে গিয়া তাঁহারা যে-যুক্তি দেন, জীবাত্মার আণবিক প্রকৃতি অস্বীকার করিতে গিয়াও তাঁহারা সেই একই যুক্তি প্রদর্শন করেন।

এই-সব বিভিন্ন মতবাদ হইতে সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব হইয়াছে এবং সেখানে আমরা প্রভূত প্রভেদ দেখিতে পাই। সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য ভাব এই: মানুষের প্রথমতঃ একটি স্থূলদেহ আছে; স্থূলদেহের পশ্চাতে রহিয়াছে সূক্ষ্মদেহ, তাহা যেন মনের বাহক এবং ইহারও পশ্চাতে রহিয়াছে আত্মা বা সাংখ্যমতে 'মনের জ্ঞাতা' এবং তাহা সর্বত্র বিচরণশীল। অর্থাৎ তোমার আত্মা, আমার আত্মা এবং প্রত্যেকের আত্মা একইকালে সর্বত্র বিরাজিত। আত্মা যদি নিরবয়ব হয়, তবে কিরূপে বলা যায় যে তাহা 'দেশে' বদ্ধ হইবে? কেন না, যাহা স্থান অধিকার করে, তাহারই অবয়ব রহিয়াছে; যাহা নিরবয়ব, তাহাই অনন্ত হইতে পারে; সুতরাং প্রত্যেক আত্মাই সর্বব্যাপী। এই বিষয়ে দ্বিতীয় মতবাদটি আরও চমকপ্রদ। প্রাচীনকালে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সব মানুষই প্রগতিশীল—অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে অনেকে। তাহারা পবিত্রতা, শক্তি এবং জ্ঞানের পথে বর্ধিত। প্রশ্ন হইল—এই জ্ঞান, এই পবিত্রতা এবং এই শক্তি মানুষের মধ্যে কোথা হইতে বিকশিত হইয়াছে? একটি শিশুর কোন জ্ঞান নাই। এই শিশুটি বড় হইয়া শক্তিমান্, ক্ষমতাপন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কোথা

হইতে এই শিশুটি তাহার জ্ঞান ও শক্তির উৎসের সন্ধান পাইল? উত্তর—ঐ জ্ঞান ও শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল; শিশুর আত্মার মধ্যেই তাহার জ্ঞান, তাহার শক্তি প্রথমাবধি বর্তমান। এই শক্তি, এই পবিত্রতা এবং এই ক্ষমতা তাহার আত্মাতে ছিল, অবিকশিত অবস্থায় ছিল; তাহাই এখন বিকশিত। এই বিকশিত এবং অবিকশিত অবস্থা বলিতে আমরা কি বুঝি? সাংখ্যবাদীরা বলেন: প্রত্যেক আত্মাই পবিত্র, পূর্ণ, সর্বশক্তিমান্ এবং সর্বজ্ঞ; কিন্তু ইহা যেরূপ মনের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হয়, সেইরূপেই বিকশিত হইতে পারে। মন যেন আত্মার প্রতিফলনের একটি আয়না মাত্র। আমার মন আমার শক্তির কিয়দংশ যেমন প্রতিফলিত করিতে পারে, তেমনি তোমার এবং অপরের আত্মাও করিতেছে। যে আয়না যত বেশী স্বচ্ছ, তাহাতে আত্মা তত বেশী সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি যেরূপ মনের অধিকারী, তাহার আত্মিক বিকাশও তেমনি হইয়া থাকে। কিন্তু সকল আত্মাই পবিত্র এবং পূর্ণ।

আবার এক সম্প্রদায় মনে করিলেন, এইরূপ হওয়া সম্ভব নয়। যদিও আত্মা স্বভাবতই পবিত্র ও পূর্ণ, এই পবিত্রতা ও পূর্ণত্ব সময় সময় যেন সঙ্কুচিত হয়, আবার সময় সময় যেন প্রসারিত হইয়া থাকে। কতকগুলি কাজ এবং চিন্তা যেন আত্মার প্রকৃতিকে সঙ্কুচিত করে, আবার কতকগুলি কাজ এবং চিন্তা যেন তাহার স্বভাবকে পরিস্ফুট ও বিকশিত করে। এই বিষয়টি আরও পরিষ্কাররূপে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যে-সব চিন্তা ও কার্য আত্মার পবিত্রতা ও শক্তি সঙ্কুচিত করে, সেগুলি অশুভ; যে-সব চিন্তা ও কার্য আত্মার শক্তিকে পরিস্ফুট করে, সেইগুলি শুভ। দুইটি মতবাদের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। 'সঙ্কোচন' এবং 'প্রসারণ'—এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যার উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। যে-মতে আত্মার যন্ত্র-স্বরূপ মনের গঠনের উপরেই আত্মার বিকাশের তারতম্য নির্ভর করে, সেই মতটি নিঃসন্দেহে স্পষ্টতর বলা যাইতে পারে। কিন্তু সঙ্কোচন এবং প্রসারণ-মতবাদী এই দুইটি শব্দের আশ্রয় লইতে চায়। তাহাদের নিকট প্রশ্ন করা কর্তব্য, আত্মার সঙ্কোচন এবং প্রসারণ বলিতে তাহারা কি বুঝিয়া থাকে? আত্মা চেতন বস্তু। প্রশ্ন করিতে পারো, স্থূল জড়পদার্থ বা সূক্ষ্ম চেতনবস্তু মন-সম্পর্কে সঙ্কোচন ও প্রসারণ বলিতে কি বুঝায়? কিন্তু ইহা ছাড়া যাহা জড় নয়,

যাহা দেশ-কালের অতীত, তাহার সম্বন্ধে এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ শব্দ-দুইটি কিরূপে প্রযুক্ত হইবে? সুতরাং মনে হয়, যে-মতবাদে আত্মা সর্বদাই পবিত্র ও পূর্ণ, শুধু মানসিক গঠনের তারতম্য অনুসারে আত্মার প্রতিফলনের তারতম্য ঘটে, সেই মতই অপেক্ষাকৃত ভাল। মনের পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার স্বভাবও যেন ক্রমশঃ আরও শুদ্ধ হইতে থাকে এবং আত্মার বিকাশও উন্নততর হয়। যতদিন না মন শুদ্ধ হয়—তাহাতে আত্মার অন্তর্নিহিত সব গুণই পূর্ণবিকশিত না হয়, ততদিন এরূপ চলিতে থাকে; তারপর আত্মা মুক্ত হয়।

আত্মার প্রকৃতিই এই। কিন্তু চরম লক্ষ্য কি? ভারতের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মার লক্ষ্য এক বলিয়াই প্রতীত হয়। সকলেরই মূল-ভাবটি এক—মুক্তি। মানুষ অনন্ত, এবং বর্তমানে যে বদ্ধ অবস্থায় সে আছে, ইহা তাহার স্বভাব নয়। কিন্তু এই বিভিন্ন বদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়াই আত্মা ক্রমশঃ মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে এবং যতদিন না আত্মা স্বাধিকার—সেই অসীম, অনন্ত, মুক্ত স্বভাব—লাভ করিতেছে, ততদিন সে নিরস্ত হইবে না। আমরা আমাদের চতুর্দিকে যে-সব সংযোগ, পুনঃসংযোগ এবং বিকাশ দেখিতে পাইতেছি, সেগুলি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়—পথের ক্ষণিক ঘটনা মাত্র। পৃথিবী সূর্য, চন্দ্র নক্ষত্র, শুভ অশুভ, হাসি কান্না, আনন্দ ও দুঃখ প্রভৃতি সংযোগ আমাদিগকে অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই আত্মা সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজ পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করে। আত্মা তখন অন্তঃ- ও বহিঃ-প্রকৃতির কোন নিয়মের দ্বারাই বদ্ধ হয় না। আত্মা তখন সব বন্ধন, সব নিয়ম ও সমগ্র প্রকৃতির ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতি তখন আত্মার অধীন হইয়া পড়ে; আত্মা প্রকৃতির অধীন হয় না, এখন যেমন অধীন বলিয়া মনে হইতেছে। ইহাই আত্মার একমাত্র লক্ষ্য। যে অভিজ্ঞতা-পরম্পরার মধ্য দিয়া আত্মা বিকশিত হইতেছে, তাহার লক্ষ্য—মুক্তি লাভ। অভিজ্ঞতাগুলি আত্মার জন্ম ও জীবন বলিয়া প্রতিভাত হয়। আত্মা যেন একটি নিম্নতর দেহ ধারণ করে এবং উহার মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করিতেছে। আত্মা নিম্নতর দেহটি অপর্যাপ্ত মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছে এবং একটি উন্নত ধরণের দেহ গ্রহণ করিতেছে। এটিকেও অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করে এবং উন্নততর দেহ

ধারণ করে, অবশেষে আত্মা এমন একটি শরীরের সন্ধান পাইবে, যাহার সাহায্যে তাহার উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হইবে। তখনই আত্মা মুক্তি লাভ করিবে।

এখন প্রশ্ন এই, আত্মা যদি অনন্ত ও সর্বব্যাপী হয়, আত্মা যদি সূক্ষ্ম চেতন বস্তু হয়, তবে ইহার পর পর শরীর গ্রহণ করিবার অর্থ কি? তত্ত্বটি এই —আত্মা আসেও না, যায়ও না, জন্মগ্রহণও করে না এবং মরেও না। যাহা সর্বব্যাপী, তাহার জন্মগ্রহণ কিরূপে সম্ভব? আত্মা দেহে বাস করে—এরূপ বলা অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা। যাহা অসীম, তাহা সীমাবদ্ধ স্থানে থাকিবে কিরূপে? কিন্তু এক ব্যক্তি যখন হাতে একখানি বই লইয়া পড়িতে পড়িতে পাতার পর পাতা উলটাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তখন বইয়ের পাতাগুলি পুনঃপুনঃ স্থান পরিবর্তন করিতে থাকে, কিন্তু পাঠক যথাস্থানেই অবস্থান করে, আত্মার সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। সমগ্র প্রকৃতিই আত্মার নিকট একখানি পুস্তকের মতো—আত্মা যেন উহা পাঠ করিতেছে। এক একটি জীবন যেন সেই পুস্তকের একটি পাতা, ঐ পাতাটি পড়া হইয়া গেলে সে ক্রমশঃ পাতা উলটাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে, যতদিন না পুস্তক পড়া শেষ হইয়া যায়, এবং চরাচর বিশ্বের সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আত্মা পূর্ণ হয়। তথাপি একই কালে এই আত্মা কখনও নড়ে নাই, আসে নাই, যায়ও নাই, শুধু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিল। কিন্তু আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যেন ঘুরিতেছি। পৃথিবী আবর্তিত হইতেছে, তথাপি আমরা মনে করি যে, পৃথিবীর পরিবর্তে সূর্য ঘুরিতেছে; আমরা জানি ইহা একটি ভুল—ইন্দ্রিয়ের ছলনামাত্র। আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং মরি, আমরা আসি এবং যাই—ইহাও একটি ভ্রান্তিমাত্র। আমরা আসিও না, যাইও না; আমরা জন্মগ্রহণও করি না। কেন না, আত্মা কোথায় যাইবে? উহার গমনের কোন স্থান নাই। এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে আত্মা পূর্ব হইতেই বর্তমান নাই?

অতএব প্রকৃতির বিবর্তন এবং আত্মার বিকাশের তত্ত্বটি আসিয়া পড়িল। বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি—উচ্চ হইতে উচ্চতর সংযোগসমূহ আত্মার নাই। আত্মা যেমন তেমনই আছে। এইগুলি প্রকৃতিতে অবস্থিত; কিন্তু যেহেতু প্রকৃতি উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্যায়ে বিবর্তিত হইতেছে, আত্মার

মহিমাও ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে। মনে কর, এখানে একটি পর্দা রহিয়াছে, এবং পর্দার পশ্চাতে একটি আশ্চর্য দৃশ্য বর্তমান। এই পর্দায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে যাহার সেই ভিতর দিয়া ঐ দৃশ্যের কিয়দংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মনে কর, ছিদ্রটি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটি আমাদের দৃষ্টিপথে অধিকতর পরিস্ফুট হইতে থাকে; যখন সমস্ত পর্দাটি অপসারিত হয়, তখন দৃশ্য ও তোমার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না, তুমি উহার সবটুকুই দেখিতে পাও। এই পর্দাটি হইল মানুষের মন। ইহার পশ্চাতে আত্মার সেই মহিমা, সেই পবিত্রতা, সেই অনন্ত শক্তি বর্তমান; এবং মন যতই স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর, পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইতে থাকে, আত্মাও স্বমহিমায় ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই নয় যে, আত্মা পরিবর্তিত হইতেছে—পরিবর্তন যাহা কিছু, তাহা এই পর্দায়। আত্মা সেই অপরিবর্তনীয়, অমৃতস্বরূপ, পবিত্র আনন্দময় অদ্বৈত সত্তা।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত তত্ত্বটি এইরূপ দাঁড়াইল: উচ্চতম হইতে নিম্নতম—নিকৃষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে ক্ষুদ্রতম বিচরণশীল কীটাণু পর্যন্ত—সকলেই সেই পবিত্র পূর্ণস্বরূপ, অসীম আনন্দময় সত্তা। কীটের মধ্যে আত্মার অনন্ত শক্তির স্বল্প বিকাশ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে আত্মাব শক্তি সর্বাধিক বিকশিত হইতেছে। প্রভেদ শুধু বিকাশের তারতম্যে, মূলতঃ আত্মা একই। সকল জীবের মধ্যে সেই পবিত্র পূর্ণ আত্মা অবস্থান করিতেছে।

স্বর্গ বা অনুরূপ স্থানসমূহের যে উল্লেখ রহিয়াছে, সেগুলি গুরুত্বের দিক দিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। স্বর্গের ধারণাকে একটি নিম্নস্তরের ধারণা বলা যাইতে পারে। ভোগপূর্ণ একটি স্থানের ধারণা হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা নির্বোধের মতো বিশ্ব চরাচরকে আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমিত করিয়া রাখিতে চাই। শিশুরা চিন্তা করে, সমগ্র বিশ্ব শিশুতে পরিপূর্ণ; উন্মাদের নিকট সমগ্র পৃথিবী একটি উন্মাদাগার। সুতরাং যাহাদের নিকট পৃথিবী কেবল ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্য, যাহাদের সমগ্র জীবন আহার এবং প্রমোদে ব্যয়িত হয়, যাহাদের সঙ্গে পশুর ব্যবধান অত্যন্ত সামান্য, তাহারা স্বভাবতই এই জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব লক্ষ্য করিয়া এমন একটি স্থানের কল্পনা করে, যেখানে তাহারা আরও

ভোগসুখ লাভ করিবে। তাহাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা অসীম, সুতরাং তাহারা এমন একটি স্থানের কল্পনা করিতে বাধ্য, যেখানে অবিরত ইন্দ্রিয়সুখ রহিয়াছে, এবং যতই আমরা অগ্রসর হই, ততই দেখি, যাহারা ঐ-সকল স্থানে যাইতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের অবশ্যই সেখানে যাইতে হয়। তাহারা স্বপ্নের মধ্য দিয়া চলে—একটি স্বপ্ন শেষ হইলে অপর একটি স্বপ্নের মধ্যে গিয়া পড়ে, যেখানে ইন্দ্রিয়ভোগের প্রাচুর্য বর্তমান। তারপর যখন তাহাদের স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, তাহারা অন্য একটি জিনিসের জন্য চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে তাহারা এক স্বপ্ন হইতে অন্য স্বপ্নে তাড়িত হইতে থাকিবে।

তারপর শেষ তত্ত্ব—আত্মা সম্বন্ধে আরও একটি ধারণা। যদি আত্মা পবিত্র এবং স্বরূপতঃ পূর্ণ, যদি প্রতি আত্মা অনন্তশক্তিসম্পন্ন এবং সর্বব্যাপী হয়, তবে বহু আত্মার কল্পনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? একই সঙ্গে বহু অনন্তের কল্পনা সম্ভব নয়। বহুর কথা ছাড়িয়া দাও, একই সঙ্গে দুইটিরও কল্পনা করা যায় না। যদি দুইটি অনন্ত থাকিত, তবে একটি অপরটির দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকিত, ফলে দুইটিই সীমিত হইত। অনন্ত কেবল একটিই হইতে পারে এবং সাহসের সহিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, অনন্ত এক—দুই নয়।

দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে অবস্থান করিতেছে—একটি শীর্ষদেশে, অপরটি নিম্নে। উভয়ই বিচিত্র বর্ণের; একটি ফল ভক্ষণ করে, কিন্তু অপরটি শান্ত, মহিমময় হইয়া নিজ গৌরবে অবস্থান করিতেছে। নিম্নতর পক্ষীটি ভাল ও মন্দ ফল ভক্ষণ করিতেছে এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে। যখনই পক্ষীটি একটি তিক্ত ফল ভক্ষণ করে, তখনই ঊর্ধ্বগামী হয়; ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া সে দেখে, অপর পক্ষীটি সেখানে শান্ত সংযত হইয়া অবস্থান করিতেছে; সে ভাল বা মন্দ কোন ফলেরই আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুসন্ধান না করিয়া, আত্মস্থ হইয়া অবস্থান করিতেছে। নিম্নস্থ পক্ষীটি ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী পক্ষীটিকে দেখিয়া ক্রমশঃ উহার সমীপবর্তী হইবার চেষ্টা করিতেছে। একটু ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, কিন্তু পূর্বপূর্ব সংস্কারসমূহ বলবৎ থাকায় সে একই ফল আবার ভক্ষণ করিতেছে। আবার একসময়ে একটি অত্যন্ত তিক্ত ফল খাইয়া মর্মাহত

হয় এবং ঊর্ধ্বে নিরীক্ষণ করে। সেখানে সেই শান্ত সংযত পক্ষীটিকে আবার দেখে। সে উহার নিকটবর্তী হইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পূর্ব সংস্কার-প্রভাবে পুনঃপুনঃ নিম্নগামী হইয়া স্বাদু এবং তিক্ত ফল ভক্ষণ করিতেছে। সে আবার একটি তিক্ত ফল ভক্ষণ করিয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া দেখিল এবং ঐ পক্ষীটির আরও সমীপবর্তী হইল। এইরূপে যতই সে নিকটে যাইতে লাগিল, ততই অপর পক্ষীটির দেহ-বিচ্ছুরিত আলোক তাহার উপর পড়িতে লাগিল। উহার নিজের পালকগুলি যেন খসিয়া পড়িতেছে। যখন সে অনেকটা নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন সমস্ত দৃশ্যটি পরিবর্তিত হইয়া গেল। নিম্নের পক্ষীটি কোন দিনই ছিল না ; যাহা ছিল, তাহা শুধু ঐ ঊর্ধ্বের পক্ষীটি ; নিম্নের পক্ষী বলিয়া যাহা এতক্ষণ মনে হইয়াছিল, তাহা উহার এক সামান্য প্রতিবিম্ব মাত্র।

আত্মার প্রকৃতি বলিতে ইহাই বুঝায়। এই মানুষের আত্মা পার্থিব ইন্দ্রিয়ভোগ ও অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে ছুটাছুটি করিতেছে। পশুর মতো ইহা কেবল ইন্দ্রিয়সুখ, কেবল ক্ষণিক স্নায়ু-উত্তেজনার পশ্চাতে ধাবমান। যখন আঘাত আসে, মুহূর্তের মধ্যে মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতে থাকে এবং সমস্ত কিছুই তখন অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন পৃথিবীকে সে যেরূপ ভাবিয়াছিল, জীবনটাকে যত সহজ ভাবিয়াছিল, আর সেরূপ দেখিতে পায় না। ঊর্ধ্বে নিরীক্ষণ করিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে দেখে, সেই পরম পুরুষের ক্ষণিক অনুভূতি লাভ করে, আরও একটু সমীপবর্তী হয়, কিন্তু অতীত কর্মের দ্বারা আবার নিম্নমুখী হইয়া পড়ে। অপর একটি আঘাত আসিয়া তাহাকে আবার সেই স্থানে প্রেরণ করে। সে আর একবার সেই পূর্ণসত্তার অনুভূতি লাভ করে এবং সমীপবর্তী হয়। এইরূপে সে যতই নিকটে যাইতে থাকে, দেখিতে পায় তাহার ব্যক্তিত্ব—হীন নিকৃষ্ট অত্যন্ত স্বার্থপূর্ণ ব্যক্তিত্ব—ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যে ক্ষুদ্র সত্তাকে সুখী করিতে গিয়া সে পৃথিবীকে ত্যাগ করিতে তৎপর হইয়াছিল, তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ লয় পাইতেছে ; এবং আরও যতই অগ্রসর হয়, ততই ধীরে ধীরে প্রকৃতি অপসৃত হইতে থাকে। যখন সে যথেষ্ট নিকটবর্তী হয়, তখন সমস্ত দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে, এবং সে দেখিতে পায় অপর পক্ষীটি—সেই অনন্ত সত্তা, যাহাকে সে এতদিন দূর হইতে দেখিতেছিল, যাহার অপূর্ব মহিমা এবং গৌরবের

আভাস সে পাইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃ তাহার নিজ আত্মারই, এবং উহা সেই নিত্যবস্তু। যাহা সর্ব বস্তুতে সত্যরূপে অধিষ্ঠিত, যাহা প্রতি অণুতে বিরাজিত ও সর্বত্র প্রকাশিত, যাহা সমস্ত বস্তুর মূল সত্তা, যাহা এই চরাচর বিশ্বের ঈশ্বর, আত্মা তখন তাহাকেই খুঁজিয়া পায়। জানো 'তত্ত্বমসি'—তুমি সেই; জানো—তুমি মুক্ত।

পরম লক্ষ্য

১৯০০ খৃঃ ২৭শে মার্চ স্যান ফ্র্যান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

[মাঝে মাঝে বিবামবিন্দু (···) গুলিব অর্থ লিপিকার কিছু ভাব ধবিতে পারেন নাই।]

আমরা দেখি, মানুষ যেন সর্বদাই তাহার নিজের অপেক্ষা বৃহত্তর কোন কিছুর দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তাহারই অর্থ অনুধাবন করিতে সদা সচেষ্ট। মানুষ চিরদিনই শ্রেষ্ঠ আদর্শের সন্ধান করিবে। সে জানে, সে-আদর্শ আছে এবং সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসন্ধান করাই ধর্ম। প্রথম দিকে তাহার সমস্ত অনুসন্ধানই বাহিরের স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল—মানুষের পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে তাহার জ্ঞানানুসারে কখনও স্বর্গে, কখনও বা বিভিন্ন স্থানে।

পরে মানুষ নিজেকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখিতে আরম্ভ করিল; সে বুঝিল যে, 'আমি' বলিতে সাধারণতঃ সে যাহা বোঝে, তাহা প্রকৃত 'আমি' নয়। তাহার ইন্দ্রিয়গোচর সত্তা আর প্রকৃত সত্তা এক নয়। সে তখন নিজের মধ্যেই নিজেকে খুঁজিতে লাগিল; সে আবিষ্কার করিল,···যে-আদর্শকে সে এতকাল বাহিরে খুঁজিতেছিল তাহা তাহার অন্তরেই আছে; বাহিরে যাহাকে সে পূজা করিতেছিল, সে তাহারই অন্তরের সত্য স্বরূপ। দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদের মধ্যে পার্থক্যই এই: আদর্শকে যখন নিজের বাহিরে স্থাপন করা হয়, তখন তাহাই দ্বৈতবাদ। আর ঈশ্বরকে যখন নিজের অন্তরে খোঁজা হয়, তখন তাহাই অদ্বৈতবাদ।

প্রথমতঃ সেই পুরাতন প্রশ্ন—কেন এবং কোথা হইতে···? মানুষ কেমন করিয়া সীমিত হইল? অসীম কেমন করিয়া সসীম হইল? পবিত্র কেমন

করিয়া অপবিত্র হইল? প্রথমতঃ কখনও ভুলিলে চলিবে না যে, কোন দ্বৈতবাদী কল্পনার দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না।

ঈশ্বর কেন এই অপবিত্র জগৎ সৃষ্টি করিলেন? পূর্ণ অসীম দয়ালু পরমপিতার সৃষ্টি হইয়াও মানুষ কেন এত দুঃখী? কেন এই স্বর্গ আর মর্ত্য, যাহার দিকে চাহিয়া আমরা নিয়মের ধারণা লাভ করি? না দেখিয়া কোন কিছু সম্বন্ধেই কেহ কল্পনা করিতে পারে না।

এই জীবনে যত কিছু নির্যাতন ভোগ করি, সবই আমরা আর একটি জায়গার উপযুক্ত বলিয়া মনে করি—সেটি হইল আমাদের নরক।…

অসীম ঈশ্বর কেন এই পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন? দ্বৈতবাদী বলেন, ঠিক যেভাবে কুম্ভকার ঘট তৈয়ারি করে। ঈশ্বর কুম্ভকার; আমরা ঘটমাত্র। দার্শনিকের ভাষায় প্রশ্নটি এই: প্রকৃত স্বরূপে মানুষ যে পবিত্র, পূর্ণ এবং অসীম—এ কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল কেমন করিয়া? অদ্বৈতবাদমূলক যে-কোন চিন্তাপ্রণালীতে ইহা একটি প্রধান সমস্যা। অন্যান্য সবই পরিষ্কার ও স্পষ্ট। এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, প্রশ্নটিই স্ববিরোধী।

দ্বৈতবাদের কথাই ধরা যাক—প্রশ্ন হইবে: ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি করিলেন? ইহা স্ববিরোধী? কেন? কারণ—ঈশ্বর বলিতে আমরা কি বুঝি? ঈশ্বর এমন এক সত্তা, যাঁহার উপরে বাহির হইতে কোন প্রতিক্রিয়া হইতে পারে না।

তুমি বা আমি মুক্ত নই। আমি তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণা বলিয়া একটা কিছু আছে, যাহার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নেই, যাহা আমাকে জলপান করিতে বাধ্য করে। আমার দেহের প্রতিটি কর্ম, এমন কি আমার মনের প্রতিটি চিন্তা পর্যন্ত আমার বাহিরের প্রভাবে প্রভাবিত। আমাকে ইহা করিতেই হইবে। সেই জন্যেই তো আমি বাধ্য…এইরূপ করিতে, ইহা পাইতে আমি বাধ্য।…আবার কেন এবং কোথা হইতে, এই প্রশ্ন দুইটিরই বা অর্থ কি? বাহিরের শক্তির অধীন হওয়া। তুমি কেন জলপান কর? কারণ তৃষ্ণা তোমাকে বাধ্য করে। তুমি দাস। কোন কিছুই তুমি নিজের ইচ্ছায় কর না, কারণ সব কিছু করিতেই তুমি বাধ্য। তোমার কাজের একমাত্র প্রেরণা কোন শক্তি…।

কোন কিছুর দ্বারা চালিত না হইলে এই পৃথিবীও কখন চলিত না। আলো জ্বলে কেন? কেহ আসিয়া একটি দেশলাই না জ্বালিলে আলো জ্বলে না। প্রকৃতির সর্বত্র সব কিছুই বাধ্যতামূলক। দাসত্ব, দাসত্ব! প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া চলার অর্থই দাসত্ব। প্রকৃতির দাস হইয়া সোনার খাঁচায় বাস করিয়া লাভ কি? মানুষ যে আসলে মুক্ত এবং স্বর্গীয়—এই জ্ঞানই তো শ্রেষ্ঠ নিয়ম ও শৃঙ্খলা। কাজেই 'কেন এবং কোথা হইতে?'—এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে অজ্ঞানেই। কোন কিছুর সহায়তায় কিছু করিতে আমি বাধ্য।

কখনও বলো, 'ঈশ্বর মুক্ত'; আবার প্রশ্ন কর, 'ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি করেন?' স্ববিরোধী কথা বলিতেছ। ঈশ্বরের অর্থই হইল সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা। যুক্তিশাস্ত্রের ভাষায় বলিলে প্রশ্নটি এইরূপ দাঁড়ায়: যাহাকে কেহ কখনও বাধ্য করিতে পারে না, তিনি কাহাব দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন? তোমরা একই সঙ্গে প্রশ্ন কর, ঈশ্বরকে কে বাধ্য করিল? প্রশ্নটি অর্থহীন। স্বরূপেই তিনি অসীম; তিনি স্বাধীন। তোমরা যখন যুক্তি শাস্ত্রের ভাষায় প্রশ্ন করিতে পারিবে, তখনই আমরা সে প্রশ্নের জবাব দিব। যুক্তিই তোমাদের বলিয়া দিবে—সত্তা এক, দ্বিতীয় নাই। যেখানেই দ্বৈতবাদ দেখা দিয়াছে, সেখানেই অদ্বৈতবাদ আসিয়া তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছে।

এ কথা বুঝিবার পথে একটিমাত্র অসুবিধা আছে। ধর্ম দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বুদ্ধির বিষয়। দার্শনিকের ভাষায় না বলিয়া তুমি যদি সাধারণ মানুষের ভাষায় বলো, তাহা হইলে যে-কেহ ইহা বুঝিতে পারে। মানুষের স্বভাবই নিজেকে প্রক্ষেপ করা। সন্তানের সঙ্গে এক করিয়া নিজের কথা ভাবো। তাহার সহিত নিজে এক হইয়া যাও, দেখিবে তোমারই যেন দুইটি দেহ। ঠিক তেমনি তোমার স্বামীর মনের ভিতর দিয়াও তুমি দেখিতে পারো। কোথায় থামিবে তুমি? অসংখ্য শরীরের মধ্যে তুমি নিজেকে দেখিতে পারো।

মানুষ প্রতিদিন প্রকৃতিকে জয় করিয়া চলিয়াছে। জাতি হিসাবে মানুষ তাহার শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে। কল্পনায় মানুষের এই শক্তির একটা সীমা নির্দেশ করিতে চেষ্টা কর। তুমি স্বীকার করিবে যে, জাতি হিসাবে মানুষ অসীম শক্তির—একটি অসীম দেহের অধিকারী। কিন্তু একমাত্র প্রশ্ন

হইতেছে, তুমি কি? তুমি কি জাতি, না একটি ব্যক্তি? যে-মুহূর্তে তুমি নিজেকে পৃথক করিয়া দেখিবে, সব কিছুই তোমাকে আঘাত করিবে। যে-মুহূর্তে তুমি নিজেকে প্রসারিত করিয়া অন্যের কথা ভাবিবে, অমনি তুমি সহায়তা পাইবে। স্বার্থপর মানুষই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শোচনীয় জীব। যে মোটেই স্বার্থপর নয়, সেই সর্বাপেক্ষা সুখী। সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গেই, সমগ্র জাতির সঙ্গে সে তখন এক; ঈশ্বর তখন তাহার মধ্যে আবির্ভূত হন।...সেইরূপ দ্বৈতবাদে—খ্রীষ্টান, হিন্দু এবং অন্য সব ধর্মে নীতির বিধান এই: স্বার্থপর হইও না।...নিঃস্বার্থ হও। অন্যের জন্য কাজ কর! নিজেকে প্রসারিত কর!...

অজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কথা বোঝানো যায় খুবই সহজে, আর বিদ্বান্‌কে বোঝানো যায় আরও সহজে। কিন্তু যে অতি সামান্য শিক্ষা পাইয়াছে, স্বয়ং ঈশ্বরও তাহাকে বুঝাইতে পারিবেন না। আসল কথা, তুমি এই পৃথিবী হইতে আলাদা নও, যেমন তোমার আত্মা তোমার অন্য সব কিছু হইতে আলাদা নয়। তাহা যদি না হইত, তুমি কিছুই দেখিতে পাইতে না, কিছুই বুঝিতে পারিতে না। বস্তুর সমুদ্রে আমাদের দেহ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত মাত্র। জীবন একটি মোড় ঘুরিয়া অন্য রূপে বহিয়া চলিয়াছে... সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, তুমি, আমি—সবাই আবর্তমাত্র। কেন আমি একটি বিশেষ মনকে আমার বলিয়া বাছিয়া লইলাম? মনের সমুদ্রে ইহা একটি মানস আবর্ত মাত্র।

তাহা না হইলে এই মুহূর্তে আমার স্পন্দন যে তোমার কাছে পৌঁছিতেছে, তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? হ্রদের মধ্যে একটি পাথর নিক্ষেপ কর, দেখিবে একটি স্পন্দন শুরু হইবে এবং সমস্ত জলটাকে স্পন্দিত করিয়া তুলিবে। আমার মনকে আনন্দের অবস্থায় লইয়া গেলাম, ফলে তোমার মনেও সেই আনন্দ সঞ্চারিত হইবে। এমন কত সময়েই তুমি তোমার মনে বা হৃদয়ে কিছু ভাবিয়াছ এবং মুখে না বলিলেও অন্যেরা তোমার সে ভাবনার স্পর্শ পাইয়াছে। সর্বত্রই আমরা এক। ...অথচ সেই কথাটাই আমরা কখনও বুঝিতে পারি না। সমগ্র জগৎই দেশ কাল ও নিমিত্ত দ্বারা গড়া। ঈশ্বরও সেই বিশ্বরূপেই প্রকট হন।...প্রকৃতি শুরু হইল কখন? ...তুমি যখন তোমার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া দেশ কাল এবং নিমিত্তে বাঁধা পড়িলে।

ইহাই তোমাদের দেহের চক্রাবর্ত। আবার ইহাই তোমাদের অসীম প্রকৃতি.…ইহাই তো প্রকৃতি—দেশ কাল ও নিমিত্ত। প্রকৃতি বলিতে ইহাই বুঝায়। তুমি যখন চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে, তখনই সময়ের সূত্রপাত হইল। তুমি যখন দেহলাভ করিলে, অমনি দেশ বা স্থান দেখা দিল ; অন্যথা দেশ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। তুমি যখন সীমাবদ্ধ হইলে, তখনই দেখা দিল কার্য-কারণ-সম্পর্ক। কোন না কোন একটা উত্তর আমাদের চাই। এই সেই উত্তর। আমাদের সীমাবদ্ধ হওয়া তো খেলা মাত্র—খেলার আনন্দ মাত্র। কিছুই তোমাকে বাঁধিতে পারে না ; কিছুই তোমাকে বাধ্য করিতে পারে না। তুমি কখনও বদ্ধ নও। আমাদের নিজেদের গড়া এই খেলায় নিজ নিজ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিতেছি মাত্র।

ব্যক্তি-সত্তার আর একটি সমস্যার কথা তাহা হইলে তোলা যাক। অনেকে আবার ব্যক্তি-সত্তাকে হারাইবার ভয়েই ভীত! শূকর-ছানা যদি দেবত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার শূকর-সত্তাকে হারানো কি তাহার পক্ষে ভাল নয়? নিশ্চয়। কিন্তু বেচারা শূকর তখন তাহা মনে করে না। কোন্ অবস্থা আমার ব্যক্তি-সত্তা? যখন আমি একটি ছোট শিশু ছিলাম এবং ঘরের মেঝেয় হামাগুড়ি দিয়া আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা করিতাম? সেই সত্তাকে হারাইতে কি আমার দুঃখিত হওয়া উচিত? আজ যেমন আমার শৈশবকালের দিকে তাকাইয়া আমি হাসি, আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পরে আমার বর্তমান অবস্থার দিকে তাকাইয়াও সেইরূপ হাসিব। ইহার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি-সত্তাটিকে আমি রক্ষা করিব?…

ব্যক্তি-সত্তার অর্থ কি, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।…দুইটি বিপরীত ভাবধারা আছে : একটি ব্যক্তি-সত্তা সংরক্ষণ, অপরটি ব্যক্তি-সত্তা বিসর্জন দিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।…শিশুর প্রয়োজনে মা তাঁহার সব বাসনাই ত্যাগ করেন।…শিশুকে যখন কোলে নেন, ব্যক্তি-সত্তার ডাক, আত্ম-রক্ষার ডাক তখন আর তাঁহার কানে আসে না। নিকৃষ্ট খাদ্য নিজে গ্রহণ করিয়া সন্তানকে দেন উত্তম খাদ্য। যাহাকে ভালবাসি, তাহার জন্য আমরা মরিতেও প্রস্তুত।

একদিকে এই ব্যক্তি সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কঠোর সংগ্রাম করিতেছি, আবার অন্য দিকে ইহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু

তাহার ফল কি হইতেছে? টম ব্রাউন কঠোর সংগ্রাম করিতেছে। স্বীয় ব্যক্তি-সত্তার জন্য সে যুদ্ধ করিতেছে। তারপর টমের মৃত্যু হইল; কিন্তু পৃথিবীর বুকে কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা দিল না। উনিশ শত বছর আগে একটি ইহুদী জন্মগ্রহণ করিলেন; স্বীয় ব্যক্তি-সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য একটি অঙ্গুলিও তিনি হেলন করিলেন না।...তাঁহার কথা ভাবো! সেই ইহুদী ব্যক্তি-সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য কখনও সংগ্রাম করেন নাই; আর সেই জন্যই পৃথিবীতে তিনি মহত্তম। এই কথাটাই পৃথিবীর মানুষ জানে না।

যথাসময়ে আমাদিগকে 'ব্যক্তি' হইতে হইবে। কিন্তু কোন্ অর্থে? মানুষের ব্যক্তিত্ব কি? টম ব্রাউন নয়, মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর, তিনিই প্রকৃত ব্যক্তি-সত্তা। মানুষ যতই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে, ততই নিজের মিথ্যা ব্যক্তি-সত্তা সে ত্যাগ করিবে। নিজের জন্য সব কিছু সংগ্রহ করিতে, সব কিছু পাইতে যত বেশী চেষ্টা সে করিবে, ততই সে ব্যক্তি হিসাবে ছোট হইয়া যাইবে। নিজের কথা সে যত কম ভাবিবে, জীবিতকালে নিজের ব্যক্তিত্ব সে যত বেশী ত্যাগ করিবে,...ততই সে ব্যক্তি হিসাবে বড় হইবে। পৃথিবীর মানুষ এই গূঢ় কথাটি বুঝিতে পারে না।

আমাদের প্রথম বুঝিতে হইবে ব্যক্তি-সত্তার অর্থ কি। ব্যক্তি-সত্তা হইল আদর্শে পৌছানো। তুমি এখন পুরুষ, বা তুমি নারী। তোমার পরিবর্তন ঘটিবেই। তোমরা কি থামিয়া থাকিতে পারো? তোমাদের মন আজ যেমন আছে, সেই রকমই কি রাখিতে চাও? রাখিতে চাও ক্রোধ ঘৃণা ঈর্ষা দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মনের সহস্রপ্রকার বৃত্তি? তোমরা কি বলিতে চাও, সে-সবই তোমরা অক্ষুন্ন রাখিবে?...কোথাও তোমরা থামিতে পার না... যতদিন না জয়লাভ সম্পূর্ণ হয়, যতদিন না তোমরা পবিত্র এবং পূর্ণ হও।

তোমরা যখন সচ্চিদানন্দময় হইবে, তখন আর কোন ক্রোধ থাকিবে না। তোমার কোন্ দেহকে তুমি রক্ষা করিবে? যে জীবনের শেষ নাই, সেখানে না পৌছানো পর্যন্ত তুমি থামিতে পার না। অসীম জীবন! সেইখানে তুমি থামিবে। আজ তোমরা কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছ; আরও জ্ঞানলাভ করিতে সর্বদাই চেষ্টা করিতেছ। কোথায় থামিবে? জীবনের সঙ্গে একাত্ম যতদিন না হইবে, ততদিন কোথাও থামিবে না।...

অনেকেই সুখলাভকেই লক্ষ্য মনে করে। সেই সুখের জন্য তাহারা শুধু ইন্দ্রিয়কে খোঁজে। উর্ধ্বতর স্তরে আরও অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। তারপর আত্মিক স্তরে। তারপর নিজের মধ্যে—জীবের মধ্যে যিনি শিব, তাঁহার মধ্যে। যে মানুষের সুখ তাহার বাহিরে, বাহিরের জিনিস চলিয়া গেলেই সে অসুখী হইয়া পড়ে। সুখের জন্য তুমি এই পৃথিবীর কোন কিছুর উপর নির্ভর করিতে পার না। আমার সব সুখ যদি আমার নিজের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে সে সুখ আমি সর্বদাই ভোগ করিতে পারি, কারণ আমার আত্মাকে তো আমি কখনও হারাইব না।...মাতা, পিতা, সন্তান, স্ত্রী, দেহ, সম্পদ—সব আমি হারাইতে পারি, শুধু হারাইতে পারি না আমার আত্মা...আত্মাই আনন্দ। সব বাসনাই আত্মায় বিধৃত।...ইহাই ব্যক্তিত্ব। ইহার পরিবর্তন নাই; ইহাই পূর্ণ।

...এবং কেমন করিয়া ইহাকে পাওয়া যায়? এই পৃথিবীর মনীষীরা—শ্রেষ্ঠ নরনারীগণ—সুদীর্ঘ সাধনার দ্বারা যাহা পাইয়াছেন, সকলেই তাহা পাইতে পারে।...বিশটি বা ত্রিশটি দেবতায় বিশ্বাসী দ্বৈতবাদী মতগুলির কথা বলিতেছ? উহাতে কিছু যায় আসে না। একটি সত্য সকলেই মানে—এই মিথ্যা ব্যক্তি-সত্তাকে ছাড়িতে হইবে।...এই যে অহং—ইহা যত হ্রাস পাইবে, ততই আমি আমার প্রকৃত স্বরূপের সান্নিধ্যে পৌছিব; সেটি আমার বিশ্বময় দেহ। নিজের মনের কথা আমি যত অল্প ভাবিব, ততই আমি সেই বিশ্বব্যাপী মনের নিকটতর হইব। নিজের আত্মার কথা আমি যত অল্প ভাবিব, ততই আমি বিশ্বব্যাপী আত্মার নিকটতর হইব।

আমরা একটি দেহে বাস করি। আমরা কিছুটা দুঃখ ভোগ করি, কিছুটা সুখ ভোগ করি। এই দেহে বাস করিয়া যে সামান্য সুখ আমরা পাই, তাহার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য জগতের সব কিছু ধ্বংস করিতেও আমরা প্রস্তুত। যদি আমার দুইটি শরীর থাকিত, তাহা হইলে আরও ভাল হইত না কি? এমনি করিয়াই আমরা আনন্দের পথে অগ্রসর হই। সকলের মধ্যেই আমি। সকলের হাত দিয়া আমি কাজ করি; সকলের পায়ে ভর দিয়া আমি হাঁটি। সকলের মুখে আমি কথা বলি; সকলের দেহে আমি বাস করি। আমার দেহ অসীম, আমার মনও অসীম। নাজারেথের যীশুর মধ্যে, বুদ্ধের মধ্যে, মহম্মদের মধ্যে—অতীত ও বর্তমানের যাহা কিছু মহৎ

এবং শুভ—সকলের মধ্যেই আমি বাস করিয়াছি। আমার পরে যাহা কিছু আসিবে, তাহার মধ্যেও আমি বাস করিব। এ কি মতবাদ মাত্র? না, ইহাই সত্য।

এই সত্য যদি উপলব্ধি করিতে পারো, সে যে অসীম আনন্দের কথা হইবে! আনন্দের সে কী উচ্ছ্বাস! কোন্ দেহ এত বড় যে, এখানে আমাদের শরীরের সকল প্রয়োজন মিটিয়া যায়? অন্য সকলের শরীরে বাস করিয়া পৃথিবীর সব শরীরকে ভোগ করিবার পর আমাদের কি অবস্থা হয়? আমরা অসীমের সঙ্গে এক হইয়া যাই, আর সেইটাই আমাদের লক্ষ্য। সেই একমাত্র পথ। একজন বলেন, 'আমি যদি সত্যকে জানি, মাখনের মতো আমি গলিয়া যাইব।' মানুষ যদি তেমনি গলিয়া যাইত! কিন্তু মানুষ বড়ই কঠিন, এত তাড়াতাড়ি গলিয়া যাইবে না!

মুক্তির জন্য আমাদের কি করিতে হইবে? তোমরা তো মুক্তই।... যে মুক্ত, সে কি কখনও বদ্ধ হয়? মিথ্যা কথা। তোমরা কখনও বদ্ধ ছিলে না। যে সীমাহীন, সে কি কখনও সীমাবদ্ধ হইতে পারে? অসীমকে অসীম দিয়া ভাগ কর, অসীমের সঙ্গে অসীম যোগ কর, অসীমকে অসীম দিয়া গুণ কর, অসীম অসীমই থাকে। তুমি অসীম; ঈশ্বর অসীম। তোমরা সকলেই অসীম। সত্তা দুই হইতে পারে না, সত্তা কেবল এক। অসীমকে কখনও সসীম করা যায় না। তোমরা কখনও বদ্ধ নও। এই শেষ কথা।...তোমরা মুক্তই আছ। লক্ষ্যে তোমরা পৌঁছিয়াছ। সকলকেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে। তোমরা লক্ষ্যে পৌঁছাও নাই—এ কথা কখনও ভাবিও না।...

আমরা যাহা (ভাবি), তাহাই হই। যদি মনে ভাবো যে, তোমরা পাপী, তাহা হইলে মোহগ্রস্তের মতো ভাবিবে—আমি একটি বিচরণশীল হতভাগ্য কীট। যাহারা নরকে বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পরে তাহারা নরকেই যায়; আর যাহারা বলে—স্বর্গে যাইবে, তাহারা স্বর্গেই যায়।

সবই লীলা।...তোমরা বলিতে পারো, 'কিছু যখন করিতেই হইবে, তখন ভালই করি না কেন।' কিন্তু ভাল মন্দের কথা কে শুনিতেছে? লীলা! সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর লীলা করিতেছেন। ব্যস্।...তুমিই তো সেই লীলারত সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। যদি খেলায় নামিয়া ভিক্ষুকের ভূমিকা গ্রহণ কর,

তুমি ভূমিকা-নির্বাচনের জন্য অন্যকে দোষী করিতে পার না। ভিক্ষুক হওয়াতেই তোমার আনন্দ। তোমার প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপ তো তুমি অবগত আছ। তুমি রাজা, খেলায় নামিয়া ভিক্ষুক সাজিয়াছ মাত্র। …সবই তো কৌতুক। সব জানিয়া শুনিয়া খেলায় নামো। এই তো সব। তারপর অভ্যাস কর। সারা জগৎই তো একটা বিরাট খেলা। সবই ভাল, কারণ সবই মজা। ঐ নক্ষত্রটি কাছে আসে এবং আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইয়া যায়—আমরাও সবাই মরিয়া গেলাম। এটাও তো কৌতুক। যে-সব ছোট জিনিস তোমাদের ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দেয়, সেগুলিকেই তোমরা কৌতুক মনে কর!…

আমাদের বলা হয়—এখানে একজন ভাল ঈশ্বর আছেন, এবং একজন মন্দ ঈশ্বর ওখানে আছেন, ভুল করামাত্র আমাকে পাকড়াও করিবার জন্য যিনি ওঁত পাতিয়া আছেন।…আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন কে যেন আমাকে বলিয়াছিলেন—ঈশ্বর সব কিছুই দেখিতে পান। শুইতে যাইয়া আমি উপরে চাহিয়া রহিলাম। মনে আশা ছিল, ঘরের ছাদ খুলিয়া যাইবে; কিন্তু কিছুই ঘটিল না। নিজেরা ছাড়া আর কেহই আমাদের উপর লক্ষ্য রাখে না। নিজের আত্মা ছাড়া অপর কোন প্রভু নাই; আমাদের অনুভূতি ছাড়া অপর কোন প্রকৃতি নাই। অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব বা প্রকৃতি; ইহা প্রথম প্রকৃতিও বটে। প্রকৃতির এই শেষ কথা। কোন কাজ আমি দুই বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করি, অমনি উহা আমার প্রকৃতি বা স্বভাব হইয়া যায়। অসুখী হইও না! অনুশোচনা করিও না! যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। যদি অনুতাপ কর, ফল ভোগ করিতে হইবে।

…বুদ্ধিমান্ হও। আমরা ভুল করি; তাহাতে কি হইল? সবই তো কৌতুক বা মজা। অতীতের পাপের জন্য লোকে এমন পাগল হইয়া ওঠে, এমন ভাবে আর্তনাদ করে, কাঁদে, যে কি বলিব! অনুশোচনা করিও না। কাজ করিবার পরে আর সে কথা ভাবিও না। অগ্রসর হও! থামিও না! পিছনে তাকাইও না! পিছনে তাকাইয়া কি লাভ হইবে? ক্ষতিও নাই, লাভও নাই। তুমি তো আর মাখনের মতো গলিয়া যাইতেছ না। স্বর্গ, নরক আর অবতার—সব অর্থহীন কথা!

কে জন্মায় আর কে মরে? মজা করিতেছ, পৃথিবীকে লইয়া খেলা করিতেছ মাত্র। যতদিন ইচ্ছা শরীরটাকে ধারণ করিতেছ। যদি পছন্দ না হয়, করিও না। অসীমই সত্য; সসীম তো খেলামাত্র। তুমি একাধারে অসীম ও সসীম দেহবান্, ইহা নিশ্চয় জানিও। কিন্তু জ্ঞানে কোন তফাত হইবে না; খেলা চলিতেই থাকিবে।…দুইটি শব্দ—আত্মা ও দেহ—যুক্ত করা হইয়াছে। আংশিক জ্ঞানই ইহার কারণ। নিশ্চয় জানিও, তুমি সর্বদাই মুক্ত। জ্ঞানের আগুনে যত কিছু কলুষ ও অসম্পূর্ণতা সব পুড়িয়া যায়। আমিই সেই অসীম।…

একেবারে আদিতে তোমরা মুক্ত ছিলে, এখনও আছ, চিরদিন থাকিবে। যে জানে সে মুক্ত, সেই মুক্ত; যে জানে সে বদ্ধ, সেই বদ্ধ।

তাহা হইলে ঈশ্বর, পূজা-অর্চনা প্রভৃতির কি হইবে? এগুলিরও প্রয়োজন আছে। আমি নিজেকে ঈশ্বর ও আমি—এই দুই অংশে ভাগ করিয়াছি; আমিই পূজিত হই এবং নিজেকে পূজা করি। কেন করিব না? ঈশ্বরই তো আমি। আমার আত্মাকে কেন পূজা করিব না? সর্বেশ্বর ভগবান্ যিনি, তিনি তো আমার আত্মাও। সবই খেলা, সবই কৌতুক; আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

জীবনের পরিণাম ও লক্ষ্য কি? কিছুই না, কারণ আমি জানি—আমিই সেই অসীম। তোমরা যদি ভিক্ষুক হও, তোমাদের লক্ষ্য থাকিতে পারে। আমার কোন লক্ষ্য নাই, কোন অভাব নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি তোমাদের দেশে আসিয়াছি, বক্তৃতা করিতেছি—নিছক মজার খেলা; আর কোন অর্থ নাই। কি অর্থই বা থাকিতে পারে? একমাত্র ক্রীতদাসরাই অপরের জন্য কাজ করিয়া থাকে। তোমরা তো অপরের জন্য কাজ কর না। যখন প্রয়োজন হয়, তোমরা পূজা কর। খ্রীষ্টান, মুসলমান, চীনা, জাপানী—সকলের সঙ্গেই তোমরা যোগ দিতে পারো। যত ঈশ্বর আছেন আর যত ঈশ্বর আসিবেন, সকলকেই তোমরা পূজা করিতে পারো।…

আমি সূর্যে আছি, চন্দ্রে আছি, নক্ষত্রমণ্ডলীতে আছি। আমি পরমেশ্বরের সঙ্গে আছি—আছি সব দেবতার মধ্যে। আমার আত্মাকেই আমি পূজা করি।

ইহার আর একটি দিক আছে। সেটি আমি এখনও বলি নাই। আমার ফাঁসি হইবে। আমিই দুষ্ট। নরকে আমিই শাস্তি পাইতেছি। সে-সবও

মজার খেলা। আমি অসীম—এই জ্ঞানলাভ করাই দর্শনের লক্ষ্য। লক্ষ্য, প্রেরণা, উদ্দেশ্য, কর্তব্য—সব পিছনে পড়িয়া থাকে।···

এই সত্যকে প্রথমে শ্রবণ করিতে হইবে, তারপর মনন। যুক্তি কর, যত প্রকারে পারো তর্ক কর। বিদ্বান্ লোক ইহা অপেক্ষা অধিক জানে না। নিশ্চিত জানিও, সব কিছুতেই তুমি আছ। সেই জন্যই কাহাকেও আঘাত করিও না, কারণ অন্যকে আঘাত করিলে তুমি নিজেকেই আঘাত করিবে।···সবশেষে এই সত্যকে ধ্যান করিতে হইবে। এই সত্যকে চিন্তা কর। তুমি কি ভাবিতে পারো—এমন এক সময় আসিবে, যখন সব কিছু ধূলায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, আর তুমি একাকী দাঁড়াইয়া থাকিবে? উচ্ছ্বসিত আনন্দের সেই মুহূর্তটি কখনও তোমাকে ত্যাগ করিবে না। তুমি প্রকৃতই দেখিতে পাইবে, তোমার দেহ নাই। তোমার দেহ কোন কালে ছিল না।

অনন্তকাল ধরিয়া আমি এক—একাকী। কাহাকে আমি ভয় করিব? সবই তো আমার আত্মা। এই সত্যকে অবিরাম ধ্যান করিতে হইবে। ইহার ভিতর দিয়াই উপলব্ধি আসিয়া থাকে, সেই উপলব্ধির ভিতর দিয়াই তুমি হইবে অপরের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ।···

'ব্রহ্মবিদের মুখের ন্যায় তোমার মুখমণ্ডল প্রতিভাত হইতেছে'[১]—এই অবস্থাই লক্ষ্য। আমি যেভাবে প্রচার করিতেছি, ইহা সেভাবে প্রচার করিবার বস্তু নয়। 'একটি গাছের নীচে আমি একজন গুরুকে দেখিয়াছিলাম, ষোড়শবর্ষীয় এক যুবক; শিষ্য এক আশীতিবর্ষের বৃদ্ধ। গুরু নীরবে শিক্ষা দিতেছেন, আর শিষ্যের সব সন্দেহ দূরীভূত হইতেছে।'[২] কে কথা বলে? সূর্যকে দেখিবার জন্য কে মোমবাতি জ্বালায়? সত্য যখন প্রকাশ পায়, কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। তোমরাও তাহা জানো।···তোমরাও তাহাই করিবে···উপলব্ধি করিবে। প্রথমে ইহা লইয়া চিন্তা কর। যুক্তি দিয়া বোঝ। কৌতূহল চরিতার্থ কর। তারপর আর কিছু ভাবিও না। কোন কিছুই যদি আমরা না পড়িতাম! ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন। একজন শিক্ষিত লোকের অবস্থা দেখ।

১ ছান্দোগ্য উপ., ৪।৯।২ ২ দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্, ১২

'এ কথা বলা হয়, এবং সে কথা বলা হয়।...'

'বন্ধু, আপনি কি বলেন ?'

'আমি কিছুই বলি না।'

তিনি শুধু উদ্ধৃত করেন অন্যের চিন্তা; কিন্তু নিজে কিছুই চিন্তা করেন না। এই যদি শিক্ষা হয়, তাহা হইলে পাগলামি আর কাহাকে বলে? যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের দিকে চাও!...এই-সব আধুনিক লেখকগণ—দুইটি বাক্যও তাহাদের নিজেদের নয়! সবই উদ্ধৃতি!...

পুঁথির মূল্য খুব বেশী নয়, আর পরের মুখে শোনা, ধর্মের তো কোন মূল্যই নাই। ইহা ঠিক আহারের মতো। তোমার ধর্ম আমাকে সন্তুষ্ট করিবে না। যীশু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বুদ্ধও করিয়াছিলেন। তুমি যদি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিয়া থাকো, তুমি নাস্তিক অপেক্ষা বেশী কিছু নও। সেই নির্বাক; আর তুমি কেবলই বক্ বক্ কর, আর পৃথিবীকে বিরক্ত কর। পুঁথি, বাইবেল আর ধর্মগ্রন্থের কোন প্রয়োজন নাই। বাল্যকালে আমি একটি প্রৌঢ়কে দেখিয়াছিলাম, তিনি কোন ধর্মগ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু স্পর্শদ্বারা তিনি অপরের মধ্যে ঈশ্বরীয় অনুভূতি সঞ্চারিত করিতে পারিতেন।

'হে পৃথিবীর গুরুবৃন্দ, তোমরা চুপ কর। স্তব্ধ হও, গ্রন্থরাজি! হে প্রভু, তুমি শুধু কথা বলো, আর তোমার ভৃত্য শুনুক।'[১]...সেখানে যদি সত্য না থাকে, তাহা হইলে এ জীবনের আর প্রয়োজন কি? আমরা সকলেই ভাবি, ইহাকে ধরিতে পারিব, কিন্তু পারি না। আমরা অনেকেই শুধু ধুলা ধরিয়া থাকি। ঈশ্বর সেখানে নাই। ঈশ্বরই যদি নাই, তবে জীবনের দরকার কি? এই পৃথিবীতে কি বিশ্রাম-স্থান কোথাও আছে? আমাদিগকেই সে সন্ধান করিতে হইবে; কিন্তু তীব্রভাবে সে সন্ধান আমরা করি না। আমরা স্রোত-তাড়িত ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মতো।

সত্য যদি থাকে, ঈশ্বর যদি থাকেন, আমাদের অন্তরেই আছেন।... আমাকে বলিতে হইবে, 'তাঁহাকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।' নতুবা আমার কোন ধর্ম নাই। কতকগুলি বিশ্বাস, মতবাদ আর উপদেশে ধর্ম হয় না।

১ Imitation of Christ

উপলব্ধি—ঈশ্বরপ্রত্যক্ষই একমাত্র ধর্ম। সমগ্র বিশ্ব যাঁহাদের পূজা করে, সেই-সব মানুষের গৌরব কিসে? তাঁহাদের কাছে ঈশ্বর একটি মতবাদমাত্র নয়। পিতামহ বিশ্বাস করিতেন বলিয়া কি তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন? না। নিজেদের দেহ, মন—সব কিছুর ঊর্ধ্বে যে অসীম, তাঁহার উপলব্ধিতেই তাঁহাদের গৌরব। সেই ঈশ্বরের তিলমাত্র প্রতিবিম্ব আছে বলিয়াই এই পৃথিবী সত্য। আমরা ভাল লোককে ভালবাসি, কারণ তাঁহার মুখে সেই প্রতিবিম্ব আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠে। নিজেদেরই উহা ধরিতে হইবে। অন্য কোন পথ নাই।

সেই তো লক্ষ্য। তাহার জন্য সংগ্রাম কর! নিজের বাইবেল রচনা কর। নিজের খ্রীষ্টকে আবিষ্কার কর। নতুবা তোমরা ধার্মিক নও। ধর্মের কথা বলিও না। মানুষ কথার পর কথা বলিয়া যায়। 'তাহাদের মধ্যে অনেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়াও অন্তরের গর্বে ভাবে, সেই আলোক তাহারা পাইয়াছে। আর শুধু তাহাই নয়, অপরকেও তাহারা ঘাড়ে লইতে চায় এবং উভয়েই গর্তে পড়িয়া যায়।'[1]

শুধু গীর্জাই কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। মন্দির বা গির্জার আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্তু সেখানেই যাহার মৃত্যু হয়, সে বড়ই হতভাগ্য! সে কথা থাক!…আরম্ভটা ভাল, কিন্তু সে কথাও থাক। সে তো শৈশবের স্থান…কিন্তু তাই হোক!…ঈশ্বরের কাছে সোজা চলিয়া যাও। কোন ধারণা নয়, কোন মতবাদ নয়। একমাত্র তাহা হইলেই সব সন্দেহ দূর হইবে।… যাহা কিছু বাঁকা, তাহা একমাত্র তখনই সোজা হইবে।…

'বহুর মধ্যে যিনি একককে দেখেন, বহু মৃত্যুর মধ্যে যিনি দেখেন সেই এক জীবনকে, বহুর মধ্যে যিনি তাঁহাকে দেখেন, যিনি নিজের অপরিবর্তনীয় আত্মাকে দেখেন, তিনিই শাশ্বত শান্তির অধিকারী।'[2]

১ কঠ উপ., ১।২।৫

২ ঐ, ২।২।১২

সুবিদিত রহস্য

ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলেস্-এ প্রদত্ত বক্তৃতা।

বস্তুর স্বরূপ অবধারণ করিতে গিয়া আমরা যে-উপায়ই অবলম্বন করি না কেন, গভীর বিশ্লেষণের ফলে আমরা দেখিতে পাই, বস্তুর যে-স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাকে আপাততঃ স্ববিরোধী ছাড়া আর কিছু বলা চলে না; তাহা যুক্তির অগম্য হইলেও সত্য। প্রাথমিক দৃষ্টিতে যে-কোন বস্তুই সসীম বলিয়া মনে হয়; কিন্তু উহাকে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলে—কি গুণের দিক দিয়া, কি সম্ভাবনার দিক দিয়া, কি শক্তির দিক দিয়া, কি সম্বন্ধের দিক দিয়া উহার কোন অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বিচারের দৃষ্টিতে উহা অসীম হইয়া দাঁড়ায়। একটি ফুলের কথাই ধরা হউক। ফুল তো ক্ষুদ্র, সসীম পদার্থ, কিন্তু কে বলিতে পারে, সে ফুলের সম্বন্ধে সবই জানে? সামান্য একটি ফুলের সম্বন্ধেও জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছানো কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ফুলটি প্রথমে সসীম বলিয়া প্রতীত হইলেও বিচারের দৃষ্টিতে অসীমে পরিণত হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র বালুকণাকে বিশ্লেষণ করিলেও বুঝা যায়, উহা আপাতদৃষ্টিতে সসীম হইলেও বস্তুতঃ অসীম; তথাপি বালুকণাকে আমরা সসীম পদার্থ বলিয়াই মনে করিয়া আসিতেছি, ফুলও তেমনি আমাদের কাছে সসীম পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমাদের অন্তরের এবং বাহিরের সকল চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এই একই কথা। আমরা প্রথমে সামান্য জিনিস মনে করিয়া যাহা কিছু চিন্তা করিতে আরম্ভ করি, অতি অল্পকাল-মধ্যেই তাহা আমাদের জ্ঞানের পরিধি অতিক্রম করিয়া অনন্তের গভীরে ডুবিয়া যায়। অনুভূত বস্তুর মধ্যে আমরা নিজেরাই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ। অস্তিত্বের কথা ভাবিতে গেলেও ধাঁধায় পড়িতে হয়। আমাদের অস্তিত্ব আছে। আমরা সসীম জীব। আমরা জীবনধারণ করি এবং মরিয়া যাই। আমাদের দিগন্ত সীমাবদ্ধ। আমরা জানি—আমাদের সত্তা সসীম, আমাদের জীবনের পরিণতি মৃত্যু, আমাদের দিঙ্মণ্ডল স্বল্পপ্রসারী; আমরা চারিদিকে জগৎ-পরিবেষ্টিত হইয়া সঙ্কীর্ণ জীবন যাপন করিতেছি। বিশ্বপ্রকৃতি যে-কোন মুহূর্তে আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া আমাদের সত্তার বিলোপ ঘটাইতে পারে। বিশাল বিশ্বের সম্মুখে আমাদের ক্ষুদ্র দেহগুলি কোনমতে

টিকিয়া আছে, মুহূর্তমধ্যে ইহারা ভাঙিয়া পড়িতে পারে। আমরা জানি, কর্মক্ষেত্রে আমরা কত শক্তিহীন। প্রতিনিয়তই আমাদের ইচ্ছা প্রতিহত হইতেছে। কত শত ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করিতে চাই, কিন্তু কয়টি ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করিতে পারি? আমাদের বাসনা অনন্ত। আমরা সব কিছুই কামনা করিতে পারি। অন্য বাসনা তো তুচ্ছ, সুদূর নীলাকাশের লুব্ধক নক্ষত্রে যাইব, এইরূপ বাসনাও আমরা পোষণ করিতে পারি। কিন্তু কয়টি বাসনা আমরা পূর্ণ করিতে পারি? আমাদের দেহ অপটু, বহিঃপ্রকৃতি ইচ্ছার প্রতিকূল, আমরা দুর্বল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আমাদের আর একটি দিক আছে। ক্ষুদ্র ফুলটি কিংবা সূক্ষ্ম বালুকণাটি যেমন একাধারে সসীম ও অসীমের দ্যোতক, আমাদের স্বরূপও সেইরূপ। আমরা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তরঙ্গটি সমুদ্র ভিন্ন আর কিছু নয়, আবার অন্যদিক দিয়া বিচার করিলে তরঙ্গ এবং সমুদ্রের পার্থক্য স্পষ্ট। তরঙ্গের এমন কোন অংশ নাই, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যায় না যে, ইহা সমুদ্রই। 'সমুদ্র' নামটি শুধু তরঙ্গ সম্বন্ধে নয়, সমুদ্রের সকল অংশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তথাপি সমুদ্র তরঙ্গ হইতে পৃথক। সত্তারূপ বিরাট সমুদ্রের মধ্যে আমরা এক-একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের মতো; কিন্তু আমরা যখন আমাদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে যাই, তখন আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের সত্তাকে ধরা সম্ভব নয়, কারণ আমরা অসীম হইয়া পড়িয়াছি।

আমরা যেন স্বপ্নে বিচরণ করিতেছি। যতক্ষণ মন স্বপ্নাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ কিছুই অস্বাভাবিক মনে হয় না, কিন্তু যখনই স্বপ্নের বিষয়কে বাস্তব বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করা হয়, তখনই উহা অদৃশ্য হয়। কেন?—স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া নয়, স্বপ্নের স্বরূপ আমাদের যুক্তি বিচার ও বুদ্ধির অগোচর বলিয়া। জীবনে অনুভূত প্রত্যেকটি বস্তু এত বিরাট যে, তাহার তুলনায় আমাদের বুদ্ধি অতি তুচ্ছ। বুদ্ধি চায় নিজের উদ্ভাবিত কতকগুলি নিয়মের মধ্যে বস্তুকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে, কিন্তু বস্তু কখনও বুদ্ধির নিগড়ে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হয় না। বস্তুকে নিয়মের জালে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধির এই প্রচেষ্টা মানবাত্মার ক্ষেত্রে আরও সহস্রগুণ ব্যর্থ বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুতঃ বিশ্বের সকল পদার্থের মধ্যে 'আমরা নিজেরাই' সর্বাধিক রহস্যময়।

সব কিছুই বিস্ময়কর! মানুষের চোখের দিকে তাকাও! কত সহজে ইহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অথচ তোমার চোখ দেখিতেছে বলিয়াই প্রকাণ্ড সূর্যের অস্তিত্ব। সেই রহস্যের কথা ভাবো! ক্ষুদ্র অসহায় চোখ-দুটি! একটা তীব্র আলোক কিংবা একটা কাঁটা চোখ-দুটিকে নষ্ট করিয়া দিতে পারে। তবু সবচেয়ে শক্তিশালী ধ্বংসকারী যন্ত্র, প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহাবিস্ময়কর চন্দ্র সূর্য তারকা পৃথিবী প্রভৃতির অস্তিত্ব এই দুইটি ক্ষুদ্র চোখের উপর নির্ভর করে! তোমার চোখই বিশ্বের অস্তিত্বের সাক্ষী। চোখ বলে, 'এই তো বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি সম্মুখে রহিয়াছে'; আমরা চোখের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়া প্রকৃতির বিচিত্র রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করি। এইভাবে ক্ষুদ্র কান, নাক, জিভ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বিপুল বিশ্বের পরিচয় লাভ করি।

কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে কে ক্ষুদ্র, কে মহৎ, কে দুর্বল, কে সবল, কে উচ্চ, কে নীচ—তাহা নিশ্চয় করিয়া বলার উপায় নাই, কারণ এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের পরস্পর-নির্ভরশীলতা এমন অদ্ভুত যে, ক্ষুদ্রতম পরমাণুটির সত্তাও সমগ্র জগতের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কেহই ছোট নয়, কেহই বড় নয়। সব কিছুই এক অসীম পরম সত্যের সহিত বিজড়িত, সব কিছুই অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান, সব কিছুই তত্ত্বতঃ অসীম। স্থূল বৃক্ষাদি ও সূক্ষ্ম বালুকাদি যাহা দেখা যায়, সুখ-দুঃখাদি যাহা অনুভব করা যায়—সব কিছুই বস্তুতঃ অসীম। প্রত্যেকটি জীব, প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি পরিচ্ছিন্ন সত্তাই স্বরূপতঃ অসীম। আমাদের সত্তার রহস্য এই যে, আমরা অসীম হইয়াও সসীম এবং সসীম হইয়াও অসীম।

ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অসীমের এই উপলব্ধি আমাদের প্রায় অজ্ঞাত। আমরা আমাদের অসীমত্ব ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা নয়, কারণ নিজের প্রকৃত স্বরূপ কেহই ভুলিতে পারে না। কেহ কি কখনও নিজের ধ্বংস কল্পনা করিতে পারে? কে ভাবিতে পারে, সে মরিয়া যাইবে?—কেহই এইরূপ চিন্তা করিতে পারে না। অসীমের সহিত আমাদের সম্বন্ধ-বোধ অজ্ঞাতসারেও আমাদের মধ্যে কাজ করিতে থাকে। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা আমাদের স্বরূপ-বিস্মৃতি এবং ইহাই আমাদের সকল দুঃখের মূল।

দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনে দেখা যায় যে, আমরা সামান্য কারণেই ব্যথিত হই, ক্ষুদ্র সত্তার দাসত্ব স্বীকার করি। আমরা মনে করি, আমরা সসীম—ক্ষুদ্র জীব। এই ধারণা হইতেই আমাদের দুঃখের উৎপত্তি। তথাপি আমরা যে অসীম, এই ধারণা পোষণ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমরা যখন দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হই, আমরা যখন তুচ্ছ বিষয়ে বিচলিত হই, তখন আমাদের এই বিশ্বাস জাগ্রত করা উচিত যে, আমরা অসীম। বস্তুতঃ আমরা অসীমই। জ্ঞাতসারে হউক কিংবা অজ্ঞাতসারে হউক, আমরা তো অসীম অনন্তের সন্ধানেই ছুটিতেছি; আমরা সর্বদা এমন কিছু খুঁজিতেছি, যাহা মুক্ত।

জগতে কোনদিন এমন জাতি ছিল না, যাহাদের ধর্ম ছিল না বা যাহারা কোন না কোন প্রকার ঈশ্বর অথবা দেবতার পূজা করিত না। ঈশ্বর আছেন কিনা, দেবতারা আছেন কিনা, এই-সকল প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। আসল প্রশ্ন, মানুষের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিলে কোন্ তথ্য আবিষ্কৃত হয়? সারা জগতের লোক একজন ঈশ্বরের খোঁজ করে কেন? মানুষের কত বাধা, কত বন্ধন! নিয়মের ভয়াবহ নিষ্পেষণ তাহাকে কোন দিকে নড়িতে দেয় না। সে যাহা কিছু করিতে চায়, তাহাতেই নিয়মের বাধা। সর্বত্রই নিয়ম। কিন্তু এত বাধা এবং নিষ্পেষণ সত্ত্বেও মানুষের আত্মা তাহার স্বাধীনতা বিস্মৃত হয় না, সে খোঁজে মুক্তি। জগতে যত ধর্মমত আছে, তাহাদের সকলেরই লক্ষ্য এক—সকল ধর্মই খোঁজে মুক্তি। মানুষ জানুক আর নাই জানুক, স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া বলিতে পারুক আর নাই পারুক, মুক্তির ধারণা, স্বাধীনতার ভাব তাহার স্বভাবগত। মানুষের মধ্যে যাহারা অতি সাধারণ, যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, তাহারাও এমন কিছু খোঁজে, যাহা প্রকৃতির নিয়মের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে। কেউ দানবের খোঁজ করে, কেউ ভূতের খোঁজ করে, কেউ বা দেবদেবীর খোঁজ করে। এই দানব, ভূত বা দেবতার নিকট প্রকৃতি সর্বশক্তিময়ী নয়, তাহার দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নিয়ম তুচ্ছ, কারণ সে প্রকৃতিকে দমন করিতে পারে। মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা: আহা, যদি এমন কাহাকেও পাওয়া যাইত, যিনি নিয়মের নিগড় ভাঙিয়া দিতে পারেন! আমরা তো সর্বদা তাঁহারই খোঁজ করিতেছি, যিনি নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন। একটি ধাবমান ইঞ্জিন রেলপথে অগ্রসর হইতেছে, আর উহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা

করিবার উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র কীট সরিয়া যাইতেছে। তখনই আমরা বলি : ইঞ্জিনটি যত প্রকাণ্ডই হউক, উহা জড় পদার্থ, উহা একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়; উহা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, উহাকে নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়; মানুষ যে দিকে চালাইতে চায়, সেই দিকেই উহাকে চলিতে হয়; উহা কখনও নিয়মকে অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু কীটটি ক্ষুদ্র হইলেও নিয়ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে, নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সে তাহার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। ইহাই তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ অসীমত্ব বা ঐশী সত্তার লক্ষণ।

নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাধীন ইচ্ছার এই আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মার এই মুক্তিপ্রবণতা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর বা কোন দেবতার আকারে ইহা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ইহা সর্বৈব বাহিরের—যাহারা দেবতাকে কেবল বাহিরেই দেখে, তাহাদের জন্য। মানুষ প্রথমে নিজেকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়াছিল; তাহার ভয় হইয়াছিল, সে হয়তো কোনদিনই মুক্ত হইতে পারিবে না। এইজন্য সে প্রকৃতির বাহিরে এমন একজনের খোঁজ করিতেছিল, যিনি স্বভাবতঃ মুক্ত। তারপর তাহার মনে হইল, বাহিরে এইরূপ অসংখ্য মুক্ত সত্তা বা দেবতা আছেন। ক্রমে মানুষ সকল দেবতাকে এক দেবাদিদেব পরমেশ্বরে মিলিত করিল। কিন্তু তাহাতেও মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে নাই। সে যখন চরম সত্যের দিকে আরও অগ্রসর হইল, তখন সে বুঝিতে পারিল যে, সে নিজে যাহাই হউক না কেন, যিনি সকল দেবতার দেবতা, যিনি সকল প্রভুর প্রভু, তাঁহার সহিত তাহার নিজের কোন সম্বন্ধ আছে। সে বদ্ধ, হীনমতি এবং দুর্বল হইলেও পরমেশ্বরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এইভাবে মানুষের দৃষ্টি খুলিল, চিন্তার উন্মেষ হইল এবং জ্ঞানের প্রসার হইল। মানুষ ক্রমশঃ সেই পরমেশ্বরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে সে বুঝিল, এক সর্বশক্তিমান্ মুক্ত আত্মাকে খুঁজিতে গিয়া তাহার মানসপটে পরমেশ্বর ও নানা দেবতার যে দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছে, সেই দৃশ্য তাহার নিজেরই সম্বন্ধে নিজভাবের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সত্য আবিষ্কৃত হইল—সে বুঝিল, পরমেশ্বর নিজের অনুরূপ করিয়া মানুষকে গড়িয়াছেন, ইহাই শুধু সত্য নয়, মানুষ নিজের মতো করিয়া পরমেশ্বরকে গড়িয়াছে, ইহাও সত্য।

এরূপেই মানুষ স্বরূপতঃ মুক্ত—এই বোধ জাগ্রত হইল। সেই পরমেশ্বর সদা অন্তরে বিরাজমান, আমাদের নিকটতম। এতকাল আমরা তাঁহাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিলাম, অবশেষে বুঝিলাম—তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরে।

গল্পে আছে, এক ব্যক্তি তাহার নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দকে গৃহের দরজায় ধাকা বলিয়া ভুল করিয়াছিল। প্রথমে একবার দরজা খুলিয়া সে দেখিল, বাহিরে কেহ নাই। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে আবার সেই দরজায় ধাকার শব্দ শুনিয়া বিস্মিত হইল। এবারও দরজা খুলিয়া বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে বুঝিতে পারিল যে, উহা তাহার নিজেরই হৃৎস্পন্দনের শব্দ। মানুষের অবস্থা এই গল্পের লোকটির মতো। এক অনন্ত মুক্ত সত্তার সন্ধানে বাহির হইয়া মানুষ যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছিল, তখন তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এতদিন সে বহির্জগতে যাঁহাকে অনন্ত মুক্ত সত্তা বলিয়া কল্পনা করিয়াছে, তিনি তাহার স্বরূপেরই বহিঃপ্রকাশ—সকল আত্মার আত্মা। এই সত্যস্বরূপ সে নিজেই।

এইরূপেই মানুষ একদিন বুঝিতে পারে, তাহার সত্তার মধ্যে এক অদ্ভুত দ্বৈতভাব বিদ্যমান। সে একাধারে অসীম ও সসীম। যিনি অসীম, তিনিও তাহারই আত্মা। অসীম অনন্ত পরব্রহ্ম যেন বুদ্ধির জালে পড়িয়া সসীম জীবকুলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। কিন্তু ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপে কোন বিকার উপস্থিত হয় নাই। তিনি অবিকৃতই রহিয়াছেন।

যিনি আমাদের আত্মার আত্মা, তাঁহাকে নিত্য মুক্ত আনন্দময় ও নির্বিকার পরব্রহ্ম বলিয়া জানাই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানই আমাদের সুদৃঢ় ভিত্তি, আমাদের আশ্রয়স্থল। ইহার মধ্যেই মৃত্যুর চির অবসান, দুঃখের চির নিবৃত্তি এবং অমৃতত্বের আবির্ভাব। যিনি বহুর মধ্যে এক, যিনি পরিণামশীল জগতের মধ্যে এক অপরিণামী সত্তা—তাঁহাকে যিনি নিজের আত্মা-রূপে উপলব্ধি করেন, শুধু তিনিই শাশ্বত শান্তির অধিকারী, অপর কেহ নয়।

মানুষ যখন দুঃখ-দুর্দশার অন্ধকারে পড়ে, তখন এই আত্মা স্বীয় জ্যোতির প্রভাবে তাহাকে জাগ্রত করে; মানুষ জাগিয়াই বুঝিতে পারে, যাহা সত্য-সত্যই তাহার নিজস্ব, তাহা সে কখনও হারাইতে পারে না। না, যাহা আমাদের নিজস্ব, তাহা আমরা হারাইতে পারি না। কে তাহার স্বরূপ হারাইতে পারে? যদি আমি ভাল হই, তাহা হইলে আমার সত্তাই প্রথম

স্বীকৃত হয়, তারপর সেই সত্তাই ভাল গুণে রঞ্জিত হয়। যদি আমি মন্দ হই, তাহা হইলেও আমার সত্তাই প্রথম স্বীকৃত হয়, তারপর সেই সত্তাই দোষ দ্বারা রঞ্জিত হয়। আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে—সর্বত্রই এক অদ্বিতীয় সত্তা বা 'সৎ' বিদ্যমান। সৎ-এর ধ্বংস নাই।

অতএব সকলেরই আশা আছে। কেহই বিনষ্ট হইতে পারে না; কেহই চিরকাল হীন থাকিতে পারে না। জীবন একটা ক্রীড়াক্ষেত্র ছাড়া কিছু নয়, ক্রীড়া যতই স্থূল হউক না কেন। আমরা যতই দুঃখ-ক্লেশ ও আঘাত পাই না কেন, তাহাতে আত্মার কোন অনিষ্ট হয় না, আত্মা অচল ও সনাতন। আমরা সেই নিত্য আত্মা।

বৈদান্তিক বলেন, 'আমার ভয় নাই, সংশয় নাই, মৃত্যু নাই; আমার পিতা নাই, মাতা নাই; আমার কখনও জন্ম হয় নাই। আমার শত্রুই বা কে? আমিই যে সব কিছু। আমি সচ্চিদানন্দ, আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য, কুচিন্তা প্রভৃতি আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ আমি সচ্চিদানন্দ, আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম।'

এই ভাবনাই সকল ব্যাধির মহৌষধ, ইহাই মৃত্যুহর অমৃত। আমরা এই জগতে আছি; আমাদের স্বরূপ সেই জগৎকে মানিয়া লইতে চায় না, উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আমাদিগকে বার বার বলিতে দাও: আমি সেই, আমি সেই। আমার ভয় নাই, সংশয় নাই, মৃত্যু নাই। আমি স্ত্রী নই, পুরুষ নই; আমার সম্প্রদায় নাই, বর্ণও নাই। আমার কি মত থাকিতে পারে? এমন কোন্ সম্প্রদায় আছে, আমি যাহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি? কোন্ সম্প্রদায় আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? আমি তো সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিদ্যমান! দেহ যতই প্রতিকূল আচরণ করুক, মন যতই বিদ্রোহী হউক, যখনই চারিদিক হইতে গভীরতম অন্ধকার, তীব্র বেদনাময় উৎপীড়ন এবং অকূল নৈরাশ্য আসিয়া ঘিরিবে, তখনই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, 'আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম'—একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, বার বার।

বার বার আমি মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছি। কতবার দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়াছে, কতবার পায়ে নিদারুণ ক্ষত দেখা দিয়াছে, হাঁটিতে অক্ষম হইয়া ক্লান্তদেহে বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছি, মনে হইয়াছে এইখানেই জীবনলীলা শেষ হইবে। কথা বলিতে পারি নাই, চিন্তাশক্তি তখন লুপ্তপ্রায়।

কিন্তু অবশেষে ঐ মন্ত্র মনে জাগিয়া উঠিয়াছে: আমার ভয় নাই, মৃত্যু নাই; আমার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই। আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। বিশ্বপ্রকৃতির সাধ্য নাই যে, আমাকে ধ্বংস করে। প্রকৃতি আমার দাস। হে পরমাত্মন্, হে পরমেশ্বর, তোমার শক্তি বিস্তার কর। তোমার হৃতরাজ্য পুনরধিকার কর। উঠ, চলো, থামিও না। এই মন্ত্র ভাবিতে ভাবিতে আমি নবজীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি এবং আজ এখানে সশরীরে বর্তমান আছি। সুতরাং যখনই অন্ধকার আসিবে, তখনই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিও, দেখিবে—সকল বিরুদ্ধ শক্তি বিলীন হইয়া যাইবে। বিরুদ্ধ শক্তিগুলি তো স্বপ্ন মাত্র। জীবন-পথের বাধাবিঘ্নগুলি পর্বতপ্রমাণ, দুর্লঙ্ঘ্য ও বিষাদময় বলিয়া মনে হইলেও এগুলি মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ভয় করিও না, দেখিবে উহারা দূরে চলিয়া গিয়াছে। নিষ্পেষণ কর, দেখিবে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; পদদলিত কর, দেখিবে মরিয়া গিয়াছে। ভীত হইও না। বার বার বিফল হইয়াছ বলিয়া নিরাশ হইও না। কাল নিরবধি, অগ্রসর হইতে থাকো, বার বার তোমার শক্তি প্রকাশ করিতে থাকো, আলোক আসিবেই। জগতে প্রত্যেকের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে? কে তোমাকে সাহায্য করিবে? মৃত্যুর হাত কে এড়াইতে পারিয়াছে? কে তোমাকে মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিবে? তোমার উদ্ধারসাধন তোমাকেই করিতে হইবে। তোমাকে সাহায্য করার সাধ্য অপর কাহারও নাই। তুমি নিজেই তোমার পরম শত্রু, আবার তুমিই তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আত্মাকে জানো, উঠ, জাগো; ভীত হইও না। দুঃখ ও দুর্বলতার মধ্যে আত্মাকে প্রকাশ কর,—প্রথমে ইহা যতই ক্ষীণ ও অনুভবের অতীত বলিয়া মনে হউক না কেন। তোমার এমন সাহস হইবে যে, তুমি সিংহগর্জনে বলিয়া উঠিবে: আমিই আত্মা, আমিই ব্রহ্ম। আমি পুরুষ নই স্ত্রীও নই; দেবতা নই, দৈত্যও নই, কোন প্রাণী বা বৃক্ষাদিও নই। আমি ধনী নই, দরিদ্রও নই, পণ্ডিত নই, মূর্খও নই। আমার স্বরূপের তুলনায় এই সকল উপাধি অতি তুচ্ছ। আমি পরমাত্মা, আমি ব্রহ্ম। ঐ যে দেদীপ্যমান চন্দ্র-সূর্য গ্রহনক্ষত্র-নিচয় দেখিতেছ, উহারা আমার প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াই আলোক বিস্তার করিতেছে। অগ্নির যে রূপ, তাহা আমিই; বিশ্বের যে শক্তি, তাহাও আমি, কারণ আমিই পরমাত্মা, আমিই ব্রহ্ম।

যে মনে করে, 'আমি ক্ষুদ্র', সে ভ্রান্ত, কারণ আমিই তো একমাত্র সত্তা, আমিই সব কিছু। আমি বলি, 'সূর্য আছে', তাই সূর্য আছে; আমি বলি, 'পৃথিবী আছে', তাই পৃথিবী আছে। আমার উপর নির্ভর না করিয়া উহাদের কেহই থাকিতে পারে না, কারণ আমি সচ্চিদানন্দ, আমি ব্রহ্ম, আমি চিরসুখী, চিরপবিত্র, চিরসুন্দর। বাহিরের ঐ সূর্য যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তির কারণ হইয়াও কাহারও চোখের দোষে দূষিত হয় না, তেমনি জগতের ভাল-মন্দ আমার স্বরূপকে স্পর্শ করে না। আমি সকল ইন্দ্রিয় এবং সকল বিষয়ের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছি, কিন্তু কোন ইন্দ্রিয় বা কোন বস্তুর দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমি কোন নিয়ম বা কর্মের অধীন নই। আমি কর্মাধ্যক্ষ। আমি চিরদিন ছিলাম, চিরদিন আছি।

আমাদেরই জনৈক কবি বলিয়াছেন—আমার প্রকৃত সুখ জাগতিক পদার্থে নাই, পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি কোন কিছু আমাকে আনন্দ দিতে পারে নাই। আমি অনন্ত নীলাকাশের মতো। কত বিচিত্র মেঘ আকাশের বুকে খেলা করিয়া মুহূর্তমধ্যে দূরে চলিয়া যায়। আবার সেই একই নীলাকাশ। সুখ-দুঃখ শুভাশুভ আত্মাকে আবৃত করিয়া আমাকে মুহূর্তের জন্য অভিভূত করিতে পারে; কিন্তু ইহারা স্থায়ী নয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়। আমি সকল অবস্থাতেই আছি। আমি নিত্য, আমি অপরিণামী, আমি চির-ভাস্বর। দুঃখ আসে আসুক, আমি জানি উহা সসীম; অতএব উহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অশুভ আসে আসুক, আমি জানি উহাও বিনষ্ট হইবে; কারণ উহাও সসীম, ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র আমিই অসীম, আমাকে কোন কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। আমি চিরন্তন, অসীম, অব্যয় পরমাত্মা।

এস, আমরা এই জ্ঞানামৃত পান করি; ইহাই আমাদিগকে অমৃতত্বে পৌঁছাইয়া দিবে। ইহাই অক্ষয় ব্রহ্মলাভের পথ। মা ভৈঃ। আমরা পাপী, আমরা সসীম, আমরা মৃত্যুর অধীন—একথা বিশ্বাস করিও না। ইহা সত্য নয়।

'আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে।' হাত যখন কাজ করিবে, মন যেন তখন জপ করিতে থাকে, 'আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম।'

যতদিন না এই সত্য তোমার অস্থি-মাংসের সহিত মিশিয়া যায়, যতদিন না তোমার অন্তর হইতে নিজের ক্ষুদ্রতা দুর্বলতা দুঃখ এবং অমঙ্গলের ভয়াবহ স্বপ্ন চিরতরে তিরোহিত হয়, ততদিন জাগরণে ও স্বপ্নে ইহা চিন্তা কর এবং তখনই পরম সত্য তোমার নিকট আর ক্ষণকালও আত্মগোপন করিয়া থাকিবে না।

জ্ঞানলাভের সোপানশ্রেণী

আমেরিকায় বেদান্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা।

জ্ঞানমার্গের সাধকের সর্বপ্রথম আবশ্যক—শম ও দম। এই দুইটির ব্যাখ্যা একসঙ্গেই করা যাইতে পারে। ইহাদের অর্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী হইতে না দিয়া স্ব স্ব কেন্দ্রে সংস্থাপিত করা। আমি প্রথম তোমাদের বলিব 'ইন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ কি। ধর, চোখগুলি রহিয়াছে; এই চোখগুলি দর্শনেন্দ্রিয় নয়, ইহারা দর্শনক্রিয়ার যন্ত্রমাত্র। যখন দর্শনেন্দ্রিয় না থাকে, তখন চক্ষু থাকিলেও দেখিতে পারি না। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় রহিয়াছে, দর্শনের যন্ত্র চক্ষুও রহিয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ মন এই দুইটির সহিত সংযুক্ত না হইবে, ততক্ষণ দর্শনক্রিয়া হয় না। সুতরাং প্রত্যেক প্রত্যক্ষব্যাপারে তিনটি বস্তু আবশ্যক—প্রথমতঃ বাহ্য করণাবলী, তারপর অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ এবং সর্বশেষে মন। ইহাদের যে-কোন একটি না থাকিলে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে মন, বাহ্য ও আভ্যন্তর দুইটি করণ-সহায়ে কাজ করে। যখন আমি কোন কিছু দেখি, আমার মন বাহির হইয়া যায় এবং বাহ্য বস্তুর আকার ধারণ করে। কিন্তু মনে কর, আমি চোখ বুজিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিলাম; মন তখন বাহিরে যায় না; ইহা ভিতরেই সক্রিয় থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় থাকে। যখন আমি তোমাদের দিকে তাকাই এবং তোমাদের সঙ্গে কথা বলি, তখন ইন্দ্রিয় ও উহাদের যন্ত্রসমূহ উভয়ই কার্যরত থাকে। যখন আমি চোখ বুজিয়া ভাবিতে আরম্ভ করি, তখন ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় থাকে, কিন্তু ইহাদের যন্ত্রগুলি সক্রিয় থাকে না। এই ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া ব্যতীত কোন

চিন্তা বা মনন-ক্রিয়া হয় না। তোমরা লক্ষ্য করিবে, তোমাদের কেহই কোন প্রতীকের সাহায্য ছাড়া চিন্তা করিতে পার না। অন্ধলোককেও কোন একটি আকারের মাধ্যমে চিন্তা করিতে হয়। দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় সাধারণতঃ অত্যন্ত সক্রিয়। তোমাদের অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, 'ইন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র। চক্ষু ও কর্ণ দর্শন ও শ্রবণের যন্ত্রমাত্র; ইন্দ্রিয়গুলি রহিয়াছে ভিতরে। ইন্দ্রিয়গুলি যদি কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে চক্ষুকর্ণ থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাইব না। সুতরাং মনকে সংযত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রথম এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে হইবে। বাহ্য ও আন্তর বিষয়ে মনের গতি-রোধ করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করা—ইহাই হইল শম ও দম শব্দের অর্থ। মন বা অন্তরিন্দ্রিয় সংযম হইল শম এবং চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম দম।

তারপর আবশ্যক—উপরতি। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা না করাকে 'উপরতি' বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই আমাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়—যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, যাহা দেখিব বা শুনিব, যাহা খাইয়াছি, খাইতেছি বা খাইব, যে যে স্থানে বাস করিয়াছি ইত্যাদি বিষয়েই আমাদের চিন্তা। আমরা প্রায় সব সময়ই ইহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করি অথবা কথা বলি। যিনি বেদান্তী হইতে ইচ্ছুক তাঁহাকে এই অভ্যাস অতি অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পরবর্তী সাধন হইল তিতিক্ষা দার্শনিক জীবন দুঃসাধ্য সাধন!—এই সাধনটি সর্বাধিক দুষ্কর। অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ; তিতিক্ষা ইহা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। বিষয়টি একটু পরিষ্কারভাবে বোঝানো দরকার। বাহ্যতঃ অন্যায়ের প্রতিরোধ না করিতে পারি কিন্তু তজ্জন্য অন্তরে দুঃখবোধ হইতে পারে। আমরা অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ করিতে পারি। কোন ব্যক্তি আমার প্রতি অত্যন্ত রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, তজ্জন্য বাহ্যতঃ তাহাকে ঘৃণা না করিতে পারি, তাহার কথার প্রত্যুত্তর না দিতে পারি এবং নিজেকে সংযত করিয়া আপাততঃ ক্রোধ প্রকাশ করিতে না পারি, তথাপি আমার অন্তরে ক্রোধ ও ঘৃণা থাকিতে পারে এবং আমি ঐ লোকটির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে পারি। ইহা আদর্শ অপ্রতিরোধ নয়। এই আদর্শানুসারে আমার মনেও কোন

ঘৃণা অথবা ক্রোধের ভাব থাকা উচিত নয়, এমন কি প্রতিরোধের চিন্তাও নয়; আমার মন এত স্থির ও শান্ত থাকিবে যেন কিছুই ঘটে নাই। যখনই আমি সেই অবস্থায় উপনীত হই, তখনই অপ্রতিরোধ-অবস্থা প্রাপ্ত হই; ইহার পূর্বে নয়। দুঃখ প্রতিরোধ করিবার অথবা দূর করিবার চিন্তামাত্র না করিয়া, মনের মধ্যে কোন প্রকার দুঃখময় অনুভূতি অথবা অনুশোচনা না রাখিয়া সর্ববিধ দুঃখের যে সহন—তাহাই তিতিক্ষা। মনে কর, অশুভের প্রতিরোধ করিলাম, ফলে গুরুতর অনিষ্টপাত হইল। আমার যদি তিতিক্ষা থাকে, তাহা হইলে অশুভ প্রতিরোধ না করার জন্য আমার অনুশোচনা বোধ করা উচিত নয়। সেই অবস্থায় উন্নীত হইলে বলা যায়, মন তিতিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতবাসীরা এই তিতিক্ষা অভ্যাস করিবার জন্য অসাধারণ কর্ম করিয়া থাকেন। তাঁহারা কিছু গ্রাহ্য না করিয়া অত্যুগ্র শীত ও উষ্ণ সহ্য করেন; তাঁহারা তুষারও গ্রাহ্য করেন না, কেন না দেহ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনই চিন্তা থাকে না। দেহের ভাবনা দেহই করে, ইহা যেন একটি বাহিরের জিনিস।

অতঃপর যে সাধনের প্রয়োজন, তাহা শ্রদ্ধা। ধর্ম ও ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা দরকার। যতক্ষণ এই বিশ্বাস না হয়, ততক্ষণ কেহ জ্ঞানী হইবার উচ্চ আশা পোষণ করিতে পারে না। এক সময় একজন মহাপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই জগতে দুই কোটি লোকের মধ্যে একজনও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'মনে কর, এই ঘরে একটি চোর রহিয়াছে এবং সে জানিতে পারিল, পাশের ঘরে রাশীকৃত সোনা আছে; ঘর দুইটির মাঝে একটি খুব পাতলা পরদা রহিয়াছে। আচ্ছা, সেই চোরটির কি অবস্থা হইবে?' আমি উত্তর দিলাম, 'চোরটি একেবারে ঘুমাইতে পারিবে না; তাহার মস্তিষ্ক সক্রিয়ভাবে সেই সোনা হস্তগত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকিবে এবং তাহার অন্য কোন চিন্তা থাকিবে না।' তদুত্তরে তিনি বলেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর, কোন মানুষ ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়া ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য পাগল হইয়া যাইবে না? যদি কোন লোক আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, এক অসীম অনন্ত আনন্দের আকর রহিয়াছে এবং তাহা লাভ করা যায়, তাহা হইলে উহা লাভ করিবার চেষ্টায় সে কি পাগল হইবে না?' ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অনুরূপ আগ্রহকেই বলে 'শ্রদ্ধা'।

তারপর সমাধান, অর্থাৎ মন ঈশ্বরে একাগ্র করিবার নিয়ত অভ্যাস। কোন কিছুই এক দিনে সম্পন্ন হয় না। ধর্ম একটি বটিকার আকারে গিলিয়া ফেলা যায় না। ইহার জন্য প্রতিনিয়ত কঠোর অনুশীলনের দরকার। কেবল ধীর ও নিয়ত অভ্যাস দ্বারা মনকে জয় করা যায়।

তারপর মুমুক্ষুত্ব—মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা। তোমাদের মধ্যে যাহারা এড্উইন আর্নল্ডের 'Light of Asia' (এশিয়ার আলো) নামক গ্রন্থ পড়িয়াছ, বুদ্ধের প্রথম উপদেশের অনুবাদ নিশ্চয়ই তাহাদের মনে আছে। সেখানে বুদ্ধ বলিয়াছেন :

'তোমরা নিজেদের জন্যই দুঃখভোগ করিয়া থাকো; অন্য কেহই তোমাদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য করে না। তুমি জীবনধারণ কর, মৃত্যুমুখে পতিত হও, জীবন-মৃত্যুর চক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া দুঃখের শলাকা, অশ্রুর বেষ্টনী এবং অসারতার মধ্যবিন্দুকে আলিঙ্গন কর—ইহাতে অন্য কেহই তোমাকে ধরিয়া রাখে না।'

আমাদের যাবতীয় দুঃখ আমরা নিজেরাই বাছিয়া লইয়াছি। ইহাই আমাদের প্রকৃতি। একজন বৃদ্ধ চৈনিক ষাট বৎসর কারারুদ্ধ ছিল; কোন নূতন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগার হইতে বাহির হইয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, 'আমি আর বাঁচিতে পারিব না।' তাহাকে আবার সেই বিভীষিকাপূর্ণ রুদ্ধ কারাগৃহে যাইতে হইবে। সে আলোক সহ্য করিতে পারে নাই। সে রাজকর্মচারিগণকে বলিল, 'তোমরা আমাকে মারিয়া ফেলো অথবা কারাগারে পাঠাইয়া দাও।' তাহাকে কারাগারেই পাঠানো হইল। মানুষ মাত্রেরই ঠিক এইরূপ অবস্থা। আমরা উদ্দামগতিতে সর্বপ্রকার দুঃখের পিছনে ছুটি, দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে আমরা অনিচ্ছুক। প্রতিদিন আমরা সুখের পশ্চাতে ধাবিত হই, নাগাল পাইবার পূর্বেই দেখি, উহা বিলীন হইয়া গিয়াছে, আঙুলের ফাঁক দিয়া গলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তবুও আমরা উন্মত্তভাবে সুখান্বেষণ হইতে বিরত হই না, বরং আগাইয়া চলি। এমন মোহান্ধ নির্বোধ আমরা!

ভারতবর্ষের কোন কোন তেলের কলে বা ঘানিতে বলদ ব্যবহার করা হয়। বলদগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তৈলবীজ পেষণ করে। বলদের কাঁধে একটি জোয়াল আছে। একটুকরা কাঠ জোয়াল হইতে লম্বমান থাকে

এবং ইহার সঙ্গে এক গোছা খড় বাঁধা থাকে। বলদের চোখ-দুইটি এমনভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হয় যে, সে কেবল সম্মুখের দিকে তাকাইতে পারে; সুতরাং খড়টুকুর নাগাল পাইবার জন্য সে আপন গলদেশ বাড়াইয়া দেয়, এইরূপ করিতে গিয়া সে কাষ্ঠখণ্ডটিকেই খানিকটা সরাইয়া দেয়। সে আবার চেষ্টা করে, কিন্তু ফল হয় একই! এই ভাবে বার বার চেষ্টা চলিতে থাকে। বলদটি কখনই খড়ের নাগাল পায় না, কিন্তু ইহা পাইবার আশায় বার বার ঘুরিয়া যায় এবং এইভাবেই সে তৈলবীজ পেষণ করে। তুমি ও আমি প্রকৃতির দাসরূপে, সম্পদের দাসরূপে, স্ত্রীপুত্র-পরিজনের দাসরূপে জন্মিয়াছি; এবং আমরা এইভাবেই একটি কল্পিত অবাস্তব তৃণগুচ্ছের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া অসংখ্য জীবন অতিক্রম করিতেছি, অথচ যাহা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তাহা পাই না। ভালবাসাই আমাদের মহান্ স্বপ্ন; আমরা সকলেই ভালবাসিবার জন্য এবং ভালবাসা পাইবার জন্য চলিয়াছি; আমরা সকলেই সুখী হইবার জন্য চলিতেছি, কখনই দুঃখের সম্মুখীন হই না; কিন্তু যতই আমরা সুখের দিকে অগ্রসর হই, সুখ ততই আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। এইভাবেই জগৎ চলিয়াছে, সমাজ চলিয়াছে। আমরা অজ্ঞানান্ধ, বিষয়ের দাস; অজ্ঞাতসারেই আমাদিগকে বিষয়াসক্তির মূল্য দিতে হয়। তোমরা নিজেদের জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ কর, দেখিবে তাহাতে সুখের মাত্রা কত অল্প এবং জগৎ-প্রপঞ্চের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বাস্তবিক পক্ষে কত অল্পই লাভ করিয়াছ।

সোলন ও ক্রিসাসের (Solon and Crœsus) কথা তোমাদের মনে আছে তো? রাজা সেই মহান্ জ্ঞানী-পুরুষকে বলিলেন, 'এশিয়া-মাইনর খুব সুখের স্থান।' সোলন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সবচেয়ে সুখী কে? বিশেষ সুখী একটি লোকও তো আমি দেখি নাই।' ক্রিসাস বলিলেন, 'ইহা একেবারে বাজে কথা! জগতে আমিই সর্বাপেক্ষা সুখী।' সোলন তখন বলিলেন, 'মহাশয়, আপনার জীবনের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন; হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত করিবেন না।' এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কালক্রমে সেই নৃপতি পারসীকদের হস্তে পরাজিত হন এবং তাহারা জীবন্ত অবস্থায় তাঁহাকে পোড়াইয়া ফেলিবার নির্দেশ দিল। চিতা প্রস্তুত; ক্রিসাস ইহা দেখিবামাত্র চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, 'সোলন! সোলন!!' তাহারা

জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কাহার কথা বলিতেছেন?' উত্তরে তিনি সোলনের বিষয়টি বিবৃত করিলেন। পারস্য-সম্রাটের মনে লাগিল; তিনি ক্রিসাসের জীবন রক্ষা করিলেন।

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনকাহিনী এইরূপ। আমাদের উপর প্রকৃতির এইরূপই প্রবল প্রভাব। ইহা বার বার পদাঘাত করিয়া আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, তবু আমরা অদম্য উত্তেজনা-বশে ইহাকেই অনুসরণ করিতেছি। নৈরাশ্যের পর নৈরাশ্য সত্ত্বেও আমরা সর্বদা অন্তরে আশা পোষণ করিতেছি। এই কুহকিনী আশা আমাদিগকে পাগল করিয়া তোলে; আমরা সর্বক্ষণ সুখের আশা করিতেছি।

প্রাচীন ভারতে একজন মহান্ নৃপতি ছিলেন। তাঁহাকে একদিন চারিটি প্রশ্ন করা হয়; ইহাদের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল: 'জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু কি?' তিনি উত্তরে বলেন, 'আশা'। সত্য, ইহাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক বস্তু। দিবারাত্র আমরা দেখিতে পাই, আমাদের চারিদিকে মানুষ মরিতেছে; তথাপি আমরা মনে কবি, আমরা মরিব না। আমরা কখনও মনে করি না যে, আমরা মরিব অথবা দুঃখকষ্ট পাইব। প্রত্যেকেই মনে করে, সে জীবনে সাফল্য লাভ করিবেই—সর্বপ্রকার নৈরাশ্য, বিপর্যয় ও তর্ক-যুক্তি উপেক্ষা করিয়াও সে অন্তরে আশা পোষণ করে। এ জগতে কেহই যথার্থ সুখী নয়। ধর, কোন ব্যক্তি ধনবান্, তাহার প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে; কিন্তু তাহার পরিপাক-শক্তির গোলমাল থাকিলে সে খাইতে পারে না। আর একজনের ভাল পরিপাক-শক্তি আছে, এবং সে সামুদ্রিক পক্ষী 'করমোর‍্যাণ্ট' (Cormorant)-এর মতো হজম করিতে পারে, কিন্তু মুখে দিবার মতো কোন খাদ্যই তাহার নাই। কেহ আবার ধনী, কিন্তু নিঃসন্তান। কেহ আবার দরিদ্র—ক্ষুধায় কাতর, কিন্তু তাহার একপাল ছেলেমেয়ে, তাহাদের লইয়া কি যে করিবে, সে বুঝিতে পারে না। এইরূপ হয় কেন? সুখ ও দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। যে সুখকে গ্রহণ করে, তাহাকে দুঃখও গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের সকলের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, আমরা দুঃখকে বাদ দিয়া সুখ লাভ করিতে পারি। এই ধারণা আমাদিগকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে যে, আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয়-গুলিকে সংযত করিতে পারি না।

আমি যখন বস্টনে ছিলাম, একজন যুবক আমার কাছে আসে। সে আমাকে একটুকরা কাগজ দিল; ইহার উপর সে একটি নাম ও ঠিকানা লিখিল। নীচে লেখা ছিল: 'যদি পাইবার উপায় তোমার জানা থাকে, তবে জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য ও সুখ তোমারই। আমার কাছে আসিলে বলিয়া দিব, কি ভাবে তাহা লাভ করা যায়। ইহার জন্য পাঁচ ডলার দিতে হইবে।' সে আমাকে কাগজখানি দিয়া বলিল, 'এ-সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?' আমি বলিলাম, 'ইহা ছাপিবার জন্য তুমি অর্থের ব্যবস্থা কর না কেন? ইহা ছাপিবার জন্যও তোমার যথেষ্ট অর্থ নাই।' সে আমার কথা বুঝিতে পারিল না। কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার না করিয়া সে প্রচুর সুখ ও অর্থ লাভ করিতে পারিবে—এই ধারণায় সে ছিল মশগুল। মানুষ দুইটি চরম সীমার দিকে ছুটিতেছে: একটি চূড়ান্ত শুভবাদ—যাহাতে সবকিছুই শুভ, সুন্দর ও গোলাপী বলিয়া মনে হয়। অপরটি চূড়ান্ত দুঃখবাদ—যাহাতে সবকিছুই তাহার নিকট বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়। অধিকাংশ লোকের মস্তিষ্ক কমবেশী অপরিণত। দশ লক্ষের মধ্যে একজনের মস্তিষ্ক সুপরিণত দেখা যায়। বাকী যাহারা, তাহারা—হয় অদ্ভুত খেয়ালী অথবা বাতিকগ্রস্ত।

স্বভাবতই আমরা সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত সীমার দিকে ধাবিত হই। যখন আমরা সুস্থ থাকি ও আমাদের বয়স অল্প, তখন আমরা মনে করি—জগতের সমস্ত ধন আমাদের করায়ত্ত হইবে; কিন্তু পরে বয়স বাড়িলে সমাজ যখন আমাদিগকে ফুটবলের মতো চারিদিকে আঘাতে জর্জরিত করে, তখন এক কোণে বসিয়া বিরক্তির অস্ফুট শব্দ উচ্চারণপূর্বক আমরা অপরকে নিরুৎসাহ করিয়া দিই। অল্প লোকেই জানে যে, সুখের সঙ্গে দুঃখ আসে, এবং দুঃখের সঙ্গে আসে সুখ। দুঃখ যেমন বিরক্তিকর, সুখও তাই; সুখ দুঃখের যমজ ভ্রাতা। মানুষ দুঃখের পশ্চাতে ছুটিবে—ইহা তাহার মর্যাদার পক্ষে হানিকর, আবার সে সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইবে—ইহাও সমভাবে অসম্মানজনক। যাহাদের বিচারবুদ্ধি সাম্যে স্থিত, তাহারা উভয়কেই পরিত্যাগ করিবে। মানুষ যাহাতে অপরের দ্বারা যন্ত্রবৎ চালিত না হয়, সেই চেষ্টা করিবে না কেন? এইমাত্র আমাদের চাবুক মারা হইল; যখনই কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম, প্রকৃতি আমাদের একটি ডলার দিয়া দিল। আবার চাবুক খাইলাম,

আবার কাঁদিতে লাগিলাম—প্রকৃতি তখন আমাদিগকে একখণ্ড পিষ্টক দিল; সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমরা হাসিতে লাগিলাম।

জ্ঞানের সাধক চান মুক্তি। তিনি দেখেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি সব অসার, এবং সুখ-দুঃখের অন্ত নাই। জগতে কত ধনীই না নূতন নূতন সুখ লাভ করিতে চায়! সব সুখই পুরাতন হইয়া গিয়াছে; এখন তাহারা মুহূর্তের স্নায়বিক উত্তেজনার জন্য নূতন সুখ চায়। দেখিতে পাইতেছ না—প্রতিদিন তাহারা কতই হাস্যাস্পদ বস্তু আবিষ্কার করিতেছে? তারপর লক্ষ্য করিয়াছ, ইহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া আসে? অধিকাংশ লোক মেষপালের মতো। দলের প্রথমটি নর্দমায় পড়িলে বাকী সবগুলি তাহাকে অনুসরণ করিয়া বিপন্ন হয়। ঠিক এই ভাবেই সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাহা করে, অন্য সকলে নিজেদের কাজের পরিণাম না ভাবিয়াই তাহা করিতে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি পার্থিব বস্তুর অসারতা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, সে অনুভব করে, এইভাবে তাহার পক্ষে প্রকৃতির ক্রীড়নক হওয়া অথবা প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়; ইহা দাসত্ব। কোন ব্যক্তিকে কয়েকটি মধুর কথা বলিলে সে তৃপ্তির হাসি হাসিতে থাকে; কিন্তু কয়েকটি কর্কশ কথা শুনিলে সে কাঁদিতে থাকে। সে এক মুঠা অন্ন, একটু শ্বাস-প্রশ্বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, দেশপ্রেম, দেশ, নাম ও যশের দাস। এই ভাবে সে দাসত্বের মধ্যে বাস করে এবং দাসত্ব-হেতু তাহার প্রকৃত স্বরূপ চাপা পড়িয়া যায়। তুমি যাহাকে মানুষ বলো, সে একটি ক্রীতদাস। এই সব দাসত্ব মর্মে মর্মে অনুভব করিলেই মুক্ত হইবার ইচ্ছা জাগে, মুক্তির একটি উদগ্র বাসনা আসে। একখণ্ড জলন্ত কয়লা একজনের মাথায় স্থাপিত হইলে ইহা দূরে ফেলিয়া দিবার জন্য সে কিরূপ চেষ্টা করে! যে-ব্যক্তি সত্য সত্যই বুঝিতে পারে যে, সে প্রকৃতির ক্রীতদাস—তাহার মুক্তির সংগ্রামও এইরূপ হইবে।

আমরা এইমাত্র দেখিলাম—মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা কি। সাধনার পরবর্তী সোপানটিও খুব শক্ত। ইহা হইল—নিত্যানিত্য-বিবেক অর্থাৎ সত্য ও অসত্য, নিত্য ও অনিত্যের বিচার। কেবল ঈশ্বরই নিত্য, আর সব কিছুই অনিত্য। সব কিছুই মরে—দেবদূত, মানুষ, জীবজন্তু সব মরে, পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারকা সব ধ্বংস হইয়া যায়। প্রতিটি বস্তু প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। অন্ধকার

পর্বতগুলি অতীতে মহাসাগর ছিল ; আগামী কাল তাহারা মহাসাগরে পরিণত হইবে। প্রত্যেক বস্তুই প্রবাহাকারে চলিতেছে। সমগ্র বিশ্বই পরিবর্তনের একটি পিণ্ড। কিন্তু এক অপরিণামী বস্তু আছেন, তিনিই ঈশ্বর। আমরা যতই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই, পরিবর্তন আমাদের তত কম হইবে, প্রকৃতি তত কম আমাদের উপর ক্রিয়া করিবে। আমরা যখন তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিব, তাঁহার সঙ্গে একত্ব অনুভব করিব, তখনই আমরা প্রকৃতিকে জয় করিব, জগৎপ্রপঞ্চের উপর প্রভুত্ব করিব ; আর আমাদের উপর তাহাদের কোন প্রভাব থাকিবে না।

দেখিতে পাইতেছ, যদি সত্য সত্যই আমরা উপরি-উক্ত শমদমাদি সাধনে প্রতিষ্ঠিত হই, তাহা হইলে আমাদের অন্য কিছুর প্রয়োজনই হয় না। সমস্ত জ্ঞান আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। আত্মার মধ্যে সমস্ত পূর্ণতা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে ; কিন্তু এই পূর্ণতা প্রকৃতি দ্বারা আবৃত। প্রকৃতি আপন এক একটি স্তরে আত্মার এই শুদ্ধ রূপকে আবৃত করিতেছে। এই অবস্থায় আমাদের কি করিতে হইবে ? প্রকৃতপক্ষে আমরা মোটেই আত্মার উৎকর্ষ সাধন করি না। কোন অপূর্ণ বস্তু কি পূর্ণ বস্তুর উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে ? আমরা শুধু আবরণটিকে সরাইয়া লই। তখন আত্মা নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপে প্রকাশিত হন।

এখন প্রশ্ন : এইসব সাধনের এত প্রয়োজন কি ? কারণ আধ্যাত্মিকতা কর্ণ বা চক্ষু বা মস্তিষ্ক দ্বারা লাভ করা যায় না। শাস্ত্রপাঠেও আধ্যাত্মিকতা লাভ করা যায় না। জগতে যত গ্রন্থ আছে, সবই আমরা পড়িয়া ফেলিতে পারি, তবু ধর্ম বা ঈশ্বর-বিষয়ে কিছুই জানিতে না পারি। সমগ্র জীবন আমরা ধর্মের কথা বলিতে পারি ; তাহাতেও আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি নাও হইতে পারে। আমরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনীষা হইতে পারি, তথাপি একেবারেই ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিতে না পারি। পক্ষান্তরে অত্যধিক বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের ফলে কিরূপ অধ্যাত্মবিমুখ অধার্মিক সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কি তোমরা দেখিতে পাও না ? ইহা তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি দোষ যে, তোমরা কেবল বুদ্ধির উন্মেষকারী শিক্ষার পশ্চাতে ধাবিত ; হৃদয়বৃত্তির দিকে তোমরা দৃষ্টি দাও না। বুদ্ধিবৃত্তি শুধু মানুষকে দশগুণ অধিক স্বার্থপর করিয়া তোলে ; ইহাই তোমাদের ধ্বংসের কারণ হইবে। হৃদয় ও

মস্তিষ্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে হৃদয়কেই মানিবে, কেন না মস্তিষ্কের একটি মাত্র বৃত্তি—বিতর্ক; ইহার মধ্যেই মস্তিষ্ক কাজ করে, ইহার বাহিরে যাইতে পারে না। হৃদয় মানুষকে উচ্চতম স্তরে লইয়া যায়; মস্তিষ্ক কখনও সেই স্তরে পৌঁছিতে পারে না। ইহা বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া বোধির স্তরে উপনীত হয়। বুদ্ধি কখনও প্রেরণাবোধ সৃষ্টি করিতে পারে না। কেবল হৃদয় যখন প্রজ্ঞালোকে আলোকিত হয়, তখনই উহা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। হৃদয়হীন বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষ কখনও প্রেরণা লাভ করিতে পারে না। প্রেমিক পুরুষের মধ্যেই হৃদয়ের বাণী শোনা যায়। বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয় উন্নততর যন্ত্র আবিষ্কার করে—সেই যন্ত্র হইল অনুপ্রেরণার যন্ত্র। বুদ্ধি যেমন জ্ঞানের যন্ত্র, হৃদয় তেমনি প্রেরণার যন্ত্র। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্তরে ইহা বুদ্ধি অপেক্ষা অনেকটা দুর্বল। জ্ঞানহীন ব্যক্তি কিছুই জানে না, কিন্তু তাহার প্রকৃতি কিছুটা আবেগপ্রবণ। তাহাকে একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সহিত তুলনা কর—অধ্যাপকটির কি অদ্ভুত ক্ষমতা! কিন্তু তিনি তাঁহার বুদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ; এবং একই সময়ে তিনি একটি শয়তান ও প্রখরবুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন লোক হইতে পারেন, কিন্তু হৃদয়বান্ ব্যক্তি কখনও শয়তান হইতে পারে না। আবেগে পূর্ণ কোন ব্যক্তি কখনও শয়তান হয় না। ঠিক ঠিক অনুশীলন করিলে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন হয় এবং ইহা বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া অনুপ্রেরণায় রূপান্তরিত হইবে। সর্বশেষে মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি অতিক্রম করিতে হইবে। মানুষের জ্ঞান, যুক্তি, অনুভব, বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির শক্তি—এ সবই জগদ্রূপ দুগ্ধমন্থনে ব্যস্ত। দীর্ঘকালব্যাপী মন্থনের পর আসে মাখন; এবং ঈশ্বরই সেই মাখন। যাঁহারা হৃদয়বান্ তাঁহারা ঐ মাখনই লাভ করেন এবং বুদ্ধিজীবীর জন্য পড়িয়া থাকে শুধু ঘোল বা মাখন-তোলা দুধ।

এগুলিই হৃদয়ের প্রস্তুতি—সেই প্রেম, হৃদয়ের সেই গভীর সহানুভূতির প্রস্তুতি। ভগবানের নিকট পৌঁছিবার জন্য শিক্ষিত অথবা পণ্ডিত হইবার একেবারেই প্রয়োজন নাই। জনৈক মহাপুরুষ একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, 'অপরকে বধ করিবার জন্য ঢাল-তরবারির প্রয়োজন, কিন্তু নিজেকে বধ করিবার জন্য একটি সূচই যথেষ্ট। সুতরাং অপরকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রচুর বুদ্ধি ও জ্ঞানের যতটুকু প্রয়োজন, তোমার আত্মবিকাশের জন্য ততটা নয়।'

কি পবিত্র? তুমি যদি পবিত্র হও, তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের নিকট

পৌঁছিবে। 'যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাহারা ধন্য ; কেন না তাহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবে।'[১] তুমি যদি পবিত্র না হও, অথচ সকল বিজ্ঞান তোমার অধিগত হয়, তাহা হইলে তাহা মোটেই তোমার সহায়ক হইবে না। যে-সকল গ্রন্থ তুমি পড, তাহাতে ডুবিয়া থাকিতে পারো ; কিন্তু তাহা তোমার বিশেষ কাজে লাগিবে না। হৃদয়ই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। হৃদয়ের পথ অনুসরণ কর। পবিত্র হৃদয়ের দৃষ্টি বুদ্ধির বাহিরে প্রসারিত। ইহা একটি বিশেষ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয় ; যে-সকল বিষয় কখনও বুদ্ধিবৃত্তির গম্য নয়, তাহা এই হৃদয় উপলব্ধি করে। যখনই নির্মল হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন সর্বাবস্থাতেই নির্মল হৃদয়ের পক্ষ অবলম্বন করিবে, যদিও তুমি মনে কর, হৃদয় যাহা করিতেছে তাহা অযৌক্তিক। যখন তোমার হৃদয় অপরের উপকার করিতে ইচ্ছুক, তখন তোমার বুদ্ধিবৃত্তি হয়তো তোমাকে বলিবে, এইরূপ করা সুবিবেচনার পরিচায়ক নয় ; এই অবস্থায় কিন্তু হৃদয়কেই মানিয়া চলিবে। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, বুদ্ধিকে অনুসরণ করিয়া তোমার যতটুকু ভ্রান্তি হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভ্রান্তির পরিমাণ তোমার অল্পই হইতেছে। শ্রেষ্ঠ দর্পণরূপ পবিত্র হৃদয়ে সত্য প্রতিফলিত হয়, সুতরাং এই সকল যমনিয়মাদির অভ্যাস হৃদয়ের পবিত্রতা সম্পাদনের জন্যই। যখনই চিত্ত শুদ্ধ হয়, মুহূর্তের মধ্যেই সকল তত্ত্ব, সকল সত্য আপন ভাস্বর মহিমায় প্রকাশিত হয়। তুমি যদি যথেষ্ট পরিমাণে পবিত্রহৃদয় হও, তাহা হইলে বিশ্বের সর্ববিধ সত্য তোমার অন্তরে প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা কখনও দূরবীক্ষণযন্ত্র, অণুবীক্ষণযন্ত্র অথবা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার দেখেন নাই, তাঁহারাই যুগ-যুগান্ত পূর্বে পরমাণু সম্বন্ধে, অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে এবং মানুষের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্বন্ধে মহাসত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই-সকল বিষয় কিরূপে জানিয়াছিলেন? হৃদয়বৃত্তির সাহায্যেই জানিয়াছিলেন। তাঁহারা হৃদয়কে নির্মল করিয়াছিলেন। বর্তমানেও আমরা ইহা করিতে পারি—পথ আমাদের জন্য প্রশস্তই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন নয়, হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনই বিশ্বের দুঃখ-দৈন্য হ্রাস করিতে পারে।

---

১ Sermon on the Mount, St. Matt. V. 8.

বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা শত শত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে; ফল দাঁড়াইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় লোক বহু লোককে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে। এই টুকুই উপকার হইয়াছে! অগণিত কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে; আর অর্থ থাকুক বা না থাকুক, প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তি সেই-সকল অভাব পরিতৃপ্ত করিতে চায়। না পারিলেও সে সংগ্রাম করিতে থাকে; পরিশেষে সংগ্রামের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। এই তো পরিণতি! স্বতরাং জীবনের দুঃখদৈন্যের সমস্যা-সমাধান বুদ্ধির পথে সম্ভব নয়; হৃদয়ের মধ্য দিয়াই তাহা সম্ভব। যদি এই-সব প্রভূত চেষ্টা মানুষকে আরও পবিত্র শান্ত সহনশীল করিতে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে এই বিশ্বের সুখ বর্তমানের সুখ অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী হইত। তাই বলি, সর্বদা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন কর। হৃদয়ের মধ্য দিয়াই ঈশ্বর কথা বলেন; বুদ্ধিবৃত্তির মধ্য দিয়া তুমি কথা বলিয়া থাকো।

তোমাদের মনে আছে, ওল্ড টেস্টামেণ্টে (Old Testament) মুশাকে বলা হইয়াছিল, 'তোমার পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেলো, কারণ যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভূমি।' ঐরূপ সশ্রদ্ধ মনোভাব লইয়া আমাদিগকে সর্বদা ধর্মানুশীলনে অগ্রসর হইতে হইবে। যে-ব্যক্তি পবিত্র হৃদয় ও শ্রদ্ধালু মনোভাব লইয়া আসেন, তাঁহার হৃদয় খুলিয়া যাইবে; অনুভূতির দ্বার তাঁহার জন্য উদ্ঘাটিত হইবে এবং তিনি সত্যদর্শন করিবেন।

যদি শুধু বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া উপস্থিত হও, তোমার কিছুটা বুদ্ধিবৃত্তিরই অনুশীলন হইবে, কিছুটা তাত্ত্বিক বিচার হইবে, কিন্তু সত্যে উপনীত হইবে না। সত্যের এমন একটি রূপ আছে যে, যে তাহা দেখিতে পায়, সে দৃঢ়প্রত্যয় হইয়া যায়। সূর্যকে দেখাইবার জন্য কোন আলোক-বর্তিকার প্রয়োজন হয় না; সূর্য স্বয়ম্প্রকাশ। সত্যের যদি প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই প্রমাণকে কে প্রমাণিত করিবে? সত্যের সাক্ষিরূপে যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে সেই সাক্ষীর আবার সাক্ষী কোথায়? আমাদিগকে শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত ধর্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের হৃদয় জাগরিত হইয়া বলিবে, 'ইহা সত্য, এবং ইহা অসত্য।'

ধর্মের ক্ষেত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত, এমন কি আমাদের চেতনারও ঊর্ধ্বে। আমরা ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি না। কেহই চক্ষুর দ্বারা ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, কখনও দর্শন করিবেন না। কাহারও

চেতনার মধ্যে ঈশ্বর নাই। আমি ঈশ্বর-সচেতন নই, তুমিও নও, কেহই নয়। ঈশ্বর কোথায়? ধর্মের ক্ষেত্র কোথায়? ইহা ইন্দ্রিয়ের অতীত, ইহা চেতনার ঊর্ধ্বে। আমরা যে-সকল অগণিত স্তরে কাজ করিয়া থাকি, চেতনা শুধু তাহাদের অন্যতম। তোমাকে চেতনার ক্ষেত্র অতিক্রম করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে যাইতে হইবে; তোমাকে নিজ কেন্দ্রের—স্বরূপের নিকট হইতে নিকটতর ভূমিতে উপনীত হইতে হইবে। আর যতই তুমি এইরূপ করিতে থাকিবে, ততই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কি?—প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার। এই প্রাচীরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ—ইহা আমি প্রত্যক্ষ করি। সহস্র সহস্র ব্যক্তি এইভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন এবং যাঁহারাই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেরই নিকট তিনি প্রত্যক্ষ হইবেন। কিন্তু এই অনুভূতি মোটেই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি নয়। ইহা অতীন্দ্রিয়—অতিচেতন। সুতরাং নিজেদের অতীন্দ্রিয়-লোকে উন্নীত করিবার জন্য এইসব যমনিয়মাদির অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সর্বপ্রকার অতীত কর্ম এবং বন্ধন আমাদিগকে নিম্নে টানিয়া লইতেছে। এই-সকল প্রস্তুতি আমাদিগকে পবিত্র ও বন্ধনমুক্ত করিবে। বন্ধনগুলি আপনা হইতেই ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং যে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের স্তরে আমরা বদ্ধ হইয়া আছি, তাহার ঊর্ধ্বে উন্নীত হইব। তখনই আমরা এমন সব বস্তু দেখিব শুনিব এবং অনুভব করিব, যাহা মানুষ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ তিনটি সাধারণ স্তরে দেখে না, শোনে না বা অনুভব করে না। তখন আমরা যেন একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলিব। লোকে আমাদের ভাষা বুঝিতে পারিবে না; কারণ তাহারা তো ইন্দ্রিয়ের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু জানে না। যথার্থ ধর্ম সম্পূর্ণভাবে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের। জগতের প্রত্যেক প্রাণীর ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিক্রম করিবার সহজাত শক্তি রহিয়াছে। ক্ষুদ্র কীট পর্যন্ত একদিন ইন্দ্রিয়গুলি অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইবে। কোন জীবনই ব্যর্থ হইবে না; জগতে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। শতবার মানুষ নিজেকে আঘাত করিবে; সহস্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্তু পরিণামে নিজে অনুভব করিবে, সে ঈশ্বর। আমরা জানি, সোজাসুজি কোন অগ্রগতি হয় না। প্রত্যেক জীবাত্মা যেন বৃত্তাকারে চলিতেছে; তাহাকে এই বৃত্ত পূর্ণ করিতে হইবে। কোন জীবাত্মাই চিরতরে নিম্নগামী হইতে পারে না;

এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহাকে উর্ধ্বগামী হইতেই হইবে। কাহারও বিনাশ নাই। আমরা সকলেই একটি সাধারণ কেন্দ্র হইতে অভিক্ষিপ্ত; এই কেন্দ্রই ঈশ্বর। ঈশ্বর যে-সকল জীব সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহারা উচ্চতমই হউক বা নীচতমই হউক—সকলেই সর্ব জীবনের জনক ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া আসিবে। 'যাঁহা হইতে সকল প্রাণী জাত, যাঁহাতে সকলে অবস্থিত এবং যাঁহার নিকট সকলেই প্রত্যাবৃত্ত হয়, তিনিই ঈশ্বর।'[১]

জ্ঞানযোগ-প্রবেশিকা

ইহাই (জ্ঞানযোগই) যোগশাস্ত্রের দার্শনিক ও যুক্তিসম্মত দিক। যোগশাস্ত্রের এই অংশটি খুবই কঠিন; আমি ধীরে ধীরে তোমাদিগকে ইহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিব।

যোগের অর্থ মানুষ ও ঈশ্বরকে যুক্ত করার পদ্ধতি। এই বিষয়টি বুঝিলে মানুষ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমরা তোমাদের নিজ নিজ সংজ্ঞা অনুযায়ী চিন্তা করিতে পারিবে এবং তোমরা দেখিতে পাইবে যে, তোমাদের প্রতিটি সংজ্ঞার সঙ্গে যোগ কথাটি খাপ খায়। সর্বদা মনে রাখিও বিভিন্ন মানসিক গঠন অনুযায়ী যোগও বিভিন্ন প্রকারের, ইহাদের একটি না হইলে অন্যটি হয়তো তোমার উপযোগী হইতে পারে। সব ধর্মের দুইটি ভাগ—তত্ত্ব ও সাধন। পাশ্চাত্যেরা তত্ত্বের দিকটিই অনুসরণ করে, এবং সাধন অর্থে শুধু সৎ কার্য করাই বুঝিয়া থাকে। ধর্মের ব্যাবহারিক দিক বা সাধন-অঙ্গই যোগ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবল সৎকাজ করা বাদ দিলেও ধর্ম একটি কার্যকরী শক্তি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মানুষ যুক্তির মধ্য দিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার ফলে 'ঈশ্বরবাদ' (Deism)-এর উৎপত্তি। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু অনুভবসিদ্ধ নয় বলিয়া মনে করা

১ তৈত্তি. উপ., ৩।১

হয়। এই মতবাদ প্রবর্তনের ফলে ধর্মের যে-টুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ডারুইন ও মিলের মতবাদ দ্বারা ধ্বংস হইল। ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক ধর্ম তখন মানুষের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল, প্রাকৃতিক শক্তির পূজা হইতেই ধর্মের উদ্ভব। সূর্য-উপাখ্যান প্রভৃতি সম্পর্কে ম্যাক্সমূলারের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। অন্যদলের সিদ্ধান্ত হইল, পিতৃপুরুষের পূজা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে; এ বিষয়ে হার্বার্ট স্পেন্সার দ্রষ্টব্য। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এই-সকল মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, কোন বহিরঙ্গ পন্থা অবলম্বন করিয়া মানুষ সত্য লাভ করিতে পারে না।

'এক টুকরা মাটি সম্বন্ধে জ্ঞান হইলে সমস্ত মাটি সম্বন্ধেই জ্ঞান হয়।' সমগ্র বিশ্ব-জগৎও ঠিক একই পরিকল্পনা অনুসারে রচিত। মানুষ মৃত্তিকা-খণ্ডের মতো। আমরা যদি অণুস্বরূপ একটি মানবাত্মাকে জানিতে পারি, যদি তাহার সূচনা ও সাধারণ ইতিহাস জানিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র প্রকৃতিকেই জানা হইল। জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ, ক্ষয় ও মৃত্যু—সমগ্র প্রকৃতিতে এই একই অনুক্রম; উদ্ভিদ্-জগৎ এবং মানুষের বেলায়ও সেই একই কথা। প্রভেদ শুধু কালে। একটি ক্ষেত্রে সমস্ত কল্পটি একদিনে সম্পূর্ণ হইতে পারে, আবার অন্য ক্ষেত্রে সত্তর বৎসর লাগিতে পারে; পদ্ধতিগুলি এক। বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি সঠিক বিশ্লেষণে উপনীত হইবার একমাত্র উপায়—আমাদের নিজ মনের বিশ্লেষণ। ধর্ম বুঝিবার জন্য মানব-মনের যথার্থ বিশ্লেষণ প্রয়োজন, শুধু যুক্তির সাহায্যে সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব, কারণ অসম্পূর্ণ যুক্তি নিজস্ব মূল ভিত্তিই অনুধাবন করিতে পারে না। অতএব মনকে জানিবার একমাত্র উপায় হইল প্রকৃত তথ্যে পৌঁছানো, তবেই বুদ্ধি সেগুলিকে সুসংবদ্ধ করিয়া মূলনীতিসমূহের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবে। বুদ্ধির কাজ নির্মাণ করা, কিন্তু ইট ছাড়া তো গৃহনির্মাণ সম্ভব নয়, আর বুদ্ধি নিজে 'ইট' তৈরি করিতে পারে না। প্রকৃত সত্যে উপনীত হইবার নিশ্চিত উপায় জ্ঞানযোগ।

প্রথমতঃ আমাদের মনের একটি গঠন-বিজ্ঞান আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়-সমূহ আছে; ইহারা কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইন্দ্রিয় অর্থে বাহ্য ইন্দ্রিয়-যন্ত্রকে বুঝাইতেছি না। মস্তিষ্কের দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রটিই দর্শনেন্দ্রিয়, চক্ষুটি নয়। এইরূপ প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের কাজ আভ্যন্তরীণ।

একমাত্র মনের প্রতিক্রিয়া ঘটিলেই বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য সংজ্ঞাবহ এবং ক্রিয়াবাহী উভয়প্রকার স্নায়ুই প্রয়োজন।

তারপর আছে মন স্বয়ং। ইহা একটি নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো; কোন কিছু, যেমন একটি প্রস্তরখণ্ড পড়িলেই উহাতে কম্পন শুরু হয়। সেই কম্পনগুলি একত্র হইয়া ঐ প্রস্তরখণ্ডে প্রতিহত হয় এবং সমস্ত হ্রদব্যাপী বিস্তৃত হইয়া অনুভূত হইতে থাকে। মন এই হ্রদের মতো, ইহাতে সর্বক্ষণ কম্পন চলিতে থাকে, এবং সেই কম্পন মনের উপর নানা রেখাপাত করে। আমাদের অহং-বোধ বা ব্যক্তিসত্তা বা আমি এইসব রেখাপাতেরই ফল। অতএব এই 'আমি' শক্তির একটি দ্রুত সঞ্চরণ মাত্র, ইহার নিজস্ব কোন বাস্তব সত্তা নাই।

মনের মূল উপাদান অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি জড়যন্ত্র মাত্র, প্রাণকে ধারণ করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন তাহার দেহেরই মৃত্যু ঘটে, কিন্তু সব কিছুই যখন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন মনের একটি ক্ষুদ্র অংশ বীজাকারে অবশিষ্ট থাকে। ইহাই নূতন দেহের বীজ-স্বরূপ, সেণ্ট পল ইহাকেই 'আত্মিক শরীর' (spiritual body) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মনের জড়ত্ব-সংক্রান্ত মতবাদটি আধুনিক সর্বপ্রকার মতবাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। নির্বোধের কোন বুদ্ধি নাই, কারণ তাহার মানস-উপাদান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জড়বস্তুর মধ্যে বুদ্ধি থাকিতে পারে না অথবা জড়বস্তুর কোন সমবায়ের দ্বারা বুদ্ধি সৃষ্টি করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে বুদ্ধি থাকে কোথায়? ইহা থাকে জড়ের অন্তরালে—ইহাই তো জীব, প্রকৃত সত্তা; জড়ের মাধ্যমে সেই তো কাজ করে। জড় ব্যতিরেকে শক্তির সঞ্চরণ সম্ভব নয়। যখন মৃত্যুর পর সমগ্র মনের কিয়দংশ ছাড়া সব কিছুই ধ্বংস হইয়া যায়, জীব একাকী ভ্রমণ করিতে পারে না বলিয়া মনের ঐ কিয়দংশ তাহার সঞ্চরণের মাধ্যমরূপে অবশিষ্ট থাকে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়? আমার বিপরীত দিকের দেওয়ালটি আমার উপর একটি ছাপ ফেলিতেছে, কিন্তু আমার মন সাড়া না দেওয়া পর্যন্ত আমি ঐ দেওয়ালটি দেখিতে পাইতেছি না। অর্থাৎ শুধু দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই মন দেওয়ালটিকে জানিতে পারে না। যে প্রক্রিয়ার ফলে মন ঐ দেওয়ালের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে, তাহা একটি বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া। এই ভাবে সমগ্র

বিশ্বজগৎকেই এবং আমাদের মনকেও আমরা আমাদের চক্ষু ও মন (বা মনন-শক্তি) দ্বারা দেখি, অবশ্য ইহাতে আমাদের নিজ নিজ প্রবণতার রঙ নিশ্চয়ই লাগে। প্রকৃত দেওয়ালটি অথবা প্রকৃত বিশ্ব মনের বাহিরেই অবস্থিত, ইহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। আমরা যদি বিশ্বজগৎকে 'ক' বলি, তবে আমাদের বক্তব্যটি দাঁড়াইবে এইরূপ : দৃশ্যমান জগৎ = ক + মন।

বহির্জগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। মনও নিজেকে জানিতে চায়, কিন্তু এই সত্তাকে জানিতে হইলে মনের মাধ্যমে জানিতে হইবে এবং ইহাও সেই দেওয়ালের মতো অজ্ঞাত। এই সত্তাকে যদি আমরা 'খ' বলিয়া ধরি, তবে আমাদের বক্তব্যটি দাঁড়াইবে : খ + মন = অন্তর্জগৎ। ক্যাণ্টই প্রথম মনের এই প্রকার বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেদে বহু পূর্বে ইহা বলা হইয়াছে। অতএব এখন এই দাঁড়াইয়াছে যে, মন 'ক এবং খ'-এর অন্তর্বর্তী হইয়া উভয়ের উপর প্রতিক্রিয়া করিতেছে।

'ক' যদি অজ্ঞাত হয়, তবে আমরা ইহার প্রতি যে-কোন গুণই আরোপ করি না কেন, সেগুলির সবই আমাদের মন হইতে উদ্ভূত। দেশ, কাল এবং কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার মাধ্যমে মনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইয়া থাকে। কাল ব্যতীত চিন্তার সঞ্চরণ এবং স্থান ব্যতীত স্থূলতর বিষয়ের কম্পন সম্ভব নয়। কার্য-কারণ শৃঙ্খলা হইতেছে একটি ক্রম, যাহার মধ্যে কম্পনগুলি আসিয়া একত্র হয়। এইগুলির মাধ্যমেই মন বিষয়ানুভূতি লাভ করে। অতএব যাহা কিছুই মনের অতীত, তাহাই দেশকাল ও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত।

অন্ধ ব্যক্তি স্পর্শ এবং শব্দের দ্বারা এই জগৎ অনুভব করিয়া থাকে। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অধিকারী আমাদের কাছে এই জগৎ অন্ধের জগৎ হইতে ভিন্ন। আমাদের মধ্যে যদি কেহ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ লক্ষ্য করিবার মতো শক্তি অর্জন করে, তড়িৎ-ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হয়, তবে তাহার নিকট জগৎ ভিন্ন রূপে প্রতীত হইবে। তথাপি এই পৃথিবী, যাহাকে 'ক' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা ইহাদের সকলের নিকটেই সমভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ মন লইয়া জগৎকে দেখিতেছে, জগৎও প্রত্যেকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইতেছে। মনুষ্য-জগতে দেখা যায়, কোথাও বা ক + ১টি ইন্দ্রিয়, কোথাও ক + ২টি ইন্দ্রিয় এবং এইভাবে ক + ৫টি ইন্দ্রিয় পর্যন্ত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যার তারতম্যের জন্য অনুভূতিও সর্বক্ষণই

জ্ঞানযোগ-কথা

স্বামীজীর এই আলোচনাগুলি আমেরিকার মিস এস ই ওয়াল্ডো নাম্নী তাঁহার শিষ্যা কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। স্বামী সারদানন্দ যখন আমেরিকায় ছিলেন (১৮৯৮), তখন উক্ত শিষ্যার নোটবুক হইতে তিনি এগুলি সংগ্রহ করেন। তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যেই এগুলি পাওয়া গিয়াছে।

১

ওঁ তৎ সৎ। ওঁকার তত্ত্ব জানাই জগৎ-রহস্য জানা। ভক্তিযোগ ও রাজ-যোগের মতো জ্ঞানযোগের লক্ষ্য একই, তবে সাধনপ্রণালী ভিন্ন। এই যোগ শক্তিমান্ সাধকদের জন্য, অষ্টাঙ্গিক যোগী বা ভক্তের জন্য নয়, যুক্তিনিষ্ঠের জন্য। শুদ্ধ প্রেম ও পরাভক্তি আশ্রয় করিয়া ভক্তিযোগী যেরূপ ভগবানের সহিত একত্ব লাভের পথে অগ্রসর হন, জ্ঞানযোগীও সেইরূপ শুদ্ধ বিচার-সহায়ে পরমাত্মা লাভের পথ করিয়া লন। প্রাচীন যুগের যাবতীয় মূর্তির কল্পনা, সব পুরাতন ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কার মন হইতে দূর করিবার জন্য তাঁহাকে দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে; ইহামুত্রফলভোগ-কামনা ত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য দৃঢ়সংকল্প হইতে হইবে। জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি আমাদের করতলগত হইবে না। স্বরূপ-উপলব্ধিই, আমরা যে জন্ম মৃত্যু ও ভীতির অতীত—এই উপলব্ধিই জ্ঞান। আত্মানুভূতিই পরম কল্যাণ—ইহা ইন্দ্রিয় ও চিন্তার অতীত অবস্থা। প্রকৃত 'আমি' ধারণাতীত। ইনি নিত্য জ্ঞাতা (eternal subject), কখনও জ্ঞানের বিষয় (object) হইতে পারেন না, কারণ জ্ঞান আপেক্ষিক বিষয় সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, নিরপেক্ষ পুরুষ সম্বন্ধে নয়। সমুদয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সীমাহীন কার্যকারণ শৃঙ্খলার পরম্পরা মাত্র। আমাদের এই জগৎ ব্যাবহারিক সত্তা—বাস্তবের ছায়া; তবুও সুখ দুঃখ এই স্তরে প্রায় ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে বলিয়া এই পৃথিবীই একমাত্র স্থান, যেখানে মানব আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

এই জগৎ প্রকৃতির বিবর্তন, ঈশ্বরের ব্যক্ত অবস্থা, মায়া বা আপাত-প্রতীয়মান জগৎপ্রপঞ্চের আবরণে দৃষ্ট ব্রহ্ম বা নিরুপাধিক পুরুষের মানবীয় জ্ঞানগম্য ব্যাখ্যা মাত্র। এ জগৎ শূন্য নয়, ইহার কিছুটা সত্তা আছে; ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই জগৎ প্রতীয়মান হয়।



আমেরিকায় স্বামীজী, ১৮৯৩



ওযেলেসলি চার্চ, সেলেম, ম্যাসাচুসেটস্

জ্ঞাতার জ্ঞান কি প্রকারে হইবে? বেদান্ত বলেন—আমরাই সেই জ্ঞাতা; ইনি জ্ঞানের বিষয়ভূত নন, তাই আমরা কখনও ইঁহাকে জানিতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞানও এই কথা বলিতেছে। ইঁহাকে জানা যায় না। তবুও কখন কখন আমরা ইঁহার অস্তিত্বের আভাস পাইয়া থাকি। যখনই একবার এই জগৎস্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, তখনই সেই অনুভূতি আমরা ফিরিয়া পাই। তখন আর জগৎ আমাদের চোখে সত্য নয়, আমরা জানিতে পারিব—ইহা মরীচিকা মাত্র। এই মায়া-মরীচিকার ওপারে যাওয়াই সকল ধর্মের লক্ষ্য। এই জীব ও ব্রহ্ম যে এক, সকল বেদ অহরহ এই কথা ঘোষণা করিতেছেন; কিন্তু অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া এই চরম সত্য উপলব্ধি করিবার অবস্থায় উপনীত হইতেছেন।

জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিকে সর্বপ্রথমে ভয় হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ভয়ই আমাদের অন্যতম প্রবল শত্রু। তারপর কোন বিষয় সম্যক্ অবগত না হইয়া বিশ্বাস করিও না। সর্বদা বলো—'আমি শরীর নই, মন নই, চিন্তা নই, চেতনাও নই, আমি আত্মা।' সব কিছু ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলে শেষে শুধু আত্মাই অবশিষ্ট থাকিবেন। জ্ঞানীর ধ্যান দুই প্রকার: (১) আমরা যাহা নই, সেই ভাব অস্বীকার করা, সেই ভাব মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া। (২) আমাদের প্রকৃত স্বরূপ 'আত্মা এক পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ—দৃঢ়তাসহ এই কথা বলা। যথার্থ বিচারমার্গী নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া বিচারের চরম সীমায় উপনীত হইবেন। পথে কোথাও থামিলে চলিবে না, 'নেতি'-বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিলে সব কিছুই দূর হইবে; অবশেষে যাহা অপরিহার্য, যাহা আর অস্বীকার করা যায় না, সেই প্রকৃত 'আমি' বা আত্মায় আমরা উপনীত হইব। এই 'আমি' জগতের সাক্ষী—অব্যয়, সনাতন, অসীম। অজ্ঞানের মেঘাবরণ স্তরে স্তরে এই আত্মাকে ঢাকিয়া রাখে, আমরা দেখিতে পাই না, আত্মা কিন্তু সর্বদা সমভাবে বিরাজমান।

দুইটি পাখি একই গাছের বিভিন্ন শাখায় উপবিষ্ট। উপরের শাখার পাখিটি ধীর স্থির মহিমময় সুশোভন ও পূর্ণস্বভাব। নিচের শাখার পাখিটি মিষ্টফল খাইয়া কখন হৃষ্ট, আবার তিক্তফল আস্বাদন করিয়া কখন বা বিষণ্ণ; এইরূপে সে শাখা হইতে শাখান্তরে বিচরণ করিতেছে। একদিন নিয়মিত আস্বাদিত ফল অপেক্ষা অতি তিক্ত একটি ফল ভক্ষণ করিয়া সে

উপরের শান্ত শোভাময় পাখিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চিন্তা করিল, 'হায় ! আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ঐ পাখির মতো হই।' তারপর কয়েক ধাপ উপরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। শীঘ্রই আবার ঐ পাখিটির মতো হইবার বাসনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া পুনরায় মিষ্ট ও তিক্ত ফলের আস্বাদনে তুষ্ট ও রুষ্ট মনোভাব লইয়া পূর্বের মতো বিচরণ করিতে লাগিল। আবার উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিল, আবার শান্ত স্নিগ্ধ মহিমামণ্ডিত উপরের পাখিটির দিকে কয়েক ধাপ অগ্রসর হইল। এইরূপ ব্যাপার বহুবার সংঘটিত হইলে অবশেষে উপরের পাখিটির সান্নিধ্য লাভ করিয়া সে দেখিল, উহার পক্ষজ্যোতি তাহার চোখ ধাঁধাইয়া তাহাকে আত্মভূত করিয়া ফেলিয়াছে। পরিশেষে দেখিতে পাইল, কি আশ্চর্য! কেবল একটি পাখিই সেখানে রহিয়াছে—সে নিজেও তো চিরকালই ঐ উপরের পাখি; তবে এই মাত্র এ সত্য সে বুঝিতে পারিল।

মানুষও ঐ নিম্নশাখাবিহারী পক্ষিতুল্য, কিন্তু সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার জন্য সচেষ্ট হইলে সেও বুঝিতে পারিবে, সেও সর্বদাই সেই আত্মা-রূপেই ছিল, আত্মা ছাড়া যাহা কিছু, সবই স্বপ্ন মাত্র। এই জড় ও জড়ের সত্যতায় বিশ্বাস হইতে নিজেদের একেবারে পৃথক্ করিয়া ফেলাই প্রকৃত জ্ঞান। ওঁ তৎ সৎ—'ওঁ'ই একমাত্র প্রকৃত সত্তা, জ্ঞানী সর্বদা ইহা মনে জাগরূক রাখিবেন। নিরপেক্ষ একত্বই জ্ঞানযোগের ভিত্তি। ইহা দ্বৈতভাব-শূন্য অদ্বৈতবাদ। ইহাই বেদান্তদর্শন-সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর, বেদান্তের আদি ও অন্ত। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, আর সব মিথ্যা। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—অহরহ এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে উহাকে আমাদের স্বভাবের অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিতে হইবে। কেবল এই উপায়েই সকল দ্বৈতভাব, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ অতিক্রম করিয়া এক অদ্বিতীয় সনাতন অব্যয় অসীম ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-রূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে আমরা সমর্থ হইব।

জ্ঞানযোগীকে সঙ্কীর্ণতম সাম্প্রদায়িকের মতো একাগ্র, আবার আকাশের মতো উদার হইতে হইবে; সম্পূর্ণভাবে চিত্ত সংযত করিয়া বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান হইবার সামর্থ্য অর্জন করিতে হইবে; আর স্বেচ্ছায় এইসব বিভিন্ন ধর্মভাবের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াও চিরন্তন সমন্বয়ের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিতে হইবে। নিয়ত অভ্যাস দ্বারাই এই সংযম অর্জিত হইতে পারে। এক হইতেই সকল বৈচিত্র্য উদ্ভূত, কিন্তু কর্মের সহিত আমরা যাহাতে

নিজেদের এক করিয়া না ফেলি, আমাদের সেই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। আর সম্মুখে উপস্থিত বস্তু ছাড়া অন্য বস্তু দেখিবার, শুনিবার বা আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি যেন আমাদের না থাকে। সমস্ত মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া আমাদিগকে একাগ্র হইতে হইবে। দিনরাত্রি নিজেকে বলো—'সোঽহং', সোঽহং'।

বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা শঙ্করাচার্য। তিনি অকাট্য যুক্তিসহায়ে বেদের সারসত্যগুলি সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব জ্ঞানশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, যাহা তাঁহার ভাষ্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয়। ব্রহ্মনির্দেশক পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যাবলী গ্রথিত করিয়া দেখাইয়াছেন, একমাত্র সেই নির্বিশেষ সত্তাই আছেন। আরও দেখাইয়াছেন, যেমন খাড়াই পথে অগ্রগতি ধীরে-ধীরেই সম্ভব, তেমনি মানসিক ধারণাশক্তির তারতম্য অনুসারে ব্রহ্মনির্দেশক বৈচিত্র্যও অতি আবশ্যক। খ্রীষ্ট তাঁহার শ্রোতাদের যোগ্যতা অনুসারে যে-উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কতকটা ইহারই অনুরূপ। প্রথমতঃ তিনি স্বর্গে আসীন ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানাইবার উপদেশ দেন। তারপর একধাপ উর্ধ্বে উঠিয়া বলেন, 'আমি দ্রাক্ষালতা; তোমরা শাখা প্রশাখা!' পরিশেষে চরম সত্য প্রচার করিয়া বলেন, 'আমি ও আমার পিতা এক', 'স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরেই অবস্থিত।' শঙ্করাচার্য শিক্ষা দেন: দেবতার শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ তিনটি—(১) মনুষ্যদেহ, (২) ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা এবং (৩) জ্ঞানের আলোক দিতে সমর্থ আচার্য। এই তিন বস্তু লাভ করিতে পারিলে মুক্তি আমাদের করতলগত। একমাত্র জ্ঞানই আমাদের মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ধর্মগুলি তিরোহিত হইবে।

এক অদ্বিতীয় সত্তাই জগতে বিদ্যমান, প্রত্যেক জীবই সেই পূর্ণ সত্তা, শুধু অংশ নয়—ইহাই বেদান্তের সারমর্ম। প্রতিটি শিশির-কণাতে সূর্য পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত। 'দেশ-কাল-নিমিত্ত'-আশ্রয়ে সেই সত্তাই মনুষ্যরূপে প্রকাশিত, কিন্তু দৃশ্যজগতের অন্তরালে এক চরম তত্ত্ব বিরাজমান। নিঃস্বার্থতার ভাব দৃঢ় হইলেই কাঁচা 'আমি' মন হইতে চলিয়া যায়। আমরা দেহ—এই দুঃখকর স্বপ্ন হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। 'আমি ব্রহ্ম'—এই সত্য জানিতে

হইবে। আমরা প্রত্যেকেই পূর্ণ অনন্ত মহাসমুদ্র; জলবিন্দু নই যে সাগরে মিশিয়া অস্তিত্ব হারাইব। মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই এই পূর্ণত্ব ও অসীমত্বের জ্ঞান লাভ করিব। অসীমকে ভাগ করা যায় না, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর দ্বিতীয় কিছুই নাই, সবই সেই এক ব্রহ্ম। এই জ্ঞান সকলেই লাভ করিবে, কিন্তু এই জীবনেই ঐ জ্ঞানলাভের জন্য আমাদিগকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ ঐ জ্ঞান লাভ না করিলে আমরা মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠ হিতসাধনে সমর্থ হইব না। জীবন্মুক্তই কেবল যথার্থ প্রেম ও প্রকৃত সত্য বিতরণ করিতে—যথার্থ দান করিতে সমর্থ; এবং সত্যই মুক্তি দিতে পারে। বাসনা আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করে। এই বাসনা এক অতৃপ্ত দানব; ইহার কবলে যাহারা পড়ে, তাহাদের শান্তি নাই; কিন্তু জীবন্মুক্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়া সব বাসনা জয় করিয়াছেন, তাঁহার কাম্য আর কিছুই নাই।

দেহ, স্ত্রী-পুরুষ-জ্ঞান, জাতি, বর্ণ, বন্ধন—এই সব মোহ মনই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে, সুতরাং সত্যের অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত মনকে অহরহ এই সত্য বলিতে হইবে: আমরা আনন্দস্বরূপ; যাহা কিছু সুখ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা এই আনন্দেরই আভাস; প্রকৃত স্বরূপের সংস্পর্শেই এই কণামাত্র সুখ আমরা লাভ করিয়া থাকি। সেই ব্রহ্ম সুখদুঃখের অতীত, তিনি জগতের সাক্ষিস্বরূপ, জীবনগ্রন্থের অপরিবর্তনীয় পাঠক; তাঁহার সম্মুখে জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি একে একে খুলিয়া যাইতেছে।

অভ্যাস হইতে যোগ, যোগ হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে প্রেম, প্রেম হইতে আনন্দের উৎপত্তি।

'আমি ও আমার' একটি কুসংস্কার; ইহার বেষ্টনে আমরা এত দীর্ঘকাল রহিয়াছি যে, ইহাকে ত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব। তবুও অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে হইলে এই কুসংস্কার ত্যাগ করিতেই হইবে। আমাদিগকে আনন্দময় ও প্রফুল্ল হইতে হইবে। অপ্রসন্ন মুখভাব লইয়া ধর্মলাভ হয় না। সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া যাবতীয় পার্থিব বস্তু অপেক্ষা ধর্ম অনেক বেশী আনন্দপ্রদ। কঠোর তপশ্চর্যা আমাদিগকে পবিত্র করিতে পারে না। ঈশ্বরপ্রেমিক ও পবিত্রাত্মা কেন বিষণ্ণ হইবেন? তিনি হইবেন আনন্দময় শিশুর মতো প্রকৃত ঈশ্বর-সন্তান। অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করাই ধর্মের সার; স্বর্গরাজ্য আমাদের অন্তরে, কিন্তু বিশুদ্ধাত্মাই সে রাজাধিরাজ-দর্শনের অধিকারী। জগতের চিন্তা করিলে

জগৎই থাকিয়া যায়; তিনিই জগৎরূপে প্রকাশিত—এই ভাবে চিন্তা করিলে আমরা ঈশ্বরকে লাভ করিব। পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রী, শত্রু-মিত্র, ব্যক্তি বা বস্তু—সকলের উপরেই এই ঈশ্বরভাব আরোপ করিতে হইবে। যদি আমরা জ্ঞানতঃ এই জগৎকে ঈশ্বরময় দেখি—তাঁহাকে ছাড়া আর কিছু অনুভব না করি, ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে এই জগৎ আমাদের চক্ষে কত পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হইবে—তখনই আমাদের সকল দুঃখ, সকল সংগ্রাম সকল যন্ত্রণার চিরতরে অবসান হইবে।

জ্ঞান সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে, তাই বলিয়া জ্ঞান ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়। জ্ঞানলাভ বলিতে বুঝায়, ধর্মমতের ঊর্ধ্বে এক উন্নত অবস্থা লাভ। জ্ঞানী ধ্বংস চান না, পরন্তু সকলকে সাহায্য করিতে চান। নদীর জল যেমন সাগরে মিশিয়া এক হইয়া যায়, যাবতীয় ধর্মও তেমনি জ্ঞানে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়।

সকল বস্তুর সত্তাই ব্রহ্মসাপেক্ষ। বাস্তবিকপক্ষে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেই বুঝিতে পারিব, যথার্থ সত্য আমরা কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছি। বৈষম্য-দৃষ্টি যখন সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যাইবে, তখনই বোধ হইবে—'আমি ও জগৎ-পিতা অভিন্ন'।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অতি সুন্দর জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। এই মহৎ কাব্যগ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যরত্নরাজির চূড়ামণিরূপে পরিগণিত। ইহা বেদের ভাষ্যস্বরূপ। গীতা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছেন, এই জীবনেই আধ্যাত্মিক সংগ্রামে আমাদিগকে জয়ী হইতে হইবে। সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া সবটুকু আধ্যাত্মিকতাই গ্রহণ করিতে হইবে। গীতা উচ্চতর জীবন-সংগ্রামের রূপক বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রই গীতা-বর্ণনার স্থলরূপে নির্দিষ্ট। ইহাতে অতি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিরুদ্ধ যুযুৎসুদলের অন্যতম নায়ক অর্জুনের সারথি-বেশে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিষণ্ণ না হইতে এবং মৃত্যুভয় ত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন; কারণ তিনি তো জানিতেন—তিনি অবিনাশী, আর পরিবর্তনশীল যাহা কিছু, সবই মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপের বিরোধী। অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অতি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন। এই-সকল উপদেশই গীতাকে পরমাশ্চর্য কাব্যগ্রন্থে পরিণত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বেদান্তদর্শনই গীতায় নিবদ্ধ। বেদের শিক্ষা এই যে, আত্মা

অবিনাশী, দেহের মৃত্যুতে আত্মা কোনরূপেই বিকৃত হন না। বৃত্তরূপ আত্মার পরিধি কোথাও নাই, কেন্দ্র জীবদেহে। তথাকথিত মৃত্যু এই কেন্দ্রের পরিবর্তন মাত্র। ঈশ্বর একটি বৃত্ত, এই বৃত্তের পরিধি কোথাও নাই, কিন্তু কেন্দ্র সর্বত্র। যখনই আমরা এই সঙ্কীর্ণ দেহরূপ কেন্দ্র হইতে বাহিরে যাইতে পারি, তখনই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—এই ঈশ্বর উপলব্ধ হন।

বর্তমানকাল অতীত ও ভবিষ্যতের সীমারেখা ভেদ-পরিচায়ক রেখামাত্র, সুতরাং অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে বর্তমানের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিয়া কেবল বর্তমানই গ্রাহ্য—এ-কথা নির্বিচারে বলিতে পারি না। এই তিন কালই একত্র মিলিয়া এক অখণ্ড সমষ্টি। সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, উহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতির তারতম্য অনুসারে আরোপিত একটি অবস্থা মাত্র।

৩

জ্ঞানের শিক্ষা এই যে, সংসার ছাড়িবে; কিন্তু তাই বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিবে না। সন্ন্যাসী সংসারে থাকিবেন বটে, কিন্তু সংসারের হইবেন না—তাঁহার সম্বন্ধে এটিই চরম পরীক্ষা। এইরূপ ত্যাগের ধারণা যে-কোন আকারেই হউক, সকল ধর্মেই স্থান পাইয়াছে। আমাদের নিকট জ্ঞানের দাবি এই যে, আমরা শুধু 'সমত্ব' দেখিব, সমদর্শী হইব। নিন্দা-স্তুতি, ভাল-মন্দ, এমন কি শীত-উষ্ণও তুল্যরূপে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতে এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁহাদের দ্বন্দ্বাতীত এই সাম্যভাব বর্ণে বর্ণে সত্য। সম্পূর্ণ অনাবৃতদেহ ও আপাততঃ একেবারে শীত-উষ্ণ বৈষম্য-বোধহীন অবস্থায় তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ হিমালয়-শৃঙ্গে অথবা উত্তপ্ত মরুভূমিতে তাঁহারা ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

আমরা 'দেহ নই'—দেহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার সর্বাগ্রে ত্যাগ করিতে হইবে। তারপর 'মন নই'—মনের সংস্কারও ছাড়িতে হইবে। আমরা মন নই; এই মন 'রেশমের মতো সূক্ষ্ম' শরীর মাত্র, আত্মার কোন অংশ নয়। প্রায় সকল পদার্থ সম্বন্ধে প্রযোজ্য এই '*body*' শব্দটি দ্বারা সব কিছুরই একটি সাধারণ নাম বুঝায়। ইহাই অস্তিত্ব। এই দেহ উহার অন্তরালে অবস্থিত চিন্তারই প্রতীক; আবার চিন্তাগুলি স্বয়ং পর্যায়ক্রমে দেহের পশ্চাতে অবস্থিত কোন

কিছুর প্রতীক। সেই কোন কিছুই পারমার্থিক সত্তা, আমাদের আত্মার আত্মা, বিশ্বাত্মা, প্রাণের প্রাণ, আমাদের যথার্থ স্বরূপ। যতদিন পর্যন্ত ঈশ্বর হইতে আমাদের অণুমাত্র পৃথক্ অস্তিত্ব-জ্ঞান থাকিবে, ততদিন ভয় থাকিবে। আবার ঈশ্বরের সহিত একত্ববোধ হইলেই ভয় দূর হইবে। কিসের ভয়? কেবল ইচ্ছাশক্তি-সহায়ে জ্ঞানী দেহমনের অতীত অবস্থা লাভ করিয়া এই বিশ্বকে শূন্যমাত্রে পরিণত করেন। এইরূপে অবিদ্যা নাশ করিয়া তিনি তাঁহার যথার্থ স্বরূপ আত্মাকে জানেন। সুখদুঃখ শুধু ইন্দ্রিয়জনিত, এগুলি আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত, সেই হেতু অপরিচ্ছিন্ন ও সর্বত্র বিরাজমান।

জ্ঞানী সমস্ত বিধি-নিষেধের গণ্ডির বাহিরে গিয়া, স্মৃতির অনুশাসন ও ধর্মশাস্ত্রের অতীত হইয়া নিজেই নিজের শাস্ত্র হইবেন। বিধি-নিষেধের মধ্যে আমরা জড়ীভূত হইয়া মৃত্যু বরণ করি। তবুও যাহারা শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিতে অসমর্থ, জ্ঞানী তাহাদের দোষ দর্শন করিবেন না; এমন কি 'আমি তোমা অপেক্ষা পবিত্র' অন্যের সম্বন্ধে জ্ঞানী কখন এরূপ মনে করিবেন না।

এইগুলি প্রকৃত জ্ঞানযোগীর লক্ষণ: (১) জ্ঞানী জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। (২) তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বশীভূত। উন্মুক্ত আকাশতলে অনাবৃত ধরাই তাহার শয্যা হউক বা রাজপ্রাসাদেই তিনি অবস্থান করুন, উভয় অবস্থাতেই তুল্য সুখী হইয়া, অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া সব কিছুই তিনি সমভাবে ভোগ করিয়া থাকেন। যেহেতু আত্ম-ব্যতিরিক্ত সব কিছু হইতেই তিনি মন উঠাইয়া লইয়াছেন, সেইজন্য দুঃখকষ্টের হাত এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া সেগুলির সম্মুখীন হইয়াই দুঃখকষ্ট সহ্য করেন। (৩) জ্ঞানী বুঝিয়াছেন—এক ব্রহ্ম ছাড়া সবই অনিত্য। (৪) মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। প্রবল ইচ্ছাশক্তি-সহায়ে মনকে উচ্চ বিষয়ে নিবিষ্ট করিয়া তিনি শান্তির অধিকারী হন। শান্তি লাভ করিতে না পারিলে আমরা পশু অপেক্ষা বেশী উন্নত নই। সর্বকর্মফল বিসর্জনপূর্বক ইহকাল বা পরকালের ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া জ্ঞানী পরার্থে ও ঈশ্বরার্থে কর্ম সম্পাদন করেন। আত্মজ্ঞান ব্যতীত জগৎ আমাদিগকে আর কি দিতে পারে? আত্মজ্ঞান-লাভ হইলেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। বেদের শিক্ষা এই যে, আত্মা এক অখণ্ড সত্তা। আমরা জানি, এই আত্মা—মন, স্মৃতি, চিন্তা,

এমন কি চেতনারও অতীত। সকলই আত্মপ্রসূত। আত্মারই মধ্য দিয়া অথবা আত্মা আছেন বলিয়াই আমরা দেখি, শুনি, অনুভব করি এবং চিন্তা করি। এই ওঁ—এই অদ্বিতীয় সত্তার সহিত একত্ব-উপলব্ধিই জীবজগতের লক্ষ্য। জ্ঞানীকে সকল ধর্মীয় মতবাদ হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে; তিনি হিন্দু বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান কিছুই নন, কিন্তু তিনি একাধারে এই তিন। জ্ঞানী সর্বকর্ম পরিত্যাগ করেন, তিনি ঈশ্বরে শরণাগত; জ্ঞানীকে কর্ম আর বদ্ধ করিতে পারে না। জ্ঞানী কঠোর বিচারবাদী, 'নেতি'বিচার-সহায়ে তিনি সবই অস্বীকার করেন। তিনি দিবারাত্রি মনে মনে বলেন, 'ধর্মবিশ্বাস নাই, মন্ত্রতন্ত্র নাই, স্বর্গ-নরক নাই, ধর্মমত নাই, মন্দির নাই—কেবল আত্মাই বর্তমান।' সর্ব বস্তু পরিহার করিয়া যে অপরিহার্য পরমতত্ত্ব লাভ হয়, তাহাই আত্মা। সমস্ত ব্যাবহারিক ও সম্বন্ধমূলক ভাবের বিলোপ-অবস্থা,—সেই নির্বাণ-অবস্থা লাভ না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানী কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া শুদ্ধ বিচার ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। এই অবস্থার বর্ণনা বা ধারণাও অসম্ভব। কোন পার্থিব ফলের দ্বারাই জ্ঞানের বিচার হয় না। শকুনি যেমন শূন্যে বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া অদৃশ্য হইলেও সামান্য গলিত দেহ দেখিয়া সবেগে নামিয়া আসিতে সর্বদা উন্মুখ, তেমন হইও না। স্বাস্থ্য বা পরমায়ু বা সম্পদ—কিছুই চাহিও না, কেবল মুক্তিকামী হও। আমরা সচ্চিদানন্দ। সৎ বা অস্তিভাব জগতের শেষ বস্তুনির্দেশক ব্যাপার। তাহাই আমাদের অস্তিত্ব, তাহাই আমাদের জ্ঞান। আর আনন্দ অস্তিত্বের অবিমিশ্র স্বাভাবিক ফল। কখন কখন মুহূর্তের জন্য আমরা সেই পরমানন্দ অনুভব করি; সেই সময় আনন্দ ছাড়া আমরা কিছুই চাহি না, কিছুই দিই না, এবং কিছুই জানি না। তারপর এ আনন্দ অন্তর্হিত হয়, আবার জগতের সমগ্র দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে চলিতে থাকে এবং আমরা জানি, 'এই বিশ্বছবি সর্বাশ্রয় ঈশ্বরেরই উপর বিন্যস্ত শিল্পরচনা মাত্র।' সংসারে ফিরিয়া আসিলেই দেখিতে পাই—সেই পারমার্থিক সত্তাই ব্যাবহারিক সত্তারূপে প্রতিভাত হইয়াছেন, দেখি—সচ্চিদানন্দকে 'পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা' এই ত্রিমূর্তিরূপে। সৎ অর্থাৎ সৃজনীশক্তি, চিৎ—পরিচালিকাশক্তি, আনন্দ—আত্মানুভবশক্তি; এই শক্তিই আবার আমাদিগকে সেই এক ব্রহ্মের সহিত যুক্ত করে। জ্ঞান বা চিৎ ব্যতীত 'সৎ'কে কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। এজন্যই খ্রীষ্টের কথার শক্তি:

'পুত্রের ভিতর দিয়া ব্যতীত কেহ পরমপিতাকে দর্শন করিতে পারে না।' বেদান্তের শিক্ষা এই যে, ইহলোকেই এবং এই দেহেই নির্বাণ লাভ করা যায়, নির্বাণ লাভ করিবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত প্রতীক্ষার প্রয়োজন নাই। নির্বাণ অর্থ আত্মানুভূতি। এক মুহূর্তের জন্যও আত্মানুভূতি লাভ হইলে ব্যক্তিত্ব-ভাবের মরীচিকা দ্বারা আর মুগ্ধ হইতে হইবে না। জগৎপ্রপঞ্চ—চক্ষুযুক্ত আমাদের দৃষ্টিতে পড়িবে, কিন্তু এই জগৎ-রচনার কারণ অবগত হইলেই ইহার যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। এই জগৎ-রূপ আবরণই অবিকারী আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে। এই আবরণ অপসারিত হইলেই আত্মদর্শন হয়। পরিবর্তন যাহা কিছু তাহা এই আবরণেই সংঘটিত হয়, আত্মায় নয়। সাধুর নিকট এই আবরণ অতি সূক্ষ্ম, ইহার ভিতর দিয়া বাস্তব সত্তা প্রায় প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু পাপীর নিকট এই আবরণ অতি স্থূল, সুতরাং পাপীর মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছেন, তাহা দেখি না এবং সাধুর মধ্যে যে আত্মা আছেন—এই সত্যও সহসা অনুধাবন করিতে পারা যায় না।

একত্বে উপনীত হইলেই সব বিচার সমাপ্ত হয়, সুতরাং আমরা প্রথমতঃ বিশ্লেষণ, তারপর সমন্বয় অবলম্বন করিয়া থাকি। বিজ্ঞানের রাজ্যে দেখা যায়, একটি অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক শক্তির অনুসন্ধানে বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলি ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হয়। চরম একত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জড়বিজ্ঞান লক্ষ্যে উপনীত হয়। একত্বে পৌঁছিলেই আমাদের বিশ্রাম। জ্ঞানই চরম অবস্থা।

সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞান বহুপূর্বেই সেই একত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, সেই অদ্বৈত-তত্ত্বে উপনীত হওয়াই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য। বিশ্বময় একই পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন, ক্ষুদ্র জীবাত্মাগুলি তাঁহারই অভিব্যক্তি-মাত্র। অতএব পরমাত্মা তাঁহার অভিব্যক্তিগুলি অপেক্ষা অনন্তগুণে বৃহৎ। সবই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। সাধু, পাপী, মেষ, ব্যাঘ্র—এমন কি হত্যাকারী পর্যন্ত পরমার্থের দিক দিয়া ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়, যেহেতু ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এক সৎ বস্তুই বিদ্যমান, ঋষিগণ তাঁহাকে বিভিন্নভাবে অভিহিত করিয়াছেন। এই জ্ঞান ব্যতীত উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, এবং যোগদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিতেই এই জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত হয়। যিনি যত বেশী এই যোগ ও ধ্যানের দ্বারা বিশুদ্ধ

ও যোগ্য হইয়াছেন, আত্মানুভূতির আলোক তাঁহার নিকট তত বেশী পরিস্ফুট। এই উৎকৃষ্ট জ্ঞান চারি সহস্র বর্ষ পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু অতি অল্প কয়েকজনেরই অধিকারে আসিয়াছে; এখনও ইহা জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত হইতে পারে নাই।

৪

তথাকথিত মনুষ্যনামধারী সকল ব্যক্তিই প্রকৃত 'মানুষ' আখ্যার যোগ্য নয়। প্রত্যেকেই নিজের মন দ্বারা এই জগৎকে বিচার করিয়া থাকে। জগৎ সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা অত্যন্ত কঠিন। অধিকাংশ ব্যক্তির নিকটই তত্ত্ব অপেক্ষা জাগতিক বস্তু বেশী গ্রাহ্য। দৃষ্টান্তরূপে বোম্বাই-এর দুইব্যক্তি সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন হিন্দু, অপরজন জৈন। ঐ নগরের এক ধনীর গৃহে বসিয়া উভয়েই শতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। বাড়িটি সমুদ্রের ধারে। খেলাও বহুক্ষণ ধরিয়া চলিতেছে। যেখানে বসিয়া তাঁহারা খেলিতেছিলেন, তাহার নিচে সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাঁহাদের মধ্যে একজন জোয়ার-ভাঁটাকে পৌরাণিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, 'দেবতারা এই জল একটা গর্তের মধ্যে ফেলিয়া সেখান হইতে আবার ঢালিয়া ফেলিতেছেন। বারবার এইরূপ ঢালাঢালি করিয়া তাঁহারা খেলা কবিতেছেন।' অন্য ব্যক্তি বলিলেন, 'না, তাহা নয়, এই জল ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য একটা পর্বতের উপর শোষণ করিয়া তুলিয়া লইয়া আবার ঢালিয়া ফেলিতেছেন।' সেখানে একটি যুবক ছাত্র ছিল, সে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'আপনারা কি জানেন না চন্দ্রের আকর্ষণে এই জোয়ার-ভাঁটা হয়?' ইহা শুনিয়া ভদ্রলোক-দুইজন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া জানিতে চাহিলেন—সে কি মনে করে যে, তাঁহারা দুইজনেই নির্বোধ, সে কি মনে করে যে, তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন চন্দ্র রজ্জু দ্বারা জোয়ার আকর্ষণ করিয়া থাকেন, আর উহা এত দূরবর্তী চন্দ্রের নিকটে যায়। এরূপ বাজে ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে তাঁহারা মোটেই রাজী হইলেন না। এমন সময় গৃহস্বামী উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষই মীমাংসার জন্য তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিলেন। তিনি শিক্ষিত বলিয়া এ রহস্য অবগত ছিলেন, কিন্তু শতরঞ্চ খেলায় রত দুইজনের এ-বিষয়ে বোধ জন্মানো নিতান্ত কঠিন বুঝিয়া যুবকটিকে নিরস্ত

হইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং জোয়ার-ভাঁটার কারণ সম্বন্ধে এমন ব্যাখ্যা দিলেন যে, মূর্খ শ্রোতা-দুইজনের তাহা ভাল লাগিল: আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বহুদূরে মহাসাগরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি স্পঞ্জের (sponge) পাহাড় আছে। আপনারা দুইজনেই অবশ্য স্পঞ্জ দেখিয়াছেন এবং আমি যে-বিষয় বুঝাইতে যাইতেছি, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিবেন। এই স্পঞ্জ-পাহাড় সাগরের অধিকাংশ জল শোষণ করিয়া লইলেই ভাঁটার উৎপত্তি হয়; ক্রমে দেবগণ নামিয়া আসিয়া ঐ পর্বতের উপর নৃত্য আরম্ভ করিলে তাঁহাদের দেহের ভারে নিষ্পেষিত হইয়া জল বাহির হইয়া যাইলেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। মহাশয়গণ, এই তো জোয়ার-ভাঁটার কারণ; এই কারণ কেমন সরল ও যুক্তিসঙ্গত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার-ভাঁটা হয় শুনিয়া যাঁহারা ঠাট্টা করিয়াছিলেন, স্পঞ্জ-পাহাড় ও তাহার উপরে দেবতাদের নৃত্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের আর কোন অবিশ্বাস রহিল না। দেবতা তো তাঁহাদের নিত্য-বিশ্বাস্য সত্যবস্তু, আর স্পঞ্জ তাঁহারা স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। উভয়ের মিলিত ক্রিয়াফলেই যে জোয়ার-ভাঁটা হইয়া থাকে, ইহা খুবই সম্ভব।

'আরাম'—সত্যলাভের পরীক্ষা নয়; বস্তুতঃ সত্যলাভ ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থা। যদি কেহ প্রকৃতপক্ষে সত্যকে জানিতে চান, তিনি যেন আরামে আসক্ত না হন। সমস্ত সুখভোগের কামনা পরিত্যাগ করা কঠিন, কিন্তু জ্ঞানীকে ইহা বর্জন করিতে হইবে। জ্ঞানী বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সব বাসনা ত্যাগ করিবেন, তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি থাকিবে না—কেবল তখনই উচ্চতর সত্য তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইবে। ত্যাগের প্রয়োজন। যজ্ঞ যে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র স্বার্থগুলির বিসর্জনের অন্তর্নিহিত শক্তি হইতেই হইয়াছে। মিথ্যা অহংভাবের বিসর্জন দ্বারা আমরা উচ্চতর 'অহং'-জ্ঞান অর্থাৎ আত্মানুভূতি লাভ করিতে পারি। দেবতাদের ক্রোধের উপশমের বা প্রসন্নতার জন্য যে যথার্থ ফলপ্রদ বলি প্রদত্ত হইত, তাহা আত্মজ্ঞান-লাভের উপায় কাঁচা 'আমি'র বিসর্জনেরই রূপক মাত্র। জ্ঞানী দেহরক্ষার জন্য যত্ন করিবেন না, মনেও ঐ ইচ্ছা পোষণ করিবেন না। বিশ্বের ধ্বংস হইলেও জ্ঞানী সাহসের সহিত সত্য অনুসরণ করিবেন। যাহারা অলীক উত্তেজনার পশ্চাতে ধাবিত হয়, তাহারা সত্য অনুসরণ করিতে পারে না। শুধু এই জীবনে নয়, শত শত জীবন ধরিয়া এই সাধনা করিতে হইবে। অতি

অল্পসংখ্যক মানুষই অন্তরে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে সাহস করে—স্বর্গসুখ, সাকার ঈশ্বর-উপাসনা ও ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করিতে সাহসী হয়। এই জ্ঞানের সাধনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প আবশ্যক; সন্দেহে দোদুল্যমান হওয়াও অত্যন্ত দুর্বলতার লক্ষণ। মানুষ নিত্য-পূর্ণই আছে, তাহা না হইলে কিরূপে পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হইত? কিন্তু তাহাকে এই পূর্ণত্ব প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছিল। মানুষ যদি শুধু বাহ্য কারণগুলির অধীন থাকিত, তাহা হইলে সে কেবল মরণশীলই থাকিয়া যাইত। যাহারা কোন অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়, তাহাদের সম্বন্ধেই অমৃতত্ব প্রযোজ্য। আত্মাকে কোন কিছু প্রভাবিত করিতে পারে না—এই ভাব সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক; কিন্তু মানুষকে আত্মার সহিত এক হইতে হইবে, দেহ বা মনের সহিত নয়। মানুষ এই জগতের দ্রষ্টামাত্র—এই সত্য সে জানিতে পারিলেই নিয়ত গতিশীল এই জগচ্চিত্র উপভোগ করিতে পারিবে। জ্ঞানী নিজেকে বলিতে থাকুন, 'আমি বিশ্ব, আমি ব্রহ্ম।' মানুষ যখন সত্য-সত্যই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়, তখন সকল ব্যাপারই তাহার পক্ষে সম্ভব হয়, এবং সকল জড়বস্তু তাহার দাস হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছেন, 'মাখন তুলিয়া দুধে রাখো বা জলে রাখো, কিছুর সহিতই তাহা মিশিবে না। সেইরূপ মানুষ একবার আত্মজ্ঞান লাভ করিলে বিষয়াসক্তি তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারে না।' 'বেলুন হইতে যেমন পৃথিবীর ছোটখাট বৈষম্যগুলি চোখে পড়ে না, মানুষেরও উচ্চ অবস্থা লাভ হইলে ভালমন্দ পার্থক্য আর তাহার চোখে পড়িবে না।' 'পোড়া ঘটকে আর কোন আকার দেওয়া যায় না; তেমনি যে মন একবার ঈশ্বরকে স্পর্শ করিয়াছে এবং অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহা অবিকারী হইয়া থাকিবে।' সংস্কৃতে 'ফিলজফি' শব্দের অর্থ 'শুদ্ধ দর্শন', এবং ধর্ম হইতেছে ফলিত দর্শনশাস্ত্র। শুধু তত্ত্বমূলক 'কল্পনাত্মক' দর্শন ভারতে বিশেষ সমাদৃত হয় না; সেখানে ভজনালয়, ধর্মমত বা গোঁড়ামি নাই; দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী—এই দুইটি প্রধান বিভাগ আছে। দ্বৈতবাদী বলেন, 'মুক্তির উপায় কেবল ভগবৎ-কৃপা। কার্য-কারণ-বিধি একবার গতিপ্রাপ্ত হইলে আর তাহার বিশ্রাম নাই। এই বিধানের অতীত একমাত্র ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে এ বিধান ভঙ্গ করিতে সহায়তা করেন।' অদ্বৈতবাদী বলেন, 'এই জড়প্রকৃতির অন্তরালে এমন একজন আছেন, যিনি

মুক্ত; সকল বিধানের অতীত সেই পুরুষকে লাভ করিয়া আমরা মুক্ত হই। এই বন্ধন-হীনতাই মুক্তি।' দ্বৈতবাদ মুক্তির একটি দিক মাত্র, অদ্বৈতবাদ জ্ঞানের চরমে পৌঁছাইয়া দেয়। পবিত্র হওয়াই মুক্তিলাভের অতি সহজ পথ। আমরা যাহা অর্জন করি, তাহাই আমাদের নিজস্ব। কোন শাস্ত্র-প্রমাণ বা ধর্মবিশ্বাস আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। যদি একজন ঈশ্বর থাকেন, সকলেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। অগ্নির উত্তাপ সম্বন্ধে কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না, সকলেই অনুভব করিতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ। ঈশ্বর সকল মানুষেরই প্রত্যক্ষগম্য। প্রতীচ্যবাসীদের 'পাপ' সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা, হিন্দুগণ সেইভাবে পাপের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কুকার্য 'পাপ' নয়; কুকার্য দ্বারা আমরা কোন শাসক ঈশ্বরের বিরাগভাজন না হইয়া শুধু নিজেদেরই অনিষ্ট করিয়া থাকি, এবং সেজন্য আমাদিগকে নিশ্চয়ই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আগুনে হাত দেওয়া পাপ নয়, কিন্তু যে ঐরূপ করে, সে নিশ্চয়ই পাপীর মতো যন্ত্রণা ভোগ করিবে। সকল কর্মেরই কিছু ফল আছে, এবং 'প্রত্যেক কর্মের ফলই কর্তার নিকট ফিরিয়া আসে'। 'ত্রিত্ববাদ'[১] 'একত্ববাদ'[২] অপেক্ষা উন্নত, একত্ববাদ দ্বৈতবাদ—এই মতে ঈশ্বর ও জীব নিত্য পৃথক। 'আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান'—এই জ্ঞান হইলে বুঝিতে হইবে, ধর্মের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে; একত্বে উপনীত হইলে অর্থাৎ যখন আমরা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা উপলব্ধি করি, তখনই চরমোন্নতি বুঝিতে হইবে।

৫

শরীর কেন চিরস্থায়ী হইতে পারে না?—এই প্রশ্ন তর্কশাস্ত্রের অনুমোদিত নয়, কারণ পরিণামী ও অস্থায়ী কতকগুলি মূলপদার্থের সমবায়কে 'শরীর' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। যখন আমরা আর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইব না, তখনই এই তথাকথিত শরীর-ধারণের প্রয়োজন থাকিবে না। দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত পদার্থ আদৌ জড় হইবে না। দেশ ও কাল শুধু আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান, আমরা সেই অবিনাশী সত্তা। সব সাকারবস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এইজন্য সব ধর্ম বলে, 'ঈশ্বর নিরাকার'। গ্রীকো-ব্যাক্ট্রিয়ান রাজা

১. Trinitarianism, ২. Unitarianism

মিনেন্দার ১৫০ খৃঃ পূঃ এক বৌদ্ধ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁহার নাম হয় 'মিলিন্দ'। তিনি তাঁহার উপদেষ্টা যুবক-সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বুদ্ধের মতো সিদ্ধপুরুষগণ কি ভ্রান্ত হইতে পারেন অথবা ভুল করিতে পারেন?' যুবক-সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, 'সিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার অভিজ্ঞতার গণ্ডির বাহিরে সামান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে পারেন, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিবলে তিনি যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্তি কখনও সম্ভব নয়। তিনি ইহকালেও এই দেহে অভ্রান্ত। তিনি বিশ্বের সারতত্ত্ব ও গূঢ়রহস্য পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু দেশ ও কালের আশ্রয়ে শুধু বাহ্য বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে সার সত্তা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা না জানিতে পারেন। তাঁহার মৃত্তিকাজ্ঞান জন্মিয়াছে, কিন্তু ঐ মৃত্তিকা যে যে আকার ধারণ করিতে পারে, সেগুলির কোন অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই। সিদ্ধ-পুরুষ আত্মাকে জানিয়াছেন, কিন্তু আত্মার প্রতিরূপ ও অভিব্যক্তির জ্ঞান তাঁহার হয় নাই।' তিনি ইচ্ছামাত্রেই আমাদের মতো ব্যাবহারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন, যদিও অসীম ক্ষমতাবলে এই জ্ঞান আরও অধিক শীঘ্রই লাভ করিতে পারেন। সম্পূর্ণ বশীভূত মনের প্রচণ্ড 'অনুসন্ধান-রশ্মি' কোন পদার্থে নিক্ষিপ্ত হইলেই উহা শীঘ্র আয়ত্ত হইবে। ইহা বুঝা অতি আবশ্যক, কারণ ইহা দ্বারা একজন বুদ্ধ বা একজন খ্রীষ্ট কিরূপে সাধারণ জাগতিক ব্যাবহারিক জ্ঞানে অনভিজ্ঞ ছিলেন, সে সম্বন্ধে যে নিরর্থক ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। শিষ্যগণ ভুল করিয়া তাঁহাদের যে উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছে, এজন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। শিষ্যগণ-বর্ণিত বাণীর একটি সত্য, অপরটি অসত্য—এরূপ বলা প্রতারণা। সমগ্র বিবরণ হয় মানিয়া লও, নতুবা পরিত্যাগ কর। অসত্য হইতে সত্য কিরূপে বাছিয়া লইব?

একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনরায় তাহা ঘটিতে পারে। যদি কেহ কখন পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকেন, আমরাও তাহা লাভ করিতে পারি। এই পৃথিবীতে ও এই শরীরে পূর্ণ হইতে না পারিলে স্বর্গ বা যে-কোন উন্নত অবস্থাই কল্পনা করি না কেন, কোন অবস্থাতেই আমরা ঐ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিব না। যীশু যদি সিদ্ধপুরুষ না হন, তাহা হইলে তাঁহার নামে প্রচারিত ধর্ম ভূমিসাৎ হইত। আর তিনি সিদ্ধ হইয়া থাকিলে

আমরাও সিদ্ধ হইতে পারি। আমরা যে-অর্থে 'জানা' বুঝি, সেই অর্থে সিদ্ধপুরুষ বিচার করেন না বা 'জানেন না', যেহেতু আমাদের জ্ঞান তুলনামূলক, এবং পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন তুলনা বা শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয়। বিচার-মূলক জ্ঞান অপেক্ষা সহজজ্ঞান[১] অল্পভ্রমাত্মক, কিন্তু বিচার[২] অপেক্ষাকৃত উন্নত, এবং উহা স্বজ্ঞায়[৩] পৌঁছাইয়া দেয়, স্বজ্ঞা আরও উন্নত। জ্ঞান স্বজ্ঞার জনক। এই স্বজ্ঞা সহজজ্ঞানের মতোই অভ্রান্ত, কিন্তু উচ্চস্তরে।

প্রাণিজগতে অভিব্যক্তির তিনটি স্তর বিদ্যমান: (১) অবচেতন—যন্ত্রবৎ, অভ্রান্ত; (২) সচেতন—বিচারময়, ভ্রান্ত; (৩) অতিচেতন বা তুরীয়—স্বজ্ঞা, অভ্রান্ত। এই অবস্থাগুলি যথাক্রমে জন্তু, মানুষ ও ঈশ্বরে প্রকাশিত। কারণ যে মানুষ পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, বোধশক্তির প্রয়োগ ব্যতীত তাঁহার অন্য কিছু থাকে না। তিনি নিজের জন্য কিছু কামনা না করিয়া জীবের মঙ্গলার্থেই জীবনধারণ করেন। যাহা কিছু ভেদ সৃষ্টি করে, তাহাই নাস্তিবাচক বা অভাবাত্মক; যাহা অস্তিবাচক, তাহাই চির-উদার। যাহা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি, তাহাই সর্বাপেক্ষা উদার—সেটিই 'সত্তা'।

'প্রাকৃতিক নিয়ম' হইতেছে জগৎব্যাপারের পারম্পর্য ব্যাখ্যা করিবার একটি মানসিক সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া, কিন্তু বাস্তবিক সত্তারূপে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। এই জগৎপ্রপঞ্চে সংঘটিত কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা প্রকাশ করিবার জন্য আমরা 'নিয়ম' শব্দ ব্যবহার করি। যাহার নিকট মাথা নত করিতে হইবে, এমন কোন অপরিহার্য বস্তু বা কুসংস্কাররূপে যেন আমরা এই নিয়মকে গণ্য না করি। ভ্রান্তি বিচারবুদ্ধির নিত্যসঙ্গী, তবুও প্রাণপণ সংগ্রামের দ্বারা ভ্রান্তিজয়ের প্রচেষ্টাই আমাদিগকে দেবত্বে পৌঁছাইয়া দিবে। আমাদের দেহ হইতে অনিষ্টকর পদার্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য প্রকৃতির যে প্রয়াস, তাহাই ব্যাধি। পাপও তেমনি আমাদের অন্তর্নিহিত দেবভাব হইতে পশুভাব দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা। দেবত্বে উন্নীত হইবার জন্য আমাদিগকে 'পাপ' অর্থাৎ ভুল করিতে হইবে।

কাহাকেও কৃপার চোখে দেখিও না। সকলকে তোমার সমান বলিয়া দেখিবে, অসাম্য—মুখ্য পাপ অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলো। আমরা সকলেই

১ Instinct ২ Reason ৩ Intuition

সমান। 'আমি ভাল, তুমি মন্দ; আমি তোমাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছি'—এই-সব ভাব যেন আমাদের মনে উদিত না হয়। সমত্বই মুক্ত মানুষের লক্ষণ। যীশু ঘৃণ্য পাপীদের কাছে গিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতেন। তিনি কখনও উচ্চ বেদীতে বসিয়া থাকিতেন না। পাপীরাই কেবল পাপ দেখিতে পায়। মানুষকে মানুষরূপে দেখিও না, তাহার মধ্যে শুধু ঈশ্বরকেই দর্শন কর। আমরাই নিজেদের স্বর্গ সৃষ্টি করি, এবং নরককেও স্বর্গে পরিণত করিতে পারি। নরকেই পাপীদের দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন আমরা আমাদের আশেপাশে পাপীদের দেখি, ততদিন আমরা নিজেরাই নরকে আছি। আত্মা দেশকালের অতীত। 'আমি সচ্চিদানন্দ, সোঽহং'—ইহা উপলব্ধি কর। জন্ম-মৃত্যু উভয় অবস্থাতেই আনন্দে থাকো, ঈশ্বরপ্রেমে সদা মাতোয়ারা হও। দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হও। আমরা দেহের দাস হইয়াছি, শৃঙ্খলকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে শিখিয়াছি, এবং দাসত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা এতদূর দাস হইয়া পড়িয়াছি যে, এই দেহবন্ধনকে চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছা করি, এবং চিরদিন দেহবুদ্ধি লইয়াই থাকিতে চাই। দেহাত্মবুদ্ধিকে আঁকড়াইয়া থাকিও না। কিছুতেই বর্তমান জীবনের মতো আর একটি ভাবী জীবনের আকাঙ্ক্ষা করিও না। এমন কি অতি প্রিয়জনের দেহও ভালবাসিও না, বা তাহাদের দেহ কামনা করিও না। এই জীবনই আমাদের শিক্ষাদাতা; মৃত্যু সেই শিক্ষা নূতন করিয়া আরম্ভ করিবার সুবিধা দেয় মাত্র। এই দেহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মতো, কিন্তু আত্মহত্যা কেবল নির্বুদ্ধিতা, ইহা শুধু শিক্ষককে হত্যা করার মতো কাজ। আবার অন্য দেহ ধারণ করিতে হইবে, সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধির অতীত অবস্থায় উন্নীত না হইলে বারংবার দেহধারণ করিতেই হইবে; তাই একটি দেহ নষ্ট করিলে অন্যটির আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। তবুও আমরা যেন কিছুতেই দেহাত্মবুদ্ধি না রাখি, দেহটিকে যেন শুধু পূর্ণতা লাভ করিবার যন্ত্রস্বরূপ মনে করি। রামের ভক্ত হনুমান্ তাঁহার নিজ অনুভূতি এই কয়েকটি কথায় সংক্ষেপে বলিয়াছেন, 'হে প্রভু, যখন দেহবুদ্ধি থাকে, তখন আমি তোমা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমি তোমার দাস। যখন আমার জীব-বুদ্ধি হয়, তখন আমি জ্যোতির্ময় তোমার অংশ, একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। কিন্তু যখন আত্মবুদ্ধি হয়, তখন আমি ও তুমি এক।' তাই

জ্ঞানী অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া শুধু আত্মাকে উপলব্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট।

৬

চিন্তা অতি গুরুত্বপূর্ণ, কেন না 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তা যাহার যেমন চিন্তা, তাহার তেমনি সিদ্ধি। জনৈক সাধু বৃক্ষতলে বসিয়া লোককে ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি শুধু দুধ ও ফলমূল আহার করিয়া এবং প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিয়া নিজেকে খুব পবিত্র মনে করিতেন। সেই গ্রামে এক চরিত্রহীনা নারী বাস করিত। স্ত্রীলোকটি দুষ্কার্যের জন্য নরকে যাইবে—এই বলিয়া সাধু প্রত্যহই তাহার নিকট গিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। হতভাগিনী তাহার জীবিকা উপার্জনের একমাত্র পথ পরিবর্তন করিতে অক্ষম হইয়া সাধু-কথিত ভয়াবহ পরিণামের চিন্তায় শঙ্কিত থাকিত। নিরুপায় স্ত্রীলোকটি কাঁদিয়া, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিত। এই সাধু ও ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হইলে দেবদূতেরা আসিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে স্বর্গে লইয়া গেল, আর যমদূতেরা আসিয়া সাধুর আত্মা দাবি করিল। সাধু উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একি? আমি কি কঠোর সাধুজীবন যাপন করিয়া সকলের মধ্যে ধর্ম প্রচার করি নাই? আমি কেন নরকে যাইব, আর এই ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক স্বর্গে যাইবে?' যমদূতগণ বলিল, 'স্ত্রীলোকটি দেহ দ্বারা পাপ কাজ করিতে বাধ্য হইলেও তাহার মন সর্বদা ভগবানে নিবিষ্ট ছিল এবং সে মুক্তি কামনা করিয়াছিল। সেই মুক্তি এখন সে লাভ করিয়াছে। আর তুমি বাহিরে ধর্ম-কার্য করিয়াছ, তোমার মন কিন্তু অপরের পাপের দিকেই সর্বদা নিবিষ্ট থাকিত। তুমি পাপই দেখিয়াছ, পাপই চিন্তা করিয়াছ; সুতরাং যেখানে কেবলই পাপ, তোমাকে সেই স্থানেই যাইতে হইবে।' এই গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়টি অতি স্পষ্ট: বাহ্য জীবন যাপনের দ্বারা কোন ফলই হয় না। হৃদয় পবিত্র হওয়া চাই; পবিত্রহৃদয় পাপ না দেখিয়া কেবল পুণ্যই দেখে। মানবজাতির অভিভাবক অথবা পাপীতাপীর উদ্ধারকর্তা সাধুরূপে দাঁড়াইবার চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে উচিত নয়। তাহার পরিবর্তে নিজদিগকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করিব। ইহার ফলে আমরা অপরের ধর্মলাভের সহায় হইতে পারিব।

পদার্থবিজ্ঞান উভয় দিকেই অতীন্দ্রিয়বিদ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ। যুক্তি সম্বন্ধেও ঠিক তাই—ইহার আরম্ভ অ-যুক্তিতে, সমাপ্তিও অ-যুক্তিতে। অনুভূতি-রাজ্যের গভীরে সন্ধান করিলে অনুভূতির অতীত এক স্তরে আমরা উপনীত হইব। যুক্তি বাস্তবিক সঞ্চিত ও শ্রেণীবদ্ধ অনুভূতি—স্মৃতি দ্বারা সুরক্ষিত। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে আমরা আর কিছু কল্পনা বা বিচার করিতে পারি না। যুক্তি বা বিচারের অতীত কোন কিছুই ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। বিচারশক্তি যে সীমাবদ্ধ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি; তবুও ইহা আমাদিগকে এমন এক স্তরে লইয়া যায়, যেখানে আমরা এক ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থার আভাস পাইয়া থাকি। তারপর প্রশ্ন আসে: মানুষের এমন কোন যন্ত্র কি আছে, যাহার সাহায্যে সে বিচার বা যুক্তির অতীত অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ? ইহা সম্ভব যে, যুক্তির অতীত অবস্থা লাভ করিবার একটি শক্তি মানুষের আছে। সত্য-সত্যই ঋষিরা সর্বকালেই এই শক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু অধ্যাত্মভাব এবং অনুভূতিকে স্বভাবতই যুক্তির ভাষায় রূপায়িত করা অসম্ভব। আর এই ঋষিরাই তাঁহাদের প্রত্যক্ষানুভূত আধ্যাত্মিক ভাবগুলি অন্যকে জ্ঞাপন করিবার অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। নিশ্চয়ই তাঁহারা ভাষায় কিছু প্রকাশ করিতে পারেন না; অতএব ইহা শুধু বলা যাইতে পারে, এগুলি তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং সকলেরই অধিগম্য। শুধু ঐভাবেই অনুভূতিগুলি জানা যায়, কিন্তু কখনও প্রকাশ করা যায় না। যে বিজ্ঞান মানুষের অতীন্দ্রিয় সত্তার মধ্য দিয়া প্রকৃতির অতীত সত্তাকে বুঝিতে চায়, তাহাকেই ধর্ম বলে। মানুষের বিষয় আমরা এ পর্যন্ত অল্পই জানি, সেইজন্য বিশ্বজগৎ সম্বন্ধেও অল্পই জানি। মানুষের বিষয় আরও বেশী জানিতে পারিলে বিশ্ব সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ অধিকতর জ্ঞান লাভ করিব। মানুষ সর্ববস্তুর সংক্ষিপ্ত আধার, সমগ্র জ্ঞান মানুষের মধ্যেই আছে। এই বিশ্বজগতের যেটুকু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেইটুকুরই আমরা কারণ নির্ধারণ করিতে পারি, মূলতত্ত্বের কোন কারণ নির্ধারণ করিতে আমরা অসমর্থ। কোন বিষয়ের কারণ নির্ধারণ করার অর্থ—উহাকে শুধু শ্রেণীবদ্ধ করা এবং মনের ক্ষুদ্র কক্ষে পুরিয়া রাখা। একটি নূতন বিষয় পাওয়া মাত্র আমরা উহাকে তখনই পূর্ব হইতে বিদ্যমান একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করি, এই চেষ্টাকেই বিচারবুদ্ধি বলে। এই বিষয়টি

কোন এক শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারিলেই কিছু পরিমাণ মানসিক তৃপ্তি বোধ হয়; কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থাও অতিক্রম করিতে পারি না। প্রাচীনকাল এ বিষয়ে সগৌরবে সাক্ষ্য দিতেছে যে, মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা লাভ করিতে পারে। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে উপনিষদ্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়দ্বারা ঈশ্বরকে কখনও উপলব্ধি করা যায় না। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদ এ পর্যন্ত একমত, কিন্তু বেদ নেতিবাচক দিকও অতিক্রম করিয়া স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন যে, মানুষ ইন্দ্রিয়াবদ্ধ জমাট বরফের মতো এই জড়জগৎকে অতিক্রম করিতে পারে এবং অতিক্রম করে। সে যেন এই বরফরাশির কোনস্থানে একটি ছিদ্র আবিষ্কার করিতে পারে এবং তাহার মধ্য দিয়া অখণ্ড জীবনসমুদ্রে পৌঁছিতে পারে। এইরূপে সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ অতিক্রম করিয়াই তাহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে।

ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানকে কখনও জ্ঞান বলা যায় না। আমরা ব্রহ্মকে জানিতে পারি না; আমরাই ব্রহ্ম—অংশ নই, পূর্ণব্রহ্ম। যাহার বিস্তার নাই, তাহা কখনও বিভাজ্য নয়। আমরা দেখিতে পাই সূর্য এক, বহু নয়; তবুও সূর্যরশ্মি যেমন লক্ষ লক্ষ শিশিরবিন্দুর মধ্যে প্রতিফলিত দেখা যায়, তেমনি এই প্রতীয়মান বৈচিত্র্য শুধু দেশকালের মধ্যেই প্রতিবিম্বিত। জ্ঞানে উপনীত হইলে বৈচিত্র্য ঘুচিয়া শুধু একত্বই অনুভূত হয়। এ অবস্থায় কর্তা-কর্ম, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, আমি-তুমি-তিনি—কিছুই থাকে না, এক অদ্বিতীয় নির্বিশেষ সত্তামাত্র বিদ্যমান থাকে। সর্বদাই আমরা এই অবস্থায় আছি, একবার মুক্ত হইলেই সদামুক্ত। মানুষ কার্য-কারণ-নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নয়। সুখ-দুঃখ মানুষের ভিতরে নাই। সুখ-দুঃখ সঞ্চরণশীল মেঘের মতো, মেঘ সূর্যকে আবৃত করিলে ছায়া পড়ে। সূর্য স্থির, মেঘই সঞ্চরণশীল; মানুষের সুখ-দুঃখও সেইরূপ। মানুষের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; মানুষ দেশকালের অতীত। এই ভাবগুলি মনের চিন্তা মাত্র, কিন্তু এগুলিকে আমরা বাস্তব সত্তা বলিয়া ভ্রম করি এবং আবৃত সেই মহিমান্বিত সত্যকে দেখিতে পাই না। আমাদের চিন্তার পদ্ধতিকেই 'কাল' বলি, কিন্তু আমরা শাশ্বত 'বর্তমান কাল'। ভাল-মন্দ আমাদের সম্বন্ধে আরোপিত অবস্থামাত্র। একটিকে ছাড়া অন্যটিকে পাওয়া যায় না, কারণ একটি ব্যতীত অন্যটির অর্থ বা অস্তিত্ব নাই। যতদিন আমরা দ্বৈতভাব গ্রহণ করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক্ ভাবি, ততদিন আমরা অবশ্যই ভাল-মন্দ দেখিব।

কেন্দ্রস্থলে উপনীত হইয়াই, পরমাত্মার সহিত এক হইয়াই আমরা ইন্দ্রিয়ের মোহ হইতে অব্যাহতি পাইব। এই বাসনাজ্বর—এই অস্বস্তিকর অশ্রান্ত উৎকট পিপাসা যখন চিরতরে নিবৃত্ত হইবে, কেবল তখনই ভাল-মন্দ হইতে অব্যাহতি পাইব, কারণ দুই-ই আমরা অতিক্রম করিয়াছি। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে অগ্নি যেমন আরও প্রজ্বলিত হয়, উপভোগের দ্বারা কামও সেইরূপ বৃদ্ধি পায় মাত্র।[১] কেন্দ্র হইতে যত দূরে, চক্র ততই দ্রুত চলিতে থাকে, বিশ্রামও তত কম। কেন্দ্রাভিমুখী হও। কামনা দমন কর, উহাকে নির্মূল কর। মিথ্যা 'অহং'ভাব দূর কর, তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টি পরিষ্কার হইবে এবং আমরা ঈশ্বর দর্শন করিব। যে-অবস্থায় উপনীত হইয়া আমরা প্রকৃত স্বরূপে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা কেবল ইহ-পরলোকের ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়াই লাভ করা যায়। কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই বুঝিতে হইবে—আমরা এখনও বাসনার দাস। এক মুহূর্তের জন্যও সম্পূর্ণভাবে আশা ত্যাগ কর, দেখিবে কুয়াসা কাটিয়া যাইবে। মানুষ যখন নিজেই সব, তখন তাহার কিসের আকাঙ্ক্ষা? সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আত্মতুষ্ট ও আত্মরতি হওয়াই জ্ঞানযোগের রহস্য। 'নাস্তি' বলিলে 'নাস্তি'-ভাব লাভ করিবে; 'অস্তি' বলিলে 'অস্তি'-ভাব পাইবে। অন্তরাত্মার অর্চনা কর, আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই; যাহা-কিছু আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা মায়া —ভ্রান্তি।

৭

বিশ্বের সবই আত্ম-সাপেক্ষ, কিন্তু আত্মা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। 'আমরা আত্মা'—ইহা জানিলেই আমাদের মুক্তি। মরণশীল জীবরূপে আমরা মুক্ত নই, কখনও হইতে পারি না। মুক্ত মরণশীলতা—স্ববিরোধী শব্দ, কারণ মরণশীলতা পরিণামী এবং শুধু অপরিণামীই মুক্তি লাভ করিতে পারে। শুধু আত্মাই মুক্ত এবং আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্তা। মুক্তির জন্য অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা আমরা অনুভব করি। সকল মতবাদ ও সকল বিশ্বাস সত্ত্বেও

---

১ ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥—বিষ্ণুপুরাণ

আমরা ইহা জানি, এবং আমাদের প্রতি কার্য দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে, আমরা ইহা জানি। ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন নহে; ইহার আপাতপ্রতীয়মান স্বাধীনতা প্রকৃত সত্তার ছায়ামাত্র। এই জগৎ যদি অসীম কার্য-কারণ-শৃঙ্খল হইত, মানুষ কোথায় দাঁড়াইয়া সাহায্য করিত? উদ্ধার-কর্তার দাঁড়াইবার একটি স্থান আবশ্যক, নতুবা খর জলস্রোতে মজ্জমান ব্যক্তিকে রক্ষা করা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? যে ধর্মোন্মাদ নিজেকে সামান্য কীট বলিয়া চীৎকার করিতেছে, সেও ভাবে সে সাধু হওয়ার পথে চলিতেছে। কীটের মধ্যেও সে সাধু (হওয়ার সম্ভাবনা) দর্শন করিতেছে।

মানব-জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য দুইটি—যথার্থ জ্ঞান (বিজ্ঞান) ও আনন্দ। মুক্তি ব্যতীত এই দুইটি লাভ করা অসম্ভব। এই দুইটি সকল জীবনেরই স্পর্শমণি। নিত্য একত্বকে এরূপ গভীরভাবে অনুভব করা উচিত যে, আমরা সকল পাপীর জন্য কাঁদিব, আমরা বোধ করিব—আমরাই পাপ করিতেছি। আত্মোৎসর্গ চিরন্তন নীতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়। সবই যখন এক, তখন কাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবে? সবই প্রেমময়, 'অধিকার' বলিয়া কিছু নাই। যীশু-প্রচারিত মহান্ উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করা হয় নাই, তাঁহার নীতি অনুসরণ করিয়া দেখ, জগতের উদ্ধার হয় কি না। বিপরীত নীতিই জগতের অনিষ্ট করিয়াছে। স্বার্থপরতা নয়, নিঃস্বার্থতাই এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে। অধিকারের ভাব একটি সীমাবদ্ধ ভাব; 'আমার' 'তোমার' বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই, কারণ 'আমিই তুমি', 'তুমিই আমি'। আমাদের 'দায়িত্ব' আছে, 'অধিকার' নাই। 'আমি জন্' বা 'আমি মেরী' না বলিয়া 'আমিই বিশ্ব' বলা উচিত। এই সীমাবদ্ধ ভাবগুলিই ভ্রান্তি এবং আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 'আমি জন্'—এই চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্রই যেন আমি কতকগুলি বাস্তব অধিকার চাই এবং বলিতে থাকি 'আমি ও আমার' এবং ক্রমাগত নূতন পার্থক্য সৃষ্টি করি। এরূপে নূতন পার্থক্যের সঙ্গে আমাদের দাসত্ব বা বন্ধন বাড়িতে থাকে এবং আমরা সেই সর্বগত অখণ্ড অনন্ত অভেদ সত্তা হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়ি। একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষই আছেন, আমরা প্রত্যেকেই সেই। অভেদ-জ্ঞানই প্রেম ও ভয়শূন্যতা; ভেদজ্ঞান ঘৃণা ও ভীতির দিকে লইয়া যায়। অভেদ-ভাব—একত্বই সকল প্রয়োজন মিটাইয়া দেয়। এই পৃথিবীতে বহিরাগত লোকদের

বাদ দিয়া আমরা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাই। কিন্তু ঊর্ধ্বে—আকাশে আমরা সেরূপ করিতে পারি না। সাম্প্রদায়িক ধর্মও ঠিক ঐরূপ আচরণ করিয়া বলিয়া থাকে—একমাত্র এই পথেই মুক্তি মিলিবে, অন্যান্য পথগুলি ভুল। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য—এই ক্ষুদ্র গণ্ডিগুলির লোপ করিয়া উহার সীমারেখা বাড়ানো, যে পর্যন্ত না উপলব্ধি হয়—সকল ধর্মই ঈশ্বরের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে হইবে। নব জীবনে দীক্ষালাভ, 'পুরাতন মানুষে'র মৃত্যু, নূতন মানুষের জন্ম—মিথ্যা অহমিকার নাশ, বিশ্বের একমাত্র সত্তা সেই আত্মার অনুভূতি এই স্বার্থ-বলিদানরূপ সত্যের দ্যোতক।

বেদের দুইটি প্রধান বিভাগ—কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যে অংশে কর্মের বিষয় আলোচিত, এবং জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ যে অংশে শুদ্ধ জ্ঞানের বিষয় আলোচিত। বেদে ধর্মভাবের ক্রমোন্নতির ধারা আমরা লক্ষ্য করি। ইহার কারণ এই—যখন উচ্চতর সত্যের উপলব্ধি হইল, তখনও উচ্চতর সত্যে পৌঁছিবার সোপান-স্বরূপ নিম্নতর সত্যের অনুভূতি রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নতর সত্যের অনুভূতি রক্ষা করার কারণ এই: ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, সৃষ্টি নিত্য বলিয়া জ্ঞানের প্রথম সোপানের উপযোগী একদল লোক সর্বদা থাকিবে, এবং সর্বোচ্চ দার্শনিক জ্ঞানের দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত থাকিলেও তাহা কখনও সকলের বোধগম্য হইবার নয়। অন্যান্য সব ধর্মে কেবল সত্যের চরম অনুভূতির উপায়টিই শুধু রক্ষিত হইয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, পূর্বভাবগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় নূতন ভাবগুলি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির বোধগম্য হইয়াছে এবং এইভাবে ধর্ম ক্রমশঃ বহু লোকের নিকট অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, এই কুফল প্রাচীন রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যগুলির বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর বিদ্রোহ-ঘোষণাতেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। আধুনিক মানুষ এই প্রাচীন মতবাদগুলি গ্রহণ করা দূরে থাকুক, কেন তাহারা এগুলি গ্রহণ করিবে, তাহার কারণ দর্শন করিবার জন্য স্পর্ধার সহিত দাবি করিতেছে। আধুনিক খ্রীষ্টধর্মের অধিকাংশ মতবাদই প্রাচীন পৌত্তলিকতা ও রীতিনীতিগুলির উপর নূতন নাম ও অর্থের প্রয়োগমাত্র। যদি প্রাচীন মূল সূত্রগুলি রক্ষিত হইত এবং পরিবর্তনের কারণ-

গুলি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইত, তাহা হইলে অনেক বিষয়ই সুবোধ্য হইত। বেদে ধর্মের প্রাচীন ভাবগুলি রক্ষিত আছে; এই কারণে ভাবগুলি ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিপুল ভাষ্য-প্রণয়ন আবশ্যক হইয়াছে, এবং ভাবগুলি কেন রাখা হইয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে। অর্থ না বুঝিয়া প্রাচীন মতগুলি দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার দরুন অনেক কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে অধুনা-বিস্মৃত ভাষায় মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে; এখন আর ঐ মন্ত্রগুলির কোন প্রকৃত অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্বেই ক্রমবিকাশবাদ বেদে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু ডারুইন এই মতবাদটি সত্য বলিয়া স্বীকার না করা পর্যন্ত, ইহা হিন্দুদিগের একটি কুসংস্কাররূপে পরিগণিত হইত।

প্রার্থনা ও উপাসনার বাহ্য রীতি-নীতিগুলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে এবং শুধু বাহ্য আচারমাত্রে পর্যবসিত হইতে না দিলে এগুলি কল্যাণপ্রদ। এগুলি চিত্তকে শুদ্ধ করে। কর্মযোগী চায় প্রত্যেকেই তাহাব পূর্বে মুক্তি লাভ করুক। অন্যকে মুক্ত হইতে সাহায্য করাই তাহার একমাত্র মুক্তি। 'কৃষ্ণভক্তদের সেবাই তাহার শ্রেষ্ঠ উপাসনা।' কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন, 'সমগ্র জগতের পাপ গ্রহণ করিয়া আমাকে নরকে যাইতে দাও, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ হউক।' এই ভাবের প্রকৃত উপাসনা আত্মোৎসর্গে পরিণত হয়। কথিত আছে, একজন মুনি তাঁহার বহুদিনের বিশ্বস্ত কুকুরটি যাহাতে স্বর্গে যাইতে পারে, সেজন্য স্বেচ্ছায় নিজের পুণ্য কুকুরকে দান করিয়া সানন্দে নরকে যাইতে উদ্যত হন।

বেদের জ্ঞানকাণ্ড শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞানই একমাত্র পরিত্রাতা; ইহার অর্থ এই—মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত জ্ঞান আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে। জ্ঞানই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, অর্থাৎ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞাতা নিজেকেই জানেন। একমাত্র কর্তা আত্মাই নিজেকে প্রকাশ করিবার এবং জানিবার চেষ্টা করে। দর্পণ যতই স্বচ্ছ হইবে, প্রতিবিম্ব ততই স্পষ্ট হইবে। ঐরূপ মানুষও শ্রেষ্ঠ দর্পণ; তাহার অন্তঃকরণ যত বেশী শুদ্ধ হইবে, তাহার মধ্যে ঈশ্বর তত বেশী প্রতিবিম্বিত হইবেন। মানুষ নিজেকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ মনে করিয়া এবং দেহাত্মবুদ্ধি আনিয়া ভ্রমে পতিত হয়। মায়া হইতে এই ভ্রমের উৎপত্তি। মায়া ঠিক ভ্রান্তি নহে; যে বস্তু প্রকৃতই যাহা, তাহাকে সেইরূপ না দেখিয়া

অন্যরূপে দেখাকেই 'মায়া' বলে। এই দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই ভেদ; ভেদ হইতে দ্বন্দ্ব ও দ্বেষ। এই ভেদবুদ্ধি যতদিন থাকিবে, ততদিন আমরা কখনও সুখী হইতে পারি না। জ্ঞানী বলেন—অজ্ঞান ও ভেদদৃষ্টিই সকল দুঃখের দুইটি কারণ। সংসারে আঘাতের পর আঘাত পাইয়া মানুষ মুক্তির জন্য সজাগ হয় এবং জন্মমৃত্যুর ভীষণ আবর্তন হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় খুঁজিয়া জ্ঞানের পথ আশ্রয় করে এবং স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হয়। মুক্তিলাভের পর মানুষ সংসারকে একটি প্রকাণ্ড যন্ত্ররূপে দেখে এবং যাহাতে নিজের হাতটি যন্ত্রের চক্রের মধ্যে না পড়ে, সে বিষয়ে সাবধান হয়। এইরূপে মুক্ত পুরুষের কর্মনিবৃত্তি হয়। কোন্ শক্তি মুক্ত পুরুষকে কর্মে আবদ্ধ করিতে পারে? তিনি লোকের হিত করেন, কারণ ইহা তাঁহার প্রকৃতি; কোন কল্পিত কর্তব্যের প্রেরণায় তিনি পৃথিবীর হিত করেন না। যাহারা এখনও ইন্দ্রিয়ের দাস, তাহাদের সম্বন্ধে এ-কথা প্রযোজ্য নয়। নিকৃষ্ট অহমিকা যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার জন্যই এই মুক্তি; তিনি আত্মায় প্রতিষ্ঠিত—কোন নিয়মের অধীন নহেন, তিনি মুক্ত এবং পূর্ণ। তিনি প্রাচীন কুসংস্কারগুলি অতিক্রম করিয়া সংসারচক্রের বাহিরে গিয়াছেন। প্রকৃতি আমাদের নিজেদেরই দর্পণস্বরূপ। মানুষের কর্মশক্তির সীমা আছে, কিন্তু বাসনা অসীম, সেজন্যই আমরা কর্মবিমুখ হইয়া অপরের কর্মশক্তি কাজে লাগাইয়া তাহাদের শ্রমের ফল ভোগ করিতে সচেষ্ট হই। কাজের জন্য যন্ত্র আবিষ্কার দ্বারা কখনই মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, কারণ আমরা বাসনার পরিতৃপ্তি করিতে গিয়া বাসনার সৃষ্টি করি; নিঃশেষিত না হইয়া আমাদের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অতৃপ্ত বাসনা লইয়া মরিলে বাসনা-পরিতৃপ্তির বৃথা অন্বেষণে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দুরা বলেন, 'মনুষ্য-শরীর ধারণ করিবার পূর্বে আমাদের আশী-লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে।' বাসনা নাশ করিয়া উহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাও—ইহাই জ্ঞানের কথা। ইহাই একমাত্র পন্থা। সব কার্য-কারণ-সম্বন্ধ দূর করিয়া আত্মাকে উপলব্ধি কর। শুধু মুক্তিই যথার্থ নীতিজ্ঞান দিতে পারে। শুধু কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা অনন্তকাল থাকিলে নির্বাণ লাভ অসম্ভব হইত। এই কার্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ মিথ্যা 'অহং'-এর নাশই নির্বাণ। কারণের অতীত হওয়াই মুক্তি। আমাদের যথার্থ স্বরূপ

সৎ ও মুক্ত। আমরা শুদ্ধসত্ত্ব, অ-সৎ হওয়া বা অন্যায় কর্ম করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। যখন আমরা চক্ষু বা মন দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি, তখন 'ইহা' বা 'উহা' সংজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে অভিহিত করি, কিন্তু বাস্তবিক এক সৎ-বস্তুই আছেন, সব বৈচিত্র্য সেই একেরই ব্যাখ্যা। আমরা কোন-কিছু হই না, আমাদের যথার্থ স্বরূপকেই পুনঃপ্রাপ্ত হই। অজ্ঞান ও অসাম্য সকল দুঃখের কারণ—বুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত সার কথা বৈদান্তিকেরা গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ ইহাই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ও এই মানব-শ্রেষ্ঠের বিস্ময়কর প্রজ্ঞার নিদর্শন। আসুন, আমরা সাহসী ও অকপট হই; তবেই আন্তরিক শ্রদ্ধা লইয়া যে-কোন পথই অবলম্বন করি না কেন, তাহাতেই মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছিব। শৃঙ্খলের পরস্পর-সংযোজক খণ্ডগুলির একটি হাতে আসিলেই ক্রমশঃ একের পর এক করিয়া সমগ্র শৃঙ্খলটি হস্তগত হইবে। মূলে জলসেচন করিলেই সমগ্র বৃক্ষ সিঞ্চিত হইবে। প্রতি পত্রে জলসিঞ্চন দ্বারা সময় নষ্ট হইবে মাত্র, উপকার কিছুই হইবে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় ঈশ্বরকে লাভ করিবার চেষ্টা কর; তাঁহাকে লাভ করিলেই আমাদের সব পাওয়া হইল। গির্জা, ধর্মমত, পূজাপদ্ধতি—এগুলি ধর্মের অপরিণত চারাগাছকে রক্ষা করিবার বেড়া মাত্র; কিন্তু পরে যাহাতে চারাগাছটি মহীরুহ হইয়া উঠিতে পারে, সেজন্য এই বেড়াগুলি তুলিয়া ফেলিবে। সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়, বাইবেল, বেদ, শাস্ত্র এই ধর্মের চারাগাছের টবের মতো; কিন্তু চারাগাছকে টবের বাহির গিয়া বিস্তার লাভ করিতে হইবে।

আমরা এই পৃথিবী, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক—সব লোকেরই অন্তর্গত, ইহা আমরা সমভাবে অনুভব করিতে শিখিব। আত্মা দেশ ও কালের অতীত; দৃষ্টিসম্পন্ন সব চোখই আমার চোখ; ঈশ্বরের গুণগানে রত সব মুখই আমার মুখ; প্রত্যেক পাপীও আমিই। আমরা কিছুতেই বদ্ধ নই, আমরা বিদেহ। এই বিশ্বই আমাদের দেহ। আমরা স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো সব বস্তুকেই প্রতিবিম্বিত করিতেছি, কিন্তু পূর্বাপর আমরা সেই একই আছি। আমরা যাদুকর, ইচ্ছামত লাঠি ঘুরাইয়া চোখের সামনে নানা দৃশ্য সৃষ্টি করিতেছি, কিন্তু আমাদিগকে এই-সকল দৃশ্যপ্রপঞ্চের অন্তরালে যাইয়া আত্মজ্ঞান লাভ

করিতে হইবে। এই বিশ্ব কেটলির মধ্যে ফুটন্ত জলের মতো; প্রথমে একটি, তারপর আর একটি, তারপর বহু বুদ্বুদের সৃষ্টি হইয়া অবশেষে সব জল এককালে ফুটিয়া উঠিবে এবং বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে। প্রথমতঃ মহান্ আচার্যগণ বুদ্বুদের মতো এখানে একজন, ওখানে একজন আবির্ভূত হইয়াছেন; অবশেষে কিন্তু সকল প্রাণীই বুদ্বুদে পরিণত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে। চিরনবীন সৃষ্টি নূতন জল আনিয়া বার বার এই নিয়মের মধ্য দিয়া চলিতে থাকিবে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতগুলি বুদ্বুদের আবির্ভাব হইয়াছে, বুদ্ধ ও যীশু ইহাদের মধ্যে দুইটি মহত্তম বুদ্বুদ। তাঁহারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, স্বয়ং মুক্ত হইয়া অপরকে মুক্ত হইতে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই পূর্ণ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের গুণের দ্বারাই তাঁহাদিগকে বিচার করিতে হইবে, দোষের দ্বারা নয়। খ্রীষ্ট পূর্ণতার আদর্শে পৌঁছিতে পারেন নাই, কারণ তিনি সর্বদা নিজের প্রচারিত অতি উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করেন নাই, এবং সর্বোপরি স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমান অধিকার দেন নাই। স্ত্রীজাতি তাঁহার জন্য যথাসাধ্য করিলেও তিনি তাহাদের একজনকেও ধর্মপ্রচারক করেন নাই; সেমিটিক-বংশে তাঁহার জন্মই ইহার নিঃসন্দেহ কারণ। মহানুভব আর্যগণ ও তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধ স্ত্রীলোককে পুরুষের সমান অধিকার দিয়াছেন। আর্যদের নিকট ধর্মে স্ত্রী-পুরুষ জাতিবিচার ছিল না। বেদ ও উপনিষদে নারীরাও চরম সত্যের প্রবক্তা ছিলেন, এবং পুরুষের সহিত সমভাবে পূজা পাইতেন।

৮

সুখ ও দুঃখ দুই-ই শৃঙ্খল, একটি সোনার, অপরটি লোহার; আমাদের বন্ধন ঘটাইতে এবং স্বরূপের উপলব্ধি হইতে নিবৃত্ত করিতে দুই-এরই শক্তি কিন্তু সমান। আত্মা সুখ-দুঃখ দুই-এরই অতীত। এই সুখ-দুঃখ অবস্থা মাত্র, এবং অবশ্যই পরিবর্তনশীল। আত্মার প্রকৃতি নিত্য আনন্দ ও শান্তি। এই আনন্দ ও শান্তির অবস্থা আমাদিগকে নূতন করিয়া লাভ করিতে হইবে না, ইহা আমাদের অধিগতই আছে। দৃষ্টির মলিনতা ধুইয়া ফেলিলেই উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। আমরা সততই আত্মায় অধিষ্ঠিত থাকিব এবং সম্পূর্ণ প্রশান্তির সহিত এই চঞ্চল বিশ্বপট দর্শন করিব। এ বিশ্বব্যাপার শুধু শিশুর

খেলা—ইহা যেন আমাদের চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট করিতে না পারে। মন যদি স্তুতিতে হৃষ্ট হয়, নিন্দায় ব্যথিত হইবে। ইন্দ্রিয়ের সুখ, এমন কি মনের সুখও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বাহ্যজগৎ-নিরপেক্ষ যথার্থ বিমল সুখ আমাদের অন্তরেই আছে। এই আত্মার আনন্দই পৃথিবীতে 'ধর্ম' নামে অভিহিত। আমাদের অন্তরে যত বেশী আনন্দ, আমরা তত বেশী ধার্মিক। সুখের জন্য যেন আমরা জগতের দিকে চাহিয়া না থাকি।

কয়েকটি গরীব জেলেনী প্রবল ঝড়ের মুখে পড়িয়া এক ধনীর উদ্যান-বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ধনী তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আহার করাইলেন এবং মনোহর পুষ্পের সৌরভে আমোদিত এক গ্রীষ্মাবাসে বিশ্রামের স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। জেলেনীরা এই সুবাসিত উদ্যান-বাটীতে শয়ন করিল বটে, কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। তাহারা যেন আকাঙ্ক্ষিত কোন-কিছু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেটি ফিরিয়া না পাওয়া পর্যন্ত সুস্থ বোধ করিতেছিল না। অবশেষে তাহাদের একজন উঠিয়া গিয়া যেখানে মাছের ঝুড়িগুলি রাখা ছিল, সেখান হইতে সেগুলি ঘরে লইয়া আসিল, তখন সেই চিরাভ্যস্ত গন্ধ পাইবামাত্র সকলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

আমাদের নিকট এই জগৎটি যেন সেই মাছের ঝুড়ির মতো না হয়; আমরা যেন সুখের জন্য ইহার উপর নির্ভর না করি। এটি তামসিক অর্থাৎ তিন গুণের মধ্যে যেটি নিকৃষ্ট, তাহার দ্বারা বদ্ধ হওয়া। ইহার ঠিক উপরের স্তরটি 'অহং'ভাবপূর্ণ; সেখানে অহরহ 'আমি'র প্রকাশ দেখা যায়। এই প্রকৃতির লোকেরা সময় সময় সৎকার্য করে এবং ধার্মিক হয়; ইহারা রাজসিক বা কর্মপর প্রকৃতির। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা শ্রেষ্ঠ; তাঁহারা শুধু আত্মাতেই বাস করেন। এই তিন প্রকার গুণ অল্পবিস্তর সকল মানুষেই আছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুণ প্রবল হয় মাত্র। রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং পরে দুইটিকেই সত্ত্বগুণে নিমজ্জিত করিতে হইবে।

• 'সৃষ্টি' অর্থে নূতন কিছু গড়া নয়, সাম্যভাব ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা। খণ্ড খণ্ড সোলা একপাত্র জলের তলদেশে নিক্ষেপ করিলে তাহারা স্বতন্ত্রভাবে ও একযোগে সবেগে উপরের দিকে উত্থিত হয়; সকল সোলা উপরে উঠিয়া

সাম্যভাব লাভ করিলে গতি বা জীবনসংগ্রাম থামিয়া যায়। সৃষ্টিব্যাপারেও এইরূপ। সমত্বে পৌঁছিলে অস্থির ভাবগুলি নিবৃত্ত হয় এবং তথাকথিত জীবনযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। জীবনের সঙ্গে মন্দ জড়িত থাকিবেই, কারণ সাম্যভাব ফিরিয়া পাইলে জগৎ লোপ পাইবে; যেহেতু সাম্য ও ধ্বংস একই বস্তু। দুঃখশূন্য সুখ বা অশুভশূন্য শুভ কোনকালেই সম্ভব নয়, কেন না সাম্যভাবের অভাবই জীবন। আমরা চাই মুক্তি; জীবন বা সুখ বা মঙ্গল আমাদের কাম্য নয়। সৃষ্টি নিত্য, ইহার আদি বা অন্ত নাই; ইহা যেন অনন্ত হ্রদের বক্ষে চিরচঞ্চল তরঙ্গপ্রবাহ। এই হ্রদের অনেক স্থল অতলস্পর্শ, অনেক স্থল শান্ত, কিন্তু সদাই তরঙ্গভঙ্গ চলিতেছে, সাম্য অবস্থা লাভের জন্য সংগ্রাম অনন্ত। জীবন ও মৃত্যু একই সত্যের নামান্তর মাত্র, একই মুদ্রার দুই পিঠ। দুই-ই মায়া—এই মুহূর্তে প্রাণধারণের, পরমুহূর্তেই প্রাণত্যাগের দুর্বোধ্য চেষ্টা। এ-সকলের ঊর্ধ্বে আত্মাই প্রকৃত স্বরূপ। আমরা সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করি এবং পরে আমাদের জন্য উহা জীবন্তভাব ধারণ করে। বিষয়গুলি স্বয়ং প্রাণশূন্য, আমরাই তাহাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি, এবং পরে আমরাই কখন বা বিষয় উপভোগ করি, আবার কখন মূঢ়ের ন্যায় বিষয় হইতে ত্রস্তভাবে পলায়ন করি! এই জগৎ সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়—সত্যের ছায়া মাত্র।

কবি বলিয়াছেন, 'কল্পনা সত্যের সোনালী আভাস'; অন্তর্জগৎ—প্রকৃত সত্তা—বহির্জগৎ হইতে অনন্তগুণ বড়। বহির্জগৎ প্রকৃত সত্তার ছায়াময় অভিক্ষেপ। রজ্জুদর্শনকালে সর্পদর্শন হয় না, আবার সর্প দৃষ্ট হইলে রজ্জুদৃষ্টি তিরোহিত হয়। একই সময়ে রজ্জু ও সর্পজ্ঞান অসম্ভব। ঠিক তেমনি যখন আমরা জগৎ দেখি, তখন আত্মাকে উপলব্ধি করি না, ইহা কেবল বুদ্ধির ধারণা। ব্রহ্মানুভূতিতে 'অহং'-জ্ঞান ও জগৎ-বোধ লোপ পায়। আলো কখনও অন্ধকার জানে না, আলোতে অন্ধকার নাই; (ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নাই) ব্রহ্মই সব। যখন একজন ঈশ্বর স্বীকার করি, তখন বুঝিতে হইবে—প্রকৃতপক্ষে আত্মাকেই নিজেদের হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া আমাদের বাহিরে অর্চনা করিতেছি; কিন্তু সর্বাবস্থাতেই তিনি আর অন্য কেহ নন—আমাদেরই যথার্থ স্বরূপ, এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর।

যেখানে আছে, সেখানেই থাকা পশুর প্রকৃতি; ভালোকে গ্রহণ এবং মন্দকে বর্জন করাই মানুষের প্রকৃতি; গ্রহণ বা বর্জন না করিয়া নিত্যানন্দে থাকাই

দৈবী প্রকৃতি। আসুন, আমরা দৈবী প্রকৃতি লাভ করি; আমাদের হৃদয়কে সমুদ্রের মতো উদার করিয়া, অকিঞ্চিৎকর পার্থিব বস্তুগুলির অতীত হইয়া জগৎকে শুধু চিত্রের মতো দেখি। কেবল তখনই আমরা সম্পূর্ণ অনাসক্ত-ভাবে জগৎকে উপভোগ করিতে পারি।

জগতে ভালোর সন্ধান কর কেন, এখানে কি তাহা পাইতে পারি? সংসার যত উৎকৃষ্ট বস্তুই দিক না কেন, ইহা ঘোলা জলে খেলিতে খেলিতে শিশুদের কয়েকটি কাচের মালা পাওয়ার মতো; মালাগুলি বার বার তাহাদের হাত হইতে পড়িয়া যায়—আবার অনুসন্ধান চলে। ধর্ম ও ঈশ্বর অসীম শক্তিপ্রদ। মুক্ত অবস্থায় আমরা শুধু আত্মা; মুক্ত হইলেই অমৃতত্বে স্থিতি; ঈশ্বরও মুক্ত হইলেই ঈশ্বরপদবাচ্য।

'অহং'-সৃষ্ট সংসার-বাসনা ত্যাগ করিতে না পারিলে আমরা কখনও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না; অতীতে কেহ কখনও পারে নাই, ভবিষ্যতেও কখন পারিবে না। সংসার-ত্যাগের অর্থ সম্পূর্ণভাবে অহংকে ভুলিয়া যাওয়া, 'অহং'-কে একেবারে না বোধ করা, দেহে বাস করিয়াও দেহের অধীন না হওয়া। এই ধূর্ত অহমিকা সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। মানব-জাতির হিত করিবার শক্তি কেবল সেই নীরব কর্মীদেরই আছে, যাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া পরকে ভালবাসিবার জন্য জীবন ধারণ করেন। তাঁহারা কখনও 'আমি, আমার' বলেন না, অন্যের হিতসাধন করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইয়াই তাঁহারা ধন্য। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ এক হইয়াছেন, কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না বা জ্ঞাতসারে কোন কর্মও করেন না। তাঁহারাই প্রকৃত জীবন্মুক্ত—সম্পূর্ণ নিষ্কাম, ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের অতীত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত তাঁহারা ব্যক্তিত্বহীন তত্ত্ব মাত্র। ক্ষুদ্র 'আমি' যতই বিসর্জন করিব, ততই আমরা ঈশ্বরভাবাপন্ন হইব। চলুন, আমরা ক্ষুদ্র 'আমি'কে পরিত্যাগ করি, তবেই আমাদের অন্তরে বৃহৎ 'আমি' আসিবে। যখন আমাদের মন হইতে 'অহং'-ভাব সম্পূর্ণ দূর হয়, তখনই আমরা উৎকৃষ্ট কর্মী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হই। বাসনাশূন্য ব্যক্তিদের কর্মই মহৎ ফল প্রসব করে। যাহারা তোমার নিন্দা করে, তাহাদিগকে আশীর্বাদ কর; চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার মিথ্যা 'অহং' দূর করিতে সাহায্য করিয়া নিন্দুকেরা তোমার কি মহৎ উপকার করিতেছে! যথার্থ 'আমি'কে আঁকড়াইয়া থাকো,

শুধু সৎ চিন্তা কর, দেখিবে ধর্মপ্রচারকদের অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করিতেছ। পবিত্রতা ও নীরবতা হইতেই মহা শক্তিময়ী বাণী আসে।

৯

ব্যক্ত ভাব কার্যতঃ নিম্নতর অবস্থা বা অধঃপতন, যেহেতু ভাব কেবল অক্ষরের সাহায্যেই ব্যক্ত হয়। তাই সেণ্ট পল বলিয়াছেন, 'অক্ষর ভাবকে নষ্ট করে।'[১] অক্ষরের মধ্যে জীবন থাকিতে পারে না—অক্ষর ভাবের প্রতিবিম্ব মাত্র। তথাপি ভাবপ্রকাশের জন্য ভাবকে জড়ের দ্বারা আবৃত করিতে হইবে। আবরণের মধ্যে আমরা প্রকৃত সত্য দেখিতে পাই না, আবরণকেই প্রতীক না ভাবিয়া যথার্থ সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। এই ভ্রম প্রায় সকলেরই হয়। প্রত্যেক মহান্ আচার্য ইহা জানেন এবং সাবধান হন, কিন্তু জনসাধারণ অপ্রত্যক্ষ অপেক্ষা প্রত্যক্ষের পূজা করিতেই বেশী উন্মুখ। ব্যক্তিত্বের পিছনে তত্ত্বের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এবং সময়োপযোগী নূতন ভাব দিবার জন্যই মহাপুরুষদের আবির্ভাব। সত্য চিরদিন অপরিবর্তনীয়, কিন্তু ইহাকে শুধু নূতন আকারে উপস্থিত করা যাইতে পারে, অথবা মানবজাতি তাহাদের উন্নতি অনুসারে যেভাবে গ্রহণ করিতে পারে, সেভাবেই সত্যের প্রকাশ হয়। নাম-রূপ হইতে মুক্ত হওয়াই, বিশেষতঃ যখন সুস্থ-অসুস্থ, সুন্দর-কুৎসিত কোনপ্রকার শরীরধারণেরই প্রয়োজন বোধ করি না, তখনই আমাদের এই সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে। 'অনন্ত উন্নতি' হইলেই অনন্ত বন্ধনও হইবে। সমস্ত ভেদভাব অতিক্রম করিয়া অনন্ত অভেদভাব, একত্ব বা ব্রহ্মভাব আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে। আত্মা সমস্ত ব্যক্তিত্বের মিলনভাব, এবং নির্বিকার ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। আত্মা জীবন নন, কিন্তু জীবনধারণ করিয়া থাকেন। আত্মা জীবন-মৃত্যু এবং শুভাশুভের অতীত—নির্বিশেষ একত্ব। নরকের মধ্য দিয়াও সত্যানুসন্ধান করিতে সাহসী হও। নাম-রূপ বা সবিশেষ বস্তু সম্বন্ধে মুক্তি প্রযোজ্য নহে। 'আমি দেহধারী-রূপে মুক্ত' —এ-কথা কোন দেহবান্ ব্যক্তিই বলিতে পারে না। দেহভাব মন হইতে অপগত না হইলে মুক্তি হইবে না। আমাদের মুক্তি অন্যের ক্লেশকর হইলে আমরা সেখানে মুক্ত নই। আমরা যেন কাহারও ক্লেশের কারণ না হই।

১ Letter killeth.—St. Paul

প্রকৃত অনুভূতি এক হইলেও আপেক্ষিক অনুভূতি বহু। সমগ্র জ্ঞানের উৎস আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, পিপীলিকার মধ্যেও যেরূপ, শ্রেষ্ঠ দেবতার মধ্যেও সেইরূপ। প্রকৃত ধর্ম এক; সকল দ্বন্দ্ব কেবল রূপ প্রতীক ও 'উদাহরণ' লইয়া। চক্ষুষ্মানের পক্ষে স্বর্গরাজ্য বা স্বর্ণযুগ চিরকাল বর্তমান। ফলকথা, আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে বলিয়াই আমরা জগৎকে হারাইয়াছি মনে করি। মূঢ়! শুনিতে পাও না কি, তোমার হৃদয়মধ্যেই সেই অনাদি সঙ্গীত—'সচ্চিদানন্দ, সোঽহং সোঽহং' অহরহ ধ্বনিত হইতেছে?

ছায়ামূর্তির (phantasm) সাহায্য ছাড়া চিন্তা করিবার চেষ্টা আর অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা একই প্রকার। প্রত্যেক ভাবেরই দুইটি অংশ—মানস ও শাব্দ। এ দুই-ই আমাদের প্রয়োজন। বিজ্ঞানবাদী (idealist) বা জড়বাদী—কেহই জগৎ-ব্যাপারনিরূপণে সমর্থ নয়। এ-বিষয়ে ভাব ও অভিব্যক্তি দুয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। দর্পণে নিজের মুখ দেখার মতো জগৎরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। অতএব কেহই স্বীয় আত্মা বা ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেকেই সেই আত্মা; এবং এই আত্মাকে জ্ঞানের বিষয় করিবার জন্য ঐ প্রতিবিম্বরূপেই তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। দর্শনাতীত তত্ত্বের উদাহরণগুলি দর্শন করাই তথাকথিত প্রতীকোপাসনা—সচরাচর যতটা অনুমান করা যায়, দেববিগ্রহের প্রসার তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যাপক।

দারু ও শিলা হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষ পর্যন্ত ইহা ব্যাপৃত। সাকারোপাসনা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সতত বিরুদ্ধভাব হইতেই ভারতে মূর্তিপূজার সূত্রপাত হইয়াছে। বেদে মূর্তিপূজার উল্লেখ নাই; স্রষ্টা এবং সখারূপে ঈশ্বরের অভাববোধের প্রতিক্রিয়া হইতেই শ্রেষ্ঠ আচার্যগণকে মূর্ত ঈশ্বর কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। বুদ্ধদেব ঠিক এইভাবে মূর্ত-ঈশ্বররূপে লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা অর্চিত হইতেছেন। হিংসামূলক সংস্কার-চেষ্টার দ্বারা প্রকৃত সংস্কার সর্বদাই বাধাপ্রাপ্ত হয়। অর্চনার প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষেরই প্রকৃতিগত; উচ্চতম দার্শনিকতার সাহায্যেই শুধু শুদ্ধ ভাবময় অবস্থায় আরোহণ করা যায়। কাজেই পূজা করিবার জন্যই মানুষ তাহার ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাবাপন্ন করিয়া লইবে। প্রতীক যেরূপই হউক না

কেন, ইহার অন্তরালে স্বয়ং ঈশ্বর আছেন—এইভাবে মূর্তিপূজা অতি উত্তম, প্রতীকের ভাবে নয়।

'শাস্ত্রে আছে'—শুধু এই বিশ্বাসের কুসংস্কার হইতে সর্বোপরি নিজেদের মুক্ত করিতে হইবে। বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতিকে কোন শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া লইতে বাধ্য করা অতি ভীষণ অত্যাচার। শাস্ত্রপূজা নিকৃষ্ট পুতুলপূজা। কোন গর্বিত ও স্বাধীনচিত্ত হরিণ তাহার শাবকটিকে কর্তৃত্বের ভাবে বলিতেছিল, 'আমার দিকে চাহিয়া আমার এই সুদৃঢ় শৃঙ্গ-দুইটি দেখ! ইহাদের এক আঘাতেই আমি মানুষ মারিতে পারি। হরিণ হওয়া কি সুখের বিষয়!' ঠিক সেই মুহূর্তে দূরে শিকারীর ভেরীর শব্দ শুনিবামাত্র কোনদিকে না চাহিয়া হরিণ বেগে পলাইতে লাগিল, বিস্ময়াবিষ্ট শাবকটিও তাহার পিছন পিছন ছুটিতে লাগিল। নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া শাবক জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এত বলশালী ও সাহসী, তবু মানুষের শব্দ শুনিয়া পলায়ন করেন কেন?' হরিণ বলিল, 'বৎস, নিজের বল-বিক্রমের উপর আস্থা থাকিলেও কেন যে ঐ শব্দ শুনিলেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায়ই হউক, কি-একটা ভাবের বশে পলাইতে বাধ্য হই, তাহা জানি না।' আমাদের দশাও ঐরূপ। শাস্ত্রনিবদ্ধ বিধির 'ভেরী-রব' শ্রবণমাত্রই প্রাচীন অভ্যাস ও সংস্কারগুলি যেন আমাদিগকে পাইয়া বসে এবং ইহা জানিবার পূর্বেই আমরা যেন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমাদের যথার্থ স্বরূপ—মুক্ত অবস্থা বিস্মৃত হই।

জ্ঞান চিরন্তন। আধ্যাত্মিক সত্যের আবিষ্কারককে আমরা 'প্রত্যাদিষ্ট' বলি এবং তিনি জগৎকে যাহা দান করেন, তাহা ঐশ্বরিক বাণী। কিন্তু ঐশ্বরিক বাণী বা প্রত্যাদেশও চিরন্তন, সুতরাং ইহাকে শেষ জ্ঞান বলিয়া অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয়। যিনি নিজেকে উপযুক্ত আধাররূপে প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার ভিতরেই ঐ ঐশ্বরিক ভাব প্রকাশ হইতে পারে। পরিপূর্ণ পবিত্রতা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, কেন না 'যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, তাঁহারাই ঈশ্বর দর্শন করিবেন।' সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ জীব, আর এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এখানেই মানুষ মুক্তিলাভে সমর্থ। মানুষই ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বোচ্চ কল্পনা। যত কিছু গুণ ঈশ্বরে অর্পণ করি, সব অল্পমাত্রায় মানুষেই বিদ্যমান। যখন উচ্চস্তরে আরোহণ করি এবং এইরূপ ঈশ্বর-ধারণার

অতীত হই, তখন দেহ, মন ও কল্পনার বাহিরে গিয়া এ জগৎকে দেখি না। সেই পরম নিত্য ভাবে আরূঢ় হইলে আমাদের পার্থিব সম্বন্ধ থাকে না; তখন সবই বিষয়শূন্য বিষয়ীতে পর্যবসিত হয়। মুক্তিক্ষেত্র এই জগতে মানুষই শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। যাঁহারা সমত্ব বা পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা 'ঈশ্বরে বাস করেন' বলিয়া কথিত। 'আত্মা দ্বারা আত্মাকে হনন'ই ঘৃণা। অতএব প্রেমই জীবনের নীতি। এই অবস্থায় উন্নীত হওয়াই পূর্ণত্ব লাভ করা; কিন্তু আমরা যত বেশী পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইব, ততই নৈষ্কর্ম্য লাভ করিব। সাত্ত্বিক ব্যক্তি এ-জগৎকে শিশুর খেলা বলিয়া দেখেন ও জানেন এবং ইহা লইয়া মাথা ঘামান না। দুইটি কুকুরছানাকে পরস্পর মারামারি ও কামড়াকামড়ি করিতে দেখিলে আমরা বিশেষ বিস্মিত হই না। আমরা জানি ইহা গুরুতর ব্যাপার নয়। পূর্ণ-মানুষ জানেন এই সংসার মায়ার খেলা। জীবনকে সংসার বলে। বিরুদ্ধ শক্তিগুলির যে ক্রিয়া আমাদের উপর হইতেছে, তাহারই ফল এই জীবন। জড়বাদী বলে—মুক্তির কথা ভ্রমমাত্র। আদর্শবাদী বলে—বন্ধনের কথা স্বপ্নমাত্র। বেদান্ত প্রচার করে—একই কালে আমরা মুক্তও বটে, বদ্ধও বটে। ইহার অর্থ এই যে, জাগতিক স্তরে আমরা কখনও মুক্ত নই, কিন্তু অধ্যাত্ম-স্তরে চিরমুক্ত। আত্মা মুক্তি ও বন্ধন দুইয়েরই অতীত। আমরা ব্রহ্মস্বরূপ, আমরা ইন্দ্রিয়াতীত অবিনশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ—আমরা পরমানন্দস্বরূপ।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত

আমেরিকান সংস্করণের ভূমিকা

এই বক্তৃতা ও পরবর্তী আলোচনাটি সাঙ্কেতিক লিপি অনুসারে গৃহীত হইয়াছিল। ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী এগুলির উপর শুধু একবার চোখ বুলাইতে পারিয়াছিলেন; আশা করা যায় কোন ভুল নাই। অধ্যাপক ল্যানম্যান ও অধ্যাপক রাইট অনুগ্রহপূর্বক চূড়ান্ত সংশোধনে সাহায্য করিয়াছেন। আলোচনাংশের বিবৃতিতে কয়েকটি প্রশ্ন অপরিহার্য-ভাবে হারাইয়া গিয়াছে। প্রথম চারিটি টীকা স্বামীজী দ্বারাই সংযোজিত। মূল বক্তৃতায় হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতিগুলি স্বামীজী প্রথমে সংস্কৃতেই বলেন, পরে অনুবাদ করিয়া দেন। অনুবাদগুলি যেভাবে বলিয়াছিলেন, সেইভাবেই রাখা হইল।

বক্তৃতা ও আলোচনার পর সন্নিবেশিত হইয়াছে—২২শে ও ২৪শে মার্চ বৈকালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী যে-সব কথা বলিয়াছিলেন। উত্তরগুলি সাঙ্কেতিকভাবে গৃহীত, কিন্তু প্রশ্নগুলি নয়। কয়েকটি অপ্রকাশিত বক্তৃতার নির্বাচিত অংশও সংযোজিত হইয়াছে। কতকগুলি উত্তর এবং নির্বাচিত অংশের বিষয়বস্তু একই, তবে বর্ণনাভঙ্গির বৈচিত্র্যের জন্য সেগুলিও সব রাখা হইল।

মাত্র একটি ভাষণে বেদান্তদর্শনের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আশা করা যায়, প্রাচ্যের জীবন ও চিন্তা বিষয়ে যাঁহারা আগ্রহান্বিত, তাঁহাদের কাছে এই বক্তৃতা, আলোচনা এবং সঙ্গের প্রশ্নোত্তর ও নির্বাচিত অংশগুলি মূল্যবান্।

J. P. F.

(মিঃ ফক্স)

বেদান্ত-দর্শন

১৮৯৬ খৃঃ ২৫শে মার্চ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ফিলজফিক্যাল সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতা

আজকাল যাহাকে সাধারণভাবে 'বেদান্ত-দর্শন' বলা হয়, ভারতের বর্তমান বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির সব মতই তাহার অন্তর্গত। সেজন্য নানাভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং আমার মনে হয়, ক্রমোন্নতির ধারায় তাহা হইয়াছে—দ্বৈতবাদে সেগুলির আরম্ভ এবং অদ্বৈতবাদে পরিসমাপ্তি। বেদান্তের শব্দগত অর্থ বেদের অন্ত বা শেষ,—বেদ হিন্দুদের শাস্ত্র।[১] পাশ্চাত্যে কখন কখন 'বেদ' বলিতে উহার স্তোত্র ও আনুষ্ঠানিক অংশ-মাত্র বোঝায়। কিন্তু বর্তমানকালে বেদের এই অংশের ব্যবহার প্রায় নাই বলিলেই চলে; ভারতে এখন 'বেদ' বলিতে সাধারণতঃ বেদান্তই বোঝায়। সব ভাষ্যকারই শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিবার সময় বেদান্ত হইতেই লইয়া থাকেন—ইহাই নিয়ম; ভাষ্যকারগণের কাছে বেদান্তের আর একটি বিশেষ নাম 'শ্রুতি'[২]। 'বেদান্ত' নামে পরিচিত সব গ্রন্থই বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের পরে রচিত হয় নাই। যেমন 'ঈশোপনিষদ্' নামক বেদান্ত-গ্রন্থ যজুর্বেদের বিংশ অধ্যায়ে রহিয়াছে, ইহা বেদের প্রাচীনতম খণ্ড। বেদের ব্রাহ্মণ বা অনুষ্ঠানমূলক অংশেও অপর কয়েকখানি উপনিষদ্[৩]

---

১ বেদ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত: জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। প্রসিদ্ধ স্তোত্র ও ক্রিয়ানুষ্ঠান-বিধি বা ব্রাহ্মণগুলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। ক্রিয়ানুষ্ঠানবিধি হইতে স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ বেদের যে-সব অংশে রহিয়াছে, সেগুলির নাম উপনিষদ্। উপনিষদ্ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। সব উপনিষদ্-ই যে বেদের স্বতন্ত্র অংশরূপে রচিত, তাহা নয়। উহার কতকগুলি ব্রাহ্মণ অংশের মাঝে মাঝে ছড়াইয়া রহিয়াছে, আর অন্ততঃ একটি রহিয়াছে সংহিতাংশে। কখন কখন বেদের অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন গ্রন্থকেও 'উপনিষদ্' বলা হয়—যথা গীতা, কিন্তু বেদে নানাস্থানে যে-সকল দার্শনিক তথ্যপূর্ণ আলোচনা ছড়ানো আছে, সেগুলিকেই সাধারণতঃ 'উপনিষদ্' বলা হয়। এই আলোচনাগুলি সংগৃহীত হইয়া 'বেদান্ত' নামে অভিহিত হইয়াছে।

২ 'শ্রুতি'র অর্থ—যাহা শ্রুত হইয়াছে। শ্রুতি বলিতে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য বুঝাইলেও ভাষ্যকারগণ প্রধানতঃ উপনিষদ্ অর্থেই ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

৩ বলা হয়, উপনিষদের সংখ্যা একশত আট। এগুলির রচনাকাল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে এ-কথা নিশ্চিত যে, উপনিষদ্ বৌদ্ধযুগের পূর্বে রচিত। কতকগুলি অপ্রধান উপনিষদে

রহিয়াছে। বাকী উপনিষদ্‌গুলি স্বতন্ত্র, বেদের ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু সেগুলি যে বেদের অন্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এ-কথা ভাবিবার কোন হেতু নাই, কারণ আমরা জানি, এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং বহু ব্রাহ্মণ-অংশও লুপ্ত হইয়াছে। কাজেই ইহা খুবই সম্ভব যে, এই উপনিষদ্‌গুলি কোন-না-কোন 'ব্রাহ্মণ'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণ-অংশগুলি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু উপনিষদ্‌গুলি রহিয়া গিয়াছে। এই উপনিষদ্‌গুলি 'আরণ্যক' নামেও অভিহিত।

কাজেই বেদান্তই কার্যতঃ হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থ, এবং ভারতীয় দর্শনে যতগুলি আস্তিক মতবাদ আছে, তাহাদের সবগুলিই বেদান্তকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এমন কি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপযোগী হইলে বৌদ্ধ এবং জৈনেরা পর্যন্ত প্রমাণরূপে বেদান্তের শ্লোক উদ্ধৃত করেন। ভারতের সব দার্শনিক মতবাদই বেদকে ভিত্তি বলিয়া দাবি করিলেও প্রত্যেক মতই ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছে। সর্বশেষটি ব্যাসের মত; ইহা পরবর্তী অন্যান্য দার্শনিক মতগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বেদনিষ্ঠ; এবং ইহা সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি পূর্ববর্তী দর্শন-গুলির সঙ্গে বেদান্তের উক্তির সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করিয়াছে। সেইজন্য বিশেষভাবে ইহাকেই 'বেদান্ত-দর্শন' বলা হয়; বর্তমান ভারতে 'ব্যাসসূত্র'গুলিই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি। বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ আবার এই ব্যাসসূত্রগুলির বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধারণতঃ ভারতে এখন তিন শ্রেণীর ভাষ্যকার[৪] রহিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা অবলম্বনে তিনটি দার্শনিক মত

অবশ্য পরবর্তী যুগের ঘটনা ও বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, সেই উপনিষদ্‌গুলি পরবর্তী কালে রচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রন্থের মূল অংশ বহু প্রাচীন হইলেও তাহার মধ্যে পরবর্তী কালের বহু ঘটনা ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব বাড়াইবার জন্য এরূপ করেন।

৪ ব্যাখ্যা নানা ধরনের আছে, যেমন ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী, চূর্ণী ইত্যাদি। এগুলির মধে ভাষ্য ছাড়া আর সবগুলিই গ্রন্থেব মূল পাঠের, অথবা তদন্তর্গত কঠিন শব্দের সরলার্থ। ভাষ্যকে ঠিক শব্দার্থ-ব্যাখ্যা বলা যায় না, মূলগ্রন্থ অবলম্বনে একটি দার্শনিক মতবাদ ব্যাখ্যা করাই ভাষ্যের উদ্দেশ্য —শুধু শব্দার্থ-প্রকাশ নয়। একটি দর্শন স্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য। ভাষ্যকার মূল গ্রন্থের বিষয়কে নিজ মতবাদের প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া সেই মতবাদেরই বিস্তার করেন।

ও সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে—প্রথমটি দ্বৈত, দ্বিতীয়টি বিশিষ্টাদ্বৈত এবং তৃতীয়টি অদ্বৈত। ইহাদের মধ্যে দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর সংখ্যাই ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশী; তাঁহাদের তুলনায় অদ্বৈতবাদীর সংখ্যা অতি অল্প। এই তিনটি মতবাদেরই ভাবধারা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব; তবে আরম্ভ করিবার পূর্বে একটি কথা বলিয়া রাখি—সাংখ্যদর্শনের মনোবিজ্ঞানই এই তিনটি মতবাদের সাধারণ মনোবিজ্ঞান। সাংখ্য মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ন্যায় ও বৈশেষিক মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে, বিরোধ শুধু কয়েকটি অপ্রধান খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া।

তিনটি বিষয়ে সব বেদান্তবাদীই একমত; সকলেই ঈশ্বরে, বেদে এবং কল্পে বিশ্বাসী। বেদের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 'কল্প' সম্বন্ধে বিশ্বাস এইরূপ: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা-কিছু জড়পদার্থ আছে, সে-সকলই 'আকাশ' নামক একটি মূল পদার্থ হইতে সৃষ্ট; এবং সব শক্তিই—মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, জীবনীশক্তি বা যে-কোন শক্তি হউক না কেন, সবই—'প্রাণ'নামক একটি মূল শক্তি হইতে উদ্ভূত। আকাশের উপর প্রাণের ক্রিয়ার ফলেই এই বিশ্ব সৃষ্ট বা অধ্যস্ত[৫] হইয়াছে। কল্পারম্ভে আকাশ গতিহীন, অনভিব্যক্ত থাকে। তারপর উহার উপর প্রাণের ক্রিয়া শুরু হয়, আর প্রাণ

বেদান্তের উপর বহু ভাষ্যাদি রচিত হইয়াছে। ব্যাস-রচিত দার্শনিক সূত্রগুলির (ব্যাস-সূত্র বা বেদান্ত-সূত্র) মধ্যেই বেদান্তের তত্ত্বগুলি শেষ ও চরম প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ব্যাস-রচিত উত্তর মীমাংসা নামক এই গ্রন্থখানিই বেদান্ত-সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য গ্রন্থ—বেদান্তই বা বলি কেন, হিন্দুশাস্ত্রের বক্তব্য বুঝিবার প্রামাণ্য গ্রন্থ এটি। সর্বাধিক বিরোধী সম্প্রদায়গুলিকেও ব্যাস-সূত্র গ্রহণ করিতে এবং তাহার সঙ্গে নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালেও বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যকারগণ হিন্দুদের তিনটি প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী। প্রাচীন ভাষ্যগুলি বোধ হয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আধুনিককালে বুদ্ধের পরবর্তী যুগের ভাষ্যকারগণ—শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব সেগুলির পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছেন। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রবর্তন করেন, রামানুজ করেন প্রাচীনকালের বোধায়নের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের, আর মধ্ব দ্বৈতবাদের। ভারতে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রভেদ প্রধানতঃ দার্শনিক বিষয় লইয়া; অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে প্রভেদ অতি সামান্য, কারণ দর্শন ও ধর্মের ভিত্তি সকলেরই এক।

৫ তোমাদের ইংরেজী ভাষায় 'ক্রিয়েশন' (Creation—সৃষ্টি) শব্দটি সংস্কৃত ভাষার 'প্রক্ষেপ' (Projection) শব্দটির ঠিক অনুরূপ। কারণ ভারতে এমন কোন ধর্ম-সম্প্রদায় নাই, যাহারা 'শূন্য (বা অসৎ) হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে'—পাশ্চাত্যের এই ধারণায় বিশ্বাস করে। পূর্ব

যতই ক্রিয়াশীল হয়, আকাশ হইতে ততই গ্রহ প্রাণী মানুষ নক্ষত্র প্রভৃতি স্থূল ও স্থূলতর পদার্থের সৃষ্টি হইতে থাকে। গণনাতীত কালের পর এই অভিব্যক্তি থামিয়া যায়, এবং বিলয় শুরু হয়; প্রত্যেক বস্তুই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তুতে বিলীন হইতে হইতে পুনরায় মূল আকাশ ও প্রাণে পরিণত হয়। তখন নূতন 'কল্প' আরম্ভ হয়। প্রাণ এবং আকাশের পারেও কিছু আছে, উভয়কে বিরাট মন বা 'মহৎ' নামক তৃতীয় সত্তায় বিলীন করা যাইতে পারে। বিরাট মন—আকাশ বা প্রাণ সৃষ্টি করে না, নিজেকেই প্রাণ ও আকাশে রূপায়িত করে।

এখন মন, আত্মা ও ঈশ্বর-বিষয়ে বিশ্বাস লইয়া আমরা আলোচনা করিব। সর্বজনগ্রাহ্য সাংখ্য মনস্তত্ত্ব অনুসারে অনুভূতির ক্ষেত্রে—যেমন কোন-কিছু দেখার সময়—প্রথমেই দেখিবার যন্ত্র বা করণ চক্ষু। চক্ষুর পিছনে দর্শনের ইন্দ্রিয়—চক্ষুর স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্র রহিয়াছে; এগুলি বাহিরের যন্ত্র নয়, কিন্তু এগুলি ছাড়া চক্ষু দেখিতে পারিবে না। অনুভূতির জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন। মন থাকা চাই এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগও চাই। এ ছাড়াও বেদনাকে বুদ্ধির বা মনের প্রতিক্রিয়াশীল নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই; বুদ্ধির নিকট হইতে প্রতিক্রিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগৎ প্রতিভাত হয় এবং অহং-বোধও জাগ্রত হয়। তারপর আসে ইচ্ছা; কিন্তু তবু সব হইল না। যেমন পরপর বিচ্ছুরিত আলোর স্পন্দনে প্রস্ফুট কয়েকটি চিত্রকে লইয়া একটি সম্পূর্ণ চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে হইলে সেগুলির প্রত্যেকটিকে কোন একটি স্থির বস্তুর উপর ফেলিতে হয়, সেইরূপ মনের প্রত্যেকটি ভাবকেও একত্র করিয়া দেহ ও মনের তুলনায় যাহা স্থির, সেরূপ কোন একটি পদার্থের উপর প্রক্ষেপ করিতেই হইবে; এই স্থির পদার্থটি জীবাত্মা—পুরুষ বা আত্মা।

সাংখ্যদর্শনের মতে 'বুদ্ধি' নামক মনের প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থাটি মহৎ বা বিরাট মনের পরিণাম, রূপান্তর বা একটি বিশেষ অভিব্যক্তি। মহৎ-ই স্পন্দনশীল চিন্তায় রূপান্তরিত হয়; এবং উহা এক অংশে পরিবর্তিত হইয়া

হইতে বিদ্যমান কোন সৎ-বস্তুর প্রক্ষেপকেই আমরা 'সৃষ্টি' বলিয়া বুঝি।—(স্বামীজীর 'আত্মা' নামক বক্তৃতা হইতে)

ইন্দ্রিয় হয়, অপর অংশে হয় সূক্ষ্ম ভূত (তন্মাত্র)। এই সব-কিছুর সমবায়ে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্ট হয়। সাংখ্যদর্শনের মতে এই মহৎ-এরও পরে আর একটি অবস্থা আছে, যাহার নাম 'অব্যক্ত' বা অপ্রকাশিত ; সেখানে মনেরও প্রকাশ নাই, শুধু কারণগুলি থাকে। এই অবস্থার আর একটি নাম 'প্রকৃতি'। এই প্রকৃতির পারে প্রকৃতি হইতে চির-স্বতন্ত্র পুরুষ রহিয়াছেন ; ইনিই সাংখ্যের নির্গুণ সর্বব্যাপী আত্মা। পুরুষ কর্তা নন, সাক্ষী-মাত্র। পুরুষকে বুঝাইতে স্ফটিকের উদাহরণ দেওয়া হয়। পুরুষ বর্ণহীন স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো ; উহার সম্মুখে বিভিন্ন বর্ণ রাখিলে উহাকে সেই-সব বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্ফটিক তাহাতে রঞ্জিত হয় না।

বেদান্তবাদীরা সাংখ্যের 'পুরুষ ও প্রকৃতি'-বিষয়ক মত নাকচ করিয়া দেন। তাঁহাদের মতে এ দুটির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, সংযোগ-সেতুর সাহায্যে সে ব্যবধান ঘুচাইতে হইবে। একদিকে সাংখ্যমত প্রকৃতিতে পৌঁছায়, এবং পৌঁছিয়াই প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আত্মার কাছে আসিবার জন্য তাহাকে তৎক্ষণাৎ একলাফে অন্য প্রান্তে যাইতে হয়। সাংখ্য মতানুযায়ী এই বিভিন্ন বর্ণগুলি স্বরূপতঃ বর্ণহীন আত্মার উপর ক্রিয়াশীল হইতে সমর্থ হয় কি করিয়া? সেজন্য বেদান্তবাদীরা প্রথম হইতেই নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, এই আত্মা ও এই প্রকৃতি এক[৬]।

এমন কি দ্বৈতবেদান্তবাদীরাও স্বীকার করেন, আত্মা বা ঈশ্বর বিশ্বের শুধু নিমিত্তকারণই নন, তিনি উপাদানকারণও। কিন্তু তাঁহাদের কাছে ইহা কথার কথা মাত্র, প্রাণের কথা নয় ; কারণ তাঁহারা নিজ সিদ্ধান্তকে এইভাবে এড়াইতে চান : তাঁহারা বলেন, বিশ্বে তিনটি সত্তা আছে—ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি। প্রকৃতি ও জীব যেন ঈশ্বরের দেহ ; এই অর্থেই বলা চলে যে, ঈশ্বর ও সমগ্র বিশ্ব এক। কিন্তু চিরকাল ধরিয়া প্রকৃতি ও বিভিন্ন জীব

৬ বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। সাংখ্যের পুরুষই বেদান্তের ঈশ্বর হইয়াছেন। সব মতবাদই সাংখ্যের মনস্তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয়েই অসীম আত্মায় বিশ্বাসী, প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, সাংখ্য বলে আত্মা বহু। সাংখ্যমতে জগতের ব্যাখ্যার জন্য বাহিরের কোনকিছুর প্রয়োজন নাই। বৈদান্তিক বিশ্বাস করেন, অদ্বিতীয় আত্মাই রহিয়াছেন, তিনিই বহু রূপে প্রতীত হন। সাংখ্যের বিশ্লেষণের উপরেই আমাদের মতবাদ বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত।—(১৮৯৬, ২৪শে মার্চের কথোপকথন হইতে)

পরস্পর স্বতন্ত্রই থাকিয়া যায়। কেবল কল্পারম্ভে তাহারা অভিব্যক্ত হয়, এবং কল্পান্তে সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বীজাকারে থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তবাদীরা জীব বা আত্মা সম্বন্ধে এই মতবাদ অগ্রাহ্য করেন; এবং উপনিষদের প্রায় সমগ্র অংশ স্বপক্ষে পাইয়া তাহারই উপর নিজেদের মত সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া তুলেন। সব উপনিষদেরই একমাত্র কাজ এই বিষয়টি প্রমাণ করা—'যেমন একখণ্ড মৃত্তিকা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলে বিশ্বের সমস্ত মৃত্তিকাই জানা যায়, তেমনি এমন কি আছে, যাহা জানিলে বিশ্বের সব-কিছুই জানা যায়?'[1] অদ্বৈতবাদীর ভাব হইল সমগ্র বিশ্বকে এমন একটি সাধারণ তত্ত্বে লইয়া যাওয়া, যে তত্ত্বটি যথার্থই বিশ্বের সামগ্রিক সত্তা। তাঁহারা দাবি করেন—সমগ্র বিশ্বে একত্ব রহিয়াছে, এবং একটি সত্তাই নিজেকে এই-সব বিভিন্ন রূপে ব্যক্ত করিতেছেন। সাংখ্য যাহাকে প্রকৃতি বলেন, তাঁহারা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু বলেন যে, প্রকৃতিই ঈশ্বর। এই অস্তিত্বই—এই সৎ-ই বিশ্ব মানুষ জীব এবং যাহা-কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহাতে রূপায়িত হইয়াছেন। মন ও মহৎ সেই এক সৎ-এরই অভিব্যক্তি মাত্র। তবে ইহাতে অসুবিধা এই যে, ইহা সর্বেশ্বরবাদ হইয়া দাঁড়ায়। যে বস্তুকে তাঁহারা অপরিবর্তনীয় 'সৎ' বলিয়া স্বীকার করেন—কারণ যাহা চরম সত্য তাহার পরিবর্তন নাই—তাহা এই পরিবর্তনীয় ও বিনাশশীল পদার্থে রূপায়িত হয় কেমন করিয়া?

এ-বিষয়ে অদ্বৈতবাদীদের বিবর্তবাদ বা আপাত-পরিবর্তনবাদ বলিয়া একটি মত আছে। দ্বৈতবাদী ও সাংখ্যবাদীদের মতে এই বিশ্বের সব-কিছুই মূল প্রকৃতির অভিব্যক্তি। একদল অদ্বৈতবাদী ও একদল দ্বৈতবাদীর মতে সমগ্র বিশ্বই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শঙ্করপন্থী খাঁটি অদ্বৈতবাদী-দের মতে সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। ঈশ্বর বিশ্বের উপাদান-কারণ, কিন্তু সত্যই তাহা নন, উপাদান বলিয়া প্রতীত হন মাত্র। এ-বিষয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদাহরণ প্রসিদ্ধ। রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হইয়াছিল মাত্র, রজ্জু কখনও সর্পে পরিণত হয় নাই। ঠিক তেমনি এই প্রকাশমান সমগ্র বিশ্বই সেই সৎ-স্বরূপ; ইহাতে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই.

১ ছান্দোগ্য উপ., প্রপাঠক ৬, ১-৪; মুণ্ডক, ১।৩

আমরা যে-সব পরিবর্তন ইহাতে দেখি, সেগুলি আপাত-প্রতীয়মান। দেশ, কাল ও নিমিত্ত এই পরিবর্তন ঘটায়; অথবা মনোবিজ্ঞানের উচ্চতর সামান্যী-করণ অনুসারে বলা যায় যে, নাম ও রূপের দ্বারাই ইহা ঘটে। নাম ও রূপ দিয়াই আমরা একটি পদার্থকে অপরটি হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝি। নাম ও রূপ-ই পার্থক্যের সৃষ্টি করে। আসলে সবই এক ও অভেদ।

আবার বেদান্তবাদীরা বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ বলিয়া কিছু নাই এবং সৃষ্টির মূলে একটি সত্তা আছে, শুধু বুদ্ধির দ্বারা অধিগম্য জগৎ বলিয়াও কিছু নাই। রজ্জু সর্পে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় মাত্র, ইহা সত্য পরিবর্তন নয়; যখন ভুল ভাঙিয়া যায়, তখন সর্প শূন্যে লীন হয়; মানুষ যখন অজ্ঞানের মধ্যে থাকে, তখন সে সৃষ্ট জগৎ-ই দেখে, ঈশ্বরকে দেখে না। যখন সে ঈশ্বরকে দেখিতে পায়, তখন তাহার কাছে জগৎ একেবারে লোপ পায়। এই ভ্রমকে 'অবিদ্যা' বা 'মায়া' বলা যায়; ইহাই এই সৃষ্টির কারণ, ইহারই প্রভাবে চরম সত্যকে, অপরিবর্তনীয়কে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বলিয়া আমরা মনে করি। এই মায়া মহাশূন্য বা অস্তিত্বহীন কিছু নয়। সৎ-ও নয়, অসৎ-ও নয়—ইহাই হইল মায়ার সংজ্ঞা; অর্থাৎ মায়া আছে—এ-কথাও বলা চলে না, আবার নাই—এ-কথাও বলা যায় না। একমাত্র চরম সত্যকে 'সৎ' বলা যাইতে পারে; সেদিক দিয়া দেখিলে মায়া অসৎ, মায়ার অস্তিত্ব নাই। মায়া অসৎ—এ-কথাও বলা যায় না; কারণ তাহা যদি হইত, তবে ইহা কখনও জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিত না। কাজেই ইহা এমন একটা কিছু, যাহা সৎ বা অসৎ কোনটিই নয়; এজন্য বেদান্তদর্শনে ইহাকে 'অনির্বচনীয়' অর্থাৎ বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, বলা হইয়াছে।

মায়া-ই এই বিশ্বের আসল কারণ। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যাহাতে উপাদান দেন, মায়া তাহাতে দেয় নাম ও রূপ; এবং উপাদানই এই সব-কিছুতে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। কাজেই অদ্বৈতবাদীদের কাছে জীবাত্মার কোন স্থান নাই। তাহাদের মতে জীবাত্মা মায়ার সৃষ্টি; আসলে জীবাত্মার কোন (পৃথক্) অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যদি সর্বব্যাপী একটি মাত্র সত্তা থাকে, তবে আমি একটি সত্তা, তুমি একটি সত্তা, সে আর একটি সত্তা—ইত্যাদি কিরূপে সম্ভব? আমরা সকলেই এক; দ্বৈতজ্ঞানই অনর্থের মূল। বিশ্ব হইতে আমি পৃথক্—এই বোধ যখনই জাগিতে শুরু করে, তখনই

প্রথমে আসে ভয়, এবং তারপর আসে দুঃখ। 'যেখানে একে অপরের কথা শোনে, একে অপরকে দেখে, তাহা অল্প। যেখানে একে অপরকে দেখে না, একে অপরের কথা শোনে না—তাহাই ভূমা, তাহাই ব্রহ্ম। সেই ভূমাতেই পরম সুখ, অল্পে সুখ নাই।'[১]

কাজেই অদ্বৈত-দর্শনের মতে বস্তুর এই পৃথক্‌করণ, এই সৃষ্টি যেন সাময়িকভাবে মানুষের যথার্থ স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের পরিবর্তন মোটেই ঘটে নাই। নিম্নতম কীট এবং উচ্চতম মানুষের মধ্যে সেই একই ঈশ্বরীয় সত্তা বিদ্যমান। কীটের দেহই নিম্নতম রূপ, যেখানে দেবত্ব মায়া দ্বারা অনেক বেশী পরিমাণে আবৃত রহিয়াছে; যেখানে দেবত্বের উপর আবরণ ক্ষীণতম, তাহাই উচ্চতম রূপ বা দেহ। সব-কিছুর পিছনে সেই এক দেবত্বই বিরাজমান; এই সত্য অবলম্বন করিয়াই নীতির ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। অপরের অনিষ্ট করিও না। প্রত্যেককে আপনার মতো ভালবাসো, কারণ সমগ্র বিশ্বই এক। অপরের অনিষ্ট করিলে নিজেরই অনিষ্ট করা হয়; অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হয়। এই সত্য হইতেই অদ্বৈত-নীতির মূলতত্ত্বের উদ্ভব; ইহাকেই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—আত্মত্যাগ।

অদ্বৈতবাদী বলেন, এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ববোধই আমার সব অনর্থের মূল কারণ। এই অহং-বোধই আমাকে অপর হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই ঘৃণা, দ্বেষ, দুঃখ, সংগ্রাম এবং আরও সব অনর্থের সৃষ্টি করে। এই বোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়, সব দুঃখ চলিয়া যায়। কাজেই এই পৃথক্ আমিত্ব বোধ ত্যাগ করিতে হইবে। নিম্নতম জীবের জন্যও প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যখন কেহ একটি ক্ষুদ্র কীটের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়, বুঝিতে হইবে সে তখন অদ্বৈতবাদীর কাম্য পূর্ণত্বে পৌঁছিয়াছে; যে মুহূর্তে সে এভাবে প্রস্তুত হয়, সেই মুহূর্তেই তাহার সম্মুখ হইতে মায়ার আবরণ অপসৃত হয়, সে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে। এই জীবনেই সে অনুভব করিবে যে, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সে এক। কিছুক্ষণের জন্য এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যেন তাহার কাছে

১ ছান্দোগ্য উপ., ৭ম প্রপাঠক, ২৪।১

লুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং সে নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবে। কিন্তু যতক্ষণ দেহের কর্ম—প্রারব্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে দেহধারণ করিয়া থাকিতে হইবে।

এই অবস্থাকে—যে-অবস্থায় মায়ার আবরণ অপসৃত হইয়াছে অথচ শরীরটা কিছুদিন থাকিয়া যায়—বেদান্তবাদীরা 'জীবন্মুক্তি' বলেন। কেহ যদি মরীচিকা দেখিয়া কিছুদিন বিভ্রান্ত হয়—কিন্তু একদিন সে মরীচিকা অদৃশ্য হয়—তাহা হইলে পরদিন বা কিছুদিন পরে সম্মুখে আবার মরীচিকার আবির্ভাব হইলেও উহা দেখিয়া সে তখন আর ভুল করিবে না। মরীচিকা ভ্রম প্রথমবার দূর হইবার পূর্বে সে ব্যক্তি বাস্তব ও ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য করিতে পারিত না। কিন্তু মরীচিকা একবার অদৃশ্য হইলে, ভুল একবার ভাঙিলে চক্ষু ও ইন্দ্রিয় যতদিন কর্মক্ষম থাকিবে, ততদিন সে আবার মরীচিকা দেখিবে বটে, কিন্তু উহাকে বাস্তব বলিয়া আর কখনও ভুল করিবে না। বাস্তবজগৎ ও মরীচিকার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সে ধরিয়া ফেলিয়াছে, মরীচিকা আর কখনও তাহার ভ্রান্তি জন্মাইতে পারিবে না। তেমনি বেদান্তবাদী যখন নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার নিকট সমগ্র জগৎ লুপ্ত হয়। জগৎ আবার ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু পূর্বের সেই দুঃখময় জগৎ-রূপে নয়। দুঃখের কারাগার তখন সচ্চিদানন্দে—নিত্য সত্তায়, নিত্য জ্ঞানে, নিত্য আনন্দে—পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে; এই অবস্থা লাভ করাই অদ্বৈত-বেদান্তের লক্ষ্য।

প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

১৮৯৬ খৃঃ ২৫শে মার্চ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (U. S. A.) গ্রাজুয়েট ফিলজফিক্যাল সোসাইটির সভায় বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতার পর শ্রোতাদের সহিত স্বামীজীর নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর অনুসারে আলোচনা হইয়াছিল :

প্র। ভারতে দার্শনিক চিন্তা বর্তমানে কিরূপ ক্রিয়াশীল, তাহার কিছু জানিতে ইচ্ছা করি। এ-সকল বিষয় আজকাল কতটা আলোচিত হইয়া থাকে ?

উ। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতের অধিকাংশ লোকই প্রকৃতপক্ষে দ্বৈতবাদী, অতি অল্পসংখ্যকই অদ্বৈতবাদী। তাহাদের প্রধান আলোচনার বিষয়—মায়াবাদ ও জীবতত্ত্ব। আমি এদেশে আসিয়া দেখিলাম, এখানকার শ্রমজীবীরা বর্তমান রাজনীতিক অবস্থার সহিত বিশেষ পরিচিত, কিন্তু যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ধর্ম বলিতে তোমরা কি বোঝ, অমুক অমুক সম্প্রদায়ের ধর্মমত কি প্রকার ?'—তাহারা বলিল, 'আমরা জানি না, তবে গির্জায় যাই।' ভারতে কিন্তু কোন কৃষককে যদি জিজ্ঞাসা করি, 'তোমাদের শাসনকর্তা কে ?'—সে বলিবে, 'তা জানি না ; তবে খাজনা দিয়া থাকি।' কিন্তু যদি তাহাকে তাহার ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, সে অমনি বুঝাইয়া দিবে—সে দ্বৈতবাদী, এবং সে মায়া ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার ধারণা বিস্তারিতভাবে বলিতে প্রস্তুত হইবে। সে লিখিতে পড়িতে জানে না, কিন্তু এ-সকল সে সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে শিখিয়াছে এবং ঐ-সব বিষয় আলোচনা করিতে খুব ভালবাসে। সারাদিন কাজের পর কৃষকেরা গাছতলায় বসিয়া ঐ-সব তত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকে।

প্র। 'গোঁড়ামি' বলিতে হিন্দুগণ কি বুঝেন ?

উ। বর্তমান কালে আহার পান ও বিবাহ সম্বন্ধে জাতিগত বিধিনিষেধগুলি প্রতিপালন করাকেই 'গোঁড়ামি' বলে। তারপর হিন্দু যে-কোন মতে বিশ্বাস করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভারতে কখন সংঘবদ্ধ ধর্মমণ্ডলী বা চার্চ ছিল না, সুতরাং গোঁড়া বা খাঁটি হিন্দুমত গঠিত ও বিধিবদ্ধ করিবার জন্য একদল লোক কোন কালেই ছিল না। মোটামুটিভাবে আমরা বলিয়া থাকি, যাহারা বেদবিশ্বাসী, তাহারাই গোঁড়া বা খাঁটি হিন্দু ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

দেখিতে পাই, দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের অনেকেই বেদ অপেক্ষা পুরাণেই বেশী বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

প্র। আপনাদের হিন্দুদর্শন গ্রীকদের স্টোয়িক[1] (Stoic) দর্শনের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

উ। খুব সম্ভবতঃ আলেকজান্দ্রিয়া-বাসিগণের মধ্য দিয়া হিন্দুদর্শন উহার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পিথাগোরাস যে সাংখ্যমতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। যাহাই হউক, আমাদের ধারণা—সাংখ্যদর্শনই বেদ-নিবদ্ধ দার্শনিক-তত্ত্বসমূহকে যুক্তিবিচার দ্বারা সমন্বয় করিবার প্রথম চেষ্টা। এমন কি বেদেও 'কপিল' নামের উল্লেখ দেখিতে পাই: ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে[2]...অর্থাৎ যিনি পূর্বে জাত সেই কপিল ঋষিকে জ্ঞানে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

প্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত এই মতের কি বিরোধ?

উ। কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং আমাদের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য আছে। আমাদের পরিণামবাদ এবং আকাশ ও প্রাণতত্ত্ব ঠিক আপনাদের আধুনিক দর্শনের সিদ্ধান্তের মতো। আপনাদের পরিণামবাদ বা ক্রমবিকাশ আমাদের যোগ ও সাংখ্যদর্শনের ভিতর রহিয়াছে। যথা, পতঞ্জলি প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতির অন্য জাতিতে পরিণত হইবার কথা বলিয়াছেন।—'জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।'[3] তবে ইহার কারণ সম্বন্ধে পতঞ্জলির সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতভেদ আছে। তাঁহার পরিণামের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক। তিনি বলেন, ক্ষেত্রে নিকটবর্তী জলাশয় হইতে জলসেচনের জন্য যেমন কৃষককে কেবল জলাবরোধটি তুলিয়া ফেলিতে হয়—'নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'[4]—সেইরূপ সকল মানবই পূর্ব হইতেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন, কেবল এই-সকল বিভিন্ন অবস্থাচক্ররূপ প্রতিবন্ধক বা বাধা তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেইগুলি সরাইয়া ফেলিলেই তাহার সেই অনন্ত শক্তি মহাবেগে বাহির

১। খৃঃ পূঃ ৩০৮ গ্রীক দার্শনিক জেনো (Zeno) কর্তৃক এই দর্শন প্রচারিত হয়। এই মতে সুখ-দুঃখে ভাল-মন্দে সমভাবসম্পন্ন হওয়া এবং সহ্য করিয়া যাওয়াই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ।

২ শ্বেতাশ্বতর উপ., ৫।২

৩ যোগসূত্র, কৈবল্যপাদ, ২

৪ ঐ, ৩

হইয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইতর প্রাণীর ভিতর মনুষ্যভাব অবরুদ্ধ রহিয়াছে; যখন সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই সে মানুষরূপে অভিব্যক্ত হয়। আবার যখন উপযুক্ত সুযোগ ও অবসর উপস্থিত হয়, তখনই মানবের মধ্যে যে-ঈশ্বরত্ব বর্তমান, তাহা অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং আধুনিক নূতন মতবাদসমূহের সহিত আমাদের বিবাদ করিবার বিশেষ কিছু নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি-ব্যাপারে সাংখ্য মতের সহিত আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানের (Physiology) পার্থক্য অতি অল্প।

প্র। কিন্তু আপনাদের জ্ঞানার্জনের প্রণালী কি ভিন্ন ?

উ। হাঁ। আমরা দাবি করি, মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। বহির্বিজ্ঞানে বাহ্য বিষয়ে মনকে একাগ্র করিতে হয়—আর অন্তর্বিজ্ঞানে মনের গতিকে আত্মাভিমুখী করিতে হয়। আমরা মনের এই একাগ্রতাকে 'যোগ' আখ্যা দিয়া থাকি।

প্র। একাগ্র অবস্থায় কি এই-সকল তত্ত্বের সত্যতা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে ?

উ। যোগীরা এই একাগ্রতা-শক্তির ফল অতি মহৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা দাবি করেন, মনের একাগ্রতার দ্বারা জগতের প্রত্যেক সত্য—বাহ্য ও আন্তর সকল সত্য করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

প্র। অদ্বৈতবাদী সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলেন ?

উ। অদ্বৈতবাদী বলেন: এই-সব সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য যাহা কিছু, সবই মায়ার—এই আপাতপ্রতীয়মান প্রপঞ্চের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে উহাদের অস্তিত্ব নাই। তবে আমরা যতদিন মায়াবদ্ধ, ততদিন আমাদিগকে এই-সকল দৃশ্য দেখিতে হয়। এই দৃশ্যজগতে ঘটনাবলী কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ঘটিয়া থাকে। উহাদের বাহিরে আর কোন নিয়ম ও ক্রম নাই, সেখানে মুক্তি—স্বাধীনতা।

প্র। অদ্বৈতবাদ কি দ্বৈতবাদের বিরোধী ?

উ। উপনিষদ্ প্রণালীবদ্ধভাবে লিখিত নয় বলিয়া দার্শনিকেরা যখন কোন মতবাদ গঠন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা উপনিষদের মধ্য হইতে নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বচনাবলী বাছিয়া লইয়াছেন। সেই কারণে সকল দর্শনকারই উপনিষদ্‌কে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, নতুবা তাঁহাদের দর্শনের কোনরূপ ভিত্তিই থাকিতে পারিত না। তথাপি

প্রকৃতপক্ষে উপনিষদের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তাপ্রণালীর ভিত্তি দেখিতে পাই, আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদের বিরোধী নয়। আমরা বলি, সত্য বা ধর্ম লাভের তিনটি প্রয়োজনীয় সোপানের মধ্যে দ্বৈতবাদ অন্যতম সোপান মাত্র; প্রথমটিই দ্বৈতবাদ। তারপর মানুষ আরও উচ্চতর অবস্থায় উপস্থিত হয়—উহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। অবশেষে সে দেখিতে পায়, সে বিশ্বের সহিত অভিন্ন। সুতরাং এই তিনটি পরস্পর-বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক।

প্র। মায়া বা অজ্ঞান আছে কেন?

উ। কার্যকারণ-সংঘাতের সীমার বাহিরে 'কেন' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে না। মায়ার ভিতরেই কোন বস্তু সম্বন্ধে 'কেন' জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা বলি, প্রশ্নটিকে ন্যায়শাস্ত্র-সম্মতভাবে প্রকাশ করিতে পারিলেই আমরা উহার উত্তর দিব। তৎপূর্বে উত্তর দিবার অধিকার আমাদের নাই।

প্র। সগুণ ঈশ্বর কি মায়ার অন্তর্গত?

উ। হাঁ, এই সগুণ ঈশ্বর মায়ার মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নন। মায়া বা প্রকৃতির অধীন হইলে সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে 'জীবাত্মা' বলে এবং মায়াধীশ বা প্রকৃতির নিয়ন্তারূপে সেই নির্গুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম। যদি কোন ব্যক্তি সূর্য দেখিবার জন্য এখান হইতে যাত্রা করে, সে প্রথমে সূর্যকে ছোট দেখিবে; যতদিন না আসল সূর্যের নিকট পৌঁছিতেছে, ততদিন ইহাকে ক্রমশঃ বড় হইতে বড় দেখিবে। যতই সে অগ্রসর হয়, ততই সে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য দেখিতেছে বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু সে যে এক সূর্যই দেখিতেছে, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এইভাবে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম-সত্তারই বিভিন্ন রূপমাত্র, সুতরাং সেই হিসাবে তাহারা সত্য। ইহাদের মধ্যে কোনটিই মিথ্যা নয়, তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি, এগুলি নিম্নস্তরের অবস্থা মাত্র।

প্র। সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তাকে জানিবার বিশেষ প্রণালী কি?

উ। আমরা বলি, দুইটি প্রণালী আছে। একটি ইতিবাচক প্রবৃত্তিমার্গ, অপরটি নেতিবাচক নিবৃত্তিমার্গ। প্রথমোক্ত মার্গে সমগ্র জগৎ চলিতেছে—ইহা প্রেমের পথ। যদি প্রেমের পরিধি অনন্তগুণ বাড়াইয়া দেওয়া যায়,

তবে আমরা সেই এক সর্বজনীন প্রেমে উপনীত হই। অপর পথ 'নেতি, নেতি' অর্থাৎ ইহা নয়, ইহা নয়—এইরূপ সাধন দ্বারা চিত্তের যে যে তরঙ্গ মনকে বহির্মুখী করিতে চেষ্টা করে, তাহাকেই নিবারণ করিতে হয়। পরিশেষে মনের যেন মৃত্যু হয়, তখন সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা এই অবস্থাকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা বা পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থা বলিয়া থাকি।

প্র। ইহা তাহা হইলে বিষয়ীকে (জ্ঞাতা বা দ্রষ্টাকে) বিষয়ে (জ্ঞেয় বা দৃশ্যে) নিমজ্জিত করার অবস্থা ?

উ। বিষয়ীকে বিষয়ে নয়, বিষয়কে বিষয়ীতে লীন করা। বাস্তবিক এই জগৎ লোপ পায়, কেবল আমি থাকি—একমাত্র আমিই বর্তমান।

প্র। আমাদের কয়েকজন জার্মান দার্শনিকের মত—ভারতের ভক্তিবাদ খুব সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল।

উ। আমি ইহাদের সহিত একমত নই, এরূপ অনুমান মুহূর্তমাত্রও টিকিতে পারে না। ভারতীয় ভক্তি পাশ্চাত্য ভক্তির মতো নয়। ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের মুখ্য ধারণা এই যে, উহাতে ভয়ের ভাব আদৌ নাই—কেবল ভগবান্‌কে ভালবাসা।

ভয়ে উপাসনা হয় না, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বদা শুধু ভালবাসার ভিতর দিয়াই উপাসনা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ অনুমান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। ভক্তির কথা অতি প্রাচীন উপনিষদ্‌সমূহেও রহিয়াছে; ঐ উপনিষদ্‌গুলি খ্রীষ্টানদের বাইবেল অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। সংহিতার মধ্যেও ভক্তির বীজ রহিয়াছে। 'ভক্তি' শব্দটিও পাশ্চাত্য শব্দ নয়। বেদ-মন্ত্রে উল্লিখিত 'শ্রদ্ধা' শব্দ হইতে ক্রমশঃ ভক্তিবাদের উদ্ভব হইয়াছিল।

প্র। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে ভারতবাসীর কিরূপ ধারণা ?

উ। খুব ভাল বলিয়াই ধারণা। বেদান্ত সকলকেই গ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতে একটি বিশেষত্ব আছে। মনে করুন, আমার একটি ছেলে আছে। আমি তাহাকে কোনপ্রকার ধর্মমত শিক্ষা দিব না—তাহাকে প্রাণায়াম শিখাইব, মনকে একাগ্র করিতে শিখাইব, এবং একটু সামান্য প্রার্থনা শিখাইব—আপনারা প্রার্থনা বলিতে যেরূপ বুঝেন, তাহা নহে, কেবল কতকটা এইভাবের প্রার্থনা শিখাইব :

'যিনি এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ধ্যান করি—তিনি আমার মনকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করুন'[১]। তাহার ধর্মশিক্ষা এইরূপ চলিবে, তারপর সে বিভিন্নমতাবলম্বী দার্শনিক ও আচার্যগণের মত শুনিতে থাকিবে। সে ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার মত নিজের সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া মনে করিবে, তাঁহাকেই গ্রহণ করিবে—তিনি তাহার গুরু হইবেন, সে শিষ্য হইবে। সে তাঁহাকে বলিবে, 'আপনি যে দর্শন প্রচার করিতেছেন, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট, অতএব ইহা আমাকে শিখাইয়া দিন।' আমাদের মূল কথাটা এই যে, আপনার মত আমার উপযোগী হইতে পারে না, আবার আমার মত আপনার উপযোগী হইতে পারে না। প্রত্যেকের সাধনপথ ভিন্ন ভিন্ন। আমার কন্যার সাধনপথ এক প্রকার, আমার পুত্রের অন্য প্রকার, আমার আবার সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেকেরই ইষ্ট বা নির্বাচিত পথ ভিন্ন হইতে পারে—এবং এই সাধনপথের বিষয় প্রত্যেকেই নিজ নিজ অন্তরে গোপন করিয়া থাকেন। ঐ পথের বিষয় আমি জানি ও আমার গুরু জানেন, আর কাহাকেও আমরা উহা জানাই না; কারণ আমরা লোকের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ করিতে চাই না। উহা অপরের নিকট প্রকাশ করিলে তাহার কোন উপকার হইবে না; কারণ প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইতে হইবে। এইজন্য সাধারণের নিকট কেবল সর্বজন-সম্মত দর্শন ও সাধনপ্রণালীসমূহই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—অবশ্য দৃষ্টান্তটি শুনিলে হাসি পাইবে। এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে হয়তো আমার উন্নতি হইতে পারে। এখন উহা আমার পক্ষে উপযোগী হইলেও আমি যদি সকলকে এক পায়ে দাঁড়াইতে উপদেশ দিই, সকলে আমার কথা শুনিয়া হাসিবে। এরূপ হওয়া খুব সম্ভব যে, আমি হয়তো দ্বৈতবাদী, আমার স্ত্রী অদ্বৈতবাদী। আমার কোন পুত্র ইচ্ছা করিলে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদের উপাসক হইতে পারে, তিনিই তাহার ইষ্ট। অবশ্য তাহাকে জাতিগত সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিতেই হইবে।

প্র। সকল হিন্দুই কি জাতিবিভাগে বিশ্বাসী?

১ গায়ত্রী-মন্ত্রের সরলার্থ

উ। বাধ্য হইয়া জাতিগত নিয়ম মানিতে হয়। আস্থা না থাকিলেও সামাজিক নিয়ম তাহাদের মানিতেই হয়।

প্র। এই প্রাণায়াম ও একাগ্রতার অভ্যাস কি সর্বসাধারণে করিয়া থাকে?

উ। হাঁ, তবে কেহ কেহ অতি অল্পমাত্রই অভ্যাস করিয়া থাকে—যতটুকু না করিলে ধর্মশাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করা হয়, ততটুকুই করিয়া থাকে। ভারতের মন্দিরগুলি এখানকার চার্চের মতো নয়। আগামী কালই সমুদয় মন্দির অন্তর্হিত হইতে পারে, লোকে উহার একান্ত অভাববোধ করিবে না। স্বর্গকাম বা পুত্রকাম হইয়া অথবা ঐরূপ অন্য কিছুর জন্য লোকে মন্দির নির্মাণ করায়। কেহ হয়তো খুব একটা বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইল এবং পূজার জন্য কয়েকজন পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া দিল, কিন্তু আমার সেখানে যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কারণ আমার যা-কিছু পূজা-পাঠ, তাহা আমার ঘরেই হইয়া থাকে। প্রত্যেক বাড়িতেই আলাদা একটি ঘর থাকে, তাহাকে ঠাকুরঘর বা পূজাগৃহ বলে। দীক্ষাগ্রহণের পর প্রত্যেক বালক-বালিকার জীবনে কর্তব্য—প্রথমে স্নান, তারপর পূজা করা। আর তাহার পূজা বা উপাসনা—এই প্রাণায়াম ও ধ্যান এবং বিশেষ একটি 'নাম' জপ করা। আর একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়—সাধনের সময় শরীরটাকে সোজা করিয়া রাখিতে হয়। আমাদের বিশ্বাস—মনের শক্তির দ্বারা শরীরটাকে সুস্থ রাখা যাইতে পারে। একজন এইরূপ পূজা করিয়া উঠিয়া গেল, আর একজন আসিয়া সেই আসনে বসিয়া পূজা করিতে লাগিল—সকলেই নিস্তব্ধভাবে নিজের নিজের পূজা করিয়া চলিয়া গেল। সময়ে সময়ে এক ঘরে তিন-চার জন বসিয়া উপাসনা করে, কিন্তু প্রত্যেকেরই উপাসনা-প্রণালী হয়তো ভিন্ন ভিন্ন। এইরূপ পূজা প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার করিয়া করিতে হয়।

প্র। আপনি যে অদ্বৈত অবস্থার কথা বলেন, উহা কি কেবল আদর্শমাত্র, না কেহ ঐ অবস্থা সত্যই লাভ করিয়াছেন?

উ। আমরা বলি, উহা প্রত্যক্ষের অন্তর্গত ব্যাপার—ঐ অবস্থা উপলব্ধি করিবারই বিষয়। যদি উহা কেবল কথার কথা হইত, তবে তো উহা কিছুই নয়। বেদ ঐ তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য তিনটি উপায়ের কথা

বলেন: শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। এই আত্মতত্ত্ব প্রথম শুনিতে হইবে, শুনিবার পর ঐ বিষয় বিচার করিতে হইবে—যেন অন্ধভাবে বিশ্বাস না করা হয়; বিচার করিয়া জানিয়া শুনিয়া যেন বিশ্বাস করা হয়, এইরূপে নিজ স্বরূপ বিচার করিয়া তবে উহার ধ্যানে নিযুক্ত হইতে হইবে—তখন উহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই যথার্থ ধর্ম। শুধু বিশ্বাস করা ধর্মের অঙ্গ নয়। আমরা বলি, এই সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থাই ধর্ম।

প্র। আপনি যদি কখন এই সমাধি-অবস্থা লাভ করেন, তবে আপনি কি উহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিবেন?

উ। না, কিন্তু সমাধি-অবস্থা বা পূর্ণ জ্ঞানভূমি যে লাভ হইয়াছে, তাহা আমরা জীবনের উপর উহার ফলাফল দেখিয়া জানিতে পারি। একজন মূর্খ নিদ্রিত হইল—নিদ্রাভঙ্গে সে যে মূর্খ, সেই মূর্খই থাকিবে, হয়তো আরও খারাপ হইতে পারে। কিন্তু কেহ সমাধিস্থ হইলে সমাধিভঙ্গের পর—সে একজন তত্ত্বজ্ঞ, সাধু মহাপুরুষ হইয়া দাঁড়ায়। তাহাতেই বুঝা যায়, এই দুই অবস্থা কতদূর ভিন্ন।

প্র। আমি অধ্যাপক —র প্রশ্নের অনুসরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আপনি এমন সব লোকের বিষয় জানেন কি না, যাঁহারা আত্ম-সম্মোহনতত্ত্বের (self-hypnotism) কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন ভারতে নিশ্চয় এই বিদ্যার খুব চর্চা ছিল, এখন আর ততদূর নাই। আমি জানিতে চাই, যাঁহারা এখন উহার চর্চা করেন, তাঁহারা ঐ তত্ত্ব সম্বন্ধে কি মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং উহার কিরূপ অভ্যাস বা সাধন করিয়াছেন।

উ। আপনারা পাশ্চাত্যদেশে যাহাকে সম্মোহনবিদ্যা (hypnotism) বলেন, তাহা আসল ব্যাপারের সামান্য অঙ্গমাত্র। হিন্দুরা উহাকে আত্মসম্মোহ-দূরীকরণ (self-de-hypnotization) বলেন। তাঁহারা বলেন, আপনারা তো সম্মোহিতই (hypontized) রহিয়াছেন—এই সম্মোহিত ভাবকে দূর করিতে হইবে, বিগতমোহ (de-hypnotized) হইতে হইবে।

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥'[১]

১ কঠ উপ., ২।২।১০, শ্বেঃ উঃ, ৬।১৪ মুঃ উঃ, ২।২।১০

—সেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারাও নয়; বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না, এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি? তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।

ইহা তো সম্মোহন (hypnotization) নয়—মোহ দূরীকরণ বা অপসারণ (de-hypnotization)। আমরা বলিয়া থাকি, অন্য সকল ধর্মই এই প্রপঞ্চের সত্যতা শিক্ষা দেয়, অতএব তাহারা এক প্রকার সম্মোহন প্রয়োগ করিতেছে। কেবল অদ্বৈতবাদীই সম্মোহিত হইতে চান না। একমাত্র অদ্বৈতবাদীই অল্পবিস্তর বুঝিয়া থাকেন যে, সর্বপ্রকার দ্বৈতবাদ হইতেই সম্মোহন বা মোহ আসিয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, এমন কি বেদকেও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, সগুণ ঈশ্বরকেও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডটাকেও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি তোমার নিজের দেহ-মনকেও ফেলিয়া দাও—কিছুই যেন না থাকে, তবেই তুমি সম্পূর্ণরূপে মোহমুক্ত হইবে।

'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥'[১]

—মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া যেখান হইতে ফিরিয়া আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া আর কোন ভয় থাকে না। ইহাই মোহ অপসারণ।

'ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥'[২]

—আমার পুণ্য নাই, পাপ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই; আমার মন্ত্র, তীর্থ, বেদ বা যজ্ঞ কিছুই নাই; আমি ভোজন, ভোজ্য বা ভোক্তা কিছুই নই। আমি চিদানন্দরূপ শিব—আমিই শিব (মঙ্গলস্বরূপ)।

আমরা সম্মোহনবিদ্যার সমুদয় তত্ত্ব অবগত আছি। আমাদের যে মনস্তত্ত্ব-বিদ্যা আছে, তাহা পাশ্চাত্য দেশ সবে জানিতে আরম্ভ করিয়াছে; তবে দুঃখের বিষয়—এখনও সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে নাই।

প্র। আপনারা আতিবাহিক দেহ (astral body) কাহাকে বলেন?

১ তৈত্তি. উপ., ২।৯

২ নির্বাণষট্কম্—শঙ্করাচার্য

উ। আমরা উহাকে লিঙ্গশরীর বলিয়া থাকি। যখন এই দেহের পতন হয়, তখন অপর দেহপরিগ্রহ কিরূপে হয়? শক্তি কখন জড়পদার্থ ব্যতীত থাকিতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, দেহত্যাগের পরে সূক্ষ্মভূতের কিয়দংশ আমাদের সঙ্গে থাকিয়া যায়। অভ্যন্তরবর্তী ইন্দ্রিয়গণ ঐ সূক্ষ্মভূতের সাহায্য লইয়া আর একটি দেহ গঠন করে, কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেহ গঠন করিতেছে—মনই শরীর গঠন করিয়া থাকে। যদি আমি সাধু হই, তবে আমার মস্তিষ্ক জ্ঞানী সাধুর মস্তিষ্কে পরিণত হইবে। আর যোগীরা বলেন, এই জীবনেই তাঁহারা নিজ দেহকে দেবদেহে পরিণত করিতে পারেন।

যোগীরা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া থাকেন। রাশি রাশি মতবাদ অপেক্ষা সামান্য একটু অভ্যাসের মূল্য অনেক অধিক। সুতরাং আমি নিজে এটা-ওটা হইতে দেখি নাই বলিয়া সেগুলি মিথ্যা, এ-কথা বলিবার অধিকার আমার নাই। যোগীদের গ্রন্থে আছে, অভ্যাসের দ্বারা সর্বপ্রকার বিস্ময়কর ফল পাওয়া যায়। নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা অতি অল্পকালের ভিতর অল্প-স্বল্প ফল পাওয়া যায়—তাহাতে জানিতে পারা যায় এ ব্যাপারের ভিতর কোন ভণ্ডামি নাই। আর সর্বশাস্ত্রেই যে-সকল অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে, এই যোগীরা সেইগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রশ্ন এই : প্রত্যেক জাতির ভিতর এইসব অলৌকিক কার্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে কিরূপে? যে বলে—এ সমুদয় মিথ্যা, এগুলির ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই, তাহাকে যুক্তিবাদী বা বিচারপরায়ণ বলিতে পারা যায় না। যতদিন না সেগুলিকে ভুল বলিয়া আপনি প্রমাণ করিতে পারিতেছেন, ততদিন সেগুলিকে অস্বীকার করিবার অধিকার আপনার নাই। আপনাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, এগুলির কোন ভিত্তি নাই, তবেই আপনি ঐগুলি অস্বীকার করিবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু তাহা তো আপনারা করেন নাই। অন্য দিকে যোগীরা বলিতেছেন, সেগুলি বাস্তবিক অলৌকিক ব্যাপার নয়, তাঁহারা এখনও ঐ-সব করিতে পারেন বলিয়া দাবি করেন। ভারতে আজ পর্যন্ত অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহাদের কোনটিই অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা সাধিত হয় না। এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ আছে। কেবল মনস্তত্ত্ব-আলোচনার বৈজ্ঞানিক চেষ্টা

ব্যতীত যদি এ-বিষয়ে আর কিছুই সাধিত না হইয়া থাকে, তবে উহার সমুদয় গৌরব যোগীদেরই প্রাপ্য।

প্র। যোগীরা কি কি ব্যাপার দেখাইতে পারেন, তাহার কোন দৃষ্টান্ত দিতে পারেন কি?

উ। অন্যান্য বিজ্ঞানের চর্চা করিতে হইলে তাহার উপর যতটা বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়, যোগী তাঁহার যোগ-বিদ্যার উপর তাহা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতে বলেন না। কোন বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ভদ্রলোকে যতটুকু বিশ্বাস করিয়া থাকে, যোগী তাহা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতে বলেন না। যোগীর আদর্শ অতি উচ্চ। মনের শক্তি দ্বারা যে-সব ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, তাহাদের মধ্যে নিম্নতর বিষয়গুলি আমি দেখিয়াছি, সুতরাং উচ্চতর ব্যাপারগুলি যে হইতে পারে, এ-বিষয়ে অবিশ্বাস করিবার অধিকার আমার নাই। যোগীর আদর্শ—সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার সহায়তায় শাশ্বত শান্তি ও প্রেমের অধিকারী হওয়া। আমি একজন যোগীকে জানি, তাঁহাকে গোখুরা সাপে কামড়াইয়াছিল, দংশনমাত্র তিনি অচৈতন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন, সন্ধ্যার সময় তাঁহার আবার চৈতন্য হয়। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কি হইয়াছিল?' তিনি বলিলেন, 'আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল।' এই যোগীর সমুদয় ঘৃণা, ক্রোধ ও হিংসার ভাব একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই তাঁহাকে প্রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করিতে পারে না। তিনি সর্বদা অনন্ত প্রেমস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, প্রেমের শক্তিতে তিনি সর্বশক্তিমান্। এইরূপ ব্যক্তিই যথার্থ যোগী। আর এইসব অলৌকিক শক্তির প্রকাশ গৌণমাত্র। ঐগুলি লাভ করা যোগীর প্রকৃত লক্ষ্য নহে। যোগীরা বলেন, যোগী ব্যতীত আর সকলেই দাসবৎ—খাদ্যের দাস, বায়ুর দাস, নিজ স্ত্রীর দাস, নিজ পুত্রকন্যার দাস, টাকার দাস, স্বদেশীয়দের দাস, নামযশের দাস, এবং এই জগতের সহস্র সহস্র বিষয়ের দাস! যে ব্যক্তি এ-সকল বন্ধনের কোন বন্ধনে আবদ্ধ নন, তিনিই যথার্থ মানুষ, যথার্থ যোগী।

'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥'[১]

১ গীতা, ৫।১৯

—এখানেই তাঁহারা সংসারকে জয় করিয়াছেন, যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমভাবাপন্ন, সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।

প্র। যোগীরা কি জাতিভেদকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন?

উ। না; জাতিবিভাগ অপরিণত মনের শিক্ষালয় মাত্র।

প্র। এই অতিচেতন ভাবের (সমাধিতত্ত্বের) সহিত ভারতের গ্রীষ্মের কি কোন সম্বন্ধ নাই?

উ। কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া তো আমার বোধ হয় না। কারণ, সমুদ্র-পৃষ্ঠের পনর হাজার ফিট উপরে প্রায় মেরুপ্রদেশের আবহাওয়ায় হিমালয় পর্বতে এই যোগবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল।

প্র। ঠাণ্ডা জলবায়ুতে কি যোগবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব?

উ। খুব সম্ভব, এবং জগতের মধ্যে ইহা যেমন কার্যে পরিণত করা সম্ভব, তেমন আর কিছুই নয়। আমরা বলি, আপনারা—আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই—জন্ম হইতেই বৈদান্তিক। জীবনের প্রতিমুহূর্তেই আপনারা জাগতিক সকল বস্তুর সহিত নিজেদের একত্ব ঘোষণা করিতেছেন। যখনই আপনাদের হৃদয় সমগ্র জগতের কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়, তখনই আপনারা অজ্ঞাতসারে প্রকৃত বেদান্তবাদী। আপনারা নীতিপরায়ণ, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ, তাহা জানেন না। বেদান্ত-দর্শনই নীতিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া মানুষকে জ্ঞানতঃ নীতিপরায়ণ হইতে শিখাইয়াছে। বেদান্ত সকল ধর্মের সার।

প্র। আপনি কি বলেন যে, আমাদের—পাশ্চাত্য জাতিদের ভিতর এমন একটা অসামাজিক ভাব আছে, যাহা আমাদিগকে এত বহুত্ববাদী (pluralistic) করিয়াছে, আর প্রাচ্যদেশীয় লোক কি আমাদের অপেক্ষা অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন?

উ। আমার মতে পাশ্চাত্য জাতি অধিকতর নিষ্ঠুরস্বভাব, আর প্রাচ্য দেশীয় ব্যক্তিগণ সর্বভূতের প্রতি অধিকতর করুণাসম্পন্ন। কিন্তু তাহার কারণ শুধু এই যে, আপনাদের সভ্যতা খুব আধুনিক। কোন স্বভাবকে দয়াবৃত্তির প্রভাবে আনিতে কিছু সময়ের আবশ্যক। আপনাদের শক্তি

যথেষ্ট, কিন্তু শক্তি-সংগ্রহ যে পরিমাণে চলিয়াছে, সেই পরিমাণে হৃদয়ের শিক্ষা চলে নাই, বিশেষতঃ মনঃসংযমের শক্তিও খুব অল্প পরিমাণেই অনুশীলন করা হইয়াছে। আপনাদিগকে সাধু ও ধীরপ্রকৃতি করিতে অনেক সময় লাগিবে। কিন্তু ভারতের প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে এই ভাব প্রবাহিত। যদি আমি ভারতের কোন গ্রামে গিয়া সেখানকার লোককে রাজনীতি শিখাইতে চাই, তাহারা বুঝিবে না; কিন্তু যদি তাহাদিগকে বেদান্ত উপদেশ করি, তাহারা অমনি বলিবে, 'হাঁ স্বামিন্, এখন আপনার কথা বুঝিতেছি—আপনি ঠিক বলিতেছেন।' আজ পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র সেই বৈরাগ্য বা অনাসক্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখন খুবই পতিত, কিন্তু এখনও বৈরাগ্যের প্রভাব এত অধিক বিদ্যমান যে, রাজারাজড়া পর্যন্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিনা সম্বলে দেশের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান।

কোন কোন স্থানে সাধারণ গ্রাম্য বালিকাও চরকায় সুতা কাটিতে কাটিতে বলিয়া থাকে: আমাকে দ্বৈতবাদের কথা বলিও না; আমার চরকা 'সোঽহং, সোঽহং—আমি সেই ব্রহ্ম, আমিই সেই ব্রহ্ম' বলিতেছে। এইসব লোকের সহিত গিয়া কথা বলুন, এবং জিজ্ঞাসা করুন: তাহারা এইরূপ বলিয়া থাকে, অথচ ঐ পাথরটাকে প্রণাম করে কেন? তাহারা বলিবে, 'আপনারা ধর্ম বলিতে শুধু মতবাদ বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা ধর্ম বলিতে বুঝি—প্রত্যক্ষ অনুভূতি।' তাহাদের মধ্যে কেহ হয়তো বলিয়া উঠিবে, 'আমি তখনই যথার্থ বেদান্তবাদী হইব, যখন আমার সম্মুখ হইতে সমগ্র জগৎ অন্তর্হিত হইবে এবং আমি সত্যদর্শন করিব। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন আমার সহিত সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তির কোন প্রভেদ নাই। সেই জন্যই আমি এইসব প্রস্তরমূর্তির উপাসনা করিতেছি, মন্দিরে যাইতেছি, যাহাতে আমার প্রত্যক্ষানুভূতি হয়। আমি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি সেই বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বকে দেখিতে—প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ইচ্ছা করি।'

'বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥'[১]

১ বিবেকচূড়ামণি, ৬০—শঙ্করাচার্য

—অনর্গল সদ্বাক্যযোজনা, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন কৌশল—এ-সব কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, উহার দ্বারা মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

যদি আমরা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারি, তবেই মুক্তিলাভ করিব।

প্র। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সর্বসাধারণের এই স্বাধীনতার সহিত জাতিভেদ-স্বীকারের কি সামঞ্জস্য আছে?

উ। কখনই নাই। লোকে বলিয়া থাকে, জাতিভেদ থাকা উচিত নয়। এমন কি যাহারা বিভিন্ন জাতিভুক্ত তাহারাও বলে, জাতিবিভাগ একটা খুব উঁচুদরের জিনিস নয়। কিন্তু তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলে যে, আমাদের ইহা অপেক্ষা ভাল অন্য কোন জিনিস দাও, আমরা ইহা ছাড়িয়া দিব। তাহারা বলে, তোমরা ইহার বদলে আমাদিগকে কি দিবে? জাতিভেদ কোথায় নাই? তোমরাও তো তোমাদের দেশে ক্রমাগত এইরূপ একটা জাতিবিভাগ গড়িবার চেষ্টা করিতেছ। কোন ব্যক্তি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই বলিয়া বসে, কয়েক শত ধনীর মধ্যে আমিও একজন। আমরাই কেবল একটা স্থায়ী জাতিবিভাগ গঠন করিতে সমর্থ হইযাছি। অপরে উহার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সফল হইতেছে না। আমাদের সমাজে অবশ্য যথেষ্ট কুসংস্কার ও মন্দ জিনিস আছে। আপনাদের দেশের কুসংস্কার ও মন্দ জিনিসগুলি আমাদের দেশে চালাইয়া দিতে পারিলেই কি সব ঠিক হইয়া যাইবে? জাতিভেদ আছে বলিয়াই এই ত্রিশ কোটি লোক এখনও খাইবার এক টুকরা রুটি পাইতেছে। অবশ্য রীতিনীতি হিসাবে ইহা যে অসম্পূর্ণ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতিবিভাগ না থাকিলে আপনারা পড়িবার জন্য একখানি সংস্কৃত বইও পাইতেন না। এই জাতিবিভাগের দ্বারা এমন একটি দৃঢ় প্রাচীরের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, উহার উপর বহিরাক্রমণের শত প্রকার তরঙ্গাঘাত আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ কোনমতেই উহাকে ভাঙিতে পারে নাই। এখনও সেই প্রয়োজন দূর হয় নাই, সেজন্য জাতিভেদ এখনও রহিয়াছে। সাত শত বর্ষ পূর্বে যেরূপ জাতিবিভাগ ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। যতই উহার উপর আঘাত লাগিয়াছে, ততই উহা দৃঢ়তর আকার ধারণ করিয়াছে। এটি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একমাত্র ভারতই কখন পররাষ্ট্র-বিজয়ে নিজ দেশের বাহিরে যায় নাই? মহামতি সম্রাট্ অশোক বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন য তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কেহ

যেন পররাষ্ট্র-বিজয়ের চেষ্টা না করে। যদি অপর জাতি আমাদের নিকট শিক্ষক পাঠাইতে চায় পাঠাক, কিন্তু তাহারা যেন আমাদের বাস্তবিক সাহায্য করে, আমাদের জাতীয় সম্পত্তিরূপ ধর্মভাবের অনিষ্ট সাধন না করে। এইসব বিভিন্ন জাতি হিন্দুজাতিকে জয় করিতে আসিল কেন? হিন্দুরা কি অপর জাতির কোন অনিষ্ট করিয়াছিল? তাহারা যতটুকু সাধ্য জগতের উপকারই করিয়াছিল। তাহারা জগৎকে বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম শিখাইয়াছিল এবং পৃথিবীর অনেক অসভ্য জাতিকে সভ্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা প্রতিদানে পাইয়াছিল শুধু হত্যা, অত্যাচার ও 'অবিশ্বাসী বদমাশ'—এই আখ্যা। বর্তমান কালেও পাশ্চাত্য ব্যক্তিদের লিখিত ভারত সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী এবং ভারত-ভ্রমণকারীদের লিখিত গল্পগুলি পড়ুন; কোন্ অনিষ্টের প্রতিশোধ লইবার জন্য ভারতবাসীদের এখনও এইরূপ কটূবাক্য বর্ষণ করা হইয়া থাকে?

[প্র। সভ্যতা সম্বন্ধে বৈদান্তিক ধারণা কিরূপ?]

উ। আপনারা দার্শনিক, আপনাদের মতে অবশ্য একতোড়া টাকা থাকা-না-থাকা লইয়া মানুষে মানুষে কখনও প্রভেদ হইতে পারে না। এইসব কলকারখানা ও জড়বিজ্ঞানের মূল্য কি? উহাদের একটি মাত্র ফল এই যে, উহারা জ্ঞান বিস্তার করিয়া থাকে। আপনারা অভাব বা দারিদ্র্য-সমস্যা পূরণ করিতে পারেন নাই, বরং অভাবের মাত্রা আরও বাড়াইয়াছেন। কলকব্জায় কখন দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। উহাদের দ্বারা কেবল সংগ্রামই বাড়িয়া যায়, প্রতিযোগিতাই তীব্রতর হইয়া থাকে। জড় প্রকৃতির কি স্বতন্ত্র কোন মূল্য আছে? কোন ব্যক্তি যদি তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চালাইতে পারে, আপনারা অমনি তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন কেন? প্রকৃতি কি লক্ষ লক্ষ বার এই ব্যাপার সাধন করিতেছে না? প্রকৃতিতে কি পূর্ব হইতেই এ-সব বিদ্যমান নাই? উহা পাইলে আপনার বিশেষ কি লাভ হইল? উহা তো পূর্ব হইতেই সেখানে রহিয়াছে। উহার একমাত্র মূল্য এই যে, উহা আমাদের উন্নতি সাধন করে। এই জগৎটা একটি ব্যায়ামাগারের মতো; এখানে জীবাত্মা কর্ম দ্বারা উৎকর্ষ সাধন করিতেছে, এবং এই উৎকর্ষ-সাধনের ফলেই আমরা দেবতা হই। সুতরাং কোন্ বিষয় ভগবানের কতটা প্রকাশ তাহা

জানিয়াই প্রত্যেক বিষয়ের মূল্য বা সারবত্তা নির্ধারণ করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্বের এইরূপ প্রকাশই সভ্যতা।

প্র। বৌদ্ধদের কি কোন জাতিবিভাগ আছে?

উ। বৌদ্ধদের কখনই বড় বিশেষ জাতিবিভাগ ছিল না, এবং ভারতে বৌদ্ধসংখ্যা অতি অল্প। বুদ্ধ একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। তথাপি আমি বৌদ্ধ দেশসমূহে দেখিয়াছি, সেখানে জাতিবিভাগ সৃষ্টি করিবার জন্ম প্রবল চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ঐ চেষ্টা সফল হয় নাই। বৌদ্ধদের জাতিবিভাগ কার্যতঃ কিছুই নয়, কিন্তু তাহারা মনে মনে নিজেদের উচ্চ জাতি বলিয়া গর্ব করিয়া থাকে।

বুদ্ধ অন্যতম বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি একটি নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন, যেমন আজকালও অনেক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে-সব ভাব এখন বৌদ্ধধর্ম বলিয়া অভিহিত, সেগুলি তাঁহার নিজের নয়। সেগুলি অতি প্রাচীন। তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন, এবং ভাবগুলির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের নূতনত্ব উহার সামাজিক ভাগ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরাই চিরদিন আমাদের আচার্যের আসন অধিকার করিয়া আসিয়াছেন; অধিকাংশ উপনিষদ্ই ক্ষত্রিয়গণের লেখা এবং বেদের কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মণদের কীর্তি। সমগ্র ভারতে আমাদের যে-সকল বড় বড় আচার্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয় ছিলেন; তাঁহাদের উপদেশও উদার ও সর্বজনীন, কিন্তু দুইজন ছাড়া ব্রাহ্মণ আচার্যগণের মধ্যে সকলেই অনুদারভাবাপন্ন। ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ—ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

প্র। সম্প্রদায়, অনুষ্ঠান, শাস্ত্র—এ-সকল কি তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের সহায়ক?

উ। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে মানুষ সব ছাড়িয়া দেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়, অনুষ্ঠান ও শাস্ত্র যতটা সেই অবস্থায় পৌঁছিবার উপায়-স্বরূপ হয়, ততটা উহাদের উপকারিতা আছে। কিন্তু যখন উহাদের দ্বারা ঐ সহায়তা না পাওয়া যাইবে, তখন অবশ্য উহাদিগের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥[1]

১ গীতা, ৩।২৬

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্ বিদ্বান্ তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥[১]

—জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীদের অবস্থার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন না; আর তাহাদের নিজ নিজ সাধনপ্রণালীতে তাহাদের বিশ্বাস নষ্ট করিবেন না, কিন্তু যথার্থভাবে তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন, এবং তিনি স্বয়ং যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায় পৌঁছিবার পথ প্রদর্শন করিবেন।

প্র। আমিত্ব ও চারিত্রনীতি—বেদান্ত কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে?

উ। প্রকৃত আমিত্ব সেই পূর্ণব্রহ্ম—মায়া দ্বারাই উহা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির আকার ধারণ করিয়াছে। আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতেছে মাত্র, প্রকৃত-পক্ষে উহা সদাই সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এক সত্তাই বর্তমান—মায়া দ্বারাই উহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মায়াতেই এইরূপ ভেদবোধ হইয়াছে। কিন্তু এই মায়ার ভিতরেও সর্বদাই সেই একের দিকে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতির চারিত্রনীতির ভিতর ঐ চেষ্টাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, কারণ ইহা জীবাত্মার প্রকৃতিগত প্রয়োজন। সে ঐরূপ চেষ্টায় ঐ একত্ব লাভ করিতেছে, আর একত্বলাভের এই চেষ্টাকেই আমরা চারিত্রনীতি-নামে অভিহিত করিয়া থাকি। অতএব আমাদের সর্বদা নীতি-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক।

প্র। চারিত্রনীতির অধিকাংশই কি বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধ লইয়াই ব্যাপৃত নয়?

উ। চারিত্রনীতির সবটাই ঐ। পূর্ণব্রহ্ম কখন মায়ার গণ্ডির ভিতর আসিতে পারেন না।

প্র। আপনি বলেন, 'আমি'ই সেই পূর্ণব্রহ্ম; আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম: এই 'আমি'র জ্ঞান আছে কি না?

উ। 'আমি'টা সেই পূর্ণব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপ, আর এই ব্যক্ত অবস্থায় তাহাতে যে প্রকাশ-শক্তি কার্য করে, তাহাকেই আমরা 'জ্ঞান' বলি। অতএব সেই পূর্ণব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপে 'জ্ঞান' শব্দের প্রয়োগ যথাযথ নয়, কারণ পূর্ণাবস্থা আপেক্ষিক জ্ঞানের অতীত।

১ গীতা, ৩।২৫

প্র। আপেক্ষিক জ্ঞান কি পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত?

উ। হাঁ, একভাবে আপেক্ষিক জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত বলিতে পারা যায়। যেমন একটা মোহর ভাঙাইয়া তাহা হইতে পয়সা সিকি দুয়ানি টাকা প্রভৃতি সর্বপ্রকার মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারা যায়, সেইরূপ ঐ পূর্ণ অবস্থা হইতে সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। উহা অতিচেতন, জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ জ্ঞানাবস্থা—সাধারণ জ্ঞান অজ্ঞান উভয়ই ইহার অন্তর্গত। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থা লাভ করে, আমাদের পরিচিত 'জ্ঞানাবস্থা'টিও তাহার সম্যক্‌রূপে থাকে। যখন সে জ্ঞানের ঐ অপর অবস্থা অর্থাৎ আমাদের সাধারণ জ্ঞানাবস্থার ন্যায় অবস্থা অনুভব করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহাকে এক ধাপ নামিয়া আসিতে হয়। এই সাধারণ জ্ঞান একটি নিম্নতর অবস্থা—মায়ার ভিতরেই কেবল এইরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভব।

প্রশ্নের উত্তর ও আলোচনার অংশ

১৮৯৬ খৃঃ ২২শে ও ২৪শে মার্চ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বৈকালীন আসরে প্রশ্নোত্তর হইতে গৃহীত, এবং স্বামীজীর অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও আলোচনা হইতেও কিছু সংযোজিত হইয়াছে।

১. যুক্তি-বিচারের সহিত যতটুকু মেলে, ব্যক্তিগতভাবে আমি বেদের ততটুকুই গ্রহণ করি। বেদের কোন কোন অংশ স্পষ্টতই পরস্পরবিরোধী। বেদসমূহ পাশ্চাত্য অর্থে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া মনে করা হয় না, উহারা জ্ঞানসমষ্টি বলিয়াই সর্ববিজ্ঞান। এই জ্ঞান কল্পারম্ভে আত্মপ্রকাশ করে এবং কল্পশেষে অব্যক্ত হয়। যখন কল্প পুনঃপ্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞানও কল্পের সহিত প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত তত্ত্বটি ঠিক আছে। কিন্তু শুধু বেদ-নামক শাস্ত্র-গ্রন্থগুলিতেই এই সব জ্ঞান আছে—এ-কথা কুতর্কমাত্র। এক স্থলে মনু বলিয়াছেন, বেদের যে-অংশ যুক্তি-বিচারের সহিত মেলে, সেই অংশই বেদ, বাকী অংশ নয়। আমাদের দার্শনিকগণ অনেকেই এই মত পোষণ করেন।

২. অদ্বৈত-দর্শনের বিরুদ্ধে যাবতীয় সমালোচনা এই কয়টি কথায় সংক্ষেপে বলা যায়: এই দর্শন ইন্দ্রিয়-ভোগের সহায়ক নয়। আমরা সানন্দে ইহা স্বীকার করি।

৩. বেদান্ত-মতের আরম্ভ প্রচণ্ড দুঃখবাদে এবং সমাপ্তি প্রকৃত আশাবাদে। আমরা ইন্দ্রিয়ের আশাবাদ অস্বীকার করি, কিন্তু অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রকৃত আশাবাদ স্বীকার করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রকৃত সুখ ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে নাই, অতীন্দ্রিয় অবস্থায় আছে; এবং প্রত্যেকের মধ্যেই সেই প্রকৃত সুখ আছে। সংসারে আমরা যে ধরনের আশাবাদ লক্ষ্য করি, উহা ইন্দ্রিয়-পথে মানুষকে বিনাশের দিকেই লইয়া যায়।

৪. দর্শনশাস্ত্রে আত্মত্যাগের গুরুত্ব সর্বাধিক। এই ত্যাগের অর্থ যথার্থ স্বরূপকে স্বীকার করা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে অস্বীকার করে বলিয়া এই ত্যাগ দুঃখবাদাত্মক, কিন্তু প্রকৃত জগৎকে গ্রহণ করে বলিয়া ইহা আশাবাদী।

৫. পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র বেদই ঘোষণা করেন, বেদাধ্যয়নও গৌণ। সেই বিদ্যাই পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা আমরা অক্ষর বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করি।[1] সেই বিদ্যা শুধু পাঠ নয়, শুধু বিশ্বাস বা বিচার নয়, পরন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা সমাধি।

৬. মায়ার কারণ কি?—গত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসিত হইতেছে। ইহার একমাত্র উত্তর: যখন যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রশ্নটি উত্থাপিত হইবে, তখনই আমরা ইহার উত্তর দিব। প্রশ্নটি স্ববিরোধী। আমাদের বক্তব্য এই যে, পরব্রহ্ম যেন আপেক্ষিক জগৎ হইয়াছেন। সেই নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম শুধু মায়াতে যেন কার্যকারণে বদ্ধ হইয়াছেন। যখন স্বীকার করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত, তখনই মানিয়া লইতে হইবে—পরব্রহ্মে কোন-কিছু ক্রিয়াব্যাপার হইতে পারে না। ব্রহ্ম কারণাতীত। ইহার অর্থ —ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত কোন কিছু ব্রহ্মের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। প্রথমতঃ ব্রহ্ম যদি কারণাতীত হন, তবে কোন কিছুই তাঁহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। নিত্যমুক্ত ব্রহ্মে দেশ কাল নিমিত্ত থাকিতে পারে না। ইহা

১ মুণ্ডক উপ., ১।১।৫

মানিয়া লইলে প্রশ্নটি দাঁড়াইবে: যাহার কোন কারণ নাই, তাহার কারণ কি? তাহা কিভাবে এইরূপে পরিবর্তিত হইল? কার্যকারণের জগতেই তোমার এই প্রশ্ন সম্ভব। তুমি কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে এই প্রশ্ন করিতে চাহিতেছ। কেবল যখন পরব্রহ্ম কার্যকারণাত্মক জগতে রূপান্তরিত হন এবং দেশ-কাল-নিমিত্তের আবির্ভাব হয়, তখনই এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, অবিদ্যাই ভ্রম সৃষ্টি করে। এই প্রশ্ন অসম্ভব। ব্রহ্মের উপর কোন কিছুর ক্রিয়া সম্ভব নয়।

না, কোন কারণ ছিল না। আমরা জানি না বা আমরা অজ্ঞ, তাহা নয়, ব্রহ্ম জ্ঞানের বাহিরে; এবং তাঁহাকে জ্ঞানের রাজ্যে আনা যাইতে পারে না। 'আমি জানি না'—এই শব্দগুলি দুই অর্থে ব্যবহার করিতে পারি। একভাবে ইহাদের অর্থ এই যে, আমরা জ্ঞানের নিম্নে আছি, অন্যভাবে ইহাদের অর্থ—এই বস্তু জ্ঞানের উপরে অবস্থিত। রঞ্জনরশ্মি এখন সুবিদিত। ইহার কারণ সম্বন্ধে দ্বিমত আছে, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই একদিন ইহার কারণ জানিতে পারিব। রঞ্জনরশ্মি সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, উহার কারণ আমরা জানি না। কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়ে আমরা জানিতে পারি না। রঞ্জনরশ্মির ক্ষেত্রে আমরা জানি না, যদিও উহা জ্ঞানের অন্তর্গত; শুধু এখন পর্যন্ত আমরা জানি না। কিন্তু ব্রহ্ম পরোক্ষ-জ্ঞানের এত উর্ধ্বে যে, তিনি কখনও জ্ঞেয় হইতে পারেন না। কি উপায়ে জ্ঞাতা জ্ঞেয় হইতে পারে?[১] তুমি সতত স্বয়ংপূর্ণ, এবং নিজেকে বিষয়ীভূত করিতে পার না। অমৃতত্ব প্রমাণ করিবার জন্য এই যুক্তিটি আমাদের দার্শনিকেরা ব্যবহার করিতেন: যদি আমি চিন্তা করিতে চেষ্টা করি যে, আমি শায়িত মৃতদেহ, তাহা হইলে আমাকে কি কল্পনা করিতে হইবে? আমিই দাঁড়াইয়া নিজেকেই দেখিতেছি—দেখিতেছি, একটা মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। অতএব আমি নিজেকে আমার দর্শনের বিষয়ীভূত করিতে পারি না।

৭. **ক্রমবিকাশ:** স্থূল বিকাশে—আকাশ এবং প্রাণের অভিক্ষেপ ও উহাদের সূক্ষ্ম অবস্থায় প্রত্যাবর্তন-ব্যাপারে—ভারতীয় চিন্তা ও আধুনিক বিজ্ঞানে অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। আধুনিক বিজ্ঞানে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে স্বকীয়

[১] বৃহদারণ্যক উপ., ২।১৪, ১।১৫

মত আছে, যোগীদেরও আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, যোগীদের অভিব্যক্তি-ব্যাখ্যা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। 'প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে পরিণত হয়।'[১] মূল ভাবটি এই যে, আমরা এক প্রজাতি'হইতে অপর এক প্রজাতিতে পরিণত হইতেছি এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ প্রজাতি। চাষী যেমন ভূসিঞ্চন করে—এই উপমার দ্বারা পতঞ্জলি প্রকৃতির আপূরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[২] আমাদের শিক্ষা ও প্রগতির একমাত্র অর্থ হইতেছে অন্তরায়গুলি অপসারিত করা, তাহা হইলে স্বভাবতই ঈশ্বরত্ব বিকশিত হইবে। ইহা দ্বারা জীবন-সংগ্রামের মতবাদ খণ্ডিত হয়। জীবনের দুঃখকর অভিজ্ঞতাগুলি পথেই অনুভূত হয়, এবং ঐগুলি নিঃশেষে অপসারিত করা যায়। ক্রমবিকাশের জন্য অভিজ্ঞতাগুলির প্রয়োজন হয় না। ঐগুলি না থাকিলেও আমাদের অগ্রগতি হইবে। বস্তুর স্বভাবই হইল বিকশিত হওয়া। গতিবেগ বা প্রেরণা (momentum) বাহিরের বস্তু নয়, উহা কিন্তু ভিতর হইতে আসে। প্রত্যেক জীবাত্মা পূর্ব হইতেই কুণ্ডলীকৃত সর্বজনীন অভিজ্ঞতার সমষ্টি এবং এই-সব অভিজ্ঞতার মধ্যে যেগুলি প্রকাশের অনুকূল পথ পাইবে, সেগুলিই বাহির হইয়া আসিবে।

সুতরাং বাহিরের বস্তুগুলি আমাদের জন্য শুধু প্রয়োজনীয় আবেষ্টনী করিয়া দিতে পারে। যে-সকল প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম এবং অশুভ আমরা দেখিতেছি, সেগুলি ক্রমসঙ্কোচের ফল বা কারণ নয়। সেগুলি জীবনের পথে আসিয়া থাকে। সেগুলি না থাকিলেও মানুষ অগ্রসর হইবে এবং ঈশ্বররূপে বিকশিত হইবে, কারণ ঈশ্বরের স্বভাবই বাহির হইয়া আসা ও নিজেকে বিকাশ করা। প্রতিযোগিতার ভয়াবহ ভাবের পরিবর্তে এই ভাবটি আমার অত্যন্ত আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। যতই ইতিহাস পাঠ করি, ততই মনে হয়, প্রতিযোগিতার ভাবটি ভুল। কেহ কেহ বলে যে, মানুষ যদি মানুষের সহিত যুদ্ধ না করিত, তাহা হইলে সে উন্নতি করিতে পারিত না। আমিও অনুরূপ চিন্তা করিতাম। কিন্তু এখন দেখি যে, প্রত্যেকটি যুদ্ধ মানুষের উন্নতি ত্বরান্বিত না করিয়া পঞ্চাশ বৎসর পিছাইয়া দিয়াছে।

১ জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।—যোগসূত্র, কৈবল্যপাদ, ২

২ নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।—ঐ, ৩

একদিন আসিবে, যখন মানুষ নূতন আলোকে ইতিহাস অধ্যয়ন করিবে এবং দেখিবে যে, প্রতিযোগিতা (প্রগতির) কারণ বা কার্য কিছুই নয়। প্রতিযোগিতা পথের একটি দৃশ্য মাত্র, ক্রমবিকাশের জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই।

আমি মনে করি—পতঞ্জলির সিদ্ধান্তই একমাত্র সিদ্ধান্ত, যাহা যুক্তি-বিচারশীল মানুষ গ্রহণ করিতে পারে। আধুনিক মতবাদ কত অশুভ সৃষ্টি করে! এই চিন্তাপদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক দুষ্ট ব্যক্তি যেন দুষ্ট হইবার ছাড়পত্র পাইয়াছে। এই দেশে (মার্কিনে) এমন সব পদার্থবিজ্ঞানী দেখিয়াছি, যাঁহারা বলেন, সমস্ত অপরাধীদের নির্মূলভাবে ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে, সমাজ হইতে অপরাধপ্রবণতা দূর করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।

পরিবেশগুলি বাধা দিতে পারে, কিন্তু প্রগতির জন্য সেগুলি প্রয়োজন নয়। প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ব্যাপার এই যে, একজন হয়তো পারিপার্শ্বিক অবস্থা জয় করিতে পারে, কিন্তু একজনের জয়ের অর্থ সহস্রজনকে বিতাড়িত করা। সুতরাং ইহাকে মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে। যাহা একের সহায়ক ও বহুর প্রতিবন্ধক, তাহা কখনও কল্যাণকর হইতে পারে না। পতঞ্জলি বলেন, আমাদের অজ্ঞানের জন্যই এই-সকল সংগ্রাম এখনও রহিয়াছে। উহারা মানুষের ক্রমবিকাশের জন্য প্রয়োজন নয়, অথবা উহার অঙ্গ নয়। আমাদের অসহিষ্ণুতাই সংগ্রাম সৃষ্টি করে। পথ রচনা করার ধৈর্য আমাদের নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে: একটি নাট্যশালায় আগুন লাগিয়াছে; অল্প কয়েকজনই বাহির হইতে পারে। অবশিষ্ট সকলে বাহিরে যাইবার চেষ্টায় পরস্পরকে পিষিয়া ফেলে। গৃহটি রক্ষা করিবার জন্য, অথবা যে দুই-তিন জন পলাইয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য এই প্রচণ্ড হুড়াহুড়ির প্রয়োজন ছিল না। যদি সকলে ধীরে ধীরে বাহিরে যাইত, তবে একজনও আহত হইত না। জীবনেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। আমাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম ব্যতীতই আমরা সকলে বাহিরে যাইতে পারি। তথাপি আমরা সংগ্রাম করি। আমাদের অজ্ঞান ও অধৈর্যের দ্বারা আমরা এই সংগ্রাম সৃষ্টি করি। আমরা অত্যন্ত ব্যস্ততার ভিতর থাকি। নিজেকে শান্ত রাখা এবং স্বাবলম্বী হওয়া শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

৮. প্রতিটি জীব একটি বৃত্ত। বৃত্তের কেন্দ্র শরীরেই অবস্থিত এবং কার্য-শক্তি সেখানেই প্রকাশিত। তুমি সর্বত্র বিদ্যমান, যদিও তুমি বোধ কর—তুমি শুধু একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত। সেই কেন্দ্রটি জড়কণাগুলি সংগ্রহ করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য একটি যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছে। যাহার মাধ্যমে আত্মা নিজেকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাকেই শরীর বলে। তুমি সর্বত্র বিরাজমান। যখন একটি দেহ বা যন্ত্র তোমার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না, তখন কেন্দ্রটি সরিয়া গিয়া অন্য সূক্ষ্ম বা স্থূল জড়কণা সংগ্রহ করে এবং সেগুলির মাধ্যমে কাজ করে। এই হইল জীব বা মানুষ। আর ঈশ্বর কি? ঈশ্বর একটি বৃত্ত, যাহার পরিধির সীমা নাই এবং কেন্দ্র সর্বত্র। সেই বৃত্তের প্রত্যেক বিন্দু জীবন্ত, সচেতন, সক্রিয় এবং সমভাবে কর্ম করিতেছে। আমাদের সীমাবদ্ধ জীবাত্মাসমূহের কেবল একটি বিন্দু চেতনাময় এবং সেই বিন্দুটি সম্মুখে ও পশ্চাতে আন্দোলিত হয়।

আত্মা একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি সীমাহীন, কিন্তু কেন্দ্র কোন একটি দেহে অবস্থিত। মৃত্যু শুধু এই কেন্দ্রের সামান্য পরিবর্তন। ঈশ্বর একটি বৃত্ত, যাহার পরিধির সীমা নাই এবং কেন্দ্র সর্বত্র অবস্থিত। আমরা যখন সীমাবদ্ধ দেহের এই কেন্দ্র হইতে বাহিরে আসিতে পারিব, তখনই আমাদের যথার্থ স্বরূপ—ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব।

৯. প্রত্যেক আত্মায় দেবত্ব অন্তর্নিহিত। বাহ্য- ও অন্তঃ-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন করাই জীবনের লক্ষ্য। কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান—ইহাদের যে-কোন একটি অবলম্বন করিয়া অথবা একাধিক বা সকলগুলির সাহায্যে এই দেবত্ব বিকাশ কর এবং মুক্ত হও। ইহাই তো ধর্মের আদি অন্ত। মতবাদ, বদ্ধ ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, শাস্ত্র-মন্দির বা পদ্ধতি ধর্মের গৌণ অঙ্গমাত্র।

১০. ধর্মবিষয়ক কোন বিশেষ মতে বিশ্বাস না থাকাই জ্ঞান, কিন্তু এ-কথার অর্থ ইহা নয় যে, জ্ঞান কোন ধর্মমতকে ঘৃণা করে। জ্ঞানের দ্বারা বোঝায় যে, ধর্মমতের ঊর্ধ্বে এক অবস্থা লাভ করা গিয়াছে। জ্ঞানী (যথার্থ দার্শনিক) কোন কিছুই ধ্বংস করিতে চান না, বরং সকলকেই সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন। নদী যেমন তাহাদের জলধারা সাগরে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং সেখানে সব এক হইয়া যায়, তেমনি সকল ধর্মমতের গতি জ্ঞানের অভিমুখে এবং সেখানেই এক হইয়া যায়।

জ্ঞানযোগ সংসার ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয়, কিন্তু তাই বলিয়া পরাজিত মনোভাব লইয়া সংসার ছাড়িতে বলে না। ত্যাগের প্রকৃত পরীক্ষা—সংসারে থাকিয়াও সংসারের না হওয়া।

১১. বেদান্তী বলেন: মানুষের জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই; মানুষ স্বর্গেও যায় না। আত্মার সম্পর্কে পুনর্জন্ম-প্রসঙ্গ প্রকৃতপক্ষে যেন একটি পৌরাণিক কাহিনী। একখানি পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টানোর উদাহরণ দেওয়া হয়। পুস্তকের বিষয়বস্তুরই ক্রমবিকাশ হয়, মানুষের নয়। আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান, সুতরাং তাহার আবার আসা-যাওয়া কোথায়? এই জন্ম-মৃত্যু প্রকৃতির অন্তর্গত পরিবর্তন মাত্র। এগুলিকে আমরা নিজেদের পরিবর্তন বলিয়া ভুল করি।

১২. পুনর্জন্ম প্রকৃতির ক্রমবিকাশ এবং অন্তর্নিহিত দেবত্বের অভিব্যক্তি।

১৩. বেদান্ত বলেন: অতীতের ভিত্তির উপরই এই জীবন গঠিত হইয়াছে এবং যখনই আমাদের সমগ্র অতীতকে দেখিতে পাইব, তখনই আমরা মুক্ত হইব। শৈশব হইতেই মুমুক্ষুত্ব বা মুক্ত হইবার ইচ্ছা ধর্মভাবের আকার ধারণ করে। কয়েক বৎসরের মধ্যে যেন সকল তত্ত্ব স্পষ্ট হইয়া যায়। এই দেহ ত্যাগ করিয়া এবং পরবর্তী জীবনের জন্য অপেক্ষমাণ জীবাত্মা —প্রাকৃতিক জগতেই বাস করে।

১৪. মুক্ত মানুষের কাছে এই জীবন-সংগ্রামের মূল্য কখনও ছিল না। কিন্তু আমাদের কাছে ইহার অর্থ আছে, কারণ নাম এবং রূপই তো জগৎ সৃষ্টি করে।

১৫. প্রথম হইতেই সকল জ্ঞান আমাদের মধ্যে সঞ্চিত থাকে—এই কথার ব্যতিক্রম কিভাবে হইতে পারে, আমি তো বুঝিতে পারি না। যদি তুমি এবং আমি সাগরের ছোট ছোট তরঙ্গ হই, তবে সেই সাগরই তো অলক্ষ্যে সকলের পিছনে রহিয়াছে।

১৬. এই কয়টি কথায় আত্মাকে বর্ণনা করিতে পারি: এই আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, বর্শা ভেদ করিতে পারে না, আগুন দগ্ধ করিতে পারে না, জলও তাঁহাকে দ্রবীভূত করিতে পারে না। আত্মা অবিনাশী ও সর্বত্র বিদ্যমান, সুতরাং আত্মার জন্য শোক করিও না।

১৭. যদি কেহ খুব খারাপ হইয়া থাকে, আমরা বিশ্বাস করি, সে ভবিষ্যতে আবার ভাল হইবে। মূল তত্ত্ব এই—সকলকেই শাশ্বত মুক্তির জন্য

সংগ্রাম করিতে হইবে। মুক্তিলাভের ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমাদের মুক্ত হইবার বাসনা ব্যতীত অন্য সব বাসনাই ভ্রান্তিজনক। বেদান্ত-মতে প্রত্যেক সৎকর্মই মানুষের সেই মুক্তভাবের প্রকাশ।

পৃথিবীতে এমন একটা সময় আসিবে, যখন সব অশুভ অন্তর্হিত হইবে—এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। তাহা কেমন করিয়া হইবে? নদী বহিয়া চলিয়াছে—একদিকে জলরাশি চলিয়া যাইতেছে, অপর দিকে আবার জলরাশি আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

১৮. বেদান্ত বলেন: তুমি স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও পূর্ণ; শুভ ও অশুভের অতীত একটি অবস্থা আছে, সেটিই তোমার স্বভাব। এই অবস্থা শুভ অপেক্ষাও উচ্চতর। ভাল—মন্দ অপেক্ষা অল্প-বিচ্যুত অবস্থা মাত্র।

পাপ বা খারাপ সম্পর্কে আমাদের কোন মতবাদ নেই। আমরা ইহাকে 'অজ্ঞান' বলি।

১৯. মানুষের সঙ্গে সমুদয় ব্যবহার ও সমগ্র নীতিশাস্ত্র—সবই জাগতিক ব্যাপার। সত্য বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে বলা যায়: তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বলি, তিনি সৎস্বরূপ চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ; ঈশ্বরের উপর অজ্ঞান আরোপ করার কথা চিন্তাই করিব না। চিন্তা বা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবার সকল প্রয়াসই সেই পরব্রহ্মকে জাগতিক করিয়া ফেলে। ইহাতে ব্রহ্মভাবের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়।

২০. একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, ইন্দ্রিয়-জগৎ সম্বন্ধে ঐ ভাবের কথা জোর করিয়া বলা চলে না। কারণ তুমি যদি ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে থাকিয়া বলো যে তুমিই ঈশ্বর, তবে অন্যায় কর্ম হইতে কে তোমাকে নিবৃত্ত করিবে? সুতরাং তোমার দেবত্ববিষয়ক দৃঢ় ঘোষণা কেবল পারমার্থিক জগতেই খাটে। আমিই যদি ঈশ্বর হই, তবে তো আমি ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির বহু ঊর্ধ্বে। সুতরাং কোন অন্যায় কাজ আমি করিতে পারি না। নৈতিকতা অবশ্য মানুষের লক্ষ্য নয়, তবে ইহাই ঐ মুক্তভাব লাভ করিবার উপায় মাত্র। বেদান্ত-মতে 'যোগ' মানুষের এই দেবত্ব (ব্রহ্মত্ব) অনুভব করিবার একটি উপায় মাত্র। বেদান্ত বলেন, অন্তর্নিহিত মুক্তভাব উপলব্ধি করিলেই ঐ দেবত্বও অনুভব করা যায়। যাহা কিছু বাধা দেয়, সব দূরীভূত হয়। ধার্মিক আচরণ ও নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি—যে যাহার আসন যথাস্থানে করিয়া লইবে।

২১. বেদান্তে সাধনার স্থান আছে, ভয়ের স্থান নাই। সব ভয় তখনই চলিয়া যাইবে, যখন তুমি তোমার স্বরূপ দৃঢ়রূপে ঘোষণা করিবে। যদি নিজেকে বদ্ধ বলিয়া মনে কর, বদ্ধই হইয়া থাকিবে; আর মুক্ত বলিয়া মনে করিলে মুক্ত হইয়া যাইবে।

২২. মায়িক জগতে আমরা মুক্তির যে ভাব অনুভব করি, তাহা আভাস মাত্র—যথার্থ মুক্তি নয়।

২৩. বাস্তবিক পক্ষে—জড়, মন ও আত্মার কোন ভেদ নাই। ঐগুলি সেই একই বস্তুকে অনুভূতি করার বিভিন্ন দিক মাত্র। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা দেখিলে এই জগৎকেই জড় বস্তু বলিয়া মনে হয়; দুষ্ট লোকের কাছে জগৎটা নরক—সৎ লোকের কাছে স্বর্গ, আর জ্ঞানীর কাছে ইহা ঈশ্বররূপে অনুভূত হয়।

২৪. বেদান্ত মানুষের যুক্তি-বিচার অনেকখানি স্বীকার করে—যদিও এই মতে বুদ্ধি অপেক্ষা উচ্চতর আরও কিছু আছে; কিন্তু বুদ্ধির মধ্য দিয়াই সেখানে পৌঁছিবার পথ।

২৫. মনের চিন্তাগুলি (চিত্তবৃত্তি) থামাইতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারিব, আমরা চিন্তার পারে। 'নেতি নেতি' করিয়া আমরা এ অবস্থায় পৌঁছিতে পারি। 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা ব্যাবহারিক জগৎ লোপ পাইলে যাহা থাকে, তাহাই আমাদের যথার্থ স্বরূপ। যথার্থ স্বরূপ কখনই ব্যক্ত করা যায় না—প্রকাশ করা যায় না, কারণ প্রকাশ করিতে গেলেই তো আবার ইচ্ছার উৎপত্তি হইবে।

২৬. এটি ঠিক যে, আমরা (চিন্তার) একটি প্রণালী সৃষ্টি করি, কিন্তু কোন প্রণালীই যে পূর্ণ নয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ সত্য অবশ্যই সকল প্রণালীর অতীত বস্তু। ইহার সহিত অন্যান্য প্রণালীর তুলনা করিতে আমরা প্রস্তুত এবং আলোচনায় এ-কথাও প্রমাণ করা যাইবে যে, এই প্রণালীই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসম্মত; তথাপি এ প্রণালীটি পূর্ণ নয়, কারণ বিচার কখনই পূর্ণ নয়। যাহা হউক, এই জ্ঞানযোগই মানবীয় অনুভূতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুক্তিসম্মত উপায়।

এ-কথা কিছুটা সত্য যে, কোন পদ্ধতি নিজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রসারশীল হইবেই। কোন চিন্তাপ্রণালী বেদান্তের মতো এত বেশী বিস্তার

লাভ করে নাই। আজও ব্যক্তিগত সংস্পর্শের মাধ্যমেই শিক্ষালাভ অত্যন্ত কার্যকর হইয়া থাকে। বহু গ্রন্থপাঠ করিলেই প্রকৃত মানুষ হয় না। যাঁহারা সত্যিকারের মানুষ ছিলেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত সংস্পর্শ পাইয়াই বড় হইয়াছিলেন। প্রকৃত মানুষের সংখ্যা সত্যই অত্যন্ত কম, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িবে। তথাপি এ-কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না যে, এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা সকলেই দার্শনিক হইয়া যাইব। এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি না যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন পৃথিবীতে শুধু সুখই থাকিবে, কোন দুঃখ থাকিবে না।

২৭. বেদান্ত-দর্শনই বৌদ্ধধর্মের ও ভারতের অন্যান্য দর্শনগুলির ভিত্তি। কিন্তু অদ্বৈত-দর্শনের আধুনিক সম্প্রদায় বলিতে যাহা বুঝায়, তাঁহারা বৌদ্ধদের অনেকগুলি সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য হিন্দুগণ—অর্থাৎ গোঁড়া হিন্দুগণ কখনই তাহা স্বীকার করিবে না, কারণ তাহাদের কাছে বৌদ্ধেরা বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু সমগ্র অদ্বৈতবাদ সম্প্রসারিত করিয়া বিরুদ্ধবাদীদেরও ইহার অন্তর্ভুক্ত করিবার একটা প্রচেষ্টা সচেতনভাবেই চলিয়াছে।

২৮. বৌদ্ধধর্মের সহিত বেদান্তের কোন বিরোধ নাই। সকল মতের সমন্বয়-সাধনই বেদান্তের ভাব। উত্তরদিকের (মহাযান) বৌদ্ধগণের সহিত আমাদের মোটেই কোন বিরোধ নাই। কিন্তু ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও দক্ষিণাংশের (হীনযান) বৌদ্ধগণের মতে এই ব্যাবহারিক জগৎ সত্যই আছে এবং তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন: এই জগতের পিছনে পারমার্থিক জগৎ সৃষ্টি করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? এ-বিষয়ে বেদান্তের উত্তর এই যে, বিবৃতিটি ভ্রমাত্মক। কারণ বেদান্ত কখনই বিবাদ করিয়া বলে না যে, একটি পারমার্থিক জগৎ ও একটি ব্যাবহারিক জগৎ বিদ্যমান। বেদান্তের মতে সত্য এক, তাহাকে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ব্যাবহারিক জগৎ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই পারমার্থিক। যে রজ্জু দেখে, সে সর্প দেখে না। হয় রজ্জু, নয় সর্প, কিন্তু একই সময়ে কখনই দুইটি নয়। সুতরাং আমরা দুইটি জগতের অস্তিত্ব মানি—আমাদের মতবাদ সম্পর্কে বৌদ্ধদের এই বিবৃতি একেবারেই অমূলক। যদি তাহারা চায়, তাহাদের বলিবার অধিকার আছে, জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কিন্তু তাই বলিয়া অপরের ইহাকে পারমার্থিক বলিবার কোন অধিকার নাই—এরূপ বিবাদ করিবার অধিকার তাহাদের নাই।

২৯. **ইচ্ছাশক্তি**ঃ বৌদ্ধধর্ম এই ব্যাবহারিক জগৎ চায় না। এই মতে ব্যাবহারিক জগতেই তৃষ্ণা (বাসনা) বিদ্যমান, এবং এই তৃষ্ণাই এ-সকল সৃষ্টি করিতেছে। আধুনিক বৈদান্তিকগণ এ-কথা একেবারেই স্বীকার করেন না। আমরা বলি, কিছু একটা আছে, যাহা ইচ্ছা (বাসনা)-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। বাসনা সৃষ্ট পদার্থ—যৌগিক ; মৌলিক নয়। বাহ্য বিষয় না থাকিলে কোন বাসনার সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে, বাসনাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে—এই মতটি একেবারেই অসম্ভব। কেমন করিয়া তাহা হইবে ? বাহ্য বিষয়ের প্রেরণা ব্যতীত তুমি কি কখনও ইচ্ছা বা বাসনার অস্তিত্ব বোধ করিয়াছ ? প্রেরণা ব্যতীত অথবা আধুনিক দার্শনিক পরিভাষায় স্নায়বিক উত্তেজনা ব্যতীত কোন বাসনার উদ্রেক হয় না। ইচ্ছা বা বাসনা মস্তিষ্কের একপ্রকার প্রতিক্রিয়া মাত্র—সাংখ্য-দার্শনিকদের মতে ইহা 'বুদ্ধি'। এই প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া-সাপেক্ষ এবং ক্রিয়া মানিলেই বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বহির্জগতের অস্তিত্ব না থাকিলে ইচ্ছাও থাকিতে পারে না ; তথাপি তোমাদের মত অনুসারে বাসনাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। বাসনা কে সৃষ্টি করে ? যেখানে বাসনা, সেখানেই জগৎ। যে প্রেরণা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই প্রেরণা হইতেই জাত বহু সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অন্যতম বাসনা। কিন্তু দর্শন এখানেই ক্ষান্ত হয় না। বাসনা বা ইচ্ছা একেবারেই ব্যক্তিগত, সুতরাং আমরা শোপেনহাওয়ারের সঙ্গে মোটেই একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা একটি যৌগিক সৃষ্টি—অন্তরের ও বাহিরের মিশ্রণে উৎপন্ন। মনে কর কোন লোক জ্ঞানেন্দ্রিয়-বর্জিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ফলে তাহার কোন ইচ্ছাই থাকিবে না। ইচ্ছার বিকাশের জন্য প্রথমতঃ বাহিরের কোন বস্তু থাকা চাই। তারপর ভিতর হইতেও মস্তিষ্ক কিছু শক্তি সংগ্রহ করে। সুতরাং ইচ্ছা এই দেওয়ালটি বা অন্যান্য বস্তুর মতোই একটি যৌগিক পদার্থ। এই-সকল জার্মান দার্শনিকের ইচ্ছা-বিষয়ক মতবাদের সহিত আমরা মোটেই একমত নই। ইচ্ছা নিজেই ব্যাবহারিক, সুতরাং কখনই পরম সত্য হইতে পারে না। বাসনা বা ইচ্ছা বহু প্রক্ষেপের অন্যতম। এমন একটা কিছু আছে, যাহা ইচ্ছা নয়, কিন্তু নিজেকে ইচ্ছারূপে প্রকাশ করিতেছে—এ-কথা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু ইচ্ছাই সব-কিছু হইয়া নিজেকে প্রকাশিত করিতেছে—এ-কথা বুঝিতে পারি না, কারণ আমরা তো জগৎ

হইতে পৃথক্ কোন ইচ্ছার অস্তিত্বের কল্পনাই করিতে পারি না। যখন সেই মুক্ত সত্তা ইচ্ছারূপে পরিণত হয়, দেশকালনিমিত্তের দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে। কাণ্টের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে দেখিব যে, ইচ্ছা—দেশ কাল ও নিমিত্তের মধ্যেই বর্তমান। তাহা হইলে কেমন করিয়া পরম সত্য হইবে? কালের মধ্যে ছাড়া কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না।

৩০. ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্যবস্তু—এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইবার ইঙ্গিত দিতে পারিলেও তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীতির মধ্যে আনিয়া দেখাইতে আমরা পারিব না। উদাহরণস্বরূপ এই একত্ব সকল বস্তুতে এমন কি সাধারণ পদার্থের মধ্যেও অবশ্যই অনুস্যূত আছে। মানববুদ্ধিপ্রসূত সামান্যীকরণ-পদ্ধতিকে উদাহরণস্বরূপ নিতে পারি; যা কিছু বিভিন্নতা, তাহা নাম ও রূপের দ্বারাই হইয়াছে; তথাপি যখনই আমরা এই নাম-রূপকে ধরিতে যাই, পৃথক্ করিয়া বুঝিতে যাই, তখনই দেখি, ইহাদের অস্তিত্ব কোথাও নাই। নাম, রূপ বা কারণকে পৃথক্‌ভাবে আমরা কখন দেখিতে পাই না। তাই এই জগৎ-প্রপঞ্চ মায়া—ব্রহ্মের সত্তার উপরই নির্ভরশীল একটা কিছু, ব্রহ্ম ব্যতীত তাহার কোন অস্তিত্বই নাই। দৃষ্টান্তরূপে সাগরের তরঙ্গকে লওয়া যাক। যতক্ষণ নির্দিষ্ট পরিমাণ জল তরঙ্গের আকারে থাকে, ততক্ষণই তরঙ্গের অস্তিত্ব থাকিবে। কিন্তু যখনই (জলরাশির) ঐ আকার মিলাইয়া যায়, উহা সমুদ্রই হইয়া যায়, তখন আর তরঙ্গ থাকে না। সমগ্র জলরাশি তরঙ্গের আকারের উপর নির্ভরশীল নয়। সাগর সর্বদাই বিদ্যমান, কেবল (মাঝে মাঝে) তরঙ্গের আকৃতি একেবারে শূন্য হইয়া যায়।

৩১. সত্য বস্তু এক। মনই সেই একেকে বহুরূপে প্রতিভাত করিতেছে। যখন আমরা বিভিন্নতা অনুভব করি, তখন এক-বোধ থাকে না, এবং যখনই একত্বের উপলব্ধি করি, তখন বিভিন্নতা লোপ পায়। ঠিক যেমন প্রাত্যহিক জীবনে—যখন একত্বের অনুভব কর, তখন বিভিন্নতা অনুভব কর না। তোমরা প্রথমে একত্ব হইতেই শুরু কর। ইহা বড় অদ্ভুত ব্যাপার যে, প্রথম প্রথম কোন চীনা একজন আমেরিকাবাসীর সঙ্গে অপর আমেরিকাবাসীর আকৃতিগত কোন পার্থক্য বুঝিতে পারে না; এবং তোমরাও (আমেরিকাবাসীরা) বিভিন্ন চৈনিকের পার্থক্য ধরিতে পার না।

৩২. আমাদের মনই যে পদার্থসকলকে জ্ঞানের বিষয় করিয়া দেয়, তাহা দেখানো যাইতে পারে। যে-সব পদার্থের বিশেষ ধর্ম বা গুণ আছে, সেগুলিই জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের পর্যায়ে পড়ে। যাহার কোন ধর্ম বা গুণ নাই, তাহা অজ্ঞেয়। মনে কর, 'ক' নামে কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বহির্জগৎ বর্তমান। যখন আমি এই বহির্জগতের দিকে তাকাইব, তখনই তাহা হইবে 'ক'+ মন। যখন আমি জগৎকে জানিতে চাই, তখন আমার মনই হইবে জ্ঞানের তিন-চতুর্থাংশ উপাদান। অন্তর্জগৎ হইবে 'খ'+ মন, এবং বহির্জগৎ='ক'+ মন। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য তাহা মনেরই সৃষ্টি, বাকী যাহা কিছু আছে, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। ইহা জ্ঞানের পরিধিরও বাহিরে এবং যাহা কিছু জ্ঞানের অতীত, তাহার বিভাজন বা পৃথক্‌করণ অসম্ভব। সুতরাং বাহিরের 'ক' ও ভিতরের 'খ' একই বস্তু। অতএব সত্যবস্তু এক।

৩৩. মায়ার আবরণের মধ্য দিয়ে দৃষ্ট পরব্রহ্মই ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর। যখন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা তাঁহাকে ধরিতে চাই, তখনই তাঁহাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন সাকাররূপে দেখিতে পাই। কিন্তু ভাবটি এই যে, আত্মাকে কখনই জ্ঞানের বিষয় করা যায় না। জ্ঞাতা কিভাবে নিজেকে জানিতে পারে? কিন্তু আত্মা যেন একটি ছায়া প্রক্ষেপ করিতে পারেন—এই ছায়াপাতকেই জ্ঞানের বিষয়ীকরণ (objectification) বলা যাইতে পারে। এই ছায়া-সত্তার চরম প্রকাশ পরমাত্মার নিজেকে নিজের জ্ঞানের বিষয় করার চেষ্টাই ব্যক্তিভাবাপন্ন সাকার ঈশ্বর। আত্মাই শাশ্বত জ্ঞাতা (subject)। আমরা সর্বদাই আত্মাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছি। আর এই সংগ্রামের ফলস্বরূপ এই বিশ্বজগৎ, এবং যাহাকে আমরা জড়বস্তু ও অন্য অনেক নামে অভিহিত করি—এই সবের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এইগুলি সব দুর্বল প্রচেষ্টার ফল; আমাদের পক্ষে সম্ভব আত্মার সর্বোচ্চ প্রকাশ ব্যক্তিভাবাপন্ন সাকার ঈশ্বর। এই বিষয়ীকরণ আমাদের স্বরূপ-প্রকাশেরই এক প্রচেষ্টা। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই পুরুষকে এই-সকল বিষয় দেখাইতেছে, এবং যখন পুরুষের যথার্থ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তখনই সে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে। অদ্বৈত বেদান্তমতে আত্মা নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বহু সাধনার পর আত্মা দেখেন যে,

জ্ঞাতা (বিষয়ী=subject) সর্বদা জ্ঞাতামাত্রই থাকিবেন এবং তখনই অনাসক্তি আরম্ভ হয় এবং আত্মা মুক্ত হন।

কোন ব্যক্তি যখন সেই পূর্ণ অবস্থা লাভ করেন, তখন তিনি ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর-স্বরূপ হন। 'আমি ও আমার পিতা এক।' তিনি জানেন যে, ব্রহ্মের সহিত তিনি এক এবং সাকার ঈশ্বরের ন্যায় নিজেকে অভিক্ষেপ করেন। মহিমান্বিত রাজাও যেমন মাঝে মাঝে পুতুল লইয়া খেলা করেন, তেমনি তিনিও খেলা করেন।

৩৪. কতকগুলি কল্পনা মানুষের বাকী বন্ধনগুলি ছিন্ন করিতে সাহায্য করে। গোটা বিশ্বটাই একটা কল্পনা। কিন্তু এক ধরনের কল্পনা অন্য ধরনের কল্পনারাশির অবসান ঘটাইতে পারে, যাহারা আমাদের বলে যে, জগতে পাপ আছে, দুঃখ ও মৃত্যু আছে, তাহারা ভয়ঙ্কর। অপর দল বলেন—তুমি পবিত্র, ঈশ্বর সত্য, জগতে কোন দুঃখ নাই—এই ভাবগুলি শুভ এবং অপরের বন্ধন দূর করিতে সাহায্য করে। মানব-মনের উচ্চতম কল্পনা—ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর-ভাবই শৃঙ্খলের সবকয়টি শিকলি ভাঙিয়া ফেলিতে পারে।

৩৫. পরম আনন্দের মুহূর্ত আমাদের জীবনে কখন কখন আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমরা আনন্দ ছাড়া কোন-কিছুই চাই না, কোন-কিছু দিই না, কোন-কিছু বুঝিও না। সে-ভাব কাটিয়া যায়, আবার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্র্য চোখের সামনে আবর্তিত দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা জানি, ইহা সব-কিছুর আধাররূপে অবস্থিত ঈশ্বর-সত্তার উপর বিরচিত বিচিত্র কারুকার্য।

বেদান্ত শিক্ষা দেয়—এখানে এইক্ষণেই নির্বাণ লাভ করা যায়; এ-অবস্থা প্রাপ্তির জন্য আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না। নির্বাণ আত্মস্বরূপের উপলব্ধি—এক মুহূর্তের জন্য যদি কেউ একবার এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, তবে সে আর ব্যক্তিত্বের মরীচিকার দ্বারা বিভ্রান্ত হইবে না। চক্ষু থাকিলে আপাতপ্রতীয়মান জগৎ দেখিতেই হইবে। কিন্তু জগৎটা যে কি, সর্বক্ষণই আমরা জানি; আমরা ইহার প্রকৃত স্বরূপকে ধরিতে পারিয়াছি। (মায়ার) পর্দাই অপরিণামী আত্মাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। পর্দা সরিয়া যাইলেই অন্তরালবর্তী আত্মাকে দেখিতে পাইব। যাহা কিছু পরিবর্তন, তাহা পর্দাতেই। মহাপুরুষদের অন্তরে এই আবরণ খুবই পাতলা, সত্য তাহার

মধ্য দিয়া প্রায় স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। আর পাপীর মধ্যে এই আবরণ বেশ পুরু, ইহার অন্তরালে যে আত্মা আছেন, তাহা দেখাই যায় না। যখন পর্দা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়, তখন বুঝিতে পারি যে, পর্দা সেভাবে কোন কালেই ছিল না, এবং আমরা আত্মাই ছিলাম, তাছাড়া আর কিছুই ছিলাম না; তখন ঐ আবরণের কথাও আমরা ভুলিয়া যাই।

৩৬. জীবনের দুইটি বিশিষ্ট ধারা এই: প্রথমতঃ যে-মানুষ তাহার প্রকৃত স্বরূপকে জানিয়াছে, সে কখনই জাগতিক বস্তু দ্বারা বিচলিত হইবে না; দ্বিতীয়তঃ কেবল সেই ব্যক্তিই জগতের কল্যাণ করিতে পারে; সেই কেবল অপরের হিত করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছে, কারণ কেবল একটি (আত্মা)ই আছেন। ইহাকে 'অহংভাব' বলা চলে না, কারণ তাহাতে ভেদবুদ্ধি আসিবে। ইহা কেবল অহংশূন্যতা। বিশ্বাত্মার (সমষ্টি-)বোধই তখন থাকিবে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক (ব্যষ্টি-)ভাব নয়। প্রেম ও সহানুভূতি প্রতি ক্ষেত্রে এই বিশ্বাত্মভাবই প্রমাণ করে। 'নাহং, তুঁহু'—আমি নই, তুমি। অপরকে সাহায্য করি, কারণ আমি তাহাতে এবং সে আমাতে—এভাবেই এই তত্ত্বটি দার্শনিক ভাষায় প্রকাশ করা যায়। প্রকৃত বৈদান্তবাদীই কোনরূপ মর্ম-পীড়া বোধ না করিয়া অপরের জন্য নিজ জীবন বলি দিতে পারেন; কারণ তিনি জানেন, তাঁহার মৃত্যু নাই। যে পর্যন্ত পৃথিবীতে একটি কীট জীবিত থাকিবে, সে পর্যন্ত তিনিও থাকিবেন; যতক্ষণ একটি মুখও আহার গ্রহণ করে, ততক্ষণ তিনিও আহার করেন। সুতরাং তিনি লোককল্যাণে কাজ করিয়া যান, শরীরের যত্ন লইবার আধুনিক ভাবের দ্বারা তিনি কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হন না। সাধক যখন আত্মত্যাগের এই স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি সকল নৈতিক নিয়মের উর্ধ্বে—সকল বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে চলিয়া যান। 'তিনি বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গাভীতে কুকুরে এবং অতি দুঃখপূর্ণ স্থানে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ গাভী কুকুর বা দুঃখপূর্ণ স্থান দেখেন না, পরন্তু সকলের মধ্যেই ঈশ্বরকে প্রকাশিত দেখিতে পান। তিনিই একমাত্র সুখী, যিনি এ জীবনেই এই সাম্যভাব লাভ করিয়াছেন; তিনি স্বর্গাদি লোক (সংসার) জয় করিয়াছেন। ঈশ্বর পবিত্র, সুতরাং বলা হয়—এ-ধরনের পুরুষ ঈশ্বরেই জীবন যাপন করিতেছেন।'[১] যীশু

---

১ গীতা, ৫।১৮-১৯

বলিয়াছেন, 'এব্রাহামের পূর্বে আমি ছিলাম।' ইহার অর্থ এই যে, ইহারা নিত্যমুক্ত আত্মা। অতীত কর্মফলে বাধ্য হইয়া ন্যাজারেথের যীশু মানবদেহ ধারণ করেন নাই, পরন্তু লোককল্যাণের জন্যই করিয়াছেন। মানুষ মুক্ত হইলে স্তব্ধ বা জড়বৎ হইয়া যায় না, বরং অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বেশী ক্রিয়াশীল হয়, কারণ অপর সকলে শুধু বাধ্য হইয়া কাজ করে, মুক্ত পুরুষই কেবল স্বাধীনভাবে কর্ম করেন।

৩৭. ব্যক্তিত্ব: আমরা যদি ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হই, তবে কি আমাদের ব্যক্তিত্ব নাই? হাঁ আছে। সেই তো ঈশ্বর। আমাদের ব্যক্তিত্বই ঈশ্বর। বর্তমানে তোমার যাহা আছে, তাহা ব্যক্তিত্ব নয়, তবে তুমি ব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছ। 'ব্যক্তিত্ব' শব্দের অর্থ—যাহা আর বিভক্ত করা যায় না। ইহাকে তুমি কেমন করিয়া ব্যক্তিত্ব বলিতে পারো? এই মুহূর্তে তুমি একভাবে চিন্তা করিতেছ, পরমুহূর্তে অন্যভাবে, আবার দু-ঘণ্টা পরে আর একভাবে চিন্তা করিতেছ। যাহা পরিবর্তনীয় নয়, তাহাই ব্যক্তিত্ব—সর্ব বস্তুর পারে অপরিবর্তনীয়। চিরকাল একই অবস্থায় আবদ্ধ থাকা তো অতি ভয়াবহ ব্যাপার, কারণ তাহা হইলে যে চোর সে চিরকাল চোরই থাকিয়া যাইবে, আর যে অভদ্র সে অভদ্রই থাকিয়া যাইবে। একটি শিশু মারা গেলে তাহাকে চিরকাল শিশুরূপেই থাকিতে হইবে। যাহার কখনও পরিবর্তন হয় না এবং হইবে না, তাহাই প্রকৃত ব্যক্তিত্ব—আর তাহাই আমাদের অন্তর্যামী ভগবান্।

৩৮. ঈশ্বর যুক্তি-বিচার করেন না। কোন বিষয় জানা থাকিলে তুমি তর্ক করিবে কেন? কতকগুলি তথ্য পাইবার জন্য আমাদের কীটের মতো মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে হইবে, আবার খানিক বাদেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া সব কিছু তালগোল পাকাইয়া যাইবে—এ দুর্বলতার চিহ্ন। আত্মা প্রতিফলিত হন মনে ও প্রত্যেক বস্তুতে। আত্মার জ্যোতিই মনকে চেতনাশীল করে। সব কিছুই চৈতন্যের প্রকাশ; মনগুলি তাঁহার দর্পণ মাত্র। যাহাকে তোমরা প্রেম, ভয়, ঘৃণা, পুণ্য ও পাপ বলো, সবই আত্মার প্রতিফলক মাত্র। যখন প্রতিফলক নিকৃষ্ট হয়, তখন প্রতিফলনও মন্দ হইবে।

৩৯. এক সময়ে আমরা নিম্নতর জীব ছিলাম। আমরা মনে করি, তাহারা আমাদের অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির। আমি পাশ্চাত্য দেশের লোকেদের

বলিতে শুনিয়াছি, 'এ জগৎ আমার জন্যই সৃষ্ট।' যদি বাঘগুলি বই লিখিতে পারিত, তাহারা লিখিত: মানুষ তাহাদেরই জন্য সৃষ্ট, এবং মানুষ অত্যন্ত পাপী জীব, কারণ তাহারা বাঘকে সহজে 'মানুষ' ধরিতে দেয় না। যে-কীট আজ তোমার পায়ের তলা দিয়া চলিয়াছে, সেও ভাবী ঈশ্বর।

৪০. প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলাই মুক্তি—এই মত আমি মানি না। ইহার যে কি অর্থ, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। মানব-প্রগতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ করিয়াই মানুষ প্রগতিশীল হইয়াছে।

এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, উচ্চতর নিয়ম দ্বারাই নিম্নতর নিয়ম জয় করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও জয়শীল মন মুক্তির চেষ্টাই করিতেছে এবং যেই মাত্র বোঝা গিয়াছে, সংগ্রামও নিয়মের ভিতর দিয়াই চলিয়াছে, তখনই উহাকেও জয় করার চেষ্টা হইয়াছে। সুতরাং প্রতি ক্ষেত্রে মুক্তিই ছিল উদ্দেশ্য। গাছ কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করে না। গরুকে কখনও চুরি করিতে দেখি নাই, শুক্তি-ঝিনুক কখনও মিথ্যা বলে না—তথাপি তাহারা মানুষের চেয়ে উচ্চতর নয়। এই জীবনই মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোষণা এবং এই নিয়মানুবর্তিতা বেশী দূরে লইয়া গেলে আমাদের জড়ে পরিণত করিবে—কি সমাজে, কি রাজনীতিতে, কি ধর্মজীবনে। খুব বেশী নিয়ম মৃত্যুরই নিশ্চিত চিহ্ন। যেখানেই সমাজে নিয়মের আধিক্য দেখা দেয়, সেখানে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, ঐ সমাজ শীঘ্রই মরিবে। যদি তোমরা হিন্দুভারতের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর, তবে দেখিবে হিন্দুর মতো অন্য কোন জাতির জীবনে এত বেশী নিয়ম প্রচলিত নাই, এবং ফলস্বরূপ জাতি-হিসাবে হিন্দুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু হিন্দুদের একটি বিশেষ ভাব ছিল এই যে, তাহারা কখনও ধর্ম-বিষয়ে কোন মতবাদ বা গোঁড়ামি সৃষ্টি করে নাই, ফলে (তাহাদের) ধর্মের সর্বাধিক পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। চিরন্তন নিয়ম কখনও মুক্তি হইতে পারে না, কারণ চিরন্তনকে নিয়মের মধ্যে ফেলার অর্থই হইতেছে তাহাকে সীমাবদ্ধ করা।

৪১. ভগবানের দৃষ্টিতে কোন উদ্দেশ্য নাই, কারণ তাঁহার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকিত, তবে তিনি বৃক্ষটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু হইতেন না। কেন তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিবে? যদি তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিত, তবে তো

তিনি সেই উদ্দেশ্য দ্বারাই বদ্ধ হইয়া পড়িতেন। মনে কর, একজন গালিচা-প্রস্তুতকারী একটি গালিচা বুনিতেছে, বাহিরের কোন মহত্তর ভাবকে রূপ দিতেছে। এখন কোথায় সেই ভাব, যাহার সঙ্গে ভগবান্ নিজেকে খাপ খাওয়াইবেন? বড় বড় সম্রাট্‌গণও যেমন মাঝে মাঝে পুতুলখেলা করেন, তেমনি ঈশ্বরও এই প্রকৃতির সঙ্গে খেলা করিতেছেন। আমরা বলি, 'ইহাই নিয়ম।' আমরা ইহাকে নিয়ম বলি, কারণ ইহার খুব সামান্য অংশই—যাহা সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে—আমরা বুঝিতে পারি। নিয়ম সম্পর্কে আমাদের সকল ধারণাই এই ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিয়ম অনন্ত—অর্থাৎ অনন্তকাল ধরিয়াই প্রস্তর পড়িতে থাকিবে, ইহা একেবারেই বাজে কথা। যদি সব যুক্তি অভিজ্ঞতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বে পাথর পড়িয়াছিল কি-না, দেখিবার জন্য কে উপস্থিত ছিল? সুতরাং নিয়ম মানুষের স্বভাবগত বস্তু নয়। মানুষ সম্বন্ধে ইহাই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত যে, আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করি, সেখানেই শেষ করি। কার্যতঃ আমরা ধীরে ধীরে নিয়মের বাহিরে যাই, এবং অবশেষে একটা সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া একেবারে নিয়মাতীত হই। ঈশ্বর ও মুক্ত অবস্থা হইতেই আমাদের আরম্ভ, আবার ঈশ্বর ও মুক্ত অবস্থাতেই আমাদের পরিসমাপ্তি। নিয়মগুলি যাত্রার মধ্যপথে অবস্থিত এবং এই-সকল নিয়মের মধ্য দিয়াই আমাদের যাইতে হইবে। আমাদের বেদান্তে সর্বদাই মুক্তির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। নিয়মের ভাবটি বেদান্তবাদীকে ভীত করে, আর ঐ চিরন্তন নিয়ম তাহার কাছে অতি ভয়াবহ ব্যাপার, কারণ তাহা হইলে মুক্তির আর কোন উপায়ই থাকে না। যদি এমন কোন চিরন্তন নিয়ম তাহাকে সর্বদাই বাঁধিয়া রাখে, তবে মানুষ ও একখণ্ড তৃণের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আমরা নিয়মের সেই বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবে বিশ্বাস করি না।

৪২. আমরা বলি যে, মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা আমাদের করিতেই হইবে। আর সেই মুক্তিই ঈশ্বর বা ভগবান্। সেই এক আনন্দই মানুষ সর্বত্র উপভোগ করে, কিন্তু যখন কেহ সসীম কিছুতে আনন্দ পাইতে চায়, তখন সে তাহার কণিকা মাত্রই পায়। ঈশ্বরের মধ্যে সাধক যে আনন্দ লাভ করে, চুরি করিয়া চোর সেই এক আনন্দই পায়; কিন্তু চোর সেই আনন্দের কণামাত্রই পায়, তাহাও দুঃখরাশির সহিত মিশ্রিত। প্রকৃত আনন্দই

ভগবান্। প্রেমই ভগবান্—মুক্তিই ভগবান্। আর যাহা কিছু মানুষকে বদ্ধ করে, তাহা ভগবান্ নয়।

৫৩. প্রকৃত সত্তা অব্যক্ত, প্রকাশশূন্য। আমরা তাহা ধারণা করিতে পারি না, কারণ ধারণা করিতে গেলে মন দিয়াই করিতে হইবে, আর মন তো নিজেই ব্যক্ত পদার্থ। প্রকৃত সত্তার মহিমাই এই যে, তিনি ধারণাতীত, মনেরও অগোচর। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জীবনে তীব্রতম ও ক্ষীণতম আলোক-স্পন্দন আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাহারা একই সত্তার বিরোধী দুইটি প্রান্ত। এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যেগুলি এখন আমরা জানি না, কিন্তু সেগুলি আমরা জানিতে পারি; অজ্ঞানবশতই সেগুলি জানিতে পারি না। আবার এমন অনেক জিনিস আছে, যেগুলি আমরা কখনও জানিতে পারি না, কারণ সেগুলি আমাদের জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্পন্দন অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্চগ্রামের। কিন্তু যদিও বুঝিতে পারি না, তথাপি আমরা সর্বদাই সেই শাশ্বত সনাতন সত্তা। জ্ঞান সেখানে অসম্ভব। ধারণা বা চিন্তার সসীমত্বই তাহার অস্তিত্বের ভিত্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমার মধ্যে আমিত্বের চেয়ে নিশ্চিত আর কিছুই নাই, তথাপি শরীর ও মন, সুখী বা দুঃখী, পুরুষ বা স্ত্রীরূপেই কেবল আমিত্বের কথা ভাবিতে পারি, এবং যখনই আমি নিজ যথার্থ স্বরূপকে ধারণা করিতে চেষ্টা করি, তখনই স্বরূপকে শরীর বা মনের নিম্ন স্তরে না নামাইয়া কোন উপায়ই দেখিতে পাই না; তথাপি আমি আমার স্বরূপ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত। 'প্রিয়ে, পতির জন্যই কেহ পতিকে ভালবাসে না, ভালবাসে কারণ তাহার মধ্যে আত্মা রহিয়াছেন। পতির আত্মায় এবং আত্মার মাধ্যমেই পত্নী পতিকে ভালবাসে। প্রিয়ে, পত্নীর জন্যই কেহ পত্নীকে ভালবাসে না, পরন্তু আত্মায় ও আত্মার মাধ্যমেই ভালবাসে।'[১] এই আত্মসত্তাই যে একমাত্র বস্তু—তাহা আমরা জানি, কারণ আত্মায় ও আত্মার মধ্য দিয়াই আমরা সব বস্তু উপলব্ধি করিয়া থাকি, তথাপি আমরা ইহার সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি না। জ্ঞাতাকে আমরা কেমন করিয়া জানিব? যদি আমরা জ্ঞাতাকে জানিতেই পারিতাম, তবে তো সে আর জ্ঞাতা থাকিবে না, জ্ঞেয় হইয়া যাইবে—জ্ঞানের বিষয় হইয়া যাইবে।

১ বৃহদারণ্যক উপ., ২।৪।৫

৪৪. পুরানো সংস্কারগুলি দূর করিবার জন্ম আমাদের যুক্তি-বিচারের প্রয়োজন আর সংস্কারগুলি বিদূরিত হইলে যাহা থাকে, তাহাই বেদান্ত। একটি সুন্দর কবিতায় ঋষি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'বন্ধু, তুমি কেন কাঁদছ? তোমার কোন ভয় নেই, মরণ নেই, কেন তুমি কাঁদছ? তোমার কোন দুঃখ নেই, কারণ সুনীল অনন্ত আকাশের মতো তুমি স্বরূপতঃ অপরিণামী। নানা বর্ণের মেঘগুলি আকাশের কোলে এসে কয়েক মুহূর্ত বর্ণচ্ছটা বিকিরণ ক'রে মিলিয়ে যায়—কিন্তু আকাশ যা ছিল, তাই থাকে। তোমাকে কেবল এই অজ্ঞানের মেঘ অপসারণ করতে হবে।'[১] আমাদের শুধু জলাবরোধক কপাটগুলি খুলিয়া দিতে হইবে, এবং পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। জলরাশি স্বভাবতই সবেগে প্রবেশ করিবে এবং খাতগুলি পূর্ণ করিয়া দিবে, কারণ জলরাশি তো সেখানে পূর্ব হইতেই রহিয়াছে।

৪৫. মানুষ অনেকটা সচেতন প্রাণী, কতকটা অচেতন, আবার চেতনার অতীতে যাইবার সম্ভাবনাও তাহার আছে। কেবল যখন আমরা ঠিক ঠিক মনুষ্যপদবাচ্য হই, তখন আমরা যুক্তি-বিচারের বাহিরে যাইতে পারি। 'উচ্চতর' বা 'নিম্নতর' ইত্যাদি শব্দগুলি কেবল ব্যাবহারিক জগতেই প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু পারমার্থিক জগতে এইগুলি বিরোধী, কারণ সেখানে কোন পৃথক্-ভাব নাই। ব্যাবহারিক জগতে মনুষ্যত্বরূপ বিকাশই চরম অভিব্যক্তি। বেদান্তবাদী বলেন, মানুষ দেবতা অপেক্ষাও উচ্চে। দেবতাদেরও একদিন মরিতে হইবে এবং মানুষ হইয়া জন্মাইতে হইবে। দেবতারাও মানব-শরীরেই সিদ্ধ বা পূর্ণ হইতে পারেন।

৪৬. মুক্তি তো মানুষের করতলগত, তবে তাহাকে এ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে। সে মুক্তই, কেবল প্রতি মুহূর্তে সে তাহা ভুলিয়া যায়। এই সত্যকে আবিষ্কার করাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক মানুষের সমগ্র জীবন-প্রচেষ্টা। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, জ্ঞানী জ্ঞাতসারে ইহা করেন, আর অজ্ঞানী করে অজ্ঞাতসারে। প্রত্যেকেই মুক্তির জন্ম সংগ্রাম করে—পরমাণু হইতে নক্ষত্ররাশি পর্যন্ত। অজ্ঞানী একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মুক্তি পাইলেই সন্তুষ্ট হয়—ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত

১ তুলনীয়—অবধূতগীতা, ৩।৩৪

হইলেই সে খুশী; কিন্তু জ্ঞানী বোধ করেন, তাঁহাকে প্রবলতর বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। তিনি রেড ইণ্ডিয়ানদের স্বাধীনতার ভাবকে মুক্তি বলিয়া মনে করেন না।

৪৭. আমাদের দার্শনিকদের মতে মুক্তিই লক্ষ্য। জ্ঞান লক্ষ্য হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান যৌগিক পদার্থ। জ্ঞান শক্তি ও মুক্তির মিশ্রণ। একমাত্র মুক্তিই আমাদের কাম্য। ইহারই জন্য মানুষ চেষ্টা করিতেছে। কেবল শক্তি লাভ করিলেই জ্ঞান হইবে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিজ্ঞানী একটি বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে এক মাইল দূরে প্রেরণ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি উহাকে অসীম দূরত্বে পাঠাইতে পারে। তাহা হইলে কেন আমরা প্রকৃতির পূজা করিব না? নিয়ম আমরা চাই না; নিয়ম ভাঙিবার শক্তি চাই। আমরা নিয়মাতীত হইতে চাই। যদি তুমি নিয়মবদ্ধ হও তো এক তাল কাদার সমান হইবে। এই মুহূর্তেই তুমি নিয়মাতীত কি-না—এটি প্রশ্ন নয়, কিন্তু আমরা যে নিয়মাতীত, এই ভাবের উপরেই সকল মানব-প্রগতির ইতিহাস রচিত। উদাহরণস্বরূপ মনে করঃ একটি লোক অরণ্যে বাস করে; সে কোন বিদ্যাশিক্ষা করে নাই, তাহার কোন জ্ঞানও নাই। সে দেখিতেছে যে, একটি পাথর নীচে পড়িতেছে—একটি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটিতেছে, আর সে ভাবিতেছে ইহাই মুক্তি। সে ভাবে—পাথরটার আত্মা আছে, তাহার কেন্দ্রীয় ভাবটি হইতেছে মুক্তি। কিন্তু যেই মাত্র সে জানিবে যে, পাথরটা নীচে পড়িতে বাধ্য, সে বলিবে, ইহা প্রকৃতি—ইহা জড় যান্ত্রিক কর্ম। আমি পথে বাহির হইতে পারি, নাও পারি। মানুষ হিসাবে এই স্বাতন্ত্র্যই আমার মহিমা। কিন্তু যখনই আমি নিশ্চয় জানি যে, আমি সেখানে যাইবই, তখনই আমি নিজ স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া যন্ত্রে পরিণত হই। অনন্ত শক্তি সত্ত্বেও প্রকৃতি একটি যন্ত্রমাত্র; মুক্তিই চেতন জীবের মূল উপাদান। বেদান্তমতে অরণ্যচারী মানুষের ভাবটি ঠিক—তাহার দৃষ্টি ঠিক, কিন্তু ব্যাখ্যা ভুল। সে এই প্রকৃতিকে স্বাধীন মনে করে, নিয়মদ্বারা পরিচালিত ভাবে না। যাবতীয় মানবিক অভিজ্ঞতার পরই আমরা আবার ঠিক এইকথাই চিন্তা করিব, কিন্তু অধিকতর দার্শনিক অর্থে। উদাহরণস্বরূপঃ আমি পথে বাহির হইতে চাই; ইচ্ছা-শক্তির অনুপ্রেরণা লাভ করিলাম এবং তারপর থামিলাম; আমার যাইবার ইচ্ছা ও পথে যাওয়া

—এই দুইটির অন্তর্বর্তী কালে আমি একইভাবে কাজ করিয়াছি। কর্মের এই একতানতাকেই আমরা নিয়ম বলিয়া থাকি। আমি দেখিতেছি, আমার কর্মের এই একতানতা মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়; সুতরাং আমি আমার কর্মকে নিয়মবদ্ধ বলি না। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। আমি পাঁচ মিনিট হাঁটিয়াছি। কিন্তু ঐ একটানা পাঁচমিনিট হাঁটার পূর্বক্ষণে ইচ্ছা-শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল—যা আমাকে হাঁটার প্রবৃত্তি দিয়াছিল। তাই মানুষ মনে করে সে স্বাধীন, কারণ তাহার সমুদয় কাজকর্মকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালে ভাগ করা যায় এবং ঐ ক্ষণগুলির মধ্যে একটা একতানতার রেশ থাকিলেও কালের বাহিরে ঐ ধরনের ঐক্য ছিল না। এই অনৈক্যবোধেই মানবের মুক্তভাব নিহিত। প্রকৃতিতে আমরা দীর্ঘকালস্থায়ী ঐক্য দেখিতে পাই, কিন্তু প্রারম্ভে ও শেষে অবশ্য মুক্তির প্রেরণা থাকিবে। আদিতেই মুক্ত হইবার এই প্রেরণা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই আবর্তিত হইতেছে। কিন্তু এই প্রেরণা আমাদের কালের তুলনায় খুবই দীর্ঘ। দার্শনিক রীতি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা দেখি যে, আমরা মুক্ত নই। কিন্তু এই চেতনা সব সময়েই থাকিয়া যায় যে, আমি মুক্ত। ঐ ভাব কেমন করিয়া আসে, এটুকুই আমাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের দুইটি বৃত্তি আছে। আমাদের বিচারবুদ্ধি বলে, আমাদের সকল কাজেরই কারণ আছে, আবার প্রত্যেকটি প্রেরণার সঙ্গে আমরা আমাদের মুক্তভাব ঘোষণা করিতেছি। বেদান্তের মীমাংসা এই যে, আমাদের ভিতরে মুক্তভাব আছে—কারণ আত্মা প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, কিন্তু আত্মার ক্রিয়া যে শরীর ও মনকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই শরীর ও মন মুক্ত নয়।

৪৮. আমরা প্রতিক্রিয়া করিলেই দাস হইয়া পড়ি। কোন লোক আমার উপর দোষারোপ করিলে সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধের আকারে আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়। লোকটি যে সামান্য একটি আন্দোলন সৃষ্টি করিল, তাহাই আমাকে দাস করিয়া তোলে। সুতরাং আমাদিগকে আমাদের মুক্তস্বভাব প্রকাশ করিতে হইবে। 'তাঁহারাই জ্ঞানী—যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, নিম্নতম প্রাণী বা মানবসমাজের অত্যন্ত ঘৃণিত দুষ্টের মধ্যে মানুষ, মুনি বা জন্তু দেখেন না, পরন্তু সকলের মধ্যে এক ভগবান্‌কেই দেখেন। ইহজীবনেই তাঁহারা স্বর্গ জয়

করিয়াছেন এবং এই সাম্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ শুদ্ধ ও সর্বত্র সমভাবাপন্ন। সুতরাং ঈদৃশ দেহধারী ঈশ্বর।'[১] এই লক্ষ্যের দিকেই আমরা চলিয়াছি এবং মানুষের বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতি ও প্রত্যেকটি কর্ম এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার এক-একটি পথ। যে লোক অর্থ চায়, সেও মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে—দারিদ্র্যের বন্ধন হইতে মুক্তি চাহিতেছে। মানুষের প্রত্যেক কর্মই উপাসনা, কারণ সর্বত্রই মুক্তিলাভের ভাব প্রকটিত; এবং সকল কর্মই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তির অভিমুখী, শুধু যে-সকল কাজ মুক্তিপথের বাধাস্বরূপ, সেগুলি পরিহার করিতে হইবে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র বিশ্ব ভগবানের উপাসনাই করিতেছে; কেবল জানে না যে, যখন ভগবানের নিন্দা করিতেছে, তখনও একভাবে তাঁহার পূজাই করিতেছে, কারণ যাহারা ভগবানের নিন্দা করিতেছে, তাহারাও মুক্তির জন্যই সংগ্রাম করিতেছে। তাহারা কখনও চিন্তা করে না যে, কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া তাহারা সেই বিষয়েরই দাস হইয়া পড়িতেছে। সামান্য খোঁচার পরিবর্তে জোরে আঘাত করা কঠিন কাজ।

৪৯. যদি আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ বিশ্বাস হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম, তবে এখনই সব কিছু করিয়া ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত। ইহা কেবল সময়ের প্রশ্ন। যদি তাই হয়, তবে আরও শক্তি প্রয়োগ কর এবং এইভাবে সময় সংক্ষিপ্ত কর। সেই অধ্যাপকের কথা স্মরণ কর, যিনি মর্মর-প্রস্তরের গঠন-রহস্য আয়ত্ত করিয়া বারো বৎসরে মর্মর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আর প্রকৃতির উহা করিতে শত শত বৎসর লাগিয়াছিল।

১ গীতা, ৫।১৮-১৯

তথ্যপঞ্জী

দর্শন-ও দার্শনিক-পরিচিতি

জ্ঞানযোগে যে-সকল পাশ্চাত্য মনীষীর কথা বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইখানে লিপিবদ্ধ হইল—উপাধি-নামের বর্ণানুক্রমে]

কমতে—Auguste Comte (১৭৯৮—১৮৫৭) ফরাসী দার্শনিক। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—Course of Positive Philosophy (১৮৩০-৪২)।

কমতেকে প্রত্যক্ষবাদ (Positivism)-এর স্রষ্টা বলা হয়। তিনি ফরাসী সংশয়বাদের (French Scepticism)-এর অন্যতম ধারক। সংশয়-বাদের মধ্যেও যে নির্দিষ্ট (Positive) জ্ঞানের স্থান আছে, ইহাই তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁহার মতে—দর্শনে পরাবিজ্ঞানের (Metaphysics) কোন স্থান নাই। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে সমালোচনামূলক ব্যাখ্যাই দার্শনিকের কাজ। চিরাচরিত প্রথায় ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার দর্শন রচনা করিয়াছেন এবং ইহাকে মানবতাবাদের (Humanism) উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

জেমস্—William James (১৮৪২—১৯১০) আমেরিকান দার্শনিক। তাঁহার প্রধান রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—The Principles of Psychology (১৮৯০), The Will to Believe (১৮৯৭), Varieties of Religious Experience (১৯০২), A Pluralistic Universe (১৯০৯), The Meaning of Truth (১৯০৯) ইত্যাদি।

ইংলণ্ডের দার্শনিক হিউমের প্রভাব জেমসের দর্শনে খুবই স্পষ্ট। সত্যের প্রকৃতি এবং পরীক্ষা-বিষয়ে জেমস্ প্রয়োগবাদে (Pragmatism) বিশ্বাস করেন এবং তিনিই এই মতবাদের স্রষ্টা। সত্যের প্রকৃতি ও তাহার জ্ঞান সম্বন্ধে জীবনে উপযোগিতার প্রসঙ্গ জেমসের রচনায় একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। জৈবিক প্রয়োজন ব্যতীত কোন কিছুই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহার Pragmatism (১৯০৭) নামক গ্রন্থে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার উল্লেখ করেন।

টিণ্ডাল—John Tyndall (১৮৩০—৯৩) ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—The Glaciers of the Alps (১৮৬০), Heat as a Mode of Motion (১৮৬৩) ইত্যাদি।

তিনি Royal Institution-এ প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৮৫৩)। তাপসংক্রান্ত বহুবিধ মৌলিক গবেষণা করেন। বায়ুমণ্ডল ও আলোর পরিক্রমা সম্বন্ধে তিনি অনেক গবেষণা করিয়াছেন।

ডয়সন—Paul Deussen (১৮৪৫—১৯১৯) জার্মান দার্শনিক। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Elements of Metaphysics. বেদান্ত-শাস্ত্রের উপর তাঁহার দুইখানি রচনা পাওয়া যায়—একখানি 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে (১৮৮৩), অন্যটি 'বেদান্তসূত্র' সম্বন্ধে (১৮৮৭)। হিন্দুদর্শন—বিশেষ-ভাবে বেদান্ত-দর্শনের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ।—১০ম খণ্ডে স্বামীজীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ডারুইন—Charles Robert Darwin (১৮০৯—৮২) ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—On the Origin of Species by means of Natural Selection or the Preservation of the Favoured Races in the Struggle for Life (১৮৫৯), The Variation of Animals and Plants under Domestication (১৮৬৮) ইত্যাদি।

ডারুইন বিবর্তনবাদ প্রচারের জন্য খ্যাত। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনই (Natural Selection) বিবর্তনবাদের মূলকথা। তিনি যোগ্যতম প্রাণীর বাঁচিবার অধিকারের উপর (Survival of the fittest) বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে এই বিবর্তনবাদ একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

পিথাগোরাস—Pythagoras (খৃঃ পূঃ ৬০০—৫১০) গ্রীক দার্শনিক। তাঁহার লিখিত রচনা কিছুই পাওয়া যায় না। পিথাগোরীয় সম্প্রদায় হইতেই তাঁহার মতবাদ কিছু কিছু জানা যায়।

পিথাগোরাসকে গ্রীক দর্শনের ইতালীয় শাখার প্রতিষ্ঠাতারূপে বর্ণনা করা হয়। তিনি পুনর্জন্মবাদে (Transmigration of souls) বিশ্বাসী। সংখ্যাতত্ত্বের (Number) মূলবিষয়ে বহু গবেষণা করেন; ইহা হইতেই

চরম সত্যের (Ultimate Reality) স্বরূপ নির্ণয় করিবার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

প্লেটো—Plato (খৃঃ পূঃ ৪২৭—৩৪৭) প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক। তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা—Apology ; Crito ; The Republic; Symposium ; Phaedo ; Phaedrus ; Meno ইত্যাদি।

স্বনামধন্য প্রাচীন দার্শনিক সক্রেটিস্ প্লেটোর শিক্ষাগুরু। প্লেটোর দর্শনে সক্রেটিসের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। দর্শনের সহিত গণিতশাস্ত্রের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তাহা প্লেটো সর্বপ্রথম তাঁহার দর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ করেন। সঙ্গীত ও স্বাস্থ্যচর্চা দর্শনের একটি অপরিহার্য বিষয় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে আত্মার মধ্যে প্রজ্ঞাই (reason) আত্মার (soul) আসল রূপ। প্রজ্ঞারূপ আত্মা দেহের সহিত যুক্ত হইলে কামনা ও অন্যান্য বৃত্তির সূচনা হয়। আবার দেহ বিনষ্ট হইলে তাহাদের লোপ হয়। আত্মা অবিনশ্বর এবং তাহাকে জানাই হইল প্রকৃত জ্ঞান (wisdom)।

ফিক্‌টে—Johann Gottilieb Fichte (১৭৬২—১৮১৪) জার্মান দার্শনিক। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Essay toward a Critique of All Revelation (১৭৯২), Introduction to the Science of Knowledge, The Natural Right, Science of Ethics (১৭৯৬—৯৮) ইত্যাদি।

ফিক্‌টে কাণ্টের দার্শনিক মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। জ্ঞানের উপায় ও স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের (Scientific Knowledge) মূল সূত্রগুলি ধরিয়া তিনি নীতিশাস্ত্র এবং সমাজতত্ত্বের উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীবাত্মার মধ্যে সক্রিয় (active) এবং নিষ্ক্রিয় (passive) এই দুইটি স্তর আছে। মন বা অহং (Ego) চরম তত্ত্ব। নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যই অহং নিজেকে বস্তুরূপে বিক্ষিপ্ত করে।

বেন্‌থাম—Jeremy Bentham (১৭৪৮—১৮৩২) ইংরেজ দার্শনিক। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Introduction to the Principles of Morals and Legislation (১৭৮৯), Deontology (১৮৩৪) ইত্যাদি।

প্রাচীন দার্শনিক এপিকিউরাসের (Epicurus) মতবাদকে যথাযথ সংস্কার করিয়া নব্যভাবধারায় পরিপুষ্ট করিয়াছেন। নীতিশাস্ত্রজ্ঞ হিসাবেই বেন্‌থাম সমধিক পরিচিত। সুখী হইবার পন্থার মধ্যে তিনি নীতিশাস্ত্রের মূল সুর আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্বজনীন সুখ বা সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ (greatest happiness of the greatest number) মানুষকে জীবনের চরম মুক্তির পথ লাভ করিতে সাহায্য করে। এই সর্বজনীন সুখ যত তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী হইবে, ততই তাহার নৈতিক মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

মিল—John Stuart Mill (১৮০৬—৭৩) ইংরেজ দার্শনিক। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—System of Logic (১৮৪৩), Utilitarianism (১৮৬৩), An Examination of William Hamilton's Philosophy (১৮৬৫) ইত্যাদি।

জন স্টুয়ার্ট মিল পিতা জেমস্ মিলের দার্শনিক মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। দার্শনিক হিসাবে মিল ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক জ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল পদ্ধতি (Methodology of Sciences) সম্পর্কে তিনি অনেক আলোচনা করেন।

ম্যাক্স মূলার—Friedrich Maximillian Muller (১৮২৩—১৯০০) বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ জার্মান পণ্ডিত। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য History of Ancient Sanskrit Literature, Sacred Books of the East, Science of Language ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি সায়নাচার্যের ভাষ্য-সহিত ঋগ্বেদের একখানি সংস্করণ প্রকাশ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।—১০ম খণ্ডে স্বামীজীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ম্যাসপেরো—Sir Gaston Camille Charles Maspero (১৮৪৬—১৯১৬) ফরাসী মিশরতত্ত্ববিদ্ (Egyptologist)। তিনি প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

লেসীং—G. E. Lessing (১৭২৯-৮১) জার্মান দার্শনিক ও সাহিত্যিক। তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা—Collected Works (6 Vol-

umes, ১৭৫৩-৫৫); Letters upon Current Literature (১৭৫৮)। তিনি দার্শনিক স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) এবং লাইব্‌নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের (Individualism) সমন্বয় সাধন করেন। পরবর্তী কালে কবি গ্যেটে এবং শিলার যে ভাবধারায় সাহিত্য-জগৎ সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, লেসীং তাহারই সূচনা করেন।

শোপেনহাওয়ার—Arthur Schopenhauer (১৭৮৮—১৮৬০) জার্মান দার্শনিক। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—On Sight and Colours (১৮১৬), The World as Will and Idea (১৮১৯), The Two Fundamental Problems of Ethics (১৮৪১) ইত্যাদি।

শোপেনহাওয়ার নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক। তাঁহার মতে অচেতন ইচ্ছাই (Will) আত্মা। এই ইচ্ছার মাধ্যমেই আত্মার অন্যান্য মানসিক ক্রিয়াগুলি সুসম্বদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয়। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদের ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশমাত্র।

স্পেন্সার—Herbert Spencer (১৮২০-১৯০৩) ইংরেজ দার্শনিক। উল্লেখযোগ্য রচনা—Principles of Psychology (১৮৫৫), First Principles (১৮৬২), Principles of Biology (১৮৬৪-৬৭), Principles of Ethics (১৮৭৯), Principles of Sociology (১৮৭৬) প্রভৃতি।

হার্বার্ট স্পেন্সার অজ্ঞেয়বাদে (Agnosticism) বিশ্বাসী। তাঁহার প্রণীত First Principles নামক গ্রন্থে তিনি এই মতবাদের অবতারণা করেন। তাঁহার মতে—এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রথম এবং প্রধান কারণ সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তাহাকে তিনি অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় (Unknown and Unknowable) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হাক্সলি—Thomas Henry Huxley (১৮২৫-৯৫) ইংরেজ প্রাণি-তত্ত্ববিদ্। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—On the Anatomy and Affinities of the Family of Medusae; The Origin of Species (১৮৫৯), Man's Place in Nature (১৮৬৩).

হাক্সলি প্রথমজীবনে চিকিৎসকরূপে রাজ-নৌবহরবিভাগে যোগদান করেন (১৮৪৬)। অতঃপর জলজ জীবদেহসমূহের গবেষণায় তিনি বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করেন। জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি দার্শনিক এবং ধর্মীয়

সমস্যাসমূহের আলোচনা করেন। তবে দার্শনিক অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক হিসাবেই তিনি সমধিক পরিচিত।

হিউম—David Hume (১৭১১-৭৬) ইংরেজ দার্শনিক। প্রধান রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Treatise on Human Nature (১৭৩৪-৩৭), Enquiry Concerning Human Understanding (১৭৪৮), An Enquiry Concerning Principles of Morals (১৭৫১) ইত্যাদি।

তাঁহার দর্শন প্রত্যক্ষবাদ (Empiricism) বলিয়া পরিচিত। তিনি একজন সংশয়বাদী দার্শনিক। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী দার্শনিক লক (John Locke) এবং বার্কলির (Bishop Berkeley) মতের কিছু কিছু ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। প্রচলিত কার্যকারণবাদ হিউম অস্বীকার করেন।

হেকেল—Karl Haeckel (১৮৩৪—১৯১৯) জার্মান বৈজ্ঞানিক। তাঁহার প্রধান রচনাসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—Die Radiolarien—(১৮৬২), Deep Sea Medusae (১৮৮২)।

তিনি ডারুইনের বহু মত গ্রহণ করেন এবং তাহার সহিত জার্মান দার্শনিক ওকেনের (Oken') মতবাদগুলির সমন্বয় সাধন করেন। জার্মানিতে ডারুইনের মতবাদ সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিবার ব্যাপারে তিনি বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তিনি জড়বাদমূলক একত্ববাদে (Materialistic Monism) বিশ্বাসী ; বিরোধী পক্ষ ইহার তীব্র সমালোচনা করেন।

হেগেল—Georg Wilhelm Friedrich Hegel (১৭৭০—১৮৩১) জার্মান দার্শনিক। তাঁহার প্রধান রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Phenomenology of Spirit (১৮০৭), Logic (১৮১২), The Outlines of the Philosophy of Right (১৮২১) ইত্যাদি।

হেগেলের মতবাদকে 'বিজ্ঞানবাদ' অথবা 'পরমচেতনবাদ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হেগেলের মতে পরম চেতন সত্তা (Absolute) সমগ্র বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য। চিন্তা বা প্রজ্ঞা এই পরমের স্বরূপ। গতিশীলতাই ইহার প্রধান লক্ষণ। দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে হেগেল ধর্ম, শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। হেগেলের মতে এই পরমের মধ্যেই আমরা সত্য, শিব ও সুন্দরের সার্থক অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। নয়, প্রতিনয় ও সমন্বয় (Thesis—Antithesis—Synthesis)—এই ত্রিভঙ্গ নিয়মে ইহার গতি হয়।

হেরোডোটাস—Herodotus (খৃঃ পূঃ ৪৮৫-৪২৫) গ্রীক ঐতিহাসিক। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—History. এই গ্রন্থটি রচনা করিয়া হেরোডোটাস 'ইতিহাসের জনক' আখ্যা লাভ করিয়াছেন।

হ্যারিসন—Frederick Harrison (1831—) তিনি লণ্ডনের অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করিয়া কিছুকাল শিক্ষকতা করিবার পর তিনি আইন ও রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগ দেন। ধর্মসংক্রান্তবিষয়ে তিনি একজন দৃষ্টবাদী (Positivist) এবং রাজনীতিতে উদারপন্থী (Liberal) ছিলেন, বহু পত্রিকায় ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিমত পাওয়া যায়। তাঁহার লিখিত রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য The Meaning of History, Order and progress, Lectures on education, Byzantine History.

প্রাচ্য বা ভারতীয় দর্শন প্রধানতঃ দুই ভাগ—বৈদিক (ষড় দর্শন) ও অবৈদিক (নাস্তিক দর্শন), দুইটিই এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

ষড় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব মীমাংসা ও বেদান্ত (উত্তরমীমাংসা)—ভারতীয় দর্শনের এই ছয়টি দর্শনকে একত্র ষড় দর্শন নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই ছয়টি দর্শনের প্রত্যেকটিই আস্তিক অর্থাৎ এগুলিতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে।

(১) **ন্যায় ও বৈশেষিক :** ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন এই উভয় দর্শনকে একত্র ন্যায় বৈশেষিক বলা হইয়া থাকে। ন্যায়দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম এবং বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা কণাদ।

ন্যায়দর্শনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গৌতম-প্রণীত 'ন্যায়সূত্র' এবং এবং বৈশেষিক দর্শনের—কণাদের বৈশেষিক-সূত্র। বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন (চতুর্থ শতক)। বৈশেষিক সূত্রের ব্যাখ্যা না করিয়াও প্রশস্তপাদ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন (পঞ্চম শতক)। ইহা ব্যতীত ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণ-গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের 'ভাষা-পরিচ্ছেদ' পাওয়া যায়। ন্যায়দর্শনকে ভিত্তি করিয়া রচিত উদয়নের 'কুসুমাঞ্জলি' অতি প্রাচীন এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বৈশেষিক-দর্শন ন্যায়দর্শন অপেক্ষা প্রাচীন এবং এই দুইটি দর্শন পৃথকরূপেই

রচিত হইয়াছিল। কিন্তু উভয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এক হওয়ায় পরবর্তী কালে ইহারা একত্র আলোচিত হইয়াছে। এই দুইটি দর্শনই বস্তুতন্ত্রবাদী। আবার এই দুইটি দর্শনেই বহুতত্ত্ববাদ স্বীকৃত। বৈশেষিক দর্শনে সপ্ত পদার্থ এবং পরমাণুবাদের সাহায্যে সমগ্র জগৎসৃষ্টির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং ইহা ন্যায়দর্শনেও স্বীকৃত হইয়াছে।

ন্যায়দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রমাণভাগই ইহাতে মুখ্যস্থান লাভ করিয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক এই উভয় দর্শনেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে। 'ন্যায়' অর্থে আমরা যুক্তিতর্ক বুঝিয়া থাকি। বিচার-বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এই দর্শনের নাম 'ন্যায়দর্শন'।

'বৈশেষিক' শব্দটি 'বিশেষ' হইতে উদ্ভূত। বিশেষ অর্থে নিত্যদ্রব্যসমূহের পরস্পর-ভেদক এক নিত্যপদার্থ বুঝায়। বৈশেষিক দর্শনে আমরা দেখিতে পাই, সমগ্র বিশ্বের মূল তত্ত্ব হিসাবে ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। 'বিশেষ' পদার্থ স্বীকার করা হয় বলিয়া এই দর্শনকে বৈশেষিক দর্শন বলা হয়।

(২) সাংখ্য ও যোগ : সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কপিল এবং যোগ-দর্শনের প্রণেতা পতঞ্জলি। সাংখ্যদর্শনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'সাংখ্য-কারিকা' এবং কপিলের 'সাংখ্যসূত্র'। যোগদর্শনের পতঞ্জলি-কৃত 'যোগসূত্র' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত ব্যাস-কৃত 'যোগ-ভাষ্য' এবং বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত 'যোগ-বার্তিক', বাচস্পতি-কৃত 'তত্ত্ববৈশারদী' উল্লেখযোগ্য।

সাংখ্যদর্শনের নামকরণ সম্পর্কে বহুবিধ মত রহিয়াছে। কাহারও মতে 'সংখ্যা' শব্দের অর্থ 'সম্যগ্ জ্ঞান', কাহারও মতে ইহাতে প্রকৃতির চতুর্বিংশতি-সংখ্যক তত্ত্ব রহিয়াছে বলিয়া ইহার ঐ নাম।

যোগ-দর্শনে অষ্ট যোগাঙ্গের সাহায্যে মোক্ষ বা সমাধি লাভের পন্থা বর্ণিত হইয়াছে। যোগসাধনার উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'যোগদর্শন' বলা হইয়া থাকে।

সাংখ্য ও যোগ এই উভয় দর্শনেই দ্বৈতবাদ স্বীকৃত; পুরুষ-সহ পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্ব-সাহায্যে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই দর্শন দুইটির মধ্যে একমাত্র পার্থক্য—সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু যোগদর্শনে জ্ঞানীগুরুরূপে ঈশ্বর স্বীকৃত। অপর সকল বিষয়ে এই

দুইটি দর্শন সদৃশ বলিয়া যোগদর্শনকে 'সেশ্বর সাংখ্য' নামেও অভিহিত করা হয়।

(৩) পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা : পূর্বমীমাংসাসূত্রের প্রণেতা জৈমিনি এবং উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্রের প্রণেতা ব্যাসদেব। জৈমিনির মীমাংসা সূত্রের উপর শবরস্বামী ভাষ্য এবং ভাষ্যের উপর কুমারিল বার্তিক ও প্রভাকর বৃহতী টীকা প্রভৃতি রচনা করেন। আচার্য শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি ব্যাসের বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

'মীমাংসা' শব্দের অর্থ হইল সদ্‌বিচার ও সমস্যার সমাধান। পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা—এই উভয় দর্শনেই জাগতিক দুঃখসমূহের নিরসন করিবার উপায় আলোচিত হইয়াছে। এই উভয় দর্শনেই বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য-প্রভাব বিশেষভাবে স্বীকৃত। কিন্তু পূর্বমীমাংসায় বেদের পূর্বভাগ কর্মকাণ্ড অর্থাৎ বেদবিহিত যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের উপর প্রাধান্য আরোপিত হইয়াছে। প্রাচীন মীমাংসকগণ বলেন, বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, এবং পরবর্তী কালের মীমাংসকদের মত—নিষ্কাম কর্ম ও আত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ ঘটে। বেদসমূহের পূর্বভাগ অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের উপর প্রাধান্য আরোপ করার জন্য এই মীমাংসাদর্শনকে 'পূর্বমীমাংসা' বলা হইয়া থাকে। অপর পক্ষে উত্তরমীমাংসাদর্শনে বেদের উত্তরভাগ বা জ্ঞানকাণ্ডকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। আত্মানুভূতিই এই দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য। এই দর্শনকে 'বেদান্তদর্শন' বলা হইয়াছে, কারণ ইহা বেদের অন্তভাগ বা উপনিষদ। উপনিষদই বেদান্ত। আবার কাহারও মতে বেদের সারতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ বেদান্তদর্শনে আলোচিত হইয়াছে বলিয়াই ইহাকে ঐ নামে অভিহিত করা হয়।

মীমাংসা-দর্শনে বেদের প্রামাণ্য পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এই মতে বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য। মীমাংসা-দর্শনে বেদের কর্মকাণ্ডের অর্থবিচার করা হইয়াছে; বেদান্তে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অর্থ আলোচিত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বলিয়া স্বীকৃত। জীব, জগৎ ও সৃষ্টিকে ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত বলা হইয়াছে। এই মতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভই মোক্ষলাভ।

অবৈদিক নাস্তিক দর্শন : চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিনটি দর্শন বেদ অস্বীকার করে, ইহারা বেদ-বিরোধী।

(১) চার্বাকদর্শন : লোকায়ত দর্শন নামেও পরিচিত—জড়বাদী ও দেহাত্মবাদী। কেহ কেহ 'বৃহস্পতিসূত্র'কে এই দর্শনের মূল বলেন; ইহা পাওয়া যায় না, অন্যান্য গ্রন্থে কিছু কিছু উদ্ধৃতিমাত্র পাওয়া যায়। চার্বাক কোন ঋষির নাম কিনা সন্দেহ, 'চারু বাক্ যস্য' এই ভাবেই 'চার্বাক' শব্দ নিষ্পন্ন। 'চর্ব্' ধাতু হইতেও চর্বক বা চার্বাক শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

এই দর্শন অনুসারে ইহজগতের উন্নতিই সব, সুখভোগই পরম-পুরুষার্থ; 'দেহ-মন-ইন্দ্রিয়'-ব্যতিরিক্ত আত্মা এবং পরলোক অস্বীকৃত; প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ নাই। আধুনিক জড়বাদিগণও অনেক দিক দিয়া এই ভাবেরই ভাবুক।

(২) জৈনদর্শন : ঋষভদেব প্রভৃতি জিন-প্রবর্তিত, মহাবীর-প্রচারিত; 'তত্ত্বাধিগমসূত্র' মূল গ্রন্থ। জৈনদর্শনের উপর বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এখনও পাওয়া যায়। জৈনদের দুই সম্প্রদায়—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর।

জৈনদর্শনে আত্মা দেহাতিরিক্ত, কিন্তু সাবয়ব, দেহপরিমিত, সঙ্কোচ-বিকাশশীল; ঘাতী (পাপ) কর্ম দ্বারা শরীরে বদ্ধ হয়; পুণ্যকর্ম (সম্যক্ চারিত্র) দ্বারা মুক্ত হয়। মুক্তিতে আত্মার দেহবন্ধন চলিয়া যায়, এবং অনবরত ঊর্ধ্বলোকে গতি হয়।

(৩) বৌদ্ধদর্শন : তথাগত বুদ্ধ-কর্তৃক প্রচারিত, তাঁহার পূর্বেও বৌদ্ধমত ছিল; 'ত্রিপিটক' বৌদ্ধদের প্রধান গ্রন্থ। বৌদ্ধদর্শন প্রধান চারিটি মতে বিভক্ত—সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ। প্রথম তিন মতে আত্মা ক্ষণিকবিজ্ঞানস্বরূপ, শেষ মতে আত্মা শূন্য। মাধ্যমিক মতের সহিত অদ্বৈত মতের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে অদ্বৈতমতে আত্মা সৎ।

সংক্ষিপ্ত তথ্য ও টীকা

পৃষ্ঠা—পঙ্‌ক্তি

৩ ৯ 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ ···'—বৃহ. উপ. ২।৫।১৯

১৮ 'নীহারেণ প্রাবৃতা···'—কুয়াশার মতো অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া জীবগণ মনে করে, 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা'; ইহলোকে সুখভোগ ও পরলোকে স্বর্গভোগ করিবার জন্য যজ্ঞে নানা প্রকার স্তোত্র উচ্চারণ করে।

৪ ১ 'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ···'—শ্বেতাশ্ব. উপ. ৪।১০

৫ ২ 'সেই সর্বব্যাপী প্রাণতত্ত্ব···'—প্রশ্ন উপ. ২।৫-১৩

৮ 'জীব চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আসে।'—বৃহ. উপ. ১৬।২।১৬

ছান্দোগ্য উপ. ৫।১০।৪

৮ ২২ 'সুবর্ণলোম' (Golden Fleece): গ্রীকপুরাণের গল্প,—এখানে অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য কোন কিছুর অনুসন্ধান।

২৪ ২২ 'আপনারা সকলেই···জলপ্লাবনের গল্প জানেন'—নোয়া (Noah)-র গল্পের জন্য দ্রষ্টব্য O. T. Genesis, Ch. 7.

৩৭ ৩ 'একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন'—এখানে আলেকজাণ্ডারের কথাই বলা হইতেছে।

৩৯ ২৩ 'হে সখে, কেন রোদন করিতেছ ?···'—তুলনীয়:

কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে স্বরূপম্
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিরূপম্।
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বয়াংসি
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥' অবধূতগীতা, ৩।৩৫

৪১ ১৫ 'হিন্দুগণ বিশেষের প্রতি বড় মন দেন না।'—সামান্যের প্রতিই তাহার দৃষ্টি। 'যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য' দ্রষ্টব্য বৃহ. উপ. ২।৪।৭-১১

৪৬ ২৩ 'যাঁহারা অত্যন্ত ধার্মিক, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে···' ঐ ৬।২।১৫

ছান্দোগ্য উপ. ৫।১০।১-২

৪৭ ১১ 'যাঁহারা অতিশয় দুর্বৃত্ত, তাহাদের মৃত্যু হইলে'—ঐ ৫।১০।৭

৪৮ ১৮ 'আর চন্দ্রলোকের পথকে 'পিতৃযান' বলে'—ঐ ৫।১০।৩-৪

বৃহ. উপ. ৬।২।১৬

৪৯ ৭ 'একটি জলন্ত মশাল'—অলাতচক্র দৃষ্টান্ত, মাণ্ডূক্য কারিকা, ৪।৪৭

৫৭ ৫ 'প্রাক্তন কর্মের বেগ'—সাংখ্যকারিকা ৬৭

৭১ ১ ট্যান্টালাস: গ্রীক পুরাণে জিউসের পুত্র। অমৃত চুরি করার অপরাধে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হয়—হ্রদে তিনি ওষ্ঠ পর্যন্ত নিমজ্জিত, কিন্তু জল পান করিতে গেলে জল নামিয়া যায়; উপরে

পৃষ্ঠা—পঙ্‌ক্তি

সুন্দর সুন্দর ফল ঝুলিতেছে, হাত বাড়াইতে গেলে সেগুলি উঠিয়া যায়।—অতৃপ্ত ও অপূরণীয় বাসনার দৃষ্টান্ত।

৮৫ ১৩ 'বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া দৃঢ়স্বরে যাহা বলিয়াছেন'—'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্‌' ইত্যাদি—ললিতবিস্তর

৮৮ ৭ মোহন বংশীবাদক: ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং-রচিত 'The Pied Piper of Hamelin' কবিতা স্মরণীয়।

১০৮ ২৩ 'কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে আরও খোলাখুলিভাবে বলিয়াছিলেন'—এ-বিষয়ে ৪০৫ পৃষ্ঠায় ১৩-১৭ পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য।

১০৯ ১৫ 'অস্তি নাস্তি কিছুই ছিল না'···নাসদীয়সূক্ত দ্রষ্টব্য
'নাসদাসীন্ন যদাসীত্তদানীং'—ঋগ্বেদ ১০।১২৯।১

১১৩ ২১ কল্প: পুরাণমতে ৪,৩২,০০,০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার দিবস ও সৃষ্টিকাল। অনুরূপ কাল রাত্রি, উহা প্রলয়কাল। এই দিবস ও রাত্রিতে এক কল্প।

১১৭ ৯ উদ্দেশ্যবাদ (Design Theory): জগতের সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া ইহার পশ্চাতে যে একজন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বা ঈশ্বর আছেন, তাহা বোঝা যায়।

২৭ 'আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি'—
'তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ' ইত্যাদি মুণ্ডক ২।১।৭-৮-৯

১১৯ ১৭ 'তুমিই পুরুষ তুমিই স্ত্রী'—'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি' শ্বে. উপ. ৪।৪

১৬২ ১৭ 'আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বক্তা'—
মিঃ ইঙ্গারসোল, ৭ম খণ্ডে ব্যক্তিপরিচয় দ্রষ্টব্য।

১৮৬ ৮।৯ 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ': শ্রেয়ঃ অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি; প্রেয়ঃ অর্থাৎ ভোগ্য প্রিয়বস্তু।

১৮৯ ১৬ 'শৈলোপদেশ': N.T. ম্যাথু ৫—৭, ল্যুক ৬: ২০-৪৯

১৯৩ ২৭ 'ওঁকারের অতিশয় মহিমা···'—ওঁকারতত্ত্ব, মাণ্ডুক্য উপ. দ্রষ্টব্য।

২০৯ ২১ স্বারাজ্যসিদ্ধি: আচার্য শঙ্করের অন্যতম প্রধান শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য-কৃত বেদান্তগ্রন্থ।

২৩২ ৯।১০ 'জড়বিজ্ঞানও ইহাই ঘোষণা করিতেছে'—আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সকল বস্তুই বিদ্যুৎশক্তি (কণা)র বিভিন্ন সংস্থান।

২৬০ ৫ 'জ্ঞানলাভের দুইটি মূলসূত্র আছে'—
আরোহ (Inductive) ও অবরোহ (Deductive) পদ্ধতি।

২৬২ ৭।৮ 'শূন্য হইতে সৃষ্টি···উপহাসের বিষয়'—
শূন্য হইতে শূন্যই আসিতে পারে, 'Ex nihilo nihil fit'
শূন্য হইতে পদার্থ সৃষ্টি কোন দর্শনই স্বীকার করে না।

পৃষ্ঠা—পঙ্‌ক্তি

২৭৩ ১২ 'প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাত্মা স্বীকার করিবার…'—বুদ্ধপ্রদত্ত শিক্ষা হইতেই বৌদ্ধদর্শনে 'অনত্তাবাদ'-এর সূত্রপাত।

৩০১ ১০ 'বেদে পাঠ করি : ঊর্ণনাভ যেমন…' ইত্যাদি, মুণ্ডক উপ. ১।১।৭

৩০২ ৯ 'জলন্ত অগ্নি হইতে যেমন লক্ষ লক্ষ স্ফ লিঙ্গ'—ঐ ২।১।১

৩০৯ ৭ 'যখন হৃদয়ের সকল কামনা পরাভূত হইবে'—'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামাঃ যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ…' ইত্যাদি কঠ উপ. ২।৩।১৪

৩২০ ২৩ 'নেফেস' অথবা 'রুয়াখ' : হিব্রুদের ভাষায় আত্মার প্রতিশব্দ 'নেফেশ' (nephesh, naphsha, nefs = breath) বহু অর্থ-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছে, প্রথমত ইহার অর্থ ছিল 'বায়ু বা প্রাণবায়ু'। আত্মার আর একটি প্রতিশব্দ 'রুয়া' (ruah = spirit), তাহারও মূল অর্থ 'প্রবল বায়ু' (wind)

৩২৩ ১৫ ইস্থার : বা ইস্তারত—৬ষ্ঠ খণ্ডে ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩২৬ ৫ ওসিরিস : বা অসিরিস—৬ষ্ঠ খণ্ডে ১১৪ পৃঃ দ্রঃ।

২৭ এপুলিয়াস (Apuleius ১২৫ ? খৃঃ) রোমীয় লেখক ও দার্শনিক। প্রাচ্যদেশসমূহে ভ্রমণ করিয়া তিনি জ্ঞান আহরণ করেন।

৩৩১ ১৭ জগদ্রূপ যন্ত্রের নির্মাতা (Deus ex Machina) :
প্রাচীনকালে গ্রীসে নাট্যানুষ্ঠানে অভিনয় সংক্রান্ত অসুবিধা সৃষ্টি হইলে মঞ্চে ঈশ্বরের অবতারণা করিয়া অসুবিধা দূর করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ—কোন কষ্টকল্পনা বা অসঙ্গত কল্পনা। তথ্যগত অসুবিধা হইলে দার্শনিকগণ যে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া সেই অসুবিধা দূর কারতে চেষ্টা করেন, তাহাকে 'Deus ex Machina' বলা হয়।

৩৪১ ১১ 'সকল কর্মই এতদতিরিক্ত কাহারও জন্য হইতে বাধ্য'—
'সংহতানাং পরার্থত্বাৎ…' সাংখ্যকারিকা ১৯।২০

৩৪৪ ৫ 'সেই শাশ্বত পুরুষ নিঃশ্বাসের…'—বৃহ. উপ. ২।৪।৯

৩৫৯ ১৮ 'দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে…'—মুণ্ডক. উপ ৩।১।১

৩৮৩ ৬ 'জ্ঞানলাভের সোপানশ্রেণী'—বিবেকচূড়ামণিঃ (১৮-৩২) দ্রষ্টব্য।

৩৮৭ ২০ সোলন ও ক্রিসাস : সোলন (খৃ. পূ. ৬-৭ শতক) এথেন্সের বিখ্যাত জ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ্; ক্রিসাস (খৃ. পূ. ৬ শতক) লিডিয়ার ধনী রাজা। পারস্যরাজ সাইরাসের নিকট পরাজিত হন।

৪১৬ ১।২ মিনেন্দার, মিলিন্দ : পালি সাহিত্যে বিখ্যাত 'মিলিন্দপনহ' দ্রষ্টব্য।

৪৫৯ ১ লিঙ্গশরীর : সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীর। 'পঞ্চদশী' তত্ত্ববিবেক প্রকরণ বা 'পঞ্চীকরণ'-এর সুরেশ্বরাচার্য-কৃত বার্তিক দ্রষ্টব্য।

৪৬০ ১৩ 'একজন যোগী'—পওহারীবাবা, ৮ম খণ্ডে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নির্দেশিকা